বরুণকুমার চক্রবর্তী

বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত

প্রথম প্রকাশ :
১লা বৈশাখ, ১৩৮৯

Bangla Sahitye Bangetar Bharater Pratiphalan.
[India other than Bengal as reflected in Bengali Literature]
by Dr. Barun Kumar Chakrabarty M. A. Ph. D.

প্রচ্ছদ :
অজয় গুপ্ত

পঁচিশ টাকা

সায়নের পক্ষে শ্রীঅমলকুমার সাহা কর্তৃক ১১৬, কার্ল মার্কস সরণি, কলিকাতা-৭০০০২৩ থেকে প্রকাশিত এবং শ্রীশীতলচন্দ্র চক্রবর্তী কর্তৃক শ্রীনারায়ণ প্রিন্টার্স, ৩/১ বি, মোহনবাগান লেন, কলিকাতা-৭০০০০৪ হইতে মুদ্রিত।

উৎসর্গ

আমার গবেষণা নির্দেশক

ড. অরুণকুমার বসু এম. এ, পি. আর. এস, পি. এইচ. ডি.

শ্রীচরণেষু—

এই লেখকের রচিত অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

সাহিত্য সমীক্ষা

বাংলা লোকসাহিত্য চর্চার ইতিহাস

বাংলা প্রবাদে স্থান-কাল-পাত্র

লোক-বিশ্বাস ও লোক-সংস্কার

লোক সংস্কৃতি ঃ নানা প্রসঙ্গ

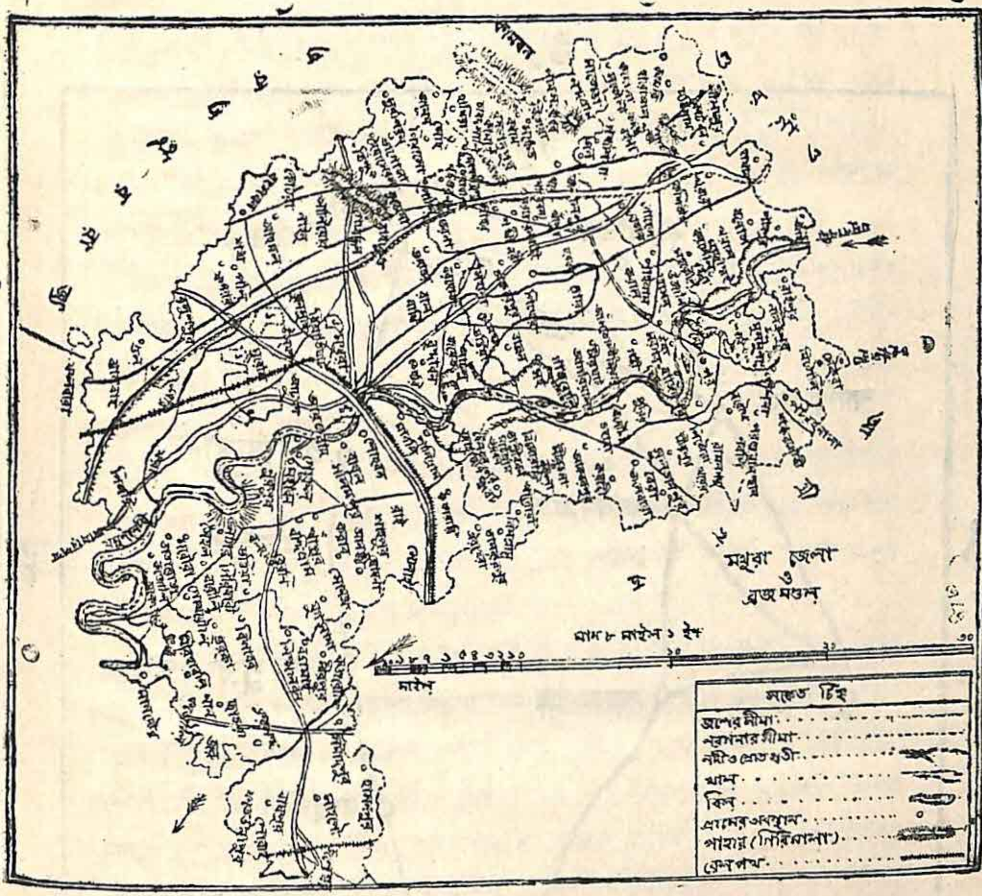
টডের রাজস্থান ও বাংলা সাহিত্য

নিবেদন

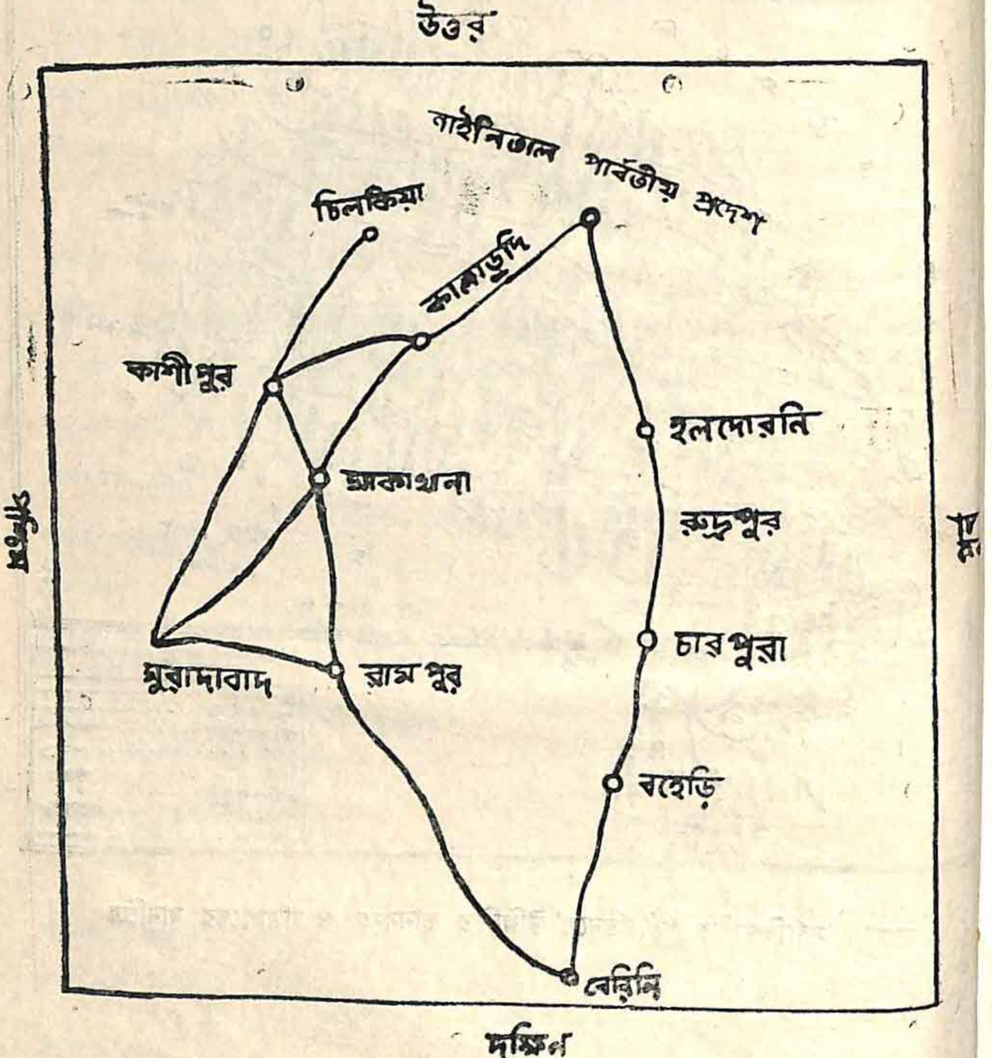
বাঙ্গালী নাকি কূপমণ্ডুক, ঘর থেকে বেরোতে তার একান্তই অনীহা। এই ধরণের প্রচারের সঙ্গে যতই কেন ভৌগোলিক কারণ যুক্ত থাকুক, তবু ঐতিহাসিক দিক দিয়ে এবংবিধ প্রচারের অসারতা বর্তমান আলোচনায় প্রতিপন্ন। শ্রীচৈতন্য থেকে শুরু করে পরবর্তীকালের বাঙ্গালীদের শুধু বৃহত্তর ভারত পর্যটনই নয়, সেইসঙ্গে পর্যটনজনিত অভিজ্ঞতার সার সংকলন বর্তমান গ্রন্থটির অন্যতম আকর্ষণ হবে বলে বিশ্বাস করি। মোটামুটিভাবে স্বাধীনতা পূর্ববর্তী অখণ্ড ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের সামাজিক, অর্থ নৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিচয় দানই গ্রন্থটি রচনার মুখ্য অভিপ্রায়; প্রসঙ্গত সেই উদ্দেশ্যের কথাও জানিয়ে দেওয়া গেল। গ্রন্থটি রচনায় যাঁর কাছে বর্তমান লেখক সর্বাধিক ঋণী, তিনি হলেন আচার্য সুকুমার সেন। গ্রন্থটি রচনার পরিকল্পনা তাঁরই নির্দেশে। ডঃ প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের কাছেও গ্রন্থটি রচনার ব্যাপারে উৎসাহ পেয়েছি। এছাড়া আমার পূজনীয় জ্যাঠামশাই এবং পিতৃদেবের প্রেরণা ছাড়া এই বইখানি রচিত হ'ত না। সর্বোপরি গ্রন্থটি প্রকাশের জন্য শ্রীমান অমলকুমার সাহা এবং শ্রীঅনুপকুমার মাহিন্দার গ্রন্থকারের ধন্যবাদার্হ হয়েছেন।

১লা বৈশাখ, ১৩৮৯ — **বরুণকুমার চক্রবর্তী**

বিষয়সূচী ঃ পৃষ্ঠা ঃ



যদুনাথ সর্বাধিকারীর 'তীর্থভ্রমণে' উল্লিখিত স্থানসমূহ ও যাত্রাপথের মানচিত্র



দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' গ্রন্থে উল্লিখিত স্থানসমূহের মানচিত্র

10064

ভূমিকা

ষোড়শ শতাব্দীতে বৈষ্ণব ধর্মের প্রভাবে ও মোঘল শাসনের জন্য বাংলা দেশের সঙ্গে ভারতের অন্যান্য প্রদেশের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপিত হয়। পরিণামে বাংলা সাহিত্যে ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ বৈষ্ণব সাহিত্যে তার প্রতিফলন ঘটে। অবশ্য বাংলা দেশের সঙ্গে বঙ্গেতর ভারতের রাজনৈতিক তথা ঐতিহাসিক সম্পর্ক দীর্ঘ দিনের।

গুপ্ত সাম্রাজ্যের পতনের পরে গৌড় বা পশ্চিমবঙ্গে সপ্তম শতাব্দীতে শশাঙ্কের অভ্যুদয় ঘটে। দক্ষিণে বর্তমান উড়িষ্যা প্রদেশের গঞ্জাম জেলা এবং পশ্চিমে বারাণসী পর্যন্ত ছিল তাঁর অধিকার ভুক্ত। শশাঙ্কের অধীনে ছিল বুদ্ধ গয়া এমন কি মগধও ছিল তাঁর রাজ্যভুক্ত।

আনুমানিক ৭৪০ খ্রীষ্টাব্দে কর্কোট বংশীয় মুক্তাপীড় ললিতাদিত্য কাশ্মীরের সিংহাসনে আরোহণ করেন। কনৌজরাজ যশোবর্মার পরাজয়ের পর মগধ, বঙ্গ এবং কলিঙ্গ পর্যন্ত তাঁর অধিকারভুক্ত হয়। এমন কি পরবর্তী কালে মালব ও গুজরাটেও তাঁর আধিপত্য হয় স্থাপিত।

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতকের মধ্যভাগে ঘটে পাল সাম্রাজ্যের সূচনা। গোপালের পুত্র ধর্মপালের সময়ে বঙ্গদেশ থেকে পাঞ্জাবের অন্তর্গত সুদূর জলন্ধর পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব ছিল বিস্তৃত। ধর্মপাল তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত উত্তর ভারতে নিজ প্রতিপত্তি অটুট রেখেছিলেন। ধর্মপালের পুত্র দেবপালের সাম্রাজ্য উত্তরে কম্বোজ থেকে দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করেছিল। প্রথম মহীপালের সময়ে পাল প্রভুত্ব খুব সম্ভবত বারাণসী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রথম মহীপালের পুত্র নয়পালের রাজত্বকালে চেদিরাজ লক্ষ্মীকর্ণ বাংলাদেশ আক্রমণ করেন। অতঃপর উভয় রাজার মধ্যে সম্পাদিত সন্ধির ফলে নয় পালের পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল লক্ষ্মীকর্ণের কন্যা যৌবনশ্রীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে সন্ধির শর্তানুযায়ী আন্তর্রাজ্য রাজনৈতিক বিবাহ ভারতবর্ষের ইতিহাসে এই প্রথম অনুষ্ঠিত হয়। তুর্কী আক্রমণ পর্যন্ত পাল রাজগণ বিহার প্রদেশে রাজত্ব করেছিলেন বলে প্রমাণ পাওয়া যায়।

সেন রাজারা ছিলেন দাক্ষিণাত্যের কর্ণাট দেশীয় ব্রাহ্মণ। এঁরা এসেছিলেন সুদূর কর্ণাট থেকে বাংলাদেশে রাজত্ব করতে। এঁরা কর্ণাটের

সঙ্গেও যোগসূত্র রক্ষা করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীতে সামন্তসেন কর্তৃক রাঢ় অঞ্চলে 'বর্দ্ধমান বিভাগ' প্রথম একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত সেন রাজারা কয়েক পুরুষ ধরে বাংলাদেশে রাজত্ব করেছিলেন। বিজয় সেন কামরূপ, ত্রিহুত এবং কলিঙ্গ রাজ্য জয় করেছিলেন। বিজয় সেনের পুত্র বল্লাল সেনের সময়ে উত্তরবঙ্গ, রাঢ়, পশ্চিমবঙ্গ ও বাগড়ী, দক্ষিণবঙ্গ এবং মিথিলা সেনরাজ্যভুক্ত ছিল। বল্লাল সেনের পুত্র লক্ষ্মণ সেন কামরূপ ও কলিঙ্গ জয় করে প্রয়াগ, বারাণসী এবং পুরীতে বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করেছিলেন।

বাংলাদেশের সঙ্গে বঙ্গেতর ভারতের যোগাযোগের আরও নিদর্শন দেওয়া যেতে পারে। জব্বলপুর অঞ্চলে ডাহলদেশে প্রতিষ্ঠিত চেদিরাজ্যের গাঙ্গেয়দেবের পুত্র লক্ষ্মীকর্ণ আনুমানিক ১০৪০ থেকে ১০৭০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কনৌজ থেকে পশ্চিমবঙ্গ পর্যন্ত অধিকার করে নিয়েছিলেন। ইখতিয়ার উদ্দীন মুহম্মদ লক্ষ্মণ সেনের কাছ থেকে পশ্চিম ও উত্তরবঙ্গ অধিকার করেছিলেন। সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতকের শেষার্ধে সমগ্র বঙ্গদেশে তুর্কী আধিপত্য স্থাপিত হয়।

শামসউদ্দীন ইলিয়াস শাহের আমলে বঙ্গদেশ থেকে বারাণসী পর্যন্ত তাঁর রাজত্ব বিস্তারলাভ করেছিল বলে অনুমিত হয়।

এইভাবে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিস্তৃত অঞ্চলের রাজনৈতিক যোগাযোগ বহু পূর্ব থেকে চলে এলেও, উল্লেখযোগ্য চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের যোগসূত্রের কোন স্বাক্ষরই কিন্তু বাংলা সাহিত্যে মেলে না। বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থানের সম্পর্কের স্বাক্ষর সংস্কৃত সাহিত্যে মোটেই বিরল নয়। কিন্তু আমাদের আলোচ্য বাংলা সাহিত্য। তাই বর্তমান আলোচনায় সংস্কৃত সাহিত্যের বিষয় উল্লিখিত হল না। অবশ্য প্রাক্ চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্য তেমন বাঞ্ছিত উৎকর্ষও লাভ করেনি। এই সময়ের সাহিত্য বলতে প্রধানতঃ চর্যাপদ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী এবং মঙ্গলকাব্য গুলিকেই বোঝায়। বলাবাহুল্য এইসব ধর্মকেন্দ্রিক সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারতের পরিচয় প্রদানের সুযোগও ছিল নিতান্ত সীমিত। সর্বোপরি মনে রাখতে হবে যে বাংলাদেশের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক তেমন ঘনিষ্ঠ হয়ে আমাদের সাহিত্যকে প্রভাবিত করতে পারেনি আসলে সাংস্কৃতিক তথা ভাবগত সম্পর্কই মুখ্যতঃ সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়ে

থাকে। কিন্তু বাংলাদেশের সঙ্গে অবশিষ্ট ভারতের সম্পর্ক সেই পর্যায়ে উন্নীত হতে পারেনি বলেই আমাদের সাহিত্য প্রতিবেশী প্রদেশ সমূহ এবং সেখানকার অধিবাসীদের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করেছে। ভাষা সমস্যাও বাংলাদেশের সঙ্গে প্রতিবেশী প্রদেশ সমূহের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপনের ক্ষেত্রে যথেষ্ট অন্তরায় সৃষ্টি করে থাকবে। অর্থ নৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য হেতু এবং তদুপরি যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বহির্বঙ্গে বাঙ্গালী উপনিবেশ স্থাপনের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেনি। অথবা উপনিবেশ স্থাপনের সুযোগ লাভ থেকে হয়েছিল বঞ্চিত। সর্বোপরি বাঙ্গালী স্বভাবতঃই ঘরমুখো; এই সব কারণে প্রাক্ চৈতন্য যুগে বাঙ্গালীর গতিবিধি সীমাবদ্ধ ছিল বাংলাদেশের মধ্যেই। অবশ্য তদানীন্তন বাংলা দেশের ভৌগোলিক পরিসীমা ছিল বিস্তৃততর। আসাম, বিহার, উড়িষ্যা প্রভৃতি রাজ্য সমূহের উল্লেখযোগ্য অংশ ছিল বঙ্গদেশেরই অন্তর্ভুক্ত। যাই হোক, বঙ্গেতর ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল না বলেই ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থান এবং ঐ সকল স্থান সমূহের অধিবাসীদের সম্পর্কে বাঙ্গালী ছিল অনবহিত। তাই একদিকে প্রাক্চৈতন্য যুগের বাংলা সাহিত্যে যেমন উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের অভাব, সেইসঙ্গে চৈতন্যদেবের পূর্ববর্তীকালে রচিত বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারতের পরিচয় সম্পূর্ণ রূপে অনুপস্থিত। প্রাক্ চৈতন্য যুগে প্রাপ্ত চণ্ডীদাসের রচনায় যে মথুরা-বৃন্দাবনের উল্লেখ দেখতে পাওয়া যায়, তা ভাগবতের মথুরা-বৃন্দাবন হলেও ইতিহাসের মথুরা-বৃন্দাবন নয়। যে সব মঙ্গলকাব্যে প্রাক্ চৈতন্য যুগের কিছু প্রতিফলন ঘটেছে বলে অনুমিত হয়, সেগুলিতে বাণিজ্য কিংবা যুদ্ধযাত্রা প্রসঙ্গে বর্ণিত বিষয়গুলি গল্পকথা রূপেই বিবেচিত হবার যোগ্য। এইসব বর্ণনার সঙ্গে ইতিহাসের যোগ সামান্যই। এইসব বর্ণনা একান্তভাবেই কৃত্রিম, কাল্পনিক এবং সম্পূর্ণরূপে জনশ্রুতিনির্ভর। অতঃপর চৈতন্যদেবের আবির্ভাবে (১৪৮৬) বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতবর্ষের বিস্তৃততর অঞ্চলের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। চৈতন্যদেব মাত্র ষোল বৎসর বয়সে পিতৃতীর্থ গয়ায় পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে গমন করেন। এইখানেই তিনি ঈশ্বর পুরীর কাছে দীক্ষিত হন। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যদেব সুদীর্ঘকাল বাংলাদেশের বাইরেই অতিবাহিত করেন। তন্মধ্যে ছয় বৎসরে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি সমগ্র দক্ষিণ ভারত, কাশী, মথুরা-বৃন্দাবন, এলাহাবাদ ইত্যাদি পরিভ্রমণ করেছিলেন।

চৈতন্যদেব নীলাচলেও দীর্ঘদিন অতিবাহিত করেছিলেন। চৈতন্যদেবকে অবলম্বন করে ষোড়শ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যে যে চরিত শাখার উদ্ভব হয়, তাতে চৈতন্যদেবের ভ্রমণ বৃত্তান্ত এবং প্রসঙ্গত ঐসব স্থান সমূহের ভৌগোলিক ও সামাজিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন ঘটে। এইজন্য বৃন্দাবন দাস রচিত' চৈতন্য ভাগবত', লোচনদাস বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্যচরিতামৃত', জয়ানন্দ বিরচিত 'চৈতন্যমঙ্গল', চূড়ামণিদাস বিরচিত 'গৌরাঙ্গ বিজয়' প্রভৃতি জীবনী কাব্যগুলির ধর্মীয় মাহাত্ম্য ব্যতীত ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এতদ্ব্যতীত প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতি গ্রন্থাদিতেও বিক্ষিপ্তভাবে বহির্বাংলার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। চৈতন্যদেব মথুরা এবং বৃন্দাবনে বৈষ্ণব ধর্মের কেন্দ্র স্থাপন করেন। এই সূত্রে মথুরা-বৃন্দাবনের সঙ্গে বাংলার ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপিত হয়। বাংলা সাহিত্যেও তার প্রতিফলন ঘটে।

১৬৭৪ শকাব্দে ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর রচিত অন্নদামঙ্গল কাব্যে নীলাচল, মথুরা-বৃন্দাবন, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, গুজরাট প্রভৃতি কয়েকটি স্থানের যৎসামান্য বিবরণ পাওয়া যায়।

বঙ্গেতর ভারতের বিস্তৃততর পরিচয় প্রদানকারী গ্রন্থরূপে ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিজয়রাম সেনের 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থখানি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার দেওয়ানী লাভ করে এবং লর্ড ক্লাইভ গভর্ণর পদে বৃত হন। ক্রমেই দেশের বিস্তৃততর ক্ষেত্রে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা ইংরেজ শাসকগণের আধিপত্য স্থাপিত হতে থাকে। এর পরিণামে বাঙ্গালী ব্যবসা ও চাকুরী সূত্রে বৃহত্তর ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দে হারি ভেরেলস্ট লর্ড ক্লাইভের স্থলাভিষিক্ত হন। সে সময়ে ইংরেজ সরকারের বিশ্বস্ত ও নির্ভরশীল কর্ম্মচারী ছিলেন দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষাল। রাজনৈতিক কারণে তৎকালীন দেশের অভ্যন্তরীণ সংবাদ সংগ্রহের গুরুদায়িত্ব ন্যস্ত ছিল দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের ওপর। গোকুলচন্দ্রের প্রয়োজনে এবং তৎসহ তীর্থ ভ্রমণের অভিপ্রায়ে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল, কবি বিজয়রাম সেন সমভিব্যাহারে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেন। কবি বিজয়রাম তাঁর 'তীর্থমঙ্গলে' কৃষ্ণচন্দ্রের গুণকীর্তন প্রসঙ্গে তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্তন এবং সেইসঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতবর্ষের এক উল্লেখযোগ্য অংশের প্রামাণিক চিত্রকে তুলে ধরেছেন। ইতিপূর্বে বাংলা সাহিতের অপর কোন গ্রন্থে

তীর্থমঙ্গলের ন্যায় অবিমিশ্র ভ্রমণবৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ হতে দেখা যায়নি। এতদ্ব্যতীত পয়ার ছন্দে রচিত এই ভ্রমণ কাব্যটিতে তীর্থস্থান সমূহ এবং ভ্রমণকালীন ঘটনাদি ব্যতীত তৎকালীন সমাজ চিত্র, দেশবাসীর মানসিকতা প্রভৃতিও প্রতিফলিত হয়েছে। বাস্তবিক গ্রন্থটিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধের ভারতবর্ষের ইতিহাস ও সমাজ তত্ত্বের আকর গ্রন্থ রূপে অভিহিত করা চলে।

ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বৃদ্ধবয়সে কাশীতে গিয়ে অবস্থান করেন। তিনি তাঁর কাশীবাসের অভিজ্ঞতা 'কাশীখণ্ড' নামক গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করে গেছেন। 'পুরাণ' অনুসরণে রচিত 'কাশীখণ্ডে'র উপসংহারে কয়েকটি অধ্যায়ে কাশীর সম্পূর্ণ পরিচয় বিধৃত রয়েছে। এখানকার দ্রষ্টব্য বিষয়গুলি, সাম্বৎসরিক উৎসবানুষ্ঠান, এখানে প্রস্তুত শিল্প দ্রব্যাদি, সাধারণের ব্যবহার্য পরিচ্ছদ প্রভৃতির সুনিপুণ বিবরণ গ্রন্থটির গুরুত্বকে বিশেষ ভাবে বর্ধিত করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করতে হয় যে 'কাশীখণ্ড' থেকেই বাংলা সাহিত্যে বিশেষ কোন একটি স্থান অবলম্বনে গ্রন্থ রচনার সূত্রপাত ঘটে। 'কাশীখণ্ডে'র লিপিকাল ১৮০৯ খ্রীষ্টাব্দ হলেও গ্রন্থটি অন্ততঃপক্ষে এর বার-তের বৎসর পূর্বেই রচিত হয়ে থাকবে। সুতরাং অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষার্ধের কাশীর সামগ্রিক জীবন চিত্র হিসাবে 'কাশীখণ্ড' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে মূল্যবান সংযোজন রূপে বিবেচিত হবার যোগ্য।

স্বনামধন্য কবিবর ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহ বৎসরাধিককাল পরিভ্রমণ করেছিলেন (১২৫৬)। 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত 'ভ্রমণকারী বন্ধুর লিখিত বিষয়' থেকে তাঁর সেই ভ্রমণ অভিজ্ঞতার কথা জানা যায়। অবশ্য ঈশ্বর গুপ্ত প্রদত্ত বিবরণ পরিমাণের বিচারে তেমন উল্লেখযোগ্য না হলেও গুপ্তকবি বর্ণিত বিষয়ের গুরুত্ব যে অপরিসীম তা অনস্বীকার্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালীর ইতিহাস প্রিয়তার জন্য ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান অবলম্বনে যেমন গ্রন্থ রচিত হতে দেখা গেছে, তেমনই কর্মসূত্রে শিক্ষিত বাঙালীর ভারতবর্ষের অন্যত্র গমন ও উপনিবেশ স্থাপন উপলক্ষেও বাংলা সাহিত্যে সেইসব স্থানের চিত্র ইত্যাদির প্রতিফলন ঘটেছে। অবশ্য পুণ্য সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ভারতের বিভিন্ন তীর্থস্থান সমূহ পর্যটন এবং সেই উপলক্ষে গ্রন্থাদি রচনার সংখ্যাও ঊনবিংশ শতাব্দীতে নেহাৎ কম হয়নি।

ঊনবিংশ শতাব্দীর এই রকম এক উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল যদুনাথ

সর্বাধিকারীর 'তীর্থভ্রমণ'। লেখক ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ ছয় বৎসর কাল ভারতের অধিকাংশ উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানগুলি পর্যটন করেছিলেন। তবে 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থটি তীর্থস্থান সমূহের বর্ণনাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায়নি। তীর্থস্থান সমূহের মাহাত্ম্যের সঙ্গে সেই সব স্থান সমূহের সমাজচিত্র, লোকচরিত্র, প্রচলিত রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনায় 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থটিও ভারতবর্ষের এক উল্লেখযোগ্য অংশের প্রামাণিক ইতিহাসে পরিণত হয়েছে।

রাজেন্দ্রমোহন বসু রচিত 'কাশ্মীরকুসুম' (১২৮২) গ্রন্থটিতে সমগ্র কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। বাস্তবিক, কাশ্মীর বিষয়ে এবংবিধ প্রামাণিক গ্রন্থ ইতিপূর্বে আর কোন সাহিত্যেই রচিত হতে দেখা যায়নি। কাশ্মীরের দ্রষ্টব্য স্থান সমূহের বর্ণনা থেকে আরম্ভ করে এখানকার ভৌগোলিক, সামাজিক, ধর্মীয় প্রভৃতি বিষয় সমূহের যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্যাদি গ্রন্থটিতে পরিবেষিত হয়েছে।

দুর্গাচরণ রায় রচিত 'দেবগণের মর্ত্যে আগমন' (১২৮৭) শীর্ষক গ্রন্থটিতে গঙ্গার উভয় তীরস্থিত প্রসিদ্ধ স্থান সমূহের বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল বোম্বাইয়ে অতিবাহিত করেন। অতঃপর বোম্বাই প্রবাসের অভিজ্ঞতাকে তিনি 'বোম্বাই চিত্র' (১২৯৫) নামক গ্রন্থে প্রকাশ করেন। ভূস্বর্গ কাশ্মীর সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনায় যেমন 'কাশ্মীর কুসুমে'র গুরুত্ব, অনুরূপ গুরুত্বের অধিকারী 'বোম্বাই চিত্র', বোম্বাইয়ের আনুপূর্বিক বিবরণ দানের জন্য।

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য বিষয় অন্তপুরঃবাসী মহিলাদের রচিত ভ্রমণ বিষয়ক গ্রন্থাদি। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রসন্নময়ী দেবীর 'আর্য্যাবর্ত' (১২৯৫) এবং গিরিন্দ্রনন্দিনী দেবী রচিত 'ধোলপুর' (১২৯৫) গ্রন্থ দু'টি। প্রথম গ্রন্থটিতে লেখিকা এটোয়া সহ আগ্রা, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী প্রভৃতির সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। দ্বিতীয় গ্রন্থটিতে লেখিকা আগ্রা এবং গোয়ালিয়রের মধ্যবর্তী 'ধোলপুর' নামক এক রাজপুত রাজ্যের—পূর্ণাঙ্গ পরিচয় প্রদান করেছেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বাগচী প্রণীত 'তীর্থমুকুর' (১৮৯২) গ্রন্থটিতে কাশী, গয়া, বৈদ্যনাথ এলাহাবাদ, অযোধ্যা, নৈমিষারণ্য, মথুরা-বৃন্দাবন, পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, কনখল,

বদরিকাশ্রম, পুরী, চন্দ্রনাথ, কামাখ্যা ইত্যাদি হিন্দুদের প্রধান প্রধান তীর্থস্থান গুলির সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে।

স্বল্পপরিসর ক্ষেত্রে হলেও মণিপুরের বাস্তব ও প্রামাণিক চিত্র উপস্থাপিত করায় জানকীনাথ বসাকের 'মণিপুর প্রহেলিকা' (১৮৯২) গ্রন্থটিও সবিশেষ গুরুত্বের অধিকারী।

ছোটনাগপুরের অন্তর্গত পালামৌ অঞ্চলকে অবলম্বন করে রচিত বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্রের—'পালামৌ' (১৮৯৩) গ্রন্থটি ক্ষুদ্রায়তন বিশিষ্ট হলেও এই অঞ্চলের—নির্ভরযোগ্য তথ্যাদির আকর গ্রন্থরূপে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বিরচিত 'আত্মজীবনী' (১৮৯৪) এবং তাঁর রচিত 'পত্রাবলী' মহর্ষির ভাবুকপ্রকৃতি ও সৌন্দর্য চেতনার পরিচয় দানের সঙ্গে বঙ্গেতর ভারতের বিভিন্ন স্থান সমূহের নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যরাজির জন্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

কর্মসূত্রে যে সব বাঙ্গালীকে বাংলাদেশের বাইরে যেতে হয়েছিল তন্মধ্যে দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায় অন্যতম। তাঁর রচিত 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' (১৯২৪) গ্রন্থটি তাঁর জীবনেতিহাস। লেখক তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই গ্রন্থটিতে বর্ণনা করেছেন। বিশেষতঃ তৎকালীন সিপাহী বিদ্রোহের প্রামাণিক বিবরণের জন্য 'বিদ্রোহে বাঙ্গালী' বিশেষ গুরুত্বের অধিকারী হয়েছে। গ্রন্থটিতে বহির্বাংলার কিছু কিছু বিবরণ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্তাকারে বর্ণিত হওয়ায় আমাদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

পরিশেষে, ষোড়শ শতাব্দী থেকে চৈতন্য দেবের সূত্রে বঙ্গেতর ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে পরিচয়ের সূত্রপাত ঘটে, পরবর্তীকালে সেই পরিচয় রাজনৈতিক অর্থ নৈতিক ইত্যাদি কারণে ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হবার সুযোগ লাভ করে। বলাবাহুল্য বাংলা সাহিত্যেও সেই পরিচয়ের প্রতিফলন ঘটতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারতের যে প্রতিফলন ঘটেছে মুখ্য রচনাবলী অবলম্বনে তার অনুসন্ধান লাভের উদ্দেশ্যেই বর্তমান আলোচনার অবতারণা।

ষোড়শ শতাব্দী থেকে বাঙ্গালীর সঙ্গে সর্বাপেক্ষা ঘনিষ্ঠ পরিচয় স্থাপিত হয়েছিল ব্রজধামের। বৃন্দাবনকে বাঙ্গালী বৈষ্ণবের প্রাচীনতম উপনিবেশ বললেও অন্যায় হয় না। তাই ব্রজধামের মথুরা ও বৃন্দাবনের আলোচনা দিয়েই পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা করা গেল।

প্রথম অধ্যায়
মথুরার পুরাবৃত্ত

শ্রীকৃষ্ণের লীলাধন্য ব্রজধাম বহুযুগ থেকেই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্রতম ক্ষেত্র বলে বিবেচিত হয়ে এলেও ব্রজধাম থেকে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত পুরাতত্ত্বের নিদর্শনাবলী থেকে স্পষ্টতঃই প্রমাণিত হয়েছে যে, কৃষ্ণলীলার সঙ্গে সম্পর্কিত হবার অনেক কাল আগে থেকেই ব্রজমণ্ডল জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের কাছে পবিত্রস্থান রূপে পরিচিত ছিল। ধর্মের বিকাশে এবং প্রতিষ্ঠায় শাসক গোষ্ঠীর পৃষ্ঠপোষকতা যে অপরিহার্য তা সর্বকালের ইতিহাসেই প্রমাণিত সত্য বলে দেখা গেছে। মথুরার পুরাবৃত্ত আলোচনাতেও এই চিরন্তন সত্যের পুনরাবৃত্তি লক্ষ্য করা যায়। মথুরার সুদীর্ঘ ইতিহাস বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী রাজবংশেরই উত্থান পতনের ইতিহাস। এক রাজত্বের পরিসমাপ্তির সঙ্গে সমসাময়িক কালে প্রচলিত ধর্মীয় অধ্যায়েরও ঘটেছে পরিসমাপ্তি। পুনরায় নতুন রাজত্বের সঙ্গে বিকশিত হয়ে উঠেছে নতুন ধর্ম। এইভাবে বহু প্রাচীন কাল থেকেই নানাবিধ ধর্মের উত্থান পতনের নীরব সাক্ষী হয়ে রয়েছে ব্রজমণ্ডল।[১]

মথুরার অন্তর্গত কাটরা, কঙ্কালী-টিলা, আনন্দ-টিলা, বিনায়ক-টিলা ও কেশোপুরী প্রভৃতি স্থান খনন করে যে সব বুদ্ধমূর্তি, বৌদ্ধকীর্তি এবং নানাবিধ শিলালিপির সন্ধান পাওয়া গেছে তা থেকেই প্রমাণিত হয় যে মথুরায় একসময় বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব বিস্তারলাভ করেছিল। মথুরায় সম্ভবত সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় সম্রাট অশোকের রাজত্ব কালে খ্রীষ্ট পূর্ব ৩য় শতাব্দীতে। এই সময়ে উপগুপ্ত মথুরায় বৌদ্ধ ধর্ম প্রচার করেছিলেন। অবশ্য ইতিপূর্বে বুদ্ধ শাক্য সিংহের অভ্যুদয়ে তাঁর শিষ্যগণ মথুরায় পদার্পণ করেছিলেন, কিন্তু যে কোন কারণেই সে সময়ে তাঁরা বৌদ্ধধর্ম প্রচারে সার্থকতা লাভ করেননি। খ্রীষ্টপূর্ব ১ম শতাব্দীতে শক ক্ষত্রপদের রাজত্বকালে মথুরায় বৌদ্ধধর্ম এবং বৌদ্ধ শিল্পের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। কারণ শকক্ষত্রপগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পের পৃষ্ঠপোষক।[২] খ্রীষ্টীয় ১ম শতাব্দীতে শক সম্রাট কণিষ্কও বিশেষভাবে বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী হয়ে পড়েছিলেন। সম্রাট অশোকের পরবর্তীকালে তিনিই ছিলেন বৌদ্ধধর্ম্মের সর্বশ্রেষ্ঠ পৃষ্ঠপোষক। কণিষ্কের প্রয়াসে মথুরায় বেশকিছু

সংখ্যক বৌদ্ধবিহার ও চৈত্য প্রতিষ্ঠা সম্ভব হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত তাঁর কয়েকটি স্বর্ণমুদ্রাতে খোদিত বুদ্ধমূর্তি এবং গ্রীক অক্ষরে উৎকীর্ণ 'বোড্ডো' শব্দটিও তাঁর বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগের পরিচয়কে বহন করছে। বাস্তবিক, কণিষ্কের আন্তরিক পৃষ্ঠপোষকতার জন্যই তাঁর এবং তাঁর উত্তরসূরিগণের রাজত্বকালে বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পকলার অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল।[৩] গুপ্ত সম্রাটরা ছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক। অবশ্য অন্য কোন ধর্মের প্রতি যে তাঁরা বিদ্বেষভাব পোষণ করতেন তা নয়। খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতকের প্রথম ভাগ থেকেই এঁদের রাজত্বের সূত্রপাত ঘটে। বলাবাহুল্য গুপ্ত সম্রাটদের রাজত্বকালে মথুরায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিশেষ প্রসার ঘটেছিল। খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট যশোধর্মের রাজত্বকালে সমগ্র উত্তর ভারতের সর্বত্র ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান ঘটলেও মথুরায় এর প্রভাব তেমন দৃষ্ট হয় নি। বরং থানেশ্বরের হর্ষদেবের উৎসাহে মথুরায় বৌদ্ধ প্রভাবই লক্ষিত হয়েছিল।

খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীতে সুদূর চীন দেশ থেকে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী পরিব্রাজক ফাহিয়ান তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র মধ্যদেশান্তর্গত মথুরায় এসেছিলেন। সে সময় মথুরায় ২০টি সংঘারাম ও বিহার বর্তমান ছিল। বৌদ্ধ মঠসমূহে সর্বমোট তিন সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষু এই সময়ে বাস করতেন। এতদ্ব্যতীত ফাহিয়ান ৬টি বৌদ্ধস্তূপও দর্শন করেছিলেন। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ধর্মাচার্য সারীপুত্তের সম্মানে নির্মিত স্তূপটি। অপর পাঁচটি স্তূপের মধ্যে একটি আনন্দ ও অপর একটি স্তূপ মুদ্গলপুত্রের স্মৃতিপূত ছিল। অবশিষ্ট তিনটি ছিল অভিধর্ম, সূত্র এবং বিনায়ধর্মের উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত। ফাহিয়ান আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে মথুরায় উচ্চ শ্রেণী থেকে নিম্নতম শ্রেণীর অনেকেই ছিলেন গোঁড়া বৌদ্ধধর্মাবলম্বী।

ফাহিয়ানের পর্যটনের প্রায় দু'শ বছর পরে অপর এক চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ এদেশে এসেছিলেন। তিনি খ্রীষ্টীয় ৬২৯ থেকে ৬৪৫ শতাব্দী পর্যন্ত ভারতবর্ষে অবস্থান করেছিলেন। তাঁর মথুরা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা থেকে জানা যায় যে, সারীপুত্ত, মৌদগল্যায়ন, পূর্ণ মৈত্রেয়ানিপুত্র, উপালি, আনন্দ, রাহুল এবং মঞ্জুশ্রী প্রমুখ শাক্যমুনির শিষ্যবর্গের পূত স্মৃতিচিত্রাদি সমন্বিত স্তূপগুলি তখনও পর্যন্ত মথুরায় বর্তমান ছিল।[৪] অর্থাৎ হিউয়েন সাঙ তাঁর পূর্ববর্তী পরিব্রাজক ফাহিয়ান বর্ণিত এবং সম্রাট অশোক নির্মিত বৌদ্ধ

নিদর্শনগুলির মধ্যে একমাত্র রাহুলের স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত অতিরিক্ত স্তূপটি ব্যতীত অপর সব ক'টিকেই অবিকৃত ও যথাযথ দেখেছিলেন। হিউয়েন সাঙ আরও বলেছেন যে বাৎসরিক উৎসবগুলিতে ধার্মিক ব্যক্তিরা দলে দলে এসে এই সব স্তূপে সমবেত হয়ে বহুবিধ উপচারে তাঁদের পরম আরাধ্যকে আরাধনা করতেন।[৫] হিউয়েন সাঙ মথুরা নগরীর পূর্বদিকে উপগুপ্ত নির্মিত একটি সংঘারাম ও তন্মধ্যস্থ ভগবান তথাগতের নখস্তূপ ও তার দক্ষিণে চারিবুদ্ধ, সারীপুত্ত, মুদ্গলপুত্র প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণের উপাসনাভূমিও দর্শন করেছিলেন। 'অবশ্য তাঁর পর্যটন কালেই মথুরায় যে বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি শুরু হয়েছিল তার প্রমাণও পাওয়া যায়। ফাহিয়ানের সময়কার কুড়িটি সংঘারাম তাঁর সময়েও বর্তমান ছিল। কিন্তু ঐসব সংঘারামে বসবাসকারী বৌদ্ধ ভিক্ষুর সংখ্যা তিন সহস্র থেকে দুই সহস্রে পরিণত হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত রাজানুকূল্যের অভাবে মথুরায় একদিকে যেমন বৌদ্ধ ধর্ম অনাদৃত হল, অপরপক্ষে বৌদ্ধকীর্তি সমূহও চরম অবহেলার সম্মুখীন হ'ল। তদুপরি একাধিকবার বৈদেশিক আক্রমণে বৌদ্ধ শিল্পকলা এবং ধর্ম মথুরা মণ্ডল থেকে অন্তর্হিত হ'ল।[৬] এই প্রসঙ্গে হিউয়েন শাঙের বিবরণী থেকে জানা যায় যে হূন সম্রাট মিহিরকুল বা মিহিরগুল (৪৭৫ খ্রীষ্টাব্দ) বৌদ্ধ ধর্মের চরম বিদ্বেষী ছিলেন। এবং তিনিই নাকি মথুরার সমস্ত বৌদ্ধ নিদর্শনাবলী ধ্বংসের নির্দেশ' দিয়েছিলেন। কিন্তু হিউয়েন সাঙ প্রদত্ত এই বিবরণীকে পুরোপুরি মেনে নেওয়া চলেনা। কারণ তাহলে তাঁর পর্যটনকালে মথুরার কুড়িটি সংঘারাম এবং সেখানে দু' সহস্র বৌদ্ধ ভিক্ষুর অবস্থান সম্ভব হ'ত না। যতদূর মনে হয় খ্রীষ্টীয় ৬ষ্ঠ শতাব্দীতে সম্রাট যশোধর্মের অভ্যুদয়ে উত্তর ভারতের সর্বত্রই ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভ্যুত্থান, বিশেষতঃ খ্রীষ্টীয় ৭ম শতাব্দীর শেষভাগে কান্যকুব্জের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত বৈদিক ধর্মানুরাগী ও ব্রাহ্মণ ভক্ত মহারাজ যশোবর্মার প্রয়াসেই একদিকে মথুরাতে ব্রাহ্মণ্য প্রভাবের বিস্তার এবং অপরপক্ষে বৌদ্ধধর্মের চরম অবনতি ঘটেছিল।

বৌদ্ধ ধর্মের মত মথুরা যে বহু প্রাচীন কালেই জৈন ধর্মেরও একটি উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল, মথুরার বিভিন্নস্থান থেকেপ্রাপ্ত পুরাকীর্তি সমূহ থেকেই তা প্রমাণিত হয়েছে।[৭] সম্ভবত ৫ম শতাব্দী পর্যন্ত মথুরায় জৈন ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ণ ছিল। বিশেষতঃ কঙ্কালী টিলা থেকে প্রাপ্ত শিলালিপি এবং বিভিন্ন তীর্থঙ্কর মূর্তি সমূহের ভগ্নাবশেষ থেকে প্রমাণিত হয় যে এখানে

এক সময়ে বিভিন্ন শ্রেণীর স্থবির ও জৈনশাখার বিস্তার ঘটেছিল। সুপ্রসিদ্ধ পুরাতত্ত্ববিদ্ কানিংহাম সাহেবও এই অভিমতই প্রকাশ করেছেন। জৈনগণ মথুরায় তীর্থোপলক্ষে আসতেন এবং নানাবিধ দেবকীর্তি সমূহ প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। অদ্যাবধি কেশোপুরের উপকণ্ঠে জৈন শিল্পকার্য সমন্বিত জম্বুস্বামীর ভজনাগৃহ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। জামালপুর ও নিকটবর্তী জৈনটিলা থেকে শকরাজ কনিষ্ঠ 'হুবিষ্ক' ও বাসুদেবের লিপিযুক্ত দিগম্বর ও শ্বেতাম্বরদের পদ্মপ্রভু প্রভৃতি নানাবিধ তীর্থঙ্কর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর থেকেই প্রমাণিত হয় যে, শক নরপতিদের কেউ কেউ জৈন ধর্মানুরাগী অথবা জৈনধর্মাবলম্বী ছিলেন।

পুরাকীর্তিসমূহের কথা বাদ দিলেও জৈনধর্মগ্রন্থসমূহ থেকেও জানা যায় যে, জৈন ধর্মের সঙ্গে মথুরা এক সময়ে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। ২৩শ তীর্থঙ্কর পার্শ্বনাথের পূর্বে ১৯শ তীর্থঙ্কর মল্লিকনাথ এবং ২১শ তীর্থঙ্কর নমীনাথ মথুরাতে জন্মগ্রহণ এবং মোক্ষলাভ করেছিলেন। জৈনদের উত্তরাধ্যয়ন সূত্রের তৃতীয় অধ্যয়নের সূত্রার্থদীপিকায় ৮টি নিহ্নবের ইতিহাস প্রদত্ত হয়েছে। এর মধ্যে ৭ম নিহ্নবের প্রসঙ্গে লক্ষ্য করা যায় যে, শেষ তীর্থঙ্কর মহাবীরের নির্বাণের ৫৮৪ বৎসর পরে অর্থাৎ ৫৭ খ্রীষ্টাব্দে মথুরায় অক্রিয়াবাদীর অভ্যুদয় ঘটে। কেউই অক্রিয়াবাদীর সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় পেরে উঠল না। অগত্যা দশপুরে আর্য্য রক্ষিত সূরিকে জানান হল। আর্য্য রক্ষিত গোষ্ঠামাহিল-কে মথুরা রাজসভায় প্রেরণ করলেন। অতঃপর এই গোষ্ঠামহিলের কাছে অক্রিয়াবাদীকে পরাজয় স্বীকার করতে হ'ল। গোষ্ঠামাহিলের অবস্থানকালে মথুরাসঙ্ঘের খ্যাতি বিস্তৃততর ক্ষেত্রে প্রসার লাভ করেছিল।

শ্বেতাম্বর জৈনদের মতানুসারে ৯৯৩ বীরগতাব্দে (৪৬৬ খ্রীষ্টাব্দে) মথুরাসঙ্ঘে পুষ্পদন্ত আচার্য কর্তৃক সমুদয় জৈনাঙ্গ লিপিবদ্ধ হয়েছিল। মোটের ওপর এই সব বর্ণনা থেকেই প্রমাণিত হয় যে বহু প্রাচীন কাল থেকেই ব্রজমণ্ডলের সঙ্গে জৈনদের বেশ ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বর্তমান ছিল।

পুরাতত্ত্ববিদ্গণের মতে শকদ্বীপ থেকে ভারতবর্ষে বিষ্ণুপূজার প্রচলন হয়েছিল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শূরসেনদের প্রযত্নেই শ্রীকৃষ্ণের সময়েই মথুরা মণ্ডলে ভাগবত ধর্মের বিকাশ ঘটেছিল। বলাবাহুল্য শূরসেনদের পূর্ব থেকেই ভারতীয় আর্যগণ কর্তৃক বিষ্ণুপূজার নিদর্শন পাওয়া যায়। অতঃপর মথুরায়

শূরসেনদের আধিপত্য হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে মথুরামণ্ডলে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক মতের অনুপ্রবেশ ঘটে। অবশেষে বৌদ্ধ প্রভাব বিস্তারের ফলে মথুরায় বৈষ্ণব প্রভাব সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল।

তারপর খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতাব্দীতে একাধিক বিষ্ণুভক্ত নরপতির আনুকূল্যে মথুরায় বৈষ্ণব তীর্থসকল উদ্ধারের প্রয়াস হয়েছিল। এই সময়ে কৃষ্ণের লীলাধন্য মথুরাপুরী, কেশবপুরী এবং কেশবপুর বহির্ভারতেও পরিচিতি লাভ করেছিল। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম্মানুরাগী কনিষ্কের রাজত্বকালে মথুরায় বৈষ্ণব প্রভাব পুনরায় ক্ষুণ্ণ হয়। পরিশেষে খ্রীষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দীর শেষ ভাগে গুপ্ত সম্রাটগণের আনুকূল্যে মথুরায় বৈষ্ণব মহিমা আপন মর্যাদায় পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্রজধামের লুপ্ত তীর্থাদি উদ্ধার

নিষ্ঠাবান হিন্দু এবং ভক্ত বৈষ্ণবের আন্তরিক প্রযত্নে যে মথুরাধাম এক সময়ে মর্ত্যের গোলোক ধামের গৌরব লাভে সমর্থ হয়েছিল, ১০১৭ খ্রীষ্টাব্দে গজনীর সুলতান মাহমুদের ভারত আক্রমণের ফলে তার সে গৌরবের বিলুপ্তি ঘটে। সুলতান মাহমুদের মথুরা আক্রমণের পরেও দীর্ঘ এক শতাব্দীর অধিককাল ব্রজধাম হিন্দু শাসনাধীনে ছিল। কিন্তু যে কোন কারণেই মথুরার হৃত গৌরব পুনরুদ্ধারকল্পে এই সময়ের মধ্যে কোন উল্লেখযোগ্য প্রয়াস নিয়োজিত হয়নি। খ্রীষ্টীয় ১১শ থেকে ১৫শ শতাব্দীর মধ্যে ব্রজধামের সকল প্রকার প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসপ্রাপ্তি ঘটে। মুসলমান অত্যাচার, পথের দুর্গমতা, দস্যুভয় প্রভৃতি নানাবিধ কারণে ভক্ত বৈষ্ণব তীর্থযাত্রী ব্রজধামে অবস্থিত ভাগবতীয় লীলাস্থল সমূহ দর্শনে সাহসী হয়নি। এইভাবে মথুরা ক্রমেই বন্য শ্বাপদের আবাস বিজন কাননে পরিণত হয়। মুসলমান দাস রাজগণের আধিপত্যকালে ক্রমে জনাকীর্ণ ব্রজধাম জনমানবশূন্য হয়ে পড়ে। কদাচিৎ ভক্ত সন্ন্যাসীরা দলবদ্ধ হয়ে শ্রীকৃষ্ণের লীলাধন্য স্থান সমূহ দর্শন করতে যেতেন। প্রাচীন বৈষ্ণব সাহিত্য পাঠে জানা যায়, চৈতন্যদেবের আবির্ভাবের পূর্ববর্তীকাল

পর্যন্ত মথুরায় একমাত্র কেশবদেব এবং তাঁর ভগ্ন মন্দির মাত্র অবস্থিত ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীতে যে নব বৈষ্ণব ভাবের উদ্ভব হয়, সেই ভাবে ভাবিত মাধবেন্দ্রপুরী ঐ শতাব্দীর শেষভাগে মথুরায় উপস্থিত হন। অতঃপর ষোড়শ শতাব্দীতে মূলতঃ মহাপ্রভু এবং তাঁর পরিকরবৃন্দের আন্তরিক প্রয়াসে ব্রজধামের বিলুপ্ত গৌরবের পুনরুদ্ধার সম্ভব হয়। একই সঙ্গে ব্রজধামের লুপ্ত তীর্থাদি উদ্ধার এবং নানাবিধ দেবালয় প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রজধাম তার পূর্বমহিমায় পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয়।

বৃন্দাবনে সর্বপ্রথম লুপ্ত তীর্থ উদ্ধার করেন মাধবেন্দ্রপুরী। তাঁর তীর্থোদ্ধারের ঘটনাটি বড় চমকপ্রদ। বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে ভ্রমণ করতে করতে মাধবেন্দ্রপুরী উপস্থিত হলেন গিরি গোবর্দ্ধনে।

প্রেমাবেশে তিনি তখন মত্তপ্রায়। গিরি গোবর্দ্ধন পরিক্রমা শেষে তিনি গোবর্দ্ধনে অবস্থিত গোবিন্দকুণ্ডে স্নান সমাপনান্তে এক বৃক্ষতলে সন্ধ্যার সময় বসেছিলেন। এমন সময়ে একটি গোপ বালক তাঁর জন্য একটি পাত্র করে দুধ নিয়ে আসেন। বালকের মধুর আচরণে মাধবেন্দ্র মুগ্ধ ও পুলকিত হন। বালকটি মাধবেন্দ্রকে বলেন যে পরে এসে দুধের পাত্রটি নিয়ে যাবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বালকটি আর আসেননি।

শেষরাত্রে তন্দ্রাচ্ছন্ন মাধবেন্দ্র স্বপ্নে দেখলেন, যে বালক তাঁর জন্য দুধ নিয়ে এসেছিলেন, সেই বালকটি তাঁর হাত ধরে এক কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করে বলছেন যে সেই কুঞ্জই তাঁর বাসস্থান। কিন্তু শীত, বর্ষা, দাবাগ্নিতে তাঁকে নিরতিশয় কষ্ট পেতে হয়। সুতরাং মাধবেন্দ্র যেন গ্রামবাসীদের সহায়তায় তাঁকে ঐ কুঞ্জ থেকে বার করে গোবর্দ্ধন পর্বতোপরে স্থাপন করেন। এবং গোবর্দ্ধনে যেন তাঁর জন্য একটি মন্দিরের ব্যবস্থা করে দেন। বালকটি তাঁর পূর্ব পরিচয় প্রকাশ করে পুরীকে জানিয়ে দেন যে মৌষল লীলায় যদুবংশ ধ্বংস হয়ে গেলে কতিপয় বালক ও বৃদ্ধ সহ অনিরুদ্ধ পুত্র বজ্র অবশিষ্ট ছিলেন। এই বজ্রই শ্রীকৃষ্ণের এই শ্রীমূর্ত্তি নির্মাণ করিয়ে সেবা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তাঁর নাম শ্রীগোপাল। তাঁর পূর্বতন মন্দির ছিল গোবর্দ্ধন পর্বত উপরে। কিন্তু মুসলমানগণ কর্তৃক বৃন্দাবন আক্রান্ত হবার কালে তাঁর সেবকগণ মন্দির থেকে তাঁকে এনে ঐ কুঞ্জমধ্যে লুকিয়ে রাখে। তদবধি তিনি ঐ কুঞ্জেই রয়েছেন। এই বলে সেই গোপ বালকরূপী শ্রীগোপাল অন্তর্হিত হলেন। পরদিন প্রভাতে মাধবেন্দ্র পুরী

স্নানান্তে গ্রামবাসীদের সহায়তায় কুঞ্জমধ্যে প্রবেশ করলেন। এবং তৃণ ও মাটি পরিষ্কার করে শ্রীগোপাল দেবকে সকলের গোচরীভূত করলেন।

১৪৩৭ শকাব্দে মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাত্রা করেন। বৃন্দাবন অবস্থানকালে তিনি কেবলমাত্র শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করলেও স্বীয় পরিকর বৃন্দের মাধ্যমে ব্রজমণ্ডলস্থিত লীলাস্থানসমূহ উদ্ধারের ব্যবস্থা করেছিলেন।

গৌরাঙ্গ পার্ষদ রূপ ও সনাতন গোস্বামী দীর্ঘকাল ব্রজমণ্ডলে অবস্থান করে লুপ্ততীর্থাদি উদ্ধার করেন। লুপ্ত তীর্থাদি উদ্ধার ব্যতীত শ্রীরূপ গোস্বামী গোপীনাথ মূর্তিও প্রকাশিত করেন। শাস্ত্রের বর্ণনানুযায়ী শ্রীবিগ্রহ শ্রীগোবিন্দ যোগপীঠে অবস্থান করে থাকেন। কিন্তু শ্রীগোবিন্দের দর্শন লাভে ব্যর্থকাম শ্রীরূপ ব্যথিত চিত্তে গ্রামে গ্রামে বনে বনে ব্রজবাসীর গৃহে গৃহে শ্রীগোবিন্দের অন্বেষণে রত হলেন। একদিন যমুনার তটে ব্রজবাসী রূপ ধারী সুন্দর এক পুরুষ তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হয়ে তাঁকে 'গুমাটিলা' নামক স্থানে নিয়ে গেলেন। ব্রজবাসীটি শ্রীরূপকে জানালেন যে এক পরম সুন্দরী গাভী প্রত্যহ সায়াহ্নে 'গুমাটিলা' উপস্থিত হয়ে দুধ দিয়ে থাকে। এই বলেই ব্রজবাসীটি অন্তর্হিত হলেন। শ্রীরূপ তারপর ব্রজবাসীদের 'গুমাটিলা'য় শ্রীগোবিন্দদেবের অবস্থানের কথা জানালেন এবং অবশেষে 'গুমাটিলা' থেকে শ্রীগোবিন্দদেব প্রকটিত হলেন। অবশ্য লচমনদাসের 'ভক্তসিন্ধু' মতে নন্দগাঁও থেকে রূপ ও সনাতন গোবিন্দজীকে লাভ করেন এবং বৃন্দাবনে এনে প্রতিষ্ঠা করেন।

শ্রীরূপ গোস্বামীর মত সনাতন গোস্বামী কর্তৃক শ্রীমদন গোপালের প্রকটিত হওয়ার ঘটনাটিও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীসনাতন গোস্বামী মাঝে মাঝে মহাবনেবাস করতেন এবং যমুনা পুলিনে মদনগোপালকে গোপ বালকদের সঙ্গে ক্রীড়ারত দেখতে পেতেন। একদিন মদনগোপাল স্বপ্নচ্ছলে সনাতনকে বললেন মহাবন থেকে তিনি সনাতনের কুটিরে আসবেন। এই বলেই মদন-গোপাল অদৃশ্য হয়ে গেলেন। পরদিন প্রভাতে মদনগোপাল স্বয়ং সনাতনের পর্ণ কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। এবং সনাতন তাঁর পর্ণ কুটিরে শুষ্ক রুটির দ্বারা সাধ্যমত মদনগোপালের ভোগার্চনার আয়োজন করলেন। অবশেষে সনাতনের ইচ্ছানুযায়ী মদন গোপাল মূলতানদেশীয় কপুর ক্ষত্রিয় বংশোদ্ভূত কৃষ্ণদাস নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির মাধ্যমে নিজের সেবাবৃত্তির ব্যবস্থা

করলেন। মদন গোপালের জন্য নির্মিত হল মন্দির, ব্যবস্থা হ'ল উপাদেয় ভোগ্য সামগ্রীর।

শ্রীমধুপণ্ডিত কর্তৃক শ্রীগোপীনাথের সেবা প্রতিষ্ঠার কাহিনীটিও এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। শ্রীপরমানন্দ ভট্টাচার্য এবং শ্রীমধুপণ্ডিত উভয়ে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমাধীন। স্বপ্নে শ্রীমধুপণ্ডিত গোপীনাথের দর্শন লাভ করেন। এবং যমুনার উপতটস্থ মনোহারী বংশীবট তটে মধুপণ্ডিত কর্তৃক শ্রীগোপীনাথ প্রকটিত হন।

উপরোক্ত বিগ্রহটি ব্যতীত শ্রীরূপ গোস্বামী চৈতন্যদেবের আদেশে ব্রহ্মকুণ্ডের তটসমীপে শ্রীবৃন্দাদেবীকেও প্রকট করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত 'সাধনদীপিকা' ও 'ভক্তিরত্নাকর' থেকে গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক আরো কয়েকটি বিগ্রহের প্রকটিত হবার বিষয় জানা যায়। এদের মধ্যে শ্রীরূপ গোস্বামী কর্তৃক রাধাদামোদর মূর্তি, গোপালভট্ট কর্তৃক রাধারমণ মূর্তি, লোকনাথ গোস্বামী কর্তৃক রাধাবিনোদ মূর্তি এবং ভূগর্ভ গোস্বামী কর্তৃক গোপীনাথ মূর্তির প্রকাশ উল্লেখযোগ্য।

এইভাবে পঞ্চদশ শতাব্দীর অন্ত্যদশকে মাধবেন্দ্র পুরীর, ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে চৈতন্যদেবের এবং তারপর থেকে উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্যন্ত বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহান্ত ও ধনী-দরিদ্র বৈষ্ণব ভক্তদের গতায়াতে ও সেবায় ব্রজভূমি বিশিষ্টতার অধিকারী হয়েছে।

---

১. In her long and chequered history, Mathura has passed through the rule of several dynasties and the sway of several religions so that often the successors have pulled down the fanes splendid of their predecessors and put up their own, which in turn, were duly demolished and buried temple and idol, under the next that rose upon the same Site-Holy cities of India ; Kanwarlal.

২. The Sake Satrapas who ruled in Mathura in the first century B. C. were patrons of Buddhism and Buddhist art, as appears from the kharosthi inscriptions on the lion-capital. —Catalogue of the Archaeological museum at Mathura by J. PH. Vogel, Ph. D. (The Mathura school Sculpture).

৩. Buddhist tradition pictures us Kanishka the Kushanas as the greatest patron of the sacred law, next to Asok. On some of his gold coins we find the figure of

Buddha with the legend Boddo in Greek letters. This royal patronage explains the flourishing state of Buddhist art under his own and his successor's rule.—Catalogue of the Archaeological Museum at Mathura by J. PH. Vogel, Ph. D.

৪. In the kingdom of Mathura there are still to be seen the stupas in which were deposited of old the relics of the holy disciples of SakyaMuni, viz, Sari Putra, Mudgalayana, Purna—maitrayani-putra, Upali, Ananda, Rahula and Manjushri—Mathura, a District Memoir by Growse.

৫. On the yearly festivals, the religious assemble in crowds at these stupas and make their several offerings at the one which is the object of their devotion.—Mathura ; a District Memoir by Growse.

৬. The broken bas—relies and headless images leave no doubt that they met with a violent end at the hand of some enemy of the Buddhist faith—Catalogue of the Archaeological Museum at Mathura by J. PH. Vogel, Ph. D.

৭. Inscriptions and other relics prove that early in the christian era it was a centre of Buddhism and Jainism.—(History of Muttra District) Imperial Gazetta of India, vol. xviii.

দ্বিতীয় অধ্যায়
শ্রীচৈতন্যের ভারত পর্যটন
গয়া পর্যটন

শ্রীচৈতন্য ষোল বৎসর বয়সে প্রথম বাংলা দেশের বাইরে পদার্পণ করেন। তিনি যান গয়ায়। পরবর্তীকালে সন্ন্যাস গ্রহণের পর তিনি সুদীর্ঘকাল বাংলাদেশের বাইরেই অতিবাহিত করেছিলেন। এরমধ্যে আবার দীর্ঘ ছয় বৎসর ধরে তিনি সমগ্র ভারতবর্ষ পর্যটন করেন। বঙ্গেতর ভারতের পরিচয় আমরা চৈতন্যদেবের জীবনী কাব্যগুলি থেকে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে পেয়ে থাকি।

পিতৃতীর্থ গয়ার বিবরণ চৈতন্যদেবের ভ্রমণ প্রসঙ্গেই প্রথম জানা গেল। মাত্র ষোল বৎসর বয়সে তিনি পিতার নামে বিষ্ণুপাদপদ্মে পিণ্ডদানের উদ্দেশ্যে হরিদাস ঠাকুর, গদাধর পণ্ডিত, গোপীনাথ, মুরারি, মুকুন্দ, বক্রেশ্বর, জগদানন্দ, গোবিন্দ আচার্য, শ্রীনিবাস প্রমুখাদির সঙ্গে গয়াভিমুখে যাত্রা করেন। এই যাত্রার বিবরণ জয়ানন্দের 'চৈতন্যমঙ্গলে' বহুল পরিমাণে বিদ্যমান। তাছাড়া চূড়ামণি দাসের 'গৌরাঙ্গ বিজয়ে'ও এই বর্ণনা বিদ্যমান।

নবদ্বীপ থেকে যাত্রা করে কয়েকদিন পরে চৈতন্য গিয়ে উপস্থিত হলেন মন্দারে। মন্দার মধুসূদন দর্শনের পর তিনি সব ক'টি পর্বত ভ্রমণ করেন। কয়েকদিন পরে গিয়ে উপস্থিত হলেন পুনঃপুনা তীর্থে অর্থাৎ পুনপুন নদীর ঘাটে। পুনঃপুনা তীর্থে স্নান করে চৈতন্য তাঁর স্বর্গীয় পিতৃদেবের উদ্দেশে তর্পণ করলেন। তারপর এখান থেকে গিয়ে উপস্থিত হলেন গয়ায়। গয়াস্থিত ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে তিনি পিতৃদেবের স্মৃতির উদ্দেশে যথোচিত সম্মান নিবেদন করলেন। তারপর বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শনের জন্য গিয়ে উপস্থিত হলেন চক্রবেড়ের ভেতরে। ব্রাহ্মণ পরিবেষ্টিত বিষ্ণুর পাদপদ্ম দর্শন করে তিনি প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়েন। চৈতন্য পাদপদ্মের উদ্দেশে নিবেদিত, গন্ধ, পুষ্প, ধূপ, দীপ, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদি স্তূপীকৃত পরিমাণে দেখতে পেলেন। তিনি নিজেও গভীর অনুরাগের সঙ্গে পুষ্প, চন্দন, বস্ত্র, নৈবেদ্য ইত্যাদি যোগে গদাধরের পাদপদ্মে পূজা করলেন। তারপর পাদপদ্মে পিণ্ডদান করলেন। কেবল যে তিনি নিজের পিতার উদ্দেশেই পিণ্ডদান করলেন তা নয়, আত্মীয় অনাত্মীয়, বিজাতীয়, পরিচিত সকলের

আত্মার কল্যাণার্থেই পিণ্ডদান করেন। এই বিষ্ণু পাদপদ্ম দর্শন কালেই তাঁর সাক্ষাৎলাভ ঘটে ঈশ্বরপুরীর সঙ্গে।

বিষ্ণু পাদপদ্মে পিণ্ডদানের পর চৈতন্য ফল্গুতীর্থে গিয়ে বালির পিণ্ডদান করলেন এবং তারপর গমন করলেন অক্ষয়বটে। গিরিশৃঙ্গে অবস্থিত প্রেত গয়াস্থানে গিয়েও চৈতন্য প্রেত শিলাতে শ্রাদ্ধাদি করলেন। অতঃপর প্রেতগয়া থেকে প্রথমে দক্ষিণ মানসে এবং তারপর গিয়ে উপস্থিত হলেন শ্রীরাম গয়ায়। রামগয়াতে শ্রাদ্ধাদির পর তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন উত্তর মানসে। এখানেও তিনি পিণ্ডদান করলেন। উত্তর মানস দর্শনের পর তিনি গেলেন অশ্বমেধঘাটে। ক্রমে ক্রমে তিনি ভীমগয়া, শিবগয়া, ব্রহ্মগয়া, ইত্যাদি ভ্রমণ করে গিয়ে উপস্থিত হলেন যোড়শ গয়ায়। যোড়শ গয়ায় চৈতন্য শ্রদ্ধা সহকারে যোড়শী করে সকলের উদ্দেশে পিণ্ডদান করলেন।

চৈতন্য যুধিষ্ঠির গয়াতেও শ্রাদ্ধ করলেন। শ্রাদ্ধের পর তিনি জলে পিণ্ড নিক্ষেপ করলে গয়ালি ব্রাহ্মণেরা ঐসব পিণ্ড ভক্ষণ করতে লাগল। ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান করে চৈতন্য গয়াশিরেও পিণ্ডদান করেন। এইভাবে সর্বতীর্থে পিণ্ডদান করে অবশেষে পুরোহিতদের যথোপযুক্ত পরিমাণে বস্ত্র এবং অর্থের দ্বারা সন্তুষ্ট করলেন। অনন্তর চৈতন্য দক্ষিণ পাবকে মুনীন্দ্র দর্শনের উদ্দেশ্যে গমন করলেন। সকলের অজ্ঞাতে দক্ষিণ পাবকে গুহার অভ্যন্তরস্থিত মঠে শুক্লবর্ণ মুনীন্দ্র যোগধ্যানে. ছিলেন মগ্ন। চৈতন্যকে দেখে তিনি দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন। মুনীন্দ্রের কাছ থেকে চৈতন্য গিয়ে উপস্থিত হলেন ব্রহ্মবেদী। এখানেই তিনি বাসা করে রইলেন। ব্রহ্মবেদীতে অবস্থান কালে জনৈক শঙ্কর আচার্যের পত্নী পার্বতী জ্বরে আক্রান্ত হয়ে তাঁর কাছে এসে উপস্থিত হল এবং দূর্বা দ্বারা তাঁকে আশীর্বাদ করল। তারপর চৈতন্যের কাছে জ্বর থেকে নিরাময় লাভের উদ্দেশ্যে তাঁর পাদোদক প্রার্থনা করল। চৈতন্য বৃদ্ধাকে তাঁর পাদোদক দিলেন। বৃদ্ধা সেই পাদোদক পানে জ্বর থেকে নিরাময় লাভ করল। গয়ায় অবস্থানকালে চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর জন্মস্থান 'কুমার হট্ট'ও দর্শন করেন এবং এখান থেকে কিছু পরিমাণে মাটি সংগ্রহ করে নেন। অপর একদিন চৈতন্য ঈশ্বরপুরীর কাছ থেকে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

গয়া থেকে চৈতন্য মথুরাভিমুখে যাত্রা করেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুদূর অগ্রসর হয়ে পুনরায় তিনি গয়ার বাসায় ফিরে আসেন। অতঃপর ঈশ্বরপুরীর

কাছ থেকে বিদায় গ্রহণ করে শিষ্যগণ সমভিব্যাহারে গয়া থেকে যাত্রা করলেন। ক্রমে রাজপথ পরিত্যাগ করে গিয়ে উপস্থিত হলেন মহারণ্য মধ্যে। অরণ্যস্থিত এক বটবৃক্ষ তলায় 'তিলোত্তমা' নামে পরিচিত প্রস্তর নির্মিত এক গ্রাম্যদেবী মূর্তি দেখতে পেলেন। মূর্তিটি অষ্টভুজা এবং ত্রিনয়নী। কিরীট কুণ্ডলে সুসজ্জিতা। মূর্তির গলদেশে মুণ্ডমালা শোভিত। চৈতন্যের পাদস্পর্শে মূর্তিটি বিদীর্ণ হয়ে গেল এবং মূর্তি থেকে শাপভ্রষ্ট এক বিদ্যাধরী মুক্তি লাভ করে।

কয়েকদিনের মধ্যেই চৈতন্য গিয়ে উপস্থিত হলেন মন্দার গিরিতে। মন্দার দর্শন করে প্রবেশ করলেন হরিড়য়াযোড়ি (হরিড়াজুড়ি)। বৈদ্যনাথের উদ্দেশে চৈতন্য স্তুতি নিবেদন করলেন এবং সব ক'টি সরোবরে স্নান করলেন। কংসনদে রাত্রি যাপন করে পরদিন প্রভাতে গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন বৈদ্যনাথের মন্দিরে। মন্দিরের ব্রাহ্মণ চৈতন্যকে মালা, মুকুট এবং প্রসাদ দান করলেন। পরিশেষে হরিড়াযোড়ি থেকে চৈতন্য নবদ্বীপ অভিমুখে রওনা হলেন।

নীলাচল পর্যটন

বঙ্গদেশে পুরুষোত্তম ক্ষেত্রের জনপ্রিয়তা ও আকর্ষণের অন্যতম উল্লেখযোগ্য কারণ শ্রীচৈতন্যের পুরুষোত্তম পর্যটন এবং দীর্ঘকাল যাবৎ এখানে তাঁর উপস্থিতি। চৈতন্যদেবের উৎকল পর্যটনের বিষয় বিস্তৃত পরিসরে 'চৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত হয়েছে। 'চৈতন্যভাগবতে'ও স্বল্প পরিসরে চৈতন্যের নীলাচল পর্যটন বর্ণিত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়। প্রথমে 'চৈতন্যচরিতামৃত'কে অবলম্বন করেই চৈতন্যের নীলাচল পর্যটন সন্নিবিষ্ট করা গেল।

শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে উপস্থিত হবার গৌণ কারণ ছিল জগন্নাথ দেব দর্শন, কিন্তু মুখ্য কারণ ছিল সার্বভৌমের সঙ্গে মিলন। এতদ্ব্যতীত বৃদ্ধা মাতার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করাও ছিল অন্যতম উদ্দেশ্য। চৈতন্যদেব নীলাচলে উপস্থিত হয়ে সার্বভৌমের কাছে ভাগবত শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ভাগবতের একটি শ্লোকের (১৭।১০) তিনি সর্বমোট তের প্রকার ব্যাখ্যা করেন। অতঃপর চৈতন্য শ্লোকটির ভিন্নতর ব্যাখ্যা করে সার্বভৌমকে বিস্মিত করে দিলেন।

শেষে সার্বভৌম চৈতন্যের শরণাপন্ন হলে তিনি তাঁকে উদ্ধার করলেন। নীলাচল বাসী সকলেই চৈতন্যকে 'সচল জগন্নাথ' বলে অভিহিত করত। চৈতন্য নীলাচলে ক্রমে ক্রমে পরমানন্দ পুরী, দামোদর স্বরূপ, প্রদ্যুম্ন মিশ্র, দামোদর পণ্ডিত, শ্রীশঙ্কর পণ্ডিত পরামানন্দ, রামানন্দ প্রমুখাদির সঙ্গে মিলিত হলেন।

যে সময়ে চৈতন্য নীলাচলে গিয়েছিলেন, সে সময়ে প্রতাপরুদ্র উৎকলে উপস্থিত ছিলেন না। তিনি যুদ্ধোপলক্ষে গিয়েছিলেন বিজয়া নগরে। এজন্য প্রতাপরুদ্রের সঙ্গে চৈতন্যের আর সাক্ষাৎ হ'ল না। শ্রীচৈতন্য অতঃপর নীলাচল থেকে গৌড় অভিমুখে যাত্রা করলেন।

১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে চৈতন্য জগন্নাথ দেব দর্শনের অভিপ্রায়ে নিত্যানন্দ গোস্বামী, পণ্ডিত জগদানন্দ, দামোদর পণ্ডিত ও মুকুন্দ দত্ত সমভিব্যাহারে প্রথম উৎকল অভিমুখে যাত্রা করেন। শান্তিপুর থেকে আটিসারা গ্রামে, আটিসারা গ্রাম থেকে ছত্রভোগে এবং ছত্রভোগ থেকে ভাগীরথী নদী নৌকাযোগে পার হয়ে চৈতন্য সদলবলে উৎকলে এসে উপস্থিত হন। নদীর পশ্চিম তীরে শ্রীপ্রয়াগ ঘাট। চৈতন্য প্রথমে এই প্রয়াগ ঘাটে উত্তরণ করলেন। প্রয়াগ ঘাটের অপর নাম গঙ্গাঘাট। এই গঙ্গাঘাটে স্নান করে চৈতন্য যুধিষ্ঠির কর্তৃক স্থাপিত মহেশের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেন।

তমলুকে কপালমোচন নামে এক তীর্থ এককালে ছিল। ঘাটের ওপরেই বিষ্ণুনারায়ণ মন্দির এবং এর কাছেই বর্গভীমার সুপ্রসিদ্ধ মন্দির। চৈতন্য বর্গভীমার সুপ্রসিদ্ধ তীর্থ দর্শনান্তে উপস্থিত হলেন দাঁতনে। দাঁতন ও জলেশ্বর অতিক্রম করে গিয়ে পৌঁছলেন সুবর্ণরেখা নদীর তীরে। এখানে চৈতন্য অন্যান্য বৈষ্ণবগণ সহ স্নান সারলেন। তারপর পুনরায় যাত্রা করে গিয়ে প্রথমে উপস্থিত হলেন বারাসাতে, তারপর জলেশ্বর গ্রামে। এখানে তিনি প্রসিদ্ধ জলেশ্বর মহাদেব দর্শন করেন। জলেশ্বরে একরাত্রি অতিবাহিত করে গিয়ে উপস্থিত হন বাঁশদা। বাঁশদায় চৈতন্যের সঙ্গে এক শাক্ত সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হয়। বাঁশদা থেকে তিনি গিয়ে উপস্থিত হন রেমুণা নামক গ্রামে। এখানে তিনি প্রসিদ্ধ ক্ষীরচোরা গোপীনাথ দর্শন করেন। গোপীনাথের মহাপ্রসাদ হল ক্ষীর। সরোনগরের মন্দিরস্থিত সিদ্ধেশ্বর লিঙ্গকে সাক্ষী করে চৈতন্য বাঙ্গালপুরের মধ্য দিয়ে দক্ষিণে অসুরগড় রেখে ভদ্রকে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভদ্রাখ জগন্নাথ দর্শন করে একরাত্রি এখানে অতিবাহিত করে উপস্থিত হলেন

আদিবরাহের আবির্ভাবধন্য যাজপুরে। উড়িষ্যার বৈতরণী নদীর তীরে এটি অবস্থিত। এখানে আছে বৈতরণী নদীতীর্থ। তাছাড়া নাভিগয়া এবং বরাহ দেবের মূর্তিও এখানে বিদ্যমান। যাজপুরে উপস্থিত হয়ে চৈতন্য প্রথমে সশিষ্য দশাশ্বমেধ ঘাটে স্নান করেন। স্নানের পর তিনি দর্শন করলেন আদিবরাহের মূর্তি। বিরাজ ক্ষেত্রে উপস্থিত হয়ে তিনি বিরজাদেবীর মন্দির ও মূর্তিও দর্শন করেন। শিষ্য ও সেবকগণের কাছ থেকে অদৃশ্য হয়ে নিজে ইচ্ছানুযায়ী তিনি একাকী যাজপুরস্থিত সহস্রাধিক দেবমন্দির ও দেবমূর্তি দর্শন করলেন।

যাজপুরে একদিন অতিবাহিত করে চৈতন্য মন্দাকিনী পার হয়ে পুরুষোত্তম পুর এবং পাটনা পার হয়ে আমরালে গিয়ে পৌছলেন। আমরাল হয়ে চৈতন্য গিয়ে পৌছলেন কটকে। কটক ছিল উড়িষ্যার রাজাদের রাজধানী। কাটজুড়ি ও মহানদীর মধ্যবর্তী। দক্ষিণ দেশের বিদ্যানগর থেকে সাক্ষীগোপাল উৎকল রাজ কর্তৃক কটকে আনীত হয়েছিলেন। চৈতন্য যখন সন্ন্যাসের পর নীলাচলে উপস্থিত হন, তখন সাক্ষীগোপাল কটকে বর্তমান ছিলেন। কটকে মহানদীর গড়গড়া ঘাটে স্নান করে রাজপথ অবলম্বনে নিত্যানন্দ প্রমুখ ভক্ত সমভিব্যাহারে গিয়ে উপস্থিত হন এরপর সাক্ষীগোপালে। এখানে তিনি সাক্ষীগোপাল মূর্তি দর্শন করেন এবং একটি দিন অতিবাহিত করেন। এরপর চৈতন্য গিয়ে উপস্থিত হন ভুবনেশ্বরে। ভুবনেশ্বর পুরী জেলার অন্তর্গত প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান। ভুবনেশ্বর কটকের দক্ষিণ পশ্চিম অংশে অবস্থিত। এখানে ভুবনেশ্বর নামে মহাদেব বর্তমান। এছাড়া আরও অনেক প্রসিদ্ধ শিব লিঙ্গ এখানে অধিষ্ঠিত। বিন্দু সরোবর ইত্যাদি তীর্থস্থানও এখানে বর্তমান। বিন্দু সরোবরে স্নান করে চৈতন্য অতঃপর পুরী অভিমুখে যাত্রা করেন। সহচরগণ সহ যাত্রা করে রাজপথ অবলম্বনে ভুবনেশ্বর থেকে কাঠতিপাড়া হয়ে কমলপুরে উপনীত হন। কমলপুর পুরী জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম থেকে পুরীর জগন্নাথ দেবের মন্দিরের ধ্বজা দেখা যায়। এখান থেকে পুরী তিন ক্রোশের পথ। কমলপুরে চৈতন্য নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, দামোদর সমভিব্যাহারে নিকটস্থ কপোতেশ্বর নামক অনাদি শিবলিঙ্গ দর্শন করেন। তারপর নৌযানে ভার্গবী নদীর অপর পারে উপস্থিত হয়ে তুলসী চত্বর গ্রাম থেকে জগন্নাথদেবের মন্দিরের শীর্ষদেশ অবলোকন করে প্রেমোন্মাদে অচৈতন্য হয়ে পড়েন। পুরীর তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত ভার্গবী নদী বা ভার্গী নদী। বর্তমান দণ্ডভাঙ্গানদী।

এই ভার্গী নদীতে নিত্যানন্দ চৈতন্যের দণ্ড তিন খণ্ড করে জলে ভাসিয়েছিলেন। চৈতন্য তুলসীচত্বর গ্রাম থেকে গিয়ে উপস্থিত হন আঠারনালায়। এখান থেকে তিনি গিয়ে একেবারে উপস্থিত হন জগন্নাথদেবের মন্দিরে। চৈতন্য ফাল্গুন মাসে নীলাচলে উপস্থিত হয়েছিলেন। ফাল্গুন মাসের শেষে তিনি পুরীধামে জগন্নাথের দোলযাত্রা দেখলেন। চৈত্র মাসটি নীলাচলে অতিবাহিত করে অতঃপর ১৪৩২ শকের বৈশাখ মাসে রথযাত্রার আগেই—দক্ষিণদেশাভিমুখে তীর্থ পর্যটনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

সমগ্র দক্ষিণ ভারত এবং দাক্ষিণাত্য পর্যটন শেষ করে ছ'বছর পরে। ১৪৩৪ শকের প্রারম্ভে পুনরায় চৈতন্য নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। নীলাচলে এসে তিনি কাশীমিশ্রের গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। এখানেই তিনি নীলাচলবাসী ভক্তদের সঙ্গে পরিচিত হন। জগন্নাথদেবের অনবসর কালের অঙ্গসেবনকারী জনার্দন, জগন্নাথের প্রহরী স্বর্ণবেত্রধারী কৃষ্ণদাস, জগন্নাথদেবের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষক শিখি মাহিতী, বৈষ্ণব ভক্ত প্রদ্যুম্ন মিশ্র, দাস নামে পরিচিত জগন্নাথ দেবের প্রধান পাচক, শিখি মাহিতীর ভ্রাতা মুরারি মাহিতী, চন্দ্রশেখর, সিংহেশ্বর মুরারি, বিষ্ণুদাস, প্রহরাজ মহাপাত্র, পরমানন্দ মহাপাত্র প্রমুখাদির সঙ্গে তিনি পরিচিত হলেন। অতঃপর রায় রামানন্দের পিতা ভবানন্দ রায় তাঁর চারটি পুত্রকে সঙ্গে নিয়ে চৈতন্যসমীপে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর এক পুত্র বাণীনাথ পট্টনায়ককে চৈতন্যের আজ্ঞা পালনের জন্য চৈতন্যের কাছে রেখে গেলেন।

উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্র চৈতন্যের দর্শন লাভের জন্য খুবই ব্যগ্র ছিলেন। কিন্তু বিষয়ী প্রতাপরুদ্রের ইচ্ছা পূরণে চৈতন্য সম্মত ছিলেন না। চৈতন্যের দর্শনলাভে ব্যর্থকাম প্রতাপরুদ্র শুধু রাজত্ব ত্যাগের সংকল্পই গ্রহণ করেন নি, সেই সঙ্গে জীবন বিসর্জন দেবার সংকল্পও গ্রহণ করেন। তখন সার্বভৌম তাঁকে চৈতন্যের দর্শন লাভের উপায় বলে দিলেন। রথযাত্রাদিনে জগন্নাথের রথ যখন বলগণ্ডিস্থানে থামবে, সেই অবসরে চৈতন্য যাবেন ভক্তদের সঙ্গে নিকটবর্তী পুষ্পোদ্যানে বিশ্রাম করতে। ইত্যবসরে প্রতাপরুদ্র যেন বৈষ্ণবের বেশে শ্রীমদ্ভাগবৎ বর্ণিত কৃষ্ণের রাসলীলা সম্বন্ধীয় পাঁচটি অধ্যায় পাঠ করতে করতে একাকী চৈতন্য সমীপে গিয়ে উপস্থিত হন। সার্ব্বভৌমের এবংবিধ পরামর্শে প্রতাপরুদ্র খুব খুশী হলেন এবং তাঁর নির্দেশিত পথেই

চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হতে মনস্থ করলেন।

তিনদিন পরে জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা উদ্‌যাপিত হল। জগন্নাথদেবের স্নানযাত্রা দেখে চৈতন্য খুব খুশী হলেন। কিন্তু স্নানযাত্রার পর অনবসর সময়ে জগন্নাথের দর্শন লাভে ব্যর্থকাম হয়ে ব্যথিত চিত্তে 'আলালনাথ' অভিমুখে চলে গেলেন। পুরী থেকে ১৪-১৫ মাইল দূরে 'আলালনাথ' অবস্থিত। জগন্নাথের অনবসরে চৈতন্য আলালনাথে গিয়ে থাকতেন। এইস্থানে আলালনাথ নামে এক নারায়ণ মূর্তি আছেন। সার্ব্বভৌম প্রমুখ ভক্তগণ চৈতন্যকে আলালনাথ থেকে নীলাচলে নিয়ে এলেন। প্রতাপরুদ্রকে চৈতন্যের নীলাচল প্রত্যাবর্তনের সংবাদ জানান হ'ল। ইতিমধ্যে গোপীনাথ আচার্য ও রাজার কাছে গিয়ে গৌড় থেকে চৈতন্যের দু'শত ভক্তের নীলাচল উপস্থিতির সংবাদ জানিয়ে তাদের উপযুক্ত বাসস্থান এবং মহাপ্রসাদের ব্যবস্থা করে দেবার জন্য বললেন। রাজা গোপীনাথ আচার্যের কথায় স্বীকৃত হয়ে গৌড়ীয় ভক্তদের সঙ্গে পরিচিত হবার জন্যে রাজপ্রাসাদের ছাদের ওপরে গিয়ে উঠলেন। অনন্তর প্রতাপরুদ্র কাশী মিশ্র এবং পড়িছাপাত্র এই দু'জনকে চৈতন্য সমীপে সমাগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পছন্দমত বাসস্থান, প্রসাদ ভক্ষণ, ঠাকুর দর্শন প্রভৃতির ব্যবস্থা করতে নির্দেশ দিলেন। চৈতন্য তাঁর ভক্তদের নিয়ে সন্ধ্যাকালে জগন্নাথ মন্দিরে গিয়ে সঙ্কীর্তন আরম্ভ করলেন। রাজা প্রতাপরুদ্র তাঁর সঙ্গীসহ প্রাসাদের ওপর থেকে চৈতন্যের সঙ্কীর্তন দেখে চমৎকৃত হলেন এবং চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য নিরতিশয় উৎকণ্ঠিত হলেন। কটক থেকে তিনি পত্রদ্বারা সার্ব্বভৌমকে জানালেন যে চৈতন্য যদি আজ্ঞা দেন তবে তিনি কটক থেকে তাঁকে দর্শন করতে শ্রীক্ষেত্রে উপস্থিত হবেন। কিন্তু চৈতন্য রাজার প্রস্তাবে সম্মত না হলে, সার্বভৌম সেকথা রাজাকে জানালেন। পুনরায় প্রতাপরুদ্র সার্বভৌমকে পত্র দ্বারা অনুরোধ জানালেন, তিনি যেন চৈতন্যের কাছে উপস্থিত ভক্তদের দ্বারা তাঁকে দর্শনদানের ব্যাপারে চৈতন্যকে সম্মত করান। অন্যথায় তিনি রাজৈশ্বর্য ত্যাগ করে ভিখারী হতে প্রস্তুত, অথবা প্রাণত্যাগ করবেন। অতঃপর সার্বভৌম ভক্তগণ সমভিব্যাহারে চৈতন্য সমীপে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর প্রতি রাজার অনুরাগের কথা জানালেন। চৈতন্যের সেবক গোবিন্দের কাছ থেকে চৈতন্যের একটি বহির্বাস চেয়ে নিয়ে নিত্যানন্দ সার্বভৌম মারফৎ তা

রাজার কাছে পাঠিয়ে দিলেন। প্রতাপরুদ্র সেই বহির্বাসটিকেই চৈতন্যজ্ঞানে পূজা করতে লাগলেন। রায় রামানন্দ দক্ষিণদেশ থেকে এসে শ্রীক্ষেত্রে চৈতন্যের সঙ্গে একত্রে বসবাসের অনুমতি প্রার্থনা করলে রাজা তাঁকে সম্মতি দিলেন এবং চৈতন্যের সঙ্গে তাঁর মিলনের ব্যাপারে সাহায্য করতে রামানন্দকে তিনি অনুরোধ জ্ঞাপন করলেন। কটক থেকে রায় রামানন্দ এবং রাজা প্রতাপরুদ্র উভয়ে একসঙ্গে শ্রীক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হলেন।

ব্যবহারিক বিষয়ে নিপুণ রাজমন্ত্রী রামানন্দ অত্যন্ত কৌশলের সঙ্গে চৈতন্যকে তাঁর প্রতি রাজা প্রতাপরুদ্রের ভক্তির কথা উল্লেখ করে চৈতন্যের মন দ্রবীভূত করতে প্রয়াসী হলেন। চৈতন্য বিষয়ী লোকের সঙ্গে সাক্ষাৎকার অনুচিত এই যুক্তিতে রাজার পরিবর্তে তাঁর পুত্রের সঙ্গে মিলিত হতে সম্মত হলেন। তদনুসারে পীতাম্বর ও রত্নময় অলঙ্কারে ভূষিত রাজা প্রতাপরুদ্রের শ্যামলবর্ণের কিশোর পুত্রকে চৈতন্য সমীপে আনয়ন করা হল। চৈতন্য রাজপুত্রকে আলিঙ্গন দান করলেন। তাকে প্রত্যহ তাঁর কাছে আসার আজ্ঞাও দিলেন। অতঃপর রামানন্দের সঙ্গে রাজপুত্র প্রতাপরুদ্রের কাছে প্রত্যাবর্তন করলেন। প্রতাপরুদ্র পুত্রকে আলিঙ্গন করে যেন সাক্ষাৎ চৈতন্যের স্পর্শসুখ লাভ করলেন। এইভাবে রাজা প্রতাপরুদ্রের পুত্র চৈতন্য ভক্তগণের মধ্যে অন্যতম বলে স্বীকৃতি লাভ করেন।

ক্রমে রথযাত্রা এসে গেল। চৈতন্য কাশী মিশ্র, পড়িছা পাত্র প্রমুখাদির কাছ থেকে গুণ্ডিচা মন্দির পরিমার্জনের দায়িত্ব চেয়ে নিলেন। গুণ্ডিচা মন্দির সুন্দরাচলে অবস্থিত। রথযাত্রার দিন জগন্নাথদেবকে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্টো রথের দিন পুনরায় তাঁকে এই মন্দির থেকে ফিরিয়ে আনা হয়। সমগ্র বৎসরের মধ্যে মাত্র ৮।৯ দিন জগন্নাথ গুণ্ডিচা মন্দিরে অবস্থান করেন এবং বৎসরের অবশিষ্ট সময় ঐ মন্দির শূন্য পড়ে থাকে। বলাবাহুল্য তাই রথের পূর্ব্বে গুণ্ডিচা মন্দিরের সারাবৎসরের ধূলা ময়লা পরিমার্জন করতে হয়। চৈতন্য এই দায়িত্বই স্বতঃস্ফূর্তভাবে যাজ্ঞা করে নিলেন। অনুচর বৃন্দসহ তিনি মন্দিরটি পরিমার্জন করলেন এরপর গুণ্ডিচা মন্দিরের নিকটবর্তী নৃসিংহ দেবের মন্দিরটিও উত্তমরূপে পরিমার্জন করলেন। তারপর নিকটস্থ ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরে সকলে স্নান করলেন।

রথযাত্রার আগের দিন ভক্তগণ সমভিব্যাহারে চৈতন্য 'নেত্রোৎসব' দর্শন

অভিপ্রায়ে জগন্নাথ দেবের মন্দিরাভিমুখে যাত্রা করেন। স্নানযাত্রার পর থেকে পনের দিন জগন্নাথের নূতন করে অঙ্গরাগ করা হয় বলে এই ক'দিন তাঁর দর্শন পাওয়া যায় না। অতঃপর রথযাত্রার পূর্বদিনে জগন্নাথের চক্ষুদান করা হয়ে থাকে। একেই বলে 'নেত্রোৎসব'। যদিও জগন্নাথের ভোগ মণ্ডপে উপস্থিত হয়ে জগন্নাথ দর্শনের কারো অধিকার নেই, তবু উৎকণ্ঠার আতিশয্যে চৈতন্য ভোগমণ্ডপে উপস্থিত হয়েই জগন্নাথ দর্শন করেন।

রথযাত্রার দিন চৈতন্য রাত্রি থাকতেই শয্যা থেকে উঠে পার্ষদগণের সঙ্গে স্নান সমাপন করে জগন্নাথের 'পাণ্ডুবিজয়' দর্শনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। রথের দিন মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত পথে তুলার বালিশ পেতে পাণ্ডাগণ জগন্নাথকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে বিগ্রহের স্কন্ধ পট্টডুরি ইত্যাদি ধরে বালিশের ওপর দাঁড় করান। ক্রমে এক বালিশ থেকে অন্য বালিশে জগন্নাথকে নেওয়া হয়। জগন্নাথের এই ভাবে বালিশের ওপর দিয়ে গমন 'পাণ্ডুবিজয়' নামে পরিচিত। 'পাণ্ডুবিজয়' দর্শন করে প্রেমাবিষ্ট হয়ে 'মণিমা' বলে উচ্চৈস্বরে চীৎকার করে ওঠেন। এদিকে প্রচলিত প্রথানুযায়ী রাজা প্রতাপরুদ্র স্বুবর্ণ মার্জনী হাতে জগন্নাথের যাত্রার পথ পরিষ্কার করছিলেন। প্রতাপরুদ্র চন্দনমিশ্রিত জলের দ্বারা পথ ভেজালেন। রাজার এবংবিধ কার্যাবলী দেখে চৈতন্য রাজার ওপর যারপরনাই সন্তুষ্ট হলেন।

রথের সাজ অপরূপ। স্বর্ণমণ্ডিত নতুন রথ। শত শত শুক্ল বর্ণের চামর, উজ্জ্বল দর্পণ, সুনির্মল চাঁদোয়া, রথের উপরিস্থিত শত শত পতাকা রথের শোভা বৃদ্ধি করছিল। রথের মধ্যে ঘাগর, কিঙ্কিনী, ঘণ্টা ইত্যাদি বাদ্য যন্ত্রাদি বাজছিল। নানাবিধ চিত্র এবং পট্টবস্ত্রাদি দ্বারাও রথ সুসজ্জিত করা হয়েছিল। একটি রথ জগন্নাথের এবং অপর দু'টি রথ যথাক্রমে সুভদ্রা এবং বলরামের। 'গৌড়' নামে একজাতীয় উড়িষ্যাবাসী লোক রথ টানতে আরম্ভ করল। রথাগ্রে নৃত্যরত চৈতন্য বারংবার আছাড় খেয়ে পড়তে লাগলেন। জগন্নাথের যত সেবক, রাজকর্মচারী এবং অন্যান্য যারা ভিন্ন প্রদেশ থেকে রথযাত্রা দর্শন করতে নীলাচলে এসেছিলেন, সকলেই চৈতন্যের নৃত্য এবং প্রেমাবেশ দর্শনে মুগ্ধ হলেন। নৃত্যরত অবস্থায় চৈতন্য প্রতাপরুদ্রের সামনে আছাড় খেয়ে পড়লে ব্যস্ত প্রতাপরুদ্র দ্রুত তাঁকে ধরলেন। কিন্তু প্রতাপরুদ্রকে ধরতে দেখে চৈতন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে লাগলেন। চৈতন্যের কথা শুনে প্রতাপরুদ্র ভীত হলে

সার্বভৌম তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। রথ ক্রমে পৌঁছাল 'বলগণ্ডি' নামক স্থানে। এখানে জগন্নাথদেবকে ভোগ নিবেদন করার রীতি প্রচলিত। তদনুযায়ী রাজা প্রতাপরুদ্র, তাঁর মহিষীবৃন্দ, নীলাচলবাসী ছোট বড় সব শ্রেণীর মানুষ নানাদেশ থেকে আগত যাত্রীরা জগন্নাথদেবের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করলেন।

চৈতন্য যখন প্রেমাবিষ্ট অবস্থায় এক উদ্যানস্থ গৃহের দাওয়ায় অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে রাজা প্রতাপরুদ্র একাকী রাজবেশ পরিত্যাগ করে সার্বভৌমের পরামর্শ অনুযায়ী বৈষ্ণবের বেশে উদ্যানে প্রবেশ করলেন এবং উদ্যানস্থ সকল ভক্তের আজ্ঞা গ্রহণ করে চৈতন্যের চরণে হাত দিলেন এবং প্রেমাবিষ্ট চৈতন্যের পাদ সংবাহন করতে লাগলেন। পাদসংবাহনকালে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধস্থিত 'জয়তি তেহধিকং' শ্লোকটি পাঠ করছিলেন। রাজার মুখে এই শ্লোক শুনে চৈতন্য আনন্দের আতিশয্যে তাঁকে আলিঙ্গন দান করলেন এবং বারংবার 'ভূরিদা ভূরিদা' শব্দ উচ্চারণ করলেন। অতঃপর চৈতন্য রাজার কাছে পরিচয় জিজ্ঞাসা করলেন। রাজা তাঁর প্রকৃত পরিচয় গোপন রেখে নিজেকে চৈতন্যের দাসানুদাস বলে বললেন। প্রতাপরুদ্র চৈতন্যকে প্রণাম করে উদ্যান থেকে নির্গত হয়ে গেলেন। উদ্যান মধ্যেই চৈতন্য তাঁর ভক্তদের সঙ্গে মধ্যাহ্নকৃত্য এবং মধ্যাহ্ন ভোজন সমাপন করলেন।

এদিকে রথ চালাবার সময় হল। গৌড় জাতীয় উড়িষ্যা বাসী সকলে রথ টেনে ব্যর্থ হয়ে রথের দড়ি পরিত্যাগ করল। তখন রাজা প্রতাপরুদ্র পাত্র মিত্র সহ রথ টানাবার জন ব্যগ্র হয়ে মহামল্লদের নিযুক্ত করলেন। কিন্তু তাতেও ব্যর্থ হলে মত্তহস্তী নিযুক্ত করা হল। কিন্তু তারাও ব্যর্থ হল। অতঃপর চৈতন্য স্বয়ং পার্ষদগণ সহ রথ টানতে থাকলে রথ ফের সচল হ'ল। অতঃপর সেবকগণ জগন্নাথকে রথ থেকে নামিয়ে গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে গিয়ে মন্দিরস্থ সিংহাসনে উপবেশন করালেন। সুভদ্রা এবং বলরামকেও সিংহাসনে স্থাপন করা হ'ল। জগন্নাথদেবের গুণ্ডিচা মন্দিরে অবস্থান কালের নয় দিনই চৈতন্যও গুণ্ডিচা মন্দিরের নিকটস্থ 'জগন্নাথ বল্লভ' নামক প্রশস্ত পুষ্পোদ্যানে অবস্থান করলেন।

এদিকে ক্রমে 'হোরা পঞ্চমী' তিথি এসে গেল। রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্তী পঞ্চমী তিথি 'হোরা পঞ্চমী' তিথি নামে পরিচিত। প্রতাপরুদ্র

কাশী মিশ্রকে এমনভাবে উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করতে বললেন যাতে চৈতন্য চমৎকৃত হন।

প্রভাতকালে চৈতন্য সুন্দরাচলে গিয়ে জগন্নাথ দর্শন করলেন। তারপর উৎকণ্ঠিত চিত্তে হোরা পঞ্চমীর উৎসবানুষ্ঠান দর্শনের অভিপ্রায়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করলেন। কাশী মিশ্র চৈতন্যকে তাঁর ভক্তদের সঙ্গে এমনস্থানে বসালেন, যেখান থেকে হোরা পঞ্চমীর অনুষ্ঠানাদি উত্তমরূপে প্রত্যক্ষ করা যায়। যথাসময়ে লক্ষ্মী দেবী নীলাচলের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। চৈতন্য 'সুন্দরাচলে' ৮৷৯ দিন অতিবাহিত করলেন। অবশেষে জগন্নাথের পুনর্যাত্রার দিন ক্রমে এসে গেল। সুন্দরাচল থেকে তাঁর নীলাচলে প্রত্যাবর্তনের পালা। পুনরায় জগন্নাথের 'পাণ্ডুবিজয়' হল। জগন্নাথকে সিংহাসনে বসান হল। চৈতন্যও ভক্তগণসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

ওড়নি ষষ্ঠীর দিন পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি চৈতন্যকে জগন্নাথ দেবের উদ্দেশে মাড়সহ নূতন বস্ত্র প্রদান করা দেখালেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর চৈতন্যের ইতিমধ্যে চার বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল। এর মধ্যে দু'বৎসর অতিবাহিত হয়েছিল দাক্ষিণাত্যে এবং দু'বৎসর নীলাচলে। চৈতন্য পঞ্চম বর্ষের রথযাত্রা দর্শনের পর গৌড় হয়ে বৃন্দাবনে যাত্রার ইচ্ছার কথা জানালেন। ১৪৩৬ শকাব্দের বিজয়া দশমীর দিনে নীলাচল থেকে তিনি সত্য সত্যই গৌড়াভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর সঙ্গে উৎকলদেশীয় ভক্তরাও চলতে লাগল। অতিকষ্টে চৈতন্য তাদের নিবৃত্ত করলেন। নিজ ভক্তগণ সহ তিনি পুরীর নিকটবর্তী 'ভবানীপুর' নামক স্থানে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে একদিন অতিবাহিত করার পর তিনি উপস্থিত হলেন ভুবনেশ্বরে। এখান থেকে কটকে এসে তিনি সাক্ষীগোপাল দর্শন করলেন। রাজা প্রতাপরুদ্রের রাজধানী ছিল কটক। তিনি সংবাদ পেয়েই চৈতন্য সমীপে এসে উপস্থিত হলেন এবং দণ্ডবৎ হয়ে চৈতন্যকে প্রণাম করলেন। চৈতন্যও তাঁকে আলিঙ্গন করলেন। প্রতাপরুদ্র চৈতন্য নদীর যে স্থানে স্নান করবেন, সেই স্থানে চৈতন্যের আগমনের স্মৃতি স্বরূপ একটি স্তম্ভ নির্মাণের আদেশ দিলেন। তাছাড়া একটি বৃহদাকারের ঘাট নির্মাণেরও তিনি আদেশ দেন। রাজা আরও বললেন যে তিনি স্বয়ং ঐ ঘাটে স্নান করবেন এবং মৃত্যুকালে ঐ ঘাটে উপস্থিত থাকতে পারলে নিজেকে সৌভাগ্যবান বলে মনে করবেন। চৈতন্যের গৌড় যাওয়ার পথে প্রতাপরুদ্রের রাজত্ব মধ্যে যেসব স্থান

পড়ে এই রকম পাঁচ সাতটি স্থানে চৈতন্যের জন্য নতুন গৃহ নির্মাণেরও তিনি আদেশ দিলেন। রাজা 'চৌদার' নামক স্থানে একটি নতুন গৃহ নির্মাণের আদেশ দিলেন। মহানদীর যে তীরে কটক, তার অপর তীরের একটি স্থান হল চৌদার। কটক থেকে মহানদী অতিক্রম করে চতুর্দ্বারে উপস্থিত হতে হয়। এই চতুর্দ্বারেরই সাধারণ নাম 'চৌদার'।

সন্ধ্যাকালে চৈতন্য কটক থেকে যাত্রা করবেন অবহিত হয়ে প্রতাপরুদ্র হস্তী পৃষ্ঠে তাঁবু খাঁটিয়ে রাজরাণীদের তার ওপরে বসালেন চৈতন্য যে পথে গমন করবেন, হাতীগুলোকে সেই পথের ধারে সারি করে রাখা হ'ল। উদ্দেশ্য, যাতে রাণীরা চৈতন্যের দর্শন লাভে সমর্থ হন। সন্ধ্যাকালে চৈতন্য তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে কটক থেকে রওনা হলেন। 'চিত্রোৎপলা' নদীর ঘাটে তিনি স্নান করলেন। মহানদীর যে অংশ কটকের কাছে প্রবাহিত, তাই 'চিত্রোৎপলা নদী' নামে পরিচিত। রাজমহিষীরা এখানেই চৈতন্যকে দর্শন করলেন। 'চিত্রোৎপলা' নদী অতিক্রম করে চৈতন্য এসে পৌছালেন চৌদারে। এখান থেকে এসে তিনি এসে উপনীত হলেন যাজপুর। তারপর এসে পৌছালেন রেমুণায়। এখানে তিনি রামানন্দকে বিদায় দিলেন। অতঃপর চৈতন্য এসে উপস্থিত হলেন উড়িষ্যা দেশের সীমানায়। এখানে রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনস্থ স্থান বিশেষের অধিপতি চৈতন্যকে উড়িষ্যা সীমার পরে যে রাজা তার যবন অধিপতি সম্বন্ধে অবহিত করলেন। 'পিছলদা' নামক স্থান পর্যন্ত ঐ যবন রাজার অধিকার ভুক্ত ছিল। যবন অধিপতির অত্যাচারে কেউ মন্ত্রেশ্বর নদী পর্যন্ত অতিক্রম করতে সাহসী হ'ত না। এদিকে এই যবন রাজার এক চর গুপ্তবেশে উড়িষ্যার কটকে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যের বিচিত্র চরিত্র দর্শন করে যবন রাজার কাছে সবিস্তারে জানিয়েছিলেন। চৈতন্য সম্পর্কে সবশুনে যবন রাজা তাঁর এক বিশ্বস্ত কর্মচারীকে পাঠালেন চৈতন্য সমীপে। কর্মচারীটি রাজ অধিকারীকে জানালেন যে তিনি যদি সম্মত হন, তাহলে যবনরাজ স্বয়ং এসে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হবেন। রাজ অধিকারী বলাবাহুল্য যারপরনাই বিস্মিত হলেন। যবনরাজকে তিনি স্বচ্ছন্দে আসতে পারেন বলে বলে দেওয়া হ'ল। তদনুযায়ী হিন্দুবেশ পরিগ্রহ করে তিনি উড়িষ্যা দেশের রাজ অধিকারীর কাছে উপস্থিত হলেন এবং চৈতন্য ভক্তে পরিণত হলেন। যবনরাজ স্বয়ং চৈতন্যকে পিছলদা পর্যন্ত পৌছিয়ে দিলেন। এখান থেকে চৈতন্য উপস্থিত হলেন পানিহাটিতে গৌড়ে কয়েকদিন

অতিবাহিত করেই চৈতন্য পুনরায় নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করলেন। তাঁর উপস্থিতি সংবাদ অবগত হয়েই কাশী মিশ্র, রামানন্দ, বাণীনাথ, প্রদ্যুম্ন মিশ্র প্রমুখেরা এসে উপস্থিত হলেন। বর্ষায় চারমাস নীলাচলে অতিবাহিত করে চৈতন্য বৃন্দাবনে যেতে মনস্থ করলেন।

নীলাচলে অবস্থানকালে প্রদ্যুম্ন মিশ্র নামক নীলাচলবাসী এক ব্রাহ্মণ একদিন চৈতন্য সমীপে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যকে তাঁর কৃষ্ণকথা শ্রবণের অভিলাষ ব্যক্ত করলেন। চৈতন্য তাকে প্রেরণ করলেন রায় রামানন্দের কাছে।

বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনকালে চৈতন্য পথে প্রয়াগে যে বল্লভ ভট্টের গৃহে নিমন্ত্রণ অঙ্গীকার করেছিলেন, সেই বল্লভ ভট্ট শ্রীমদ্ভাগবতের এক টীকা রচনা করে তা চৈতন্যকে শোনাবার উদ্দেশ্যে নীলাচলে এসে উপস্থিত হলেন। চৈতন্য বল্লভ ভট্টের সঙ্গে অদ্বৈত আচার্য, নিত্যানন্দ, সার্বভৌম, রায় রামানন্দ প্রমুখাদির পরিচয় করিয়ে দিলেন। এদের দেখে ভট্ট যারপরনাই চমৎকৃত হলেন। রথযাত্রার সময় পার্ষদগণ সহ চৈতন্যের নৃত্যও দর্শন করলেন তিনি। চৈতন্য কিন্তু তাঁর কৃত ভাগবতের টীকা শুনতে অসম্মত হলেন। ভট্ট অতঃপর চৈতন্যের কাছে তাঁর দীনতা স্বীকার করলেন। বালগোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত বল্লভভট্ট গদাধর পণ্ডিতের কাছে কিশোর গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করলেন।

রাজা প্রতাপরুদ্র নীলাচলে অবস্থানকালে প্রত্যহ কাশী মিশ্রের গৃহে উপস্থিত হয়ে তাঁর পাদসম্বাহনাদি করতেন এবং তাঁর কাছ থেকে জগন্নাথের সেবার বিবরণ বিষয়ে অবহিত হতেন। প্রতারুদ্রের অধীনস্থ মালজাঠ্যাদণ্ড পাটের শাসনকর্তা গোপীনাথ পট্টনায়ককে চৈতন্য কিভাবে রাজ কার্য সম্পাদন করতে হয় সে সম্পর্কে উপযুক্ত উপদেশাদি দান করেন। গোপীনাথের মনে নির্বেদ উপস্থিত হয়। তিনি চৈতন্যকে অনুরোধ জানালেন তাঁকে বিষয় সম্পর্ক থেকে মুক্ত করতে। কিন্তু চৈতন্য তার সে প্রার্থনা মঞ্জুর করলেন না। রাজার ন্যায্য প্রাপ্য মিটিয়ে দিয়ে অবশিষ্ট লভ্যাংশ দ্বারা নানাবিধ ধর্মকর্ম করার পরামর্শ দিলেন তাকে।

একদিন চৈতন্য জগন্নাথদেবের সম্মুখস্থ জগমোহন নামক নাটমন্দিরের পূর্ব প্রান্তে গরুড়স্তম্ভ নামক যে স্তম্ভ আছে তার পশ্চাতে দাঁড়িয়ে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন। এই সময় এক উড়িষ্যা দেশীয় স্ত্রীলোক জগন্নাথের দর্শন লাভে

অসমর্থ হয়ে গরুড়স্তম্ভে আরোহণ করে চৈতন্তের স্কন্ধে একটি পা স্থাপন করে মনের সুখে জগন্নাথ দর্শন করছিলেন। চৈতন্যের সেবক গোবিন্দ স্ত্রীলোকটিকে চৈতন্যের স্কন্ধে পা রাখতে নিষেধ করলেন। কিন্তু পাছে স্ত্রীলোকটির জগন্নাথ দর্শনে ব্যাঘাত হয় এজন্য তাকে বাধা দিতে চৈতন্য নিষেধ করলেন। স্ত্রীলোকটির বাহ্যজ্ঞান ফিরে এলে তিনি নিজ কৃত কর্মের জন্য চৈতন্যের কাছে ক্ষমা চাইলেন, তাঁকে প্রণাম করলেন।

একদিন সমুদ্রে স্নান করতে যাবার সময় চৈতন্য সমুদ্রের তীরস্থির 'চটক পর্বত' নামে পরিচিত বালুর পাহাড় দেখে প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন এবং চটক পর্বতাভি-মুখে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে অনেক কষ্টে তাঁর ভক্তগণ তাঁর জ্ঞান ফিরিয়ে আনেন।

দক্ষিণ ভারত পর্যটন

১৪৩২ শকাব্দে (১৫১০ খ্রীষ্টাব্দে) বৈশাখ মাসের প্রথম দিকে শ্রীচৈতন্য তাঁর পার্ষদদের কাছে দক্ষিণ ভারত পরিভ্রমণ করার ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। নিত্যানন্দ, জগদানন্দ, মুকুন্দ প্রভৃতিদের অনেকেই তাঁর সঙ্গে যেতে চাইলেন। কিন্তু তিনি কাউকেই সঙ্গে নিলেন না, নিলেন একমাত্র কৃষ্ণদাস নামে এক ব্রাহ্মণ কুমারকে। সার্বভৌমের গৃহে কয়েকদিন অতিবাহিত করে সেখান থেকে সদলবলে জগন্নাথ দেবের মন্দিরে এসে জগন্নাথ দর্শন করে, জগন্নাথের প্রসাদী মালা নিয়ে অন্যান্যদের সঙ্গে জগন্নাথদেবকে প্রদক্ষিণ করে পরিশেষে দক্ষিণ ভারত তীর্থ পর্যটনের উদ্দেশ্যে বার হলেন চৈতন্যদেব। এই ভ্রমণের যথাযথ বিবরণ 'চৈতন্যচরিতামৃতে' আছে। 'গোবিন্দদাসের করচা'য় বর্ণিত চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভারত পর্যটনের বৃত্তান্ত পরবর্তীকালের কল্পনাপ্রসূত।

সার্বভৌম চৈতন্যের সঙ্গে সমুদ্রতীর পর্যন্ত এসে তাঁকে গোদাবরী নদীতীরে বিদ্যানগরে বসবাসকারী উৎকল রাজপ্রতিনিধি রায় রামানন্দের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য অনুরোধ জ্ঞাপন করেন। অতঃপর সার্বভৌমের অনুরোধে স্বীকৃত হয়ে চৈতন্য দ্রুত সেই স্থান ত্যাগ করলেন। এরপর গোপীনাথ,

নিত্যানন্দ ইত্যাদির সঙ্গে পুরীর চারক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত আলালনাথের মন্দিরে এসে উপস্থিত হলেন। আলালনাথকে প্রণাম করে চৈতন্য প্রেমাবেশে একেবারে মত্ত হয়ে উঠলেন। সেই দিনটি এখানে অতিবাহিত করে পরদিন ঐস্থান ত্যাগ করলেন। কৌপীন, বহির্বাস এবং জলপাত্র সঙ্গে নিয়ে কেবল কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণ কুমার তাঁর অনুগমণ করল।

আলালনাথ থেকে চৈতন্য কূর্মক্ষেত্রে এসে কূর্ম বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন। এখানে কূর্ম নামক এক বৈদিক ব্রাহ্মণ তাঁকে নিজের গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। একদিন বিপ্রগৃহে অবস্থান করে পরদিন সেখান থেকে প্রস্থান করলেন। চৈতন্যের প্রস্থানের পর বাসুদেব নামে এক কুষ্ঠরোগ গ্রস্ত ব্রাহ্মণ তাঁকে দর্শনের জন্য কূর্মের গৃহে এসে উপস্থিত হন। কিন্তু ইতি-পূর্বেই সেখান থেকে চৈতন্যদেব চলে গেছেন জেনে ব্রাহ্মণ খুব বিলাপ করতে থাকেন। সম্পূর্ণ আকস্মিক ভাবে চৈতন্য পুনরায় কূর্মগৃহে এসে উপস্থিত হন এবং বিলাপরত বাসুদেবকে আলিঙ্গন করেন। বাসুদেবের দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধি সম্পূর্ণ রূপে নিরাময় হয়ে গেল। বাসুদেবকে কৃষ্ণনাম প্রচারের উপদেশ দিয়ে চৈতন্য সেখান থেকে অন্তর্হিত হলেন এখান থেকে যাত্রা করে কিছুদিন পরে তিনি এসে উপস্থিত হলেন 'জিয়ড়' নৃসিংহ ক্ষেত্রে।[১] নৃসিংহ মূর্তির উদ্দেশে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম নিবেদন করে তিনি প্রেমাবেশে নৃত্য করতে শুরু করলেন। নৃসিংহ সেবক তাঁকে মাল্য প্রসাদ এনে দিল। জিয়ড়েও এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক তিনি আমন্ত্রিত হলেন। এঁর বাড়ীতে রাত্রিযাপন করে ওখান থেকে সকলকে বৈষ্ণব ধর্মে দীক্ষিত করে এসে উপস্থিত হলেন। গোদাবরী নদীতীরে। গোদাবরীর তীর সন্নিবিষ্ট বিবিধ প্রকার বৃক্ষরাজি পূর্ণ বনভূমি ও নদী দর্শন করে চৈতন্য স্থানটিকে বৃন্দাবন মনে করে প্রেমাবিষ্ট হলেন। স্নানান্তে যখন তিনি ঘাটের কিয়দ্দূরে উপবিষ্ট হয়ে হরিনাম সংকীর্তন করছেন, এমন সময়ে স্নানের জন্য রাজা রামানন্দ বহুবিধ বাজনাসহ চতুর্দোলায় চড়ে ঐ ঘাটে এসে উপস্থিত হলেন। রামানন্দ এবং চৈতন্য পরস্পর পরস্পরের পরিচয় লাভ করে প্রেমানন্দে অচৈতন্য হয়ে পড়লেন। যখন তাঁরা প্রকৃতিস্থ হলেন, তখন সেখানে এক ব্রাহ্মণ এসে উপস্থিত। তিনি চৈতন্যদেবকে নিজের গৃহে আমন্ত্রণ জানালেন। তদনুযায়ী ঐ বিপ্রের গৃহে চৈতন্য মধ্যাহ্নকালীন আহার সমাধা করলেন। সন্ধ্যায় রামানন্দ এসে পুনরায় চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত

হলেন। রামানন্দের কাছে রাধাকৃষ্ণের প্রেমতত্ত্বের ব্যাখ্যা শুনে তিনি তাঁকে গাঢ় আলিঙ্গন পাশে আবদ্ধ করলেন। বিদ্যানগরে চৈতন্য রামানন্দের সঙ্গে কৃষ্ণতত্ত্ব, রাধাতত্ত্ব, প্রেমতত্ত্ব, লীলাতত্ত্ব—ইত্যাদি আলোচনায় দশদিন অতিবাহিত করলেন। রামানন্দকে বিষয় পরিত্যাগ করে নীলাচলে মিলিত হবার আহ্বান জানিয়ে চৈতন্য তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিলেন। পরদিন প্রভাতে হনুমানজীর মন্দিরে গিয়ে হনুমানকে প্রণাম করে প্রব্রজ্যায় বেরিয়ে গেলেন। বিদ্যানগরে চৈতন্যের সঙ্গে জ্ঞানী, কর্মী, পাষণ্ডী, শ্রীসম্প্রদায় ভুক্ত বৈষ্ণব, রাম উপাসক প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল। সকলেই পূর্বধর্মমত পরিত্যাগ করে চৈতন্য প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করলেন।

বিদ্যানগর থেকে চৈতন্য গৌতমী গঙ্গায় স্নানান্তে মল্লিকার্জুন তীর্থে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি মহেশ ও দাসরাম মহাদেব দর্শন করলেন। তারপর গিয়ে পৌঁছালেন অহোবল নগরে। এখানে তিনি নৃসিংহ মূর্তি দর্শন করলেন। অহোবল থেকে সিদ্ধিবট নামক নগরে উপনীত হলেন।[২] এখানে তিনি সীতাপতি রঘুনাথ মূর্তির উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন।[৩] সিদ্ধিবট নগরে তিনি এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক নিমন্ত্রিত হলেন। এই ব্রাহ্মণটি রামনাম ছাড়া অন্য কোন নাম কখনও উচ্চারণ করতেন না। ব্রাহ্মণের নিমন্ত্রণ অনুযায়ী তাঁর কাছে ভিক্ষা গ্রহণ করে তাঁকে তিনি কৃপা প্রদর্শন করলেন। পরদিন প্রভাতে তিনি স্কন্দক্ষেত্র তীর্থাভিমুখে যাত্রা করলেন। স্কন্দক্ষেত্রে স্কন্দ এবং ত্রিমঠে ত্রিবিক্রম বামন মূর্তি দর্শনান্তে পুনরায় সিদ্ধিবটস্থিত পূর্বের সেই রাম ভক্ত বিপ্রের গৃহে এসে উপস্থিত হলেন। দেখলেন ব্রাহ্মণ তাঁর আজন্ম অভ্যস্ত রামনাথ পরিত্যাগ করে কৃষ্ণনাম করছেন। অতঃপর বৃদ্ধ ব্রাহ্মণকে কৃপা প্রদর্শন করে চৈতন্য বৃদ্ধকাশী অভিমুখে রওনা হলেন। বৃদ্ধকাশীতে উপস্থিত হয়ে শিব দর্শন করলেন এবং নিকটবর্তী গ্রামস্থ এক ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করলেন। এখানে অসংখ্য ব্যক্তি তাঁকে দর্শন করতে হাজির হ'ল। বহু তার্কিক, মীমাংসক ও মায়াবাদীর সঙ্গে তাঁর শাস্ত্রালোচনা হল। সকলের মত খণ্ডন করে তিনি নিজের মত প্রতিষ্ঠা করলেন। অবশেষে জনৈক বৌদ্ধাচার্য কয়েকজন শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে চৈতন্যকে পরম বৈষ্ণব বলে জেনে তাঁকে অপদস্থ করতে অপবিত্র অন্নপূর্ণ একটি পাত্রকে বিষ্ণু প্রসাদ বলে নিয়ে এলেন। অকস্মাৎ বৃহদাকৃতির একটি পাখী এসে সেই অপবিত্র অন্নপূর্ণ পাত্রখানি নিয়ে উড়েগেল। উড়ে যাবার

সময় অপবিত্র অন্নগুলি শিষ্যদের মাথায় এবং পাত্রখানি বৌদ্ধাচার্যের মাথায় গিয়ে পড়ল। পাত্রের আঘাতে বৌদ্ধাচার্য মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। তখন শিষ্যরা চৈতন্যের শরণাপন্ন হলেন। তিনি তাদের আচার্যের কানে কৃষ্ণনাম করার পরামর্শ দিলেন। কৃষ্ণনাম শুনে আচার্যদেব পুনরায় চৈতন্য ফিরে পেলেন এবং হরিধ্বনি করতে লাগলেন।

বৃদ্ধকাশী থেকে চৈতন্য ত্রিপদী ত্রিমল্লে উপস্থিত হয়ে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি দর্শন করলেন।[৪] তারপর এখান থেকে বেঙ্কটঅচল[৫] পরিভ্রমণ করে ত্রিপদীতে শ্রীরাম রঘুনাথ দর্শনান্তে পানা নরসিংহে এসে উপস্থিত হলেন। পানা নরসিংহে তিনি নৃসিংহদেব দর্শন করলেন। শিবকাঞ্চীতে[৬] তিনি শিব দর্শন করলেন এবং এখানকারশৈবদের বৈষ্ণব ধর্মে ধর্মান্তরিত করলেন। বিষ্ণুকাঞ্চীতে লক্ষ্মীনারায়ণ দর্শন করে এখানে-দিন দুই অতিবাহিত করলেন। অতঃপর ত্রিমল্ল দর্শনান্তে ত্রিকালহস্তিতে[৭] গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে মহাদেব দর্শন করে এখান থেকে গিয়ে পৌছলেন পক্ষীতীর্থে। পক্ষীতীর্থে শিব, বৃদ্ধ কোল তীর্থে[৮] শ্বেত বরাহ, পীতাম্বরে[৯] শিব, শিয়ালীস্থিত ভৈরবীদেবী দর্শন করে কাবেরী নদীর তীরে এসে পৌছলেন। কাবেরী তীরস্থিত গোসমাজ-শিব, বেদাবনস্থিত মহাদেব এবং অমৃতলিঙ্গ শিব দর্শন করলেন। এইসব স্থানের শৈবদের তিনি বৈষ্ণবে পরিণত করলেন। অতঃপর দেবস্থানে বিষ্ণু, কুম্ভকর্ণ-কপালের সরোবর, শিবক্ষেত্রে শিব, পাপনাশনে[১০] বিষ্ণু ইত্যাদি দর্শন করে এসে উপনীত হলেন শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে।[১১] এখানে কাবেরী নদীতে স্নান করে নদী তীরে অবস্থিত শ্রীরঙ্গনাথের মন্দিরে গিয়ে শ্রীরঙ্গনাথ দর্শন করলেন।[১২] শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে বেঙ্কট ভট্ট নামক শ্রীবৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত এক ব্রাহ্মণ তাঁকে নিজ গৃহে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন। বেঙ্কট ভট্টের গৃহে চৈতন্য মধ্যাহ্নভোজন সমাধা করলেন। অতঃপর বেঙ্কটভট্ট তাঁকে তাঁর গৃহে চাতুর্মাস্যের চারমাসকাল অবস্থান করার জন্য বিনীত প্রার্থনা জানালেন। অনন্তর চৈতন্য ভট্টের গৃহে চারমাস অবস্থান করতে সম্মত হলেন[১৩]। প্রত্যহ কাবেরীতে স্নান, রঙ্গনাথ দর্শন, কৃষ্ণকথা আলোচনা ইত্যাদির মাধ্যমে চৈতন্য চারমাসকাল অতিবাহিত করলেন। শ্রীরঙ্গক্ষেত্রের ব্রাহ্মণেরা প্রত্যেকে তাঁকে একদিন করে নিমন্ত্রণ করলেন।

শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে এক ব্রাহ্মণ দেবালয়ে উপবেশন করে প্রত্যহ অষ্টাদশ অধ্যায়

গীতা পাঠ করতেন। ব্রাহ্মণ ঠিক শুদ্ধভাবে গীতাপাঠ করতে পারতেন না। এজন্য অনেকেই তাঁকে ব্যঙ্গ করত। চৈতন্য একদিন গেলেন ব্রাহ্মণের গীতাপাঠ শুনতে। গীতা পাঠকালে ব্রাহ্মণকে অতিশয় পুলকিত দেখে চৈতন্য তাঁকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ জানালেন যে তিনি যতক্ষণ গীতাপাঠ করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তিনি দেখতে পান যেন অর্জ্জুনের রথে ঘোড়ার লাগাম ধরে শ্রীকৃষ্ণ উপবিষ্ট রয়েছেন এবং অর্জুনকে হিতোপদেশ দান করছেন। এইকথা শুনে চৈতন্য ব্রাহ্মণকে আলিঙ্গন করলেন এবং তাঁকেই উপযুক্ত গীতাপাঠকারী বলে অভিমত প্রকাশ করলেন। চারমাস কাল বেঙ্কটভট্টের গৃহে অতিবাহিত করে তাঁর সঙ্গে সখ্য স্থাপন করে অতঃপর চাতুর্মাস্য অবসানে সেখান থেকে দক্ষিণ দিকের উদ্দেশে যাত্রা করলেন।

শ্রীক্ষেত্র থেকে চৈতন্য ঋষভ পর্বতে উপস্থিত হয়ে নারায়ণ দর্শন করলেন। এখানে মাধবেন্দ্র পুরীর অন্যতম শিষ্য পরমানন্দ পুরী এক ব্রাহ্মণ গৃহে চাতুর্মাস্য যাপন করছিলেন। একথা জেনে চৈতন্য পরমানন্দ পুরী সমীপে গিয়ে উপস্থিত হলেন। উভয়ে এখানে একত্রে কৃষ্ণকথা আলোচনায় তিনদিন অতিবাহিত করলেন। তারপর পরমানন্দকে নীলাচলে আসার নিমন্ত্রণ জানিয়ে দক্ষিণ অভিমুখে অগ্রসর হয়ে শ্রীশৈলে উপস্থিত হলেন।[১৪] এখানে ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর বেশে শিব-দুর্গা অবস্থান করছিলেন। শিব-দুর্গার কাছে তিনদিন ভিক্ষা গ্রহণের পর চৈতন্য প্রথমে কামকোষ্ঠী এবং কামকোষ্ঠী থেকে কৃতমালা নদীতীরে অবস্থিত দক্ষিণ মথুরা অভিমুখে গমন করলেন।[১৫] এখানে এক রামভক্ত ব্রাহ্মণ তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। কৃতমালা নদীতে স্নান করে চৈতন্য নিমন্ত্রণকারী ব্রাহ্মণের গৃহে উপস্থিত হলেন।[১৬] উপস্থিত হয়ে দেখেন রামভাবে বিভোর ব্রাহ্মণ তখনও পর্যন্ত রান্নার কোন আয়োজন করেন নি। অতঃপর তৃতীয় প্রহরে ব্রাহ্মণ চৈতন্যের সেবার ব্যবস্থা করে দিয়ে নিজে উপবাসী রইলেন। চৈতন্য তাঁকে তাঁর উপবাসের কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। ব্রাহ্মণ জানালেন যে রাবণ কর্তৃক সীতা হরণের কাহিনী শ্রবণ করে নিজের প্রাণের প্রতি তাঁর বিতৃষ্ণা জন্মেছে। অবশেষে চৈতন্য তাঁকে রাবণ কর্তৃক মায়াসীতা হরণের কথা জানালে তবে ঐ ব্রাহ্মণ আত্মহত্যার সঙ্কল্প ত্যাগ করে আহার্য গ্রহণ করলেন।

কৃতমালায় স্নান করার পর দুর্ব্বেশন[১৭] গিয়ে চৈতন্য রঘুনাথ মূর্তি দর্শন

করলেন। এখান থেকে মহেন্দ্র শৈলে গিয়ে পরশুরামের বন্দনা করলেন। তারপর ধনুতীর্থে[১৮] স্নান সেরে সেতুবন্ধ রামেশ্বরে শিব দর্শন করে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। সেদিন রাবণ কর্তৃক মায়া সীতা হরণের বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হচ্ছিল। ব্যাখ্যা শুনে চৈতন্য অতিশয় আনন্দিত হলেন এবং দক্ষিণ মথুরা নিবাসী রামভক্ত ব্রাহ্মণের জন্য কূর্ম পুরাণের ঐ প্রাচীন পত্রটি যাচ্ঞা করে নিলেন। তারপর একখানি নতুন পত্র লিখিয়ে সেই পুস্তক মধ্যে রাখলেন। অতঃপর মথুরায় প্রত্যাবর্তন করে সেই ব্রাহ্মণকে পত্রখানি অর্পণ করলেন।

এখান থেকে তিনি এসে উপস্থিত হলেন পাণ্ড্যদেশে তাম্রপর্ণী নদীর তীরে।[১৯] তাম্রপর্ণী তীরে অবস্থিত নয় ত্রিপদী, চিড়য়তালা তীর্থে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, তিলকাঞ্চীতে শিব, গজেন্দ্র মোক্ষণ তীর্থে বিষ্ণুমূর্তি, পানাগড়ি তীর্থে সীতাপতি, চামতাপুরে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, শ্রীবৈকুণ্ঠে বিষ্ণু, মলয় পর্বতে অগস্ত্য, কন্যাকুমারীতে পার্বতীর কুমারী মূর্তি[২০] এবং আমলকীতলায় রামমূর্তি দর্শনান্তে বামাচারী সন্ন্যাসীদের বাসস্থান মল্লারদেশে গমন করলেন।

এখানে তমাল কার্তিক দর্শন করে বাতাপানী গমন করলেন। বাতাপানীতে রঘুনাথ দর্শন করে সেই রাত্রি এখানেই অতিবাহিত করলেন। ভট্টমারিগণ স্ত্রীলোক ও ধনসম্পদ দেখিয়ে চৈতন্যের অনুচর কৃষ্ণদাসকে প্রলুব্ধ করলে তিনি তাদের কাছ থেকে কৃষ্ণদাসকে উদ্ধার করেন। অতঃপর এখান থেকে পয়স্বিনী তীরে স্নান করে আদিকেশব মন্দিরে কেশব দর্শন করতে গেলেন। এখানে তাঁর সঙ্গে মহাভাগবতগণের কৃষ্ণকথা বিষয়ে আলাপ হ'ল। এই স্থান থেকেই চৈতন্য ব্রহ্মসংহিতার পঞ্চম অধ্যায় প্রাপ্ত হন। বহু যত্নে তিনি পুঁথিটির নকল করিয়ে তা সঙ্গে নিলেন। অতঃপর অনন্ত পদ্মনাভে এসে উপস্থিত হলেন। দু'দিন এখানে অতিবাহিত করে তিনি পদ্মনাভ দর্শন করলেন। তারপর এখান থেকে গেলেন শ্রীজনার্দন দর্শনে। এখানেও দিন দুই অতিবাহিত করে পয়োষ্ণীতে এসে শঙ্কর নারায়ণ দেখলেন।[২১] অতঃপর সিংহারি মঠে গিয়ে শঙ্করাচার্য দর্শন করলেন। সিংহারি মঠ থেকে মৎস্যতীর্থ দর্শনান্তে[২২] তুঙ্গভদ্রায় স্নান করলেন। তারপর শ্রীপাদ মধ্বাচার্যের শ্রীপাটে উপস্থিত হয়ে উড়ুপকৃষ্ণ দর্শন করে প্রেমোন্মত্ত হলেন। এখানে তত্ত্ববাদী সম্প্রদায়ের সঙ্গে তাঁর ধর্মালোচনা হয়। শ্রীচৈতন্য এখান থেকে চলে আসলেন ফল্গুতীর্থে। এখানে ত্রিতকূপ

বিশালা দর্শনান্তে পঞ্চাপ্সরা তীর্থে এসে পৌছান। পঞ্চাপ্সরা তীর্থে গোকর্ণ শিব দর্শন করে দ্বৈপায়নী, সূর্পারক প্রভৃতি তীর্থাদি পর্যটন করেন। তারপর কোলাপুরে লক্ষ্মী, ক্ষীর-ভগবতী, লাঙ্গাগণেশ এবং চোরাভগবতী দেখে পাণ্ডুপুরে এসে উপস্থিত হলেন। পাণ্ডুপুরে বিঠ্‌ঠল ঠাকুর দর্শন করে শ্রীচৈতন্য প্রভূত আনন্দলাভ করেন। পাণ্ডুপুরে এক ব্রাহ্মণ কর্তৃক তিনি নিমন্ত্রিত হন। ব্রাহ্মণের গৃহে ভিক্ষা গ্রহণ করার সময়ে তিনি জানতে পারেন মাধবেন্দ্র পুরীর শিষ্য শ্রীরঙ্গপুরী ঐ গ্রামেই এক ব্রাহ্মণের গৃহে বিশ্রাম গ্রহণে রত। এই সংবাদ অবগত হয়েই উক্ত ব্রাহ্মণের গৃহে চৈতন্য উপস্থিত হলেন শ্রীরঙ্গপুরীর সঙ্গে সাক্ষাৎকারের উদ্দেশ্যে। শ্রীরঙ্গপুরীকে চৈতন্য দণ্ডবৎ হয়ে প্রণাম নিবেদন করলেন। বিপ্রগৃহে উভয়ের কৃষ্ণকথা আলোচনা প্রসঙ্গে পাঁচ-সাত দিন অতিবাহিত হয়ে গেল। শ্রীরঙ্গপুরীর নিকট থেকে তিনি তাঁর ভ্রাতা শঙ্করারণ্যের দেহত্যাগের সংবাদ অবগত হলেন। অতঃপর ব্রাহ্মণের গৃহ থেকে শ্রীরঙ্গপুরী দ্বারকা দর্শনের উদ্দেশ্যে রওনা হয়ে গেলে উক্ত ব্রাহ্মণের অনুরোধে তাঁর গৃহে চৈতন্য আরও চারদিন অবস্থান করলেন। বিপ্রগৃহে অবস্থানকালে তিনি ভীমরথীতে স্নান করে বিঠ্‌ঠল দর্শন করতেন।

পাণ্ডুপুর থেকে তিনি এসে উপস্থিত হলেন কৃষ্ণ বেণ্বাতীরে এবং এখানেও নানা তীর্থ ও মন্দিরাদি তিনি দর্শন করলেন। এই স্থানের ব্রাহ্মণ সমাজে শ্রীকৃষ্ণকথামৃত পাঠ শ্রবণ করে তিনি প্রভূত আনন্দলাভ করেন এবং পুঁথিটির নকল করিয়ে নেন।

শ্রীচৈতন্য অনন্তর তাপীস্নান সেরে উপস্থিত হলেন মাহিষ্মতীপুরে এবং নর্মদা তীরস্থিত নানাবিধ তীর্থাদি তিনি দর্শন করেন। ধনুতীর্থ দর্শন করে তিনি নির্বিন্ধ্যাতে স্নান করলেন এবং তারপর ঋষ্যমুখ পর্বত ধরে দণ্ডকারণ্যে গিয়ে প্রবেশ করেন। দণ্ডকারণ্যে অতি প্রাচীন, উচ্চ এবং স্থূলকায় সাতটি তালবৃক্ষকে আলিঙ্গন করলে ঐ তাল বৃক্ষগুলি অন্তর্হিত হয়ে গেল। এই দেখে ঐ স্থানের অধিবাসীদের চৈতন্যই যে রাম অবতার এবিষয়ে দৃঢ় প্রত্যয়ের সৃষ্টি হয়। অতঃপর চৈতন্য পম্পা সরোবরে এসে স্নান করলেন এবং পঞ্চবটীতে উপস্থিত হয়ে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। অনন্তর ঐ স্থান থেকে নাসিক-ত্র্যম্বক দেখে ব্রহ্মগিরি গেলেন। ব্রহ্মগিরি থেকে

গোদাবরী নদীর উৎপত্তিস্থান কুশাবর্তে এসে উপস্থিত হলেন। সপ্ত গোদাবরী এবং অন্যান্য আরও অনেক তীর্থাদি পর্যটনের পর পুনরায় বিদ্যানগরে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে রায় রামানন্দ পুনরায় তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। রামানন্দের কাছে চৈতন্য নিজের তীর্থযাত্রার কথা বর্ণনা করেন। উভয়ে পরমানন্দে কৃষ্ণকথা আলোচনায় দিন কয়েক অতিবাহিত করার পর অবশেষে রামানন্দকে নীলাচলে আসবার আজ্ঞাদান করে শ্রীচৈতন্য স্বয়ং নীলাচল অভিমুখে রওনা হলেন।

কাশী পর্যটন

চৈতন্যদেব কাশীতে দু'বার অবস্থান করেছিলেন—একবার মথুরা-বৃন্দাবন গমনের মুখে আর একবার বৃন্দাবন থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে।

চৈতন্যদেব বৃন্দাবন যাত্রাকালে ঝারিখণ্ড পথে প্রথমে এসে উপস্থিত হন কাশীতে। কাশীতে উপস্থিত হয়ে মণিকর্ণিকার ঘাটে মধ্যাহ্নকালীন স্নান করার সময়ে তাঁর সঙ্গে তপন মিশ্রের দেখা হয়। তপন মিশ্র তাঁকে প্রথমে বিশ্বেশ্বর এবং তারপর বিন্দুমাধব দর্শন করান। বিশ্বেশ্বর ও বিন্দুমাধব দর্শনের পর তপন মিশ্র তাঁকে নিজগৃহে নিয়ে আসেন এবং চৈতন্য দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর বলভদ্র ভট্টাচার্যের দ্বারা রান্না করিয়ে তাঁকে ভিক্ষা করালেন।

চৈতন্যের আগমন সংবাদ জেনে চন্দ্রশেখর নামে তপন মিশ্রের এক বন্ধু তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এলেন। তপন মিশ্র এবং চন্দ্রশেখরের ইচ্ছানুযায়ী চৈতন্যদেব অনিচ্ছা সত্ত্বেও দশদিন কাশীতে অবস্থান করেন।

কাশীতে অবস্থানকালে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা তাঁকে দেখবার জন্য আসতে লাগলেন।

প্রকাশানন্দ সরস্বতী নামে তদানীন্তন কালের এক বহুখ্যাত পণ্ডিত এবং সাধক কাশীতে শিষ্যসভায় বেদান্ত ব্যাখ্যা করতেন। এক মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ চৈতন্যের আচরণ, প্রেমাবেশ, তাঁর অনুপম রূপ-মাধুর্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রকাশানন্দকে জানালে প্রকাশানন্দ তাঁকে যারপরনাই ব্যাঙ্গ করলেন। তিনি

ব্রাহ্মণকে নিষেধ করলেন চৈতন্যের কাছে যেতে। এতে ব্রাহ্মণ খুব দুঃখিত হলেন এবং চৈতন্যের কাছে উপস্থিত হয়ে প্রকাশানন্দের আচরণের কথা জানালেন। অবশেষে চৈতন্য ঐ মহারাষ্ট্রীয় বিপ্রকে সেবকরূপে অঙ্গীকার করে পরদিন প্রভাতেই মথুরার উদ্দেশে রওনা হয়ে গেলেন।

দীর্ঘকাল মথুরা-বৃন্দাবন পর্যটন করে শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে এসে উপস্থিত হলেন। প্রয়াগ থেকে তিনি নৌকা পথে পুনরায় কাশীর উদ্দেশে যাত্রা করলেন। কাশীপুরীর বাইরেই চন্দ্রশেখর এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। চৈতন্যদেবকে দেখে চন্দ্রশেখর যারপরনাই আনন্দিত হলেন এবং তাঁকে নিজের গৃহে নিয়ে এলেন। তপন মিশ্র তাঁকে নিমন্ত্রণ করায় চৈতন্য তপনের গৃহে ভোজন করলেন। অপরদিন তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণের সহচর বলভদ্র ভট্টাচার্য ভোজন করলেন চন্দ্রশেখরের গৃহে। তপন মিশ্র শ্রীচৈতন্যকে অনুরোধ জানালেন তিনি যেন কেবল তাঁর গৃহেই ভোজন করেন। তদনুযায়ী চৈতন্য কাশীধামে অবস্থানকালে চন্দ্রশেখরের গৃহে অবস্থান করলেও ভোজন করতেন তপন মিশ্রের গৃহে। দাক্ষিণাত্য পর্যটনের পথে প্রথমবার কাশীতে অবস্থানকালে যে মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছিলেন, তিনিও এসে চৈতন্যের সঙ্গে মিলিত হলেন। চৈতন্যদেবের আগমন সংবাদে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ইত্যাদি নানা জাতের ধর্মভাবাপন্ন মানুষ তাঁকে দর্শন করতে আসতে লাগলেন।

চৈতন্যদেবের কাশীধাম অবস্থানকালে সনাতন চন্দ্রশেখরের গৃহে এসে তাঁর সঙ্গে মিলিত হলেন। এখানেই তাঁকে দু'মাস ব্যাপী চৈতন্য ভক্তি সিদ্ধান্তাদি শিক্ষা দিলেন। চন্দ্রশেখরের বন্ধু পরমানন্দ নামে জনৈক কীর্তনীয়া চৈতন্যকে কাশীতে অবস্থানকালে কীর্তন শোনাতেন। কাশীতে অবস্থান-কালে প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাঁর শিষ্যবর্গ মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা চৈতন্যকে নিন্দাবাদ করেছিলেন। কিন্তু তিনি এসব বিষয়ে গ্রাহ্য করেন নি। শেষে তপন মিশ্র, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ প্রমুখ কাশীবাসী ভক্তদের দুঃখ মোচন কল্পে তিনি প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সন্ন্যাসীদের বৈষ্ণবে পরিণত করেন।

কাশীর মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা যেখানে সেখানে চৈতন্যদেবের নিন্দা করে বেড়াতেন। চৈতন্যদেবের অনুরাগী ও ভক্ত মহারাষ্ট্র নিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ তা শুনে খুব দুঃখ পেলেন। অতঃপর ঐ ব্রাহ্মণ চিন্তা করলেন যে সন্ন্যাসীরা

চৈতন্যকে দেখেননি বলেই তাঁর নিন্দায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। সুতরাং তিনি চৈতন্যের সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ করিয়ে দিতে মনস্থ করলেন। নিজের গৃহে তিনি চৈতন্য এবং মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করলেন।

পরদিন চৈতন্য মধ্যাহ্নকালীন স্নান এবং নিত্যকর্মাদি শেষ করে ব্রাহ্মণের গৃহে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এবং এখানে প্রকাশানন্দ সরস্বতী প্রমুখ সকলকে কৃপা প্রদর্শন করে বৈষ্ণবে পরিণত করেন। সে সময়ে প্রকাশানন্দ সরস্বতী ছিলেন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সাধক। বাঙ্গালী সন্ন্যাসী চৈতন্যের কাছে তাঁর পদানত হবার সংবাদে সকলেই বিস্মিত হলেন এবং দলে দলে তাঁকে দেখতে আসতে লাগলেন।

কাশীতে অবস্থানকালে একদিন চৈতন্য কাশীর পঞ্চনদে স্নান করে বিন্দুমাধব দর্শন করতে গেলেন এবং বিন্দুমাধব দর্শন করে তিনি প্রেমাবিষ্ট হয়ে মন্দির অঙ্গনেই নৃত্য করতে লাগলেন। তাঁর সঙ্গে নাম সংকীর্তনে যোগ দিলেন চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ, তপন মিশ্র এবং সনাতন। প্রকাশানন্দও তাঁর শিষ্যদের নিয়ে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। চৈতন্য প্রকাশানন্দকে নমস্কার করলেন। তারপর মন্দির প্রাঙ্গণেই প্রকাশানন্দের কাছে শ্রীমদ্ভাগবতের বেদান্ত ভাষ্য স্থাপন করলেন। তাছাড়া ভাগবতের সঙ্গে শ্রুতির সম্পর্ক নিয়েও তাঁর সঙ্গে আলোচনা করলেন। ধর্মবিষয়েও প্রকাশানন্দকে নানা উপদেশ দিলেন। কাশীবাসী অনেককেই তিনি বৈষ্ণবে পরিণত করেন। দু'মাসের কিছু বেশি কাশীতে অতিবাহিত করে অতঃপর এক রাত্রে চৈতন্যদের নীলাচলের উদ্দেশে যাত্রা করলেন। তপন মিশ্র, রঘুনাথ, চন্দ্রশেখর, পরমানন্দ সকলেই তাঁর অনুগামী হতে চাইলেন। বলভদ্র এবং আর একজনকে মাত্র সঙ্গে নিয়ে চৈতন্য ঝারিখণ্ড পথে নীলাচল অভিমুখে যাত্রা করলেন।

মথুরা-বৃন্দাবন পর্যটন

বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং তাঁর এক ব্রাহ্মণ বংশীয় ভৃত্যের সঙ্গে মহাপ্রভু ১৪৩৭ শকাব্দের শরৎকালে শ্বাপদ সঙ্কুল এবং বর্বর জাতি অধ্যুষিত বিপদ সঙ্কুল ছোট নাগপুরের গভীর অরণ্যের ভিতর দিয়ে বৃন্দাবনের উদ্দেশে যাত্রা করেন এবং কাশী ও প্রয়াগ দর্শনান্তে বৃন্দাবন ও মথুরায় এসে উপস্থিত হন। মথুরায় উপস্থিত হয়ে শ্রীচৈতন্য বিশ্রান্তি তীর্থে বা যমুনার সুপ্রসিদ্ধ বিশ্রান্তি ঘাটে স্নান করেন। তারপর ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দর্শন করে জন্মস্থানে অবস্থিত কেশব নামের ভগবদ বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করেন। এই সময়ে কেশব বিগ্রহের সেবাকারী চৈতন্যকে মাল্যভূষিত করেন। শ্রীচৈতন্যের রূপ ও প্রেম দর্শনে মথুরাবাসী সকলে বিস্মিত হয়ে গেলেন এবং তাঁকে কৃষ্ণ অবতার বলে তাদের মনে দৃঢ় প্রত্যয় জন্মাল। মথুরায় তিনি এক সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে মিলিত হন এবং ঐ ব্রাহ্মণের প্রস্তুত করা অন্ন গ্রহণ করেন। লক্ষ লক্ষ মথুরাবাসী তাঁকে দর্শন করার জন্য আসতে লাগলেন এবং চৈতন্যের দ্বারা প্রেমাবিষ্ট হয়ে হরিধ্বনিতে দিগবিদিগ মুখরিত করে তুলতে লাগলেন।

যমুনার অবিমুক্ত, বিশ্রান্তি, প্রয়াগ, মোক্ষ, বোধি ইত্যাদি ২৪টি ঘাটে স্নান করে তারপর সেই সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণের সঙ্গে স্বয়ম্ভু, বিশ্রাম, দীর্ঘবিষ্ণু, ভূতেশ্বর, মহাবিদ্যা ও গোকর্ণাদি তীর্থস্থান গুলি দর্শন করলেন। এরপর শ্রীচৈতন্যের অভিলাষ হ'ল বন দর্শনে। সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ সমভিব্যাহারে তিনি মধুবন, তালবন, কুমুদবন ইত্যাদি দ্বাদশ বন দর্শন করলেন।

বৃন্দাবনের নামমাত্র শ্রবণে যে চৈতন্যদেব অতিশয় ব্যাকুল হয়ে উঠতেন, স্বাভাবিক কারণেই সাক্ষাৎ বৃন্দাবন, বিশেষত মথুরা ও দ্বাদশবন পর্যটন কালে তাঁকে অতিশয় প্রেমাবিষ্ট দেখা গেল। ময়ূরের কণ্ঠের বর্ণ তাঁর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি জাগ্রত করায় তিনি প্রেমাবেশে ভূমিতে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লে বলভদ্র ভট্টাচার্য এবং সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ তাঁর সেবা যত্ন করলেন। প্রেমাবিষ্ট শ্রীচৈতন্য যখন আরিট্ গ্রামে উপস্থিত হন, তখন তাঁর প্রেমাবেশ সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত। এই আরিট্ গ্রামেই ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বৃষ রূপী অরিষ্টাসুরকে বধ করেছিলেন।

কথিত আছে, অরিষ্টাসুরকে বধ করবার পর শ্রীকৃষ্ণ নিছক কৌতুকের বশবর্তী হয়ে যখন শ্রীরাধাকে স্পর্শ করতে উদ্যত হয়েছিলেন তখন শ্রীরাধাও কৌতুক বশতঃ কৃষ্ণকে স্মরণ করিয়ে দেন যে তিনি গো বধের পাপে লিপ্ত হয়েছেন। কারণ অরিষ্ট অসুর হলেও, সে বৃষের রূপ ধারণ করেছিল। অতএব যেহেতু তিনি গোরূপী অরিষ্টাসুরকে বধ করে গো বধের পাপে লিপ্ত হয়েছেন, সেইজন তাঁকে সর্বতীর্থের জলে স্নান করতে হবে। তবেই তিনি শ্রীরাধাকে স্পর্শ করার অধিকারী হবেন। শ্রীরাধার কথামত শ্রীকৃষ্ণ সর্বতীর্থের জলে স্নান করার উদ্দেশ্যে ভূমিতে পদাঘাত করে একটি কুণ্ডের সৃষ্টি করেন। ঐ কুণ্ড সর্বতীর্থের জলে পরিপূর্ণ হয়। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ ঐ কুণ্ডে সর্বতীর্থের জলে স্নান করেন। এই কুণ্ডটিই 'অরিষ্ট কুণ্ড' বা 'শ্যামকুণ্ড' নামে পরিচিতি লাভ করে।

অরিষ্টকুণ্ডের উৎপত্তি দেখে ঐ কুণ্ডের পশ্চিমে শ্রীরাধা তাঁর সখীদের সহায়তায় অনুরূপ অপর একটি কুণ্ড খননে প্রয়াসী হন। অল্পসময়ের মধ্যেই কুণ্ডটি নির্মিত হয়। এ'টিই হল 'শ্রীরাধাকুণ্ড' বা 'শ্রীকুণ্ড'। অতঃপর শ্রীকৃষ্ণ স্বীয় কুণ্ডস্থিত তীর্থ সকলকে রাধা নির্মিত কুণ্ডে প্রবেশ করার নির্দেশ দান করেন। তদনুযায়ী শ্যামকুণ্ড থেকে সব তীর্থ রাধাকুণ্ডে প্রবেশ করে তাকে পূর্ণ করে।

আরিট্ গ্রামে উপস্থিত হয়ে চৈতন্যদেব রাধাকুণ্ডের কথা জিজ্ঞাসা করেন। কিন্তু রাধাকুণ্ডটি ইতিপূর্বেই বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল বলে আরিট্ গ্রামের অধিবাসীরা কুণ্ডটি সম্পর্কে অজ্ঞাত ছিল। শ্রীচৈতন্যের অনুগামী সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণও এই কুণ্ড সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। অবশেষে স্বল্প জল পূর্ণ দু'টি ধান্যক্ষেত্র থেকে চৈতন্য কুণ্ড দু'টিকে আবিষ্কার করেন। ঐ দুই ধান্যক্ষেত্রের স্বল্প জলে তিনি স্নান করলেন। ধান্যক্ষেত্রে তাঁকে স্নানরত দেখে গ্রামবাসী সকলে খুব বিস্মিত হলেন। স্নানের পর কুণ্ড থেকে মৃত্তিকা সংগ্রহ করে পরম ভক্তিভরে তিনি তিলক রচনা করে পরলেন। তারপর বলভদ্রের মাধ্যমে কিছু পরিমাণে কুণ্ডের মৃত্তিকা সঙ্গে করে নিলেন। এইভাবে শ্যামকুণ্ড ও রাধাকুণ্ড আবিষ্কার করে তিনি গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কর্তৃক ব্রজধামে লুপ্ত তীর্থোদ্ধারের পথ প্রশস্ত করে দিলেন।

অতঃপর তিনি এসে উপস্থিত হলেন রাধাকুণ্ডের নৈঋত কোণে অবস্থিত

সুমনঃ সরোবরে বা কসুম সরোবরে। এখানে তিনি দর্শন করলেন শ্রীকৃষ্ণের স্মৃতি বিজড়িত গিরি গোবর্দ্ধন। একটি শিলাখণ্ডকে আলিঙ্গন করে তিনি প্রেমাবেশে উন্মত্তপ্রায় হয়ে গেলেন। প্রেমোর্মত্ত অবস্থাতেই তিনি এসে উপস্থিত হলেন গোবর্দ্ধন নামক গ্রামে। এখানে তিনি দর্শন করলেন 'হরিদেব' নামক নারায়ণ মূর্তিকে। অতঃপর ব্রহ্মকুণ্ডে স্নান সেরে অন্ন গ্রহণ করলেন। সে রাত্রি তিনি হরিদেবের মন্দিরেই অবস্থান করলেন।

গিরি গোবর্দ্ধনের ওপরে অবস্থিত শ্রীগোপালদেব দর্শনের ব্যাপারে চৈতন্যদেব এক সমস্যার সম্মুখীন হন। গোবর্দ্ধন শিলাকে তিনি মনে করতেন কৃষ্ণ কলেবর রূপে। সুতরাং গোবর্দ্ধন আরোহণ করে শ্রীগোপাল দর্শন করলে প্রকারান্তরে শ্রীকৃষ্ণের অঙ্গে তাঁর পাদস্পর্শ হয়। আবার অন্যদিকে গোবর্দ্ধনে আরোহণ না করলে শ্রীগোপালের দর্শন লাভ থেকে তাঁকে বঞ্চিত হতে হয়। স্বয়ং গোপালদেব অবশেষে তাঁকে এই সমস্যা থেকে উদ্ধার করলেন। গোবর্দ্ধন থেকে অবতরণ করে চৈতন্যকে দর্শন দানের জন্য এক অভিনব পন্থার আশ্রয় নিলেন।

গোবর্দ্ধনের মধ্যেকার একটি গ্রামের নাম 'অন্নকূট'। এই 'অন্নকূট' গ্রামেই শ্রীগোপালের মন্দির। 'অন্নকূট' গ্রামে ছিল যত রাজপুত জাতীয় লোকের বাস। এক অপরিচিত লোকের রূপ ধারণ করে শ্রীগোপালদেব পরদিন সকালে যবন কর্তৃক অন্নকূট গ্রাম আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ গ্রামবাসীদের দিলেন। সেই সঙ্গে তিনি আরও বলে দিলেন যে যবনের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য সেই রাত্রেই তারা যেন গোপালদেবকে নিয়ে পলায়ন করে যায়। অপরিচিত ব্যক্তিরূপী গোপালের নির্দেশ মত গ্রামবাসীরা গোবর্দ্ধন থেকে গোপালকে নিয়ে নিকটবর্তী গাঁঠুলি গ্রামস্থিত এক ব্রাহ্মণের গৃহে রাখলেন। অন্নকূট গ্রাম জনশূন্য হয়ে গেল। প্রাতঃকালে চৈতন্যদেব মানস গঙ্গায় স্নান সেরে গোবর্দ্ধন পরিক্রমায় বার হলেন। গোবিন্দ-কুণ্ডাদি তীর্থে তিনি স্নান করলেন। এবং এই স্নান প্রসঙ্গেই তিনি গাঁঠুলি গ্রামে গোপলদেবের অবস্থানের কথা অবহিত হলেন। অতঃপর তিনদিন ধরে তিনি গাঁঠুলি গ্রামস্থিত গোপালদেবকে দর্শন করলেন এবং গোপালদেবের অনুপম সৌন্দর্য দর্শনে প্রেমাবিষ্ট হলেন। চতুর্থ দিবসে গোপালদেবকে পুনরায় অন্নকূট গ্রামের মন্দিরে স্থানান্তরিত করলে এখান থেকেই চৈতন্য উপস্থিত হলেন শ্রীকাম্যবনে।

বৃন্দাবনস্থিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থল সমূহ দর্শনান্তে তিনি গিয়ে উপস্থিত হলেন 'নন্দীশ্বর' বা 'নন্দ গ্রামে'। 'নন্দ গ্রামে' ছিল নন্দ মহারাজের গৃহ। নন্দীশ্বর দর্শন করে তিনি প্রেমোন্মত্ত হয়ে উঠলেন। নন্দ গ্রামস্থ অপরাপর কুণ্ডে তিনি স্নান করলেন। তারপর নন্দীশ্বর পর্বতের গুহাস্থিত নন্দ মহারাজ, গোপালদেব এবং যশোদার মূর্তিত্রয় দর্শন করলেন। অতঃপর এখান থেকে গেলেন শ্রীব্রজ-মণ্ডলের অন্তর্গত দ্বাদশ বনের অন্যতম শ্রীকৃষ্ণের গোচারণ স্থল 'খদিরবনে' (খায়রো)। 'খদিরবন' দর্শনান্তে গেলেন 'শেষশায়ী' দর্শনে। 'শেষশায়ী'স্থিত 'ক্ষীর-সমুদ্র' নামক জলাশয়ে শ্রীকৃষ্ণ এক সময় কৌতুক বশতঃ ক্ষীরোদ সমুদ্রে অনন্ত শয্যাশায়ী নারায়ণের ন্যায় শয়ন করেছিলেন এবং শ্রীরাধা শেষশায়ীর চরণসেবারতা লক্ষ্মীর ন্যায় তাঁর পদসেবা করেছিলেন।

'শেষশায়ী'স্থিত শ্রীকৃষ্ণ বিগ্রহ এবং তাঁর চরণ সেবারতা শ্রীরাধিকা বিগ্রহ দর্শন করে শ্রীচৈতন্য উপস্থিত হলেন বলরাম ও কৃষ্ণের ক্রীড়াস্থল 'খেলন-বনে'। 'খেলন-বন' থেকে তিনি গেলেন ভাণ্ডীরবনে। এখানে শ্রীকৃষ্ণ এবং বলরাম তাঁদের সখাদের সঙ্গে মল্লবেশে যুদ্ধ ক্রীড়া করতেন। ভাণ্ডীরবন থেকে যমুনা অতিক্রম করে গিয়ে উপস্থিত হলেন 'ভদ্রবনে'। 'ভদ্রবন' থেকে আবার 'শ্রীবনে'। 'শ্রীবন' দর্শনের পর চৈতন্য যমুনাতীরবর্তী শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থল 'লোহবন' দর্শন করতে গেলেন। এই লোহবনেই 'লোহজঙ্ঘ' অসুর শ্রীকৃষ্ণের দ্বারা নিহত হয়েছিল। লোহবন থেকে শ্রীব্রজ মণ্ডলান্তর্গত যমুনার পূর্বতীরস্থিত শ্রীকৃষ্ণ বলরামের বাল্য লীলাস্থল 'বৃহদ্বনে' গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে তিনি শ্রীকৃষ্ণের পবিত্র জন্মস্থানও দর্শন করেন।

কৃষ্ণ যে স্থানে যমলার্জ্জুন বৃক্ষদ্বয় ভেঙ্গে ছিলেন, সেই স্থানটিও তিনি দর্শন করেন। অতঃপর যমুনার পূর্বতীরবর্তী প্রদেশ কৃষ্ণ বলরামের বাল্য লীলাস্থল গোকুল দর্শনান্তে উপস্থিত হলেন মথুরা নগরীতে। মথুরায় কংস কারাগারে শ্রীকৃষ্ণের জন্মস্থান দেখে চৈতন্য তাঁর অনুগামী সনোড়িয়া মাথুর ব্রাহ্মণের গৃহে আতিথ্য গ্রহণ করেন। কিন্তু জনবহুলতা হেতু সত্বর মথুরা ত্যাগ করে বৃন্দাবন ও মথুরার মধ্যবর্তী যমুনাতীরে অবস্থিত অক্রূর তীর্থে এসে অবস্থান করতে লাগলেন। অক্রূরতীর্থ থেকে এসে উপস্থিত হলেন বৃন্দাবনে। বৃন্দাবনস্থিত কালিয়হ্রদ এবং 'প্রস্কন্দন' তীর্থে স্নান করে 'দ্বাদশাদিত্য' দর্শনের পর তিনি গেলেন কেশিতীর্থে। রাসস্থলী দর্শন করে চৈতন্য প্রেমাবেশে

একেবারে মূর্চ্ছিত হয়ে পড়লেন। সমগ্র দিন রাসস্থলীতে অতিবাহিত করে সন্ধ্যাকালে মথুরাস্থিত 'অক্রূরঘাটে' এসে ভোজন পর্ব সমাধা করলেন। পরদিন প্রাতঃকালে বৃন্দাবনস্থ চীরঘাটে যেখানে কৃষ্ণ কর্তৃক বস্ত্রহরণ লীলা অনুষ্ঠিত হয়েছিল, সেই স্থানে স্নান করলেন এবং চীরঘাটের নিকটবর্তী একটি তেঁতুল গাছের তলায় উপবেশন করে বৃন্দাবনের শোভা এবং যমুনা নদী দর্শন করতে লাগলেন। নামকীর্তনে অসুবিধা হওয়ায় তিনি বৃন্দাবনে গিয়ে একান্তে মধ্যাহ্নকাল পর্যন্ত নামকীর্তন করলেন। তৃতীয় প্রহরে কৃষ্ণদাস নামে এক রাজপুত গৃহস্থ কেশিতীর্থে স্নান করে কালীদহে গমনকালে আমলকি তলায় চৈতন্যকে দেখে যারপরনাই বিস্মিত হলেন। শেষে কৃষ্ণদাস মধ্যাহ্নকালে চৈতন্যের সঙ্গে অক্রূরতীর্থে এসে উপনীত হলেন এবং স্ত্রীপুত্রাদি পরিত্যাগ করে তাঁর সঙ্গ লাভ করলেন।

চৈতন্যদেবের বৃন্দাবনে অবস্থানকালে এইরকম জনরবের উদ্ভব হয়েছিল যে বৃন্দাবনে পুনরায় কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছেন। বৃন্দাবনস্থ কালীদহের জলে শ্রীকৃষ্ণ প্রকটিত হয়েছেন এইরূপ জনরবে আকৃষ্ট হয়ে মথুরা থেকেও বহু সংখ্যক দর্শনার্থী শ্রীকৃষ্ণ দর্শনের আশায় কালীদহের তীরে রাত্রিকালে এসে সমবেত হতেন। সমস্ত রাত্রি কালীদহের তীরে অবস্থান করে পরদিন প্রাতঃকালে তারা নিজ নিজ গৃহে পুনরায় প্রত্যাবর্তন করতেন। তিনরাত্রি এইভাবে অতিবাহিত হ'ল।

কয়েকদিন অক্রূর তীর্থে অবস্থান করে চৈতন্যদেব কৃষ্ণনাম বিতরণ করলেন। একদিন অক্রূর ঘাটের উপর উপবিষ্ট থাকাকালে অক্রূর ঘাটের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট পূর্বের বহু ঘটনার কথা তাঁর স্মৃতিপটে উদিত হ'ল। কংস কর্তৃক প্রেরিত হয়ে অক্রূর যখন বলরাম ও কৃষ্ণকে বৃন্দাবন থেকে মথুরায় নিয়ে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে এই ঘাটে অক্রূর স্নান করতে নেমেছিলেন। জলে অবতরণ করে জলের মধ্যেই রামকৃষ্ণ এবং বৈকুণ্ঠ দর্শন করেছিলেন। তদবধি ও'টি অক্রূরতীর্থ রূপে পরিচিতি লাভ করে। অন্যথায় অক্রূর তীর্থের পূর্বনাম ছিল 'ব্রহ্মহ্রদ'।

এক সময়ে মহারাজ নন্দ একাদশীর উপবাস করে পরদিন দ্বাদশী তিথিতে যমুনায় স্নান করবার উদ্দেশ্যে অবতরণ করলে বরুণের ভৃত্য তাঁকেই বরুণালয়ে অপহরণ করে নিয়ে যায়। এই ঘটনার কথা অবগত হয়ে নন্দকে উদ্ধারের

উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণ বরুণালয়ে গমন করেন এবং সপরিকর বরুণ সেই সময়ে শ্রীকৃষ্ণের স্তুতি করেছিলেন। অতঃপর কৃষ্ণ পিতা মহারাজ নন্দকে নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করলে সরল হৃদয় নন্দ তাঁর জ্ঞাতিবর্গের কাছে বরুণ কর্তৃক শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশে স্তুতির কথা প্রকাশ করে দিলে গোপগণ কৃষ্ণলোক দর্শনের জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। তখন শ্রীকৃষ্ণ ঐ গোপীদের সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত হন অক্রূর তীর্থের ঘাটে এবং সকলকে ঘাটের জলে নিমগ্ন হতে বলেন। জলে নিমগ্ন হলে সৌভাগ্যবান গোপগণ জলমধ্যে সপরিকর শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোলোক দর্শন করেছিলেন।

এইসব পৌরাণিক ঘটনার কথা স্মরণ করে শ্রীচৈতন্য অক্রূর তীর্থের জলে ঝাঁপ দেন এবং নিমজ্জিত হন। বলভদ্র ভট্টাচার্য তখন তাঁকে জল থেকে উদ্ধার করেন।

মাথুর বিপ্রের পরামর্শমত বলভদ্র চৈতন্যদেবকে প্রয়াগে মকর সংক্রান্তি তিথিতে স্নানের বাসনা এবং বৃন্দাবনে তাঁর ব্যক্তিগত কষ্টের কথা জানিয়ে বৃন্দাবন ত্যাগের অভিপ্রায় জ্ঞাপন করেন। শেষপর্যন্ত চৈতন্য বৃন্দাবন ত্যাগে সম্মত হন।

পরদিন প্রাতঃকালে প্রাতঃস্নানের পর বৃন্দাবনধাম পরিত্যাগ করতে হবে জেনে তিনি প্রেমাবিষ্ট হলেন। অতঃপর অক্রূর ঘাটের অপর পারেস্থিত মহাবন গোকুলের উদ্দেশে রাজপুত কৃষ্ণদাস মাথুর ব্রাহ্মণ প্রভৃতি সমভিব্যাহারে রওনা হলেন। পথে যেতে যেতে পরিশ্রান্ত হয়ে সকলে পথি পার্শ্বস্থিত একটি বৃক্ষের তলায় উপবেশন করলেন। সেই বৃক্ষের কাছে বিচরণরত অনেকগুলি গাভীকে দেখে চৈতন্যদেব অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। কিন্তু ইত্যবসরে এক রাখালের বংশী ধ্বনি শুনে প্রেমাবশে তিনি মূর্চ্ছিত হয়ে পড়েন। এই সময়ে ঐখানে দশ জন মুসলমান পাঠান ঘোড়ায় চড়ে হাজির হ'ল। তারা ভাবলে মোহরের লোভে চৈতন্যকে ধুতরা খাওয়ান হয়েছে। রাজপুত কৃষ্ণদাস, মাথুর ব্রাহ্মণ প্রভৃতিদের তারা বাঁধল। অতঃপর চৈতন্যের জ্ঞান ফিরলে এদের বন্দিদশা ঘুচল। পীর বলে খ্যাত একজন পাঠানের সঙ্গে চৈতন্যের শাস্ত্রালোচনা হয়। অবশেষে পাঠান পীর তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করে। চৈতন্য তার নামকরণ করেন 'রামদাস'। 'বিজুলিখান' নামক এক অল্প বয়স্ক পাঠান রাজকুমার তাঁর শরণাপন্ন হলে তাকেও তিনি কৃপা করেন। এই ভাবে ক্রমে ক্রমে দশজন

পাঠানই তাঁর কৃপালাভ করে। অবশেষে গঙ্গাতীর পথে সদলবলে শ্রীচৈতন্য প্রয়াগে এসে উপনীত হন।

প্রয়াগ পর্যটন

শ্রীচৈতন্যের উত্তর পশ্চিম ভ্রমণের বিবরণ চৈতন্যচরিতামৃতে ভালো ভাবে আছে।

মাথুর বিপ্র রাজপুত কৃষ্ণদাস, বলভদ্র প্রভৃতি সমভিব্যাহারে সোরোক্ষেত্র থেকে গঙ্গাতীর পথে প্রয়াগে এসে উপস্থিত হলেন শ্রীচৈতন্য। প্রয়াগে পৌঁছে তিনি ত্রিবেণীতে দশদিন ধরে মকর স্নান করলেন।

প্রয়াগে অবস্থানকালে চৈতন্য বিষ্ণুমাধব দর্শন করলেন এবং প্রেমাবিষ্ট হয়ে পড়লেন। দাক্ষিণাত্যবাসী এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে তাঁর পরিচয় ছিল। তিনি চৈতন্যকে তাঁর গৃহে নিমন্ত্রণ করলেন। এই দাক্ষিণাত্যবাসী ব্রাহ্মণের গৃহেই শ্রীরূপ ও শ্রীবল্লভ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

প্রয়াগে শ্রীচৈতন্য যখন ত্রিবেণীর ওপরে অবস্থান করছিলেন, সেই সময়ে ত্রিবেণীর যে তীরে বাসা ছিল ঠিক তার বিপরীত তীরস্থিত 'আড়ৈল' ('আউয়েল' এবং 'আম্বুল' পাঠান্তরও বর্তমান) গ্রামে বাস করতেন বল্লভ ভট্ট। বল্লভ ভট্ট চৈতন্যের আগমন সংবাদ জেনে তাঁর কাছে উপস্থিত হলেন। তাঁদের মধ্যে কৃষ্ণকথা আলোচনা হ'ল। চৈতন্যের ক্রম বর্ধমান প্রেম দেখে বল্লভ ভট্ট চমৎকৃত হলেন এবং তাঁকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করেন। বল্লভ ভট্টের গৃহেই রঘুপতি উপাধ্যায় নামে ত্রিহুত দেশীয় এক পণ্ডিত এসে তাঁকে দর্শন করলেন। রঘুপতিকে চৈতন্য আশীর্বাদ করলেন। অতঃপর চৈতন্যের নির্দেশে রঘুপতি কৃষ্ণলীলা বিষয়ে নিজকৃত শ্লোক পাঠ করে শোনালেন। রঘুপতির শ্লোক শুনে চৈতন্যের অদ্ভুত প্রেমাবেশ উপস্থিত হলে তা দেখে উপাধ্যায় চৈতন্যকে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ বলে স্থির করলেন।

বল্লভ ভট্টের গৃহে বহুলোক এসে উপস্থিত হ'ল চৈতন্যকে দেখবার জন্য এবং সকলেই কৃষ্ণভক্তে পরিণত হয়। অতঃপর বল্লভভট্ট চৈতন্যকে নিয়ে গঙ্গাপথে নৌকায় উপস্থিত হলেন প্রয়াগে।

ত্রিবেণীর ঠিক ওপরেই ছিল চৈতন্যের বাসা। এই স্থানে বহু জন-

সমাগম হ'ত বলে চৈতন্য নির্জন দশাশ্বমেধ ঘাটে উপবেশন করে শ্রীরূপকে কৃষ্ণবিষয়ক নানা তত্ত্ব ও উপদেশ দান করেন। দশদিন প্রয়াগে অবস্থান করে চৈতন্য অতঃপর রূপ গোস্বামীকে বৃন্দাবন গমনের নির্দেশ দিয়ে স্বয়ং প্রয়াগ থেকে নৌকাপথে কাশী অভিমুখে যাত্রা করেন।

---

১. গোবিন্দদাসের করচার বিবরণ অনুযায়ী চৈতন্যদেব আলালনাথ থেকে একেবারে গোদাবরীতীরে উপস্থিত হয়েছিলেন। করচায় তাঁর কূর্মস্থান এবং জিয়ড় নৃসিংহ ক্ষেত্র গমনের উল্লেখ নেই।

২. গোবিন্দদাসের করচায় বর্ণিত হয়েছে চৈতন্য ত্রিমন্দ এবং পন্থগুহা হয়ে সিদ্ধি বটনগরে উপস্থিত হয়েছিলেন।

৩. করচার বর্ণনানুযায়ী সিদ্ধিবটে চৈতন্য তীর্থ রামধনী এবং সত্যবাই ও লক্ষ্মীবাই নাম্নী দু'জন বারাঙ্গনার উদ্ধার সাধন করেছিলেন। এতদ্ব্যতীত তিনি এখানে বটেশ্বর শিবও দর্শন করেন।

৪. করচায় স্কন্দক্ষেত্র, ত্রিমঠ, বৃদ্ধকাশী, ত্রিপদী-ত্রিমল্ল তীর্থ কয়টির কোন উল্লেখ নেই। করচার বিবরণ অনুযায়ী চৈতন্য সিদ্ধিবটেশ্বর থেকে নন্দীশ্বর হয়ে মুন্নানগরে গমন করেন। (মুন্নানগর এবং সিদ্ধিবট উভয়ই পেন্নার নদীর তীরে অবস্থিত.)

৫. করচায় বর্ণিত হয়েছে চৈতন্য এখানে রামানন্দ স্বামী নামে এক অদ্বৈতবাদী পণ্ডিতকে হরিমন্ত্রে দীক্ষিত করেছিলেন। এখান থেকে তিনি বগুলাবনে পন্থভীল নামক এক দস্যুকে উদ্ধার করে এখান থেকে তিনক্রোশ দূরে অবস্থিত গিরীশ্বর মহাদেবের মন্দিরে গিয়ে শিবলিঙ্গের আরাধনা করেন এবং জনৈক সন্ন্যাসীর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয়। এখান থেকে তিনি 'তৃপদী'তে গমন করেন।

৬. করচায় শিবকাঞ্চীর উল্লেখ নেই।

৭. করচায় ত্রিকাল ঈশ্বর বলে বর্ণিত হয়েছে।

৮. করচায় বর্ণিত হয়েছে কালতীর্থ।

৯. করচার বর্ণনানুযায়ী নন্দা ভদ্রা সন্ধিতীর্থ।

১০ করচায় পাপনাশনের উল্লেখ নেই।

১১. করচায় বর্ণিত হয়েছে, চৈতন্য 'তৃপদী' থেকে 'রঙ্গধামে' আসার পথে চাঁই পল্লী, নাগর, পদ্মকোট, ত্রিপাত্র, ঝরিবন-এই স্থান ক'টিতে ভ্রমণ করেছিলেন। নাগরে চৈতন্য নাকি শ্রীরাম-লক্ষ্মণের মূর্তি দর্শন করেছিলেন এবং এক দুরাত্মা ব্রাহ্মণকে উদ্ধার করেছিলেন। পদ্মকোট তীর্থে তিনি অষ্টভুজা ভগবতী পদ্মকোট দেবী দর্শন করেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে।

১২. করচায় বর্ণিত হয়েছে চৈতন্য শ্রীরঙ্গক্ষেত্রে ভগবান নরসিংহরূপে দৈত্যরাজকে সংহাররত এবং সম্মুখে ভক্ত প্রহ্লাদ করজোড়ে দণ্ডায়মান-এই মূর্তি দর্শন করেছিলেন। অনন্তশয্যায় শায়িত শ্রীরঙ্গদেবের মূর্তি দর্শন করেন নি।

১৩. করচায় এর কোন উল্লেখ নেই।

১৪. করচার বিবরণ অনুযায়ী চৈতন্য ঋষভ পর্বত থেকে রামনাথে গিয়েছিলেন।

১৫. করচায় চৈতন্যদেবের কামকোষ্ঠী ও দক্ষিণ মথুরা গমনের কথা উল্লিখিত হয়নি।

১৬. করচায় কৃতমালানদীতে চৈতন্যের স্নানের বিষয়ও অনুপস্থিত।

১৭. করচায় এই উল্লেখ নেই।

১৮. গোবিন্দদাস ধনুতীর্থের উল্লেখ করেন নি।

১৯. করচার বর্ণনানুযায়ী চৈতন্য রামেশ্বর থেকে মাধবীবন ও তম্বকুণ্ডীতীর্থ হয়ে তাম্রপর্ণী নদীতে স্নান করে কন্যাকুমারিকায় যান। করচায় নয়ত্রিপদী, তিলকাঞ্চি, গজেন্দ্রমোক্ষণ, পানাগড়িতীর্থ, চামতাপুর, শ্রীবৈকুণ্ঠ ও মলয় পর্বতের উল্লেখ নেই।

২০. করচায় চৈতন্য কর্তৃক কন্যাকুমারিকায় কোন বিগ্রহ দর্শনের উল্লেখ নেই।

২১. গোবিন্দদাসের বর্ণনানুযায়ী চৈতন্য কন্যাকুমারিকা থেকে সাঁতাল পর্বতের মধ্য দিয়ে ত্রিবঙ্কু দেশে গমন করেছিলেন। ত্রিবঙ্কু থেকে রামগিরি দর্শন করে পয়োষ্ণী নদীতীরে পয়োষ্ণী নগরে শিবনারায়ণ দর্শন করেন।

২২. করচার বিবরণ অনুযায়ী অতঃপর চৈতন্য মহীশূর রাজ্যের ভিতর দিয়ে বেদাবতী নদীতীরস্থিত কাডারে গিয়ে উপস্থিত হন। বেদাবতী নদী অতিক্রম করে চৈতন্য নাগপঞ্চপদী এবং চিতোল (দুর্গ) হয়ে তুঙ্গভদ্রায় গিয়ে উপনীত

হন। তুঙ্গভদ্রায় স্নান করে তিনি কোটিগিরিতে গমন করেন। কোটিগিরি থেকে চণ্ডপুর (চন্দ্রতীর্থ বা তালকাবেরী ?) পৌছান। অনন্তর তিনি সত্যগিরি কান্ধারদেশ, গুর্জরীনগর হয়ে বিজাপুর পর্বতাভিমুখে গমন করেন। বিজাপুর থেকে হরগৌরী দর্শনান্তে পূর্ণ নগরে (পুনা) গিয়ে উপস্থিত হন। পুনা থেকে পাট্‌শ (পাব্‌ল গ্রাম) হয়ে তিনি গোরঘাট (পারঘাট) গিরিবর্ত্মের নিকটবর্তী ভোলেশ্বর নগরে (মহাবালেশ্বর) গিয়ে উপস্থিত হন। এখান থেকে দেবলেশ্বর হয়ে জিজুরী নগরে গিয়ে পৌছান। জিজুরীতে মুরারি পল্লীতে উপস্থিত হয়ে জিজুরীর দেবমন্দিরের দেবদাসীদের (মুরারি নামে পরিচিত) উদ্ধার করেন। অতঃপর চোরানন্দী বনে গিয়ে দস্যু সর্দার নরোজীর উদ্ধার সাধন করে খণ্ডলায় গমন করেন। খণ্ডলা থেকে নাসিকনগর এবং নাসিকের উত্তরে ত্রিমুখে (ত্র্যম্বক) যান। এখান থেকে পঞ্চবটী বন অতিক্রম করে দমন নগরে গিয়ে উপনীত হন। অতঃপর পথে পথে একপক্ষকাল অতিবাহিত করে সুরাট নগরে গিয়ে সুরথ রাজা প্রতিষ্ঠিত অষ্টভুজা ভগবতীমূর্তি দর্শন করেন। পরে তাপ্তী অভিমুখে গমন করে বলিরাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বামনমূর্তি দর্শন করেন। অনন্তর চৈতন্য ভঁরোচ নগরে গিয়ে বলিরাজার যজ্ঞকুণ্ড দর্শন করেন। তারপর নর্মদা অতিক্রম করে বরোদা ও আমেদাবাদ ভ্রমণ করেন। শুভ্রাবতী নদী অতিক্রম করে ভোগা গ্রামস্থিত বারমুখী নাম্নী এক বারবনিতাকে উদ্ধার করেন। অতঃপর প্রথমে জাফরাবাদ এবং পরে সোমনাথ গমন করেন। এরপর জুনাগড়, গৃণার পাহাড় অতিক্রম করে ক্রমে অমরাপুরী গোপীতলা, রৈবতক ও প্রভাসতীর্থে গমন করেন। তারপর দ্বারকা, দ্বারকা থেকে নর্মদাতীরস্থিত দোহদনগর, দোহদনগর থেকে কুক্ষী, আমঝোরা, মন্দুরা, দেবঘর, চণ্ডীপুর, রায়পুর, বিদ্যানগর ও রত্নপুর গমনান্তে মহানদী অতিক্রম করে স্বর্ণগড়ে প্রবেশ করেন। এখান থেকে সম্বলপুর, ভ্রমরা, প্রতাপনগর, দাসপাল, রসাল-কুণ্ড, ঋষিকুল্যা ও আলালনাথ হয়ে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন।

তৃতীয় অধ্যায়

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারতের ভৌগোলিক ও সামাজিক জীবন যাত্রার প্রতিফলন।

প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ সমূহের ভৌগোলিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রার প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য মূলতঃ ধর্মকেন্দ্রিক। তীর্থস্থান-সমূহের বর্ণনা, দেবতার লীলা-মাহাত্ম্য প্রচার এবং ভক্তগণের জীবন চরিতের বর্ণনার উদ্দেশ্যেই এই সময়ের সাহিত্যের সৃষ্টি। লেখকগণের মুখ্য উদ্দেশ্য বঙ্গেতর ভারতের ভৌগোলিক তথা সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবনযাত্রার পরিচয় প্রদান না হলেও তথাপি প্রসঙ্গক্রমে এই সকল বিষয় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে বর্ণিত হতে দেখা গেছে।

ক উড়িষ্যা

নীলাচলে একপ্রকার পরিমাপ প্রচলিত ছিল—একে বলা হ'ত 'মান' অর্থাৎ এক কাঠা। এটা ছিল এক সের ওজন অপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। চৈতন্য নীলাচলে অবস্থানকালে একদিন ভগবান আচার্য তাঁকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। চৈতন্যের একজন কীর্তনীয়া ছিলেন—তিনি পরিচিত ছিলেন 'ছোট হরিদাস' নামে। ভগবান আচার্য ছোট হরিদাসকে বলেছিলেন—

মোর নামে শিখি মাহিতীর ভগ্নী স্থানে গিয়া।
শুক্ল চালু এক মান আনহ মাগিআ॥

(অন্ত্যলীলা ; ২য় পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

উড়িষ্যা দেশে হরিদ্রামিশ্রিত তৈল 'অভ্যঙ্গ' নামে পরিচিত। উড়িষ্যা দেশের স্ত্রীলোকেরা অদ্যাবধি স্নানের পূর্বে গাত্রে এই 'অভ্যঙ্গ' মর্দন করে থাকেন। নীলাচলে অবস্থানকালে রায় রামানন্দ দু'জন দেবদাসীকে স্বহস্তে এই 'অভ্যঙ্গ' মর্দন করে দিয়েছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে—

স্বহস্তে করান তাঁর অভ্যঙ্গ মর্দন।
স্বহস্তে করান স্নান গাত্র সম্মার্জ্জন॥

(অন্ত্যলীলা ; ৫ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

নীলাচলে একশ্রেণীর রমণী 'দেবদাসী' নামে পরিচিত। এই সকল রমণী অভিভাবকহীনা, অবিবাহিতা এবং সুন্দরী। এরা জগন্নাথের মন্দিরে বিগ্রহের সম্মুখে নৃত্য-গীতাদি করে থাকেন বলে এদের 'দেবকন্যা' বা 'দেবদাসী' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

দুই দেবকন্যা হয় পরমা সুন্দরী।
নৃত্যগীতে সুনিপুণা বয়সে কিশোরী॥
তাঁরা দোঁহে লইয়া রায় নিভৃত উদ্যানে।
নিজ নাটকের গীতে শিখায় আবর্তনে॥

(অন্ত্যলীলা ; ৫ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

পুনরায়,

একদিন প্রভু যমেশ্বর টোটায় যাইতে
সেইকালে দেবদাসী লাগিলা গাইতে॥

(অন্ত্যলীলা ; ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ.চ)

উড়িষ্যায়, বিশেষতঃ নীলাচলে যে পদ্মাবতী চরণ চারণ চক্রবর্তী জয়দেব রচিত 'গীতগোবিন্দে'র বিশেষ প্রচার ছিল এবং তা সুরসংযোগে গীত হ'ত তার পরিচয় পাওয়া যায় নিম্নোদ্ধৃত অংশটিতে—

গুর্জ্জরী রাগ লইয়া সুমধুর স্বরে।
গীতগোবিন্দ পদ গায় জগ মন হরে॥

(অন্ত্যলীলা ; ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ.চ)

নীলাচলের সর্বত্র জগন্নাথের প্রসাদ বিক্রয় হয়ে থাকে—

সমুদ্রের তটে বট নিকটেতে পুরী।
দারুব্রহ্মরূপে নীলাচলে গিরি॥
নাম ধরে প্রভু শ্রীজগন্নাথ।
নাছে বাটে হাটে বিকায় ভাত॥

(বিজয় খণ্ড ; চৈ.ম। জয়ানন্দ)

উড়িষ্যায় বহু বিবাহের রীতি যে প্রচলিত ছিল তার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষত অভিজাত ঘরে এই রীতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত ছিল। উড়িষ্যার রাজা প্রতাপরুদ্রের একশতটি পত্নীর উল্লেখ করেছেন জয়ানন্দ তাঁর 'চৈতন্যমঙ্গলে'।

রাজার শতেক স্ত্রী প্রধান চন্দ্রকলা।
গৌরচন্দ্র দিলা তারে গলার দিব্যমালা॥

(উৎকলখণ্ড ; প্রতাপরুদ্রমিলন ও গৌরাঙ্গের দক্ষিণ যাত্রা)

উড়িষ্যায় অকুলীন পাত্রের সঙ্গে কুলীন কন্যার বিবাহদানের প্রথা ছিল নিষিদ্ধ। এমনকি, এই প্রথা ভঙ্গ করলে জাতিচ্যুত হবার সম্ভাবনা ছিল। কটক জেলার অন্তর্গত যাজপুর গ্রামের নিকটবর্তী 'বিদ্যানগর' নামে পরিচিত গ্রামের এক অকুলীন পাত্রের সঙ্গে কুলীন কন্যার বিবাহের প্রস্তাবে পাত্র স্বয়ং পূর্বোক্ত প্রচলিত সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে পাত্রীর পিতাকে সচেতন করে দিয়েছে—

তবে মুই নিষেধিনু শুন দ্বিজবর।
তোমার কন্যার যোগ্য নহি মুই বর॥
কাঁহা তুমি পণ্ডিত ধনী পরম কুলীন।
কাঁহা মুই দরিদ্র মূর্খ তাতে কুলহীন॥

(মধ্যলীলা ; ৫ম পরিচ্ছেদ ; চৈ.চ)

নীচবংশে কন্যা দান করলে যে কুলনাশের সম্ভাবনা ছিল অন্যত্রও তার উল্লেখ দেখা যায়—

নীচে কন্যা দিলে কুল যাইবেক নাশ।
শুনিয়া সকল লোক করিবে উপহাস॥

(মধ্যলীলা ; ৫ম পরিচ্ছেদ ; চৈ.চ)

সে সময়ে চন্দন বন ছিল উৎকলের রাজার অধীনে। এজন্য রাজার বিনানুমতিতে কারও পক্ষে চন্দন সংগ্রহ করা অথবা চন্দন নিয়ে দেশান্তরে গমন ছিল অসম্ভব অথবা নিলে কর প্রদান করতে হ'ত। শ্রীগোপালের ইচ্ছানুযায়ী চন্দন সংগ্রহের উদ্দেশ্যে পুরীতে উপস্থিত হয়ে মাধবেন্দ্র পুরী জগন্নাথের সেবক মহান্তগণকে গোপাল কর্তৃক চন্দন যাচ্ঞার কথা জানালে—

গোপাল চন্দন মাগে শুনি ভক্তগণ,
আনন্দে চন্দন লাগি করিল যতন।
রাজপাত্র সনে যার যার পরিচয়,
তাঁরে মাগি কর্পূর চন্দন করিলা সঞ্চয়।

(মধ্যলীলা; ৪র্থ পরিচ্ছেদ; চৈ. চ)

শুধুমাত্র তাই নয়, সেইসঙ্গে জগন্নাথের সেবকগণ মাধবেন্দ্র পুরীকে রাজ পত্রের ব্যবস্থাও করে দিলেন যাতে দানীরা মাধবেন্দ্রকে কিছু বলতে না পারে—

ঘাটে দান ছাড়াইতে রাজপাত্র দ্বারে,
রাজলেখা করি দিল পুরী গোঁসাই করে।

(মধ্যলীলা; ৪র্থ পরিচ্ছেদ; চৈ.চ)

এই প্রসঙ্গে উৎকলস্থিত সে সময়ে দানীদের কথা উল্লেখযোগ্য। পথকর আদায়ের জন্য উৎকলের সর্বত্র দানীদের ছিল ঘাঁটি। এরা পথিকদের উপর নানাভাবে অত্যাচার করত। যাজপুরে চৈতন্য তাঁর অনুচরগণসহ উপস্থিত হ'লে দানীরা তাঁদের প্রতিও অত্যাচার করেছিল—

গদাধর আদি করি যত সঙ্গিগণ।
ঠাঁই ঠাঁই গেলা সবে করিতে ভিক্ষাটন॥
হেনকালে এক দানী রাখে তা সবারে।
মহাক্রোধ করি দানী বান্ধে মুকুন্দেরে॥
সারাদিন রাখিয়াছে ক্রোধ নাহি পড়ে।
অনেক যতনে প্রবোধিল সন্ধ্যাকালে॥
তা সবার আছিল কম্বল একখণ্ড।
কাড়িয়া লইল সেই পাপিষ্ঠ পাষণ্ড॥

(শেষ খণ্ড ; চৈ.ম। লোচনদাস)

চৈতন্যভাগবতেও দুরাত্মা দানীদের কথা উল্লিখিত হয়েছে। চৈতন্য উড়িষ্যাদেশে প্রবেশ করেই দানীর দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে—

কতদূর গেলে মাত্র দানী দুরাচার।
রাখিলেক, দান চাহে, না দেয় যাইবার॥

(অন্ত্যখণ্ড ; ২য় অধ্যায় ; চৈ.ভা.)

খ. বৃন্দাবন

বৃন্দাবনের একপ্রকার ফল 'পিলু' নামে প্রসিদ্ধ।[১] পিলু ফলের আঁটিতে কাঁটা আছে। তাই পিলুফল চিবিয়ে খেতে গেলে কাঁটার আঘাতে

মুখের ছাল উঠে যাবার সম্ভাবনা। যারা এটা জানেন, তারা পিলুফল না চিবিয়ে আস্ত খেয়ে থাকেন। জগদানন্দ যখন বৃন্দাবন থেকে নীলাচলাভিমুখে রওনা হয়ে গেলেন, তখন সনাতন গোস্বামী জগদানন্দকে কিছু ভেট দিয়েছিলেন। অন্যান্য দ্রব্যাদির সঙ্গে ছিল কিছু শুষ্ক পিলুফল। জগদানন্দ নীলাচলে পৌঁছে—

সব দ্রব্য রাখিল, পিলু দিলেন বাঁটিয়া।
'বৃন্দাবনের ফল' বলি খাই হৃষ্ট হৈয়া ॥
যে কেহ জানে সে আঁটি সহিত গিলিল।
যে না জানে—গৌড়িয়া পীলু চাবাইয়া খাইল ॥
মুখে তার ছাল গেল, জিহ্বায় পড়ে লালা।
বৃন্দাবনের পীলু খাইতে এই এক খেলা ॥

(অন্ত্যলীলা ; ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ.চ)

কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'গোবিন্দ লীলামৃতে'ও পিলুফলের উল্লেখ দেখা যায়।

পক্ক পিলু দ্রাক্ষা আর সুপক্ক খর্জ্জুর। তাল শ্রীফল জম্বু কমলা প্রচুর ॥

(পঞ্চদশ সর্গ ; অনুঃ যদুনন্দন দাস)

'পদকল্পতরু'র একাধিক পদেও বৃন্দাবনের বিভিন্ন ফলগাছের বর্ণনা প্রসঙ্গে 'পিলু' বৃক্ষের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়—

আম জাম বিল্ব পীলু গুবাক নারিকেল।
বাদাম ছোহারা লেবু কপিত্থ সকল ॥

(২৩৭ ॥ ২৭১০ ; পৃঃ ১২৩। ৩য় খণ্ড)

ব্রজে দধিমন্থনের জন্যে মৃত্তিকানির্মিত এক প্রকার পাত্র ব্যবহৃত হ'ত। এ'টি 'মাঠ' নামে খ্যাত ছিল।

মৃত্তিকা নির্ম্মিত বৃহৎ পাত্র 'মাঠ' নাম।
মাঠোৎপত্তি—প্রশস্ত—এ হেতু মাঠ গ্রাম ॥
দধি মন্থনাদি লাগি ব্রজবাসিগণ।
লয়েন অসংখ্য 'মাঠ'—ঐছে সবে কন ॥

(৫ম তরঙ্গ ; ভক্তিরত্নাকর)

বৃন্দাবনের অন্যতম প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য চানা বা ছোলা, জোয়ার, বজরা,

গম ইত্যাদি।[২] তাই এখানকার অধিবাসীদের এক উল্লেখযোগ্য খাদ্য চানা এবং রুটি। রূপ এবং সনাতন বৃন্দাবনে কিরূপ বৈরাগ্যের জীবন যাপন করতেন, সেই বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে—

বিপ্র গৃহে স্থূল ভিক্ষা, কাঁহা মাধুকরী।
শুষ্ক রুটি চানা চিবায় ভোগ পরিহরি॥
(মধ্যলীলা ; ১৯শ পরিচ্ছেদ; চৈ. চ)

রায় রামানন্দের কৃচ্ছ্রসাধন প্রসঙ্গেও বর্ণিত হয়েছে—

রায় শুষ্ককাষ্ঠ আনি বেচে মথুরাতে।
পাঁচ ছয় পয়সা হয় একেক বোঝাতে॥
আপনে রহে এক পয়সার চানা চিবাইয়া।
আর পয়সা বেনিয়া স্থানে রাখেন ধরিয়া॥
(মধ্যলীলা ;২৫শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

'খড়েল্যা' গ্রামের অধিবাসী রাজপুরোহিত পরশুরামের কন্যা শ্রীকরমেতি বাই বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়ে—

শাক মূল ফল কভু চনা চাবাইয়া।
প্রাণ রক্ষাহেতু মাত্র থাকেন খাইয়া॥
(চতুর্বিংশমালা; ভক্তমাল; বসুমতী সংস্করণ।৫ম)

পথশ্রমে ক্লান্ত শ্রীনিবাসও ব্রজবাসী কর্তৃক চানা ও গুড়ের দ্বারা আপ্যায়িত হয়েছিলেন বলে বর্ণিত হয়েছে। তখনও বৃন্দাবনে পৌছতে শ্রীনিবাসের দিন চারেকের মত পথ অবশিষ্ট রয়েছে। একদিন পরিশ্রান্ত শ্রীনিবাস একটি বৃক্ষতলে শায়িত ছিলেন। অতঃপর সেখানে—

বৃন্দাবন হৈতে আইলা পাঁচ ব্রজবাসী। জলের নিকট বৃক্ষতলে বসিলেন আসি॥ শ্রীনিবাস দেখিলেন অতিশ্রান্ত হন। জল দিল কর ঠাকুর পদ-প্রক্ষালন। স্নান স্মরণ করি জলপাণির বেলে। চনা গুড় দিল শ্রীনিবাসের অঞ্চলে॥ (৫ম বিলাস; প্রেমবিলাস)

বৃন্দাবনে অবস্থানকালে উপবাসী জগন্নাথ মাধব দাসকেও একজন ব্রজবাসী কিছু চানা ভাজা দান করেছিলেন—

কিছুই না মিলে সাধু রহে উপবাসী।
পরদিন যমুনার তীরে আছে বসি॥

কতগুলি চনা ভাজা কেহ আনি দিলা।
বঙ্কবিহারীকে তাহা ভোগ লাগাইলা॥

(ঊনবিংশ মালা; ভক্তমাল; বসুমতী সংস্করণ।৫ম)

ব্রজমণ্ডলের অন্যতম খাদ্য তক্র বা ঘোল। এটি 'মাঠা' নামেও পরিচিত। এতে শিকিভাগ মাত্র জল থাকে। চৈতন্যের প্রিয় ভৃত্য রঘুনাথ দাস সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি বৃন্দাবনে উপস্থিত হয়েছিলেন রূপ ও সনাতনের চরণ দর্শনান্তে গোবর্দ্ধন পর্বত থেকে পড়ে প্রাণত্যাগ করবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু শেষপর্যন্ত রূপ ও সনাতনের জন্য তাঁর আর প্রাণত্যাগ করা হ'ল না। তখন রঘুনাথ ধর্মাচরণে মনোনিবেশ করলেন। অন্নজল ত্যাগ করে তিনি কেবলমাত্র দুই-তিন পল ওজনের মাঠা ভক্ষণ করতে লাগলেন—

অন্ন জল ত্যাগ কৈল অন্য কথন।
পল[৩] দুই তিন মাঠা করেন ভক্ষণ॥

(আদিলীলা; ১০ম পরিচ্ছেদ; চৈ. চ)

অন্যত্রও তক্রেরউল্লেখ লক্ষ্য করা যায়—

দাস নামে এক ব্রজবাসী এথা রয়।
দাস গোস্বামীর তারে স্নেহ অতিশয়॥
তেঁহো একদিন সখীস্থলী গ্রামে গেলা।
বৃহৎ পলাশ পাত্র দেখি তুলি নিলা॥
দাস গোস্বামীর কথা মনে মনে কহে।
অন্নাদিক ত্যাগ কৈলা দারুণ বিরহে॥
এক দোনা[৪] তক্র পিয়ে নিয়ম তাঁহার।
ইথে কিছু অতিরিক্ত হইবে আহার॥
ঐছে মনে করি ঘরে আসি দোনা কৈলা।
তাহে তক্র লৈয়া রঘুনাথ আগে আইলা॥

(৫ম তরঙ্গ ; ভক্তিরত্নাকর)

এই প্রসঙ্গে বৃন্দাবনে পত্র নির্মিত পাত্রের ব্যবহারও লক্ষণীয়।[৫] বৃন্দাবনে দধি দুগ্ধ, ঘৃত, নবনী প্রভৃতি দ্রব্যাদির প্রাচুর্য। গোবর্দ্ধন নিবাসী বল্লদেব ভক্ত-নিত্যানন্দের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবার কালে নানাবিধ দুগ্ধজাত সামগ্রী নিয়ে গিয়েছিলেন।

দধি-দুগ্ধ-ছানা-নবনীত আদি লৈয়া।
প্রভু আগে আসি কিছু কহে প্রণমিয়া॥
(৫ম তরঙ্গ; ভক্তিরত্নাকর)

পুনরায়,

দিব্য বৃক্ষতলে সবে মনের উল্লাসে।
সনাতনে বসাই বৈসয়ে চারি পাশে॥
দধি, দুগ্ধ, নবনীত আদি গৃহ হৈতে।
আনে যত্নে সবে সনাতনে ভুঞ্জাইতে॥
(৫ম তরঙ্গ ; ভক্তি রত্নাকর)

বৃন্দাবনস্থিত গোবর্ধনধারী শ্রীগোপালের ভোগবর্ণনায় ব্রজবাসীদের একাধিক বৈচিত্র্যময় ভোজ্যদ্রব্যের পরিচয় প্রকাশিত হ'তে দেখা গেছে—

কেহ বড়া, বড়ি, কড়ি[৬] করে বিপ্রগণ॥
জনা পাঁচ সাত রুটি করে রাশি রাশি।
অন্ন ব্যঞ্জন সব রহে ঘৃতে ভাসি॥
নব বস্ত্র পাতি তাহে পলাশের পাত।
রান্ধি রান্ধি তার উপর রাশি কৈল ভাত॥
তার পাশে রুটি রাশি উপপর্ব্বত হইল।
সূপ ব্যঞ্জনাদির ভাণ্ড চৌদিকে ধরিল॥
তার পাশে দধি দুগ্ধ মাঠা[৭] শিহরিণী।[৮]
পায়স মাথন সর[৯] পাশে ধরি আনি॥
(মধ্যলীলা ; ৪র্থ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

রাধাকৃষ্ণের লীলাধন্য বৃন্দাবনে বালকদের রাধা-কৃষ্ণ সাজে সজ্জিত করে 'রাসলীলা' অনুষ্ঠান করা হয়ে থাকে।

তার সাক্ষী দেখ পূর্ব্বাপর বৃন্দাবনে।
রাসলীলা করে ব্রজবাসী—আদিগণে॥
রাধাকৃষ্ণ সাজাইয়া সেই যে বালকে।
পরম ভক্তি করি পূজে সব লোকে॥
তাহার অধরামৃত চরণামৃত লৈয়া।
কাড়াকাড়ি করি খায় পদার্থ ভাবিয়া॥
(ত্রয়োদশ মালা ; ভক্তমাল ; বসুমতী সংস্করণ।৫ম)

মথুরায় যে গীত, অভিনয়াদির বহুল প্রচলন ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় শ্রীনিবাস মথুরায় উপস্থিত হ'লে তৎকালীন মথুরার বর্ণনায়—

মহাকোলাহল গান কেহ করে নাট।
সেইরূপে গেলা কৃষ্ণ বিশ্রামের ঘাট॥

(৫ম বিলাস ; প্রেম বিলাস)

মথুরায় নটিনীরা লোকের গৃহে গৃহে নৃত্যগীতাদি করে বেড়াত। মথুরানিবাসী বিঠঠলের গৃহে এক নটিনী কর্তৃক গীত পরিবেশনের কথা বর্ণিত হয়েছে 'ভক্তমালে'।

বিঠঠলের ঘরে এক নটিনী আইল।
ঠাকুরের গৃহে গান আরম্ভ করিল॥
রাসলীলা গান করে মধুর স্বরেতে।
বিঠঠল শুনিয়া প্রেমে নারে সংবরিতে॥

(বিংশ মালা ; ভক্তমাল ; বসুমতী সংস্করণ।৫ম)

কেবলমাত্র মথুরাতেই নয়, পরন্তু বৃন্দাবনেও নর্তকগণের অবস্থানের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ঝন্না পন্না নিবাসী হরিরাম নাম ব্যাস গোস্বামী গৃহ পরিত্যাগ পূর্বক বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলে—

গৃহ ছাড়ি সাধু বৃন্দাবনে কৈল বাস।
তথায় নর্ত্তকগণ করে লীলা রাস॥

(বিংশমালা ; ভক্তমাল ; বসুমতী সংস্করণ।৫ম)

ব্রজধামে ব্রজবাসীদের পরিধেয় বস্ত্রাদির মধ্যে অন্যতম উল্লেখযোগ্য হ'ল পাগড়ী।[১০] বিশেষত, গোপজাতির সকলেই মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করত। সনাতন গোস্বামী বৃন্দাবন অবস্থান কালে তাঁর নিকট গোরক্ষকের বেশে কৃষ্ণ আবির্ভূত হয়েছিলেন—

কৃষ্ণ গোপ বালকের ছলে দুগ্ধ লৈয়া।
দাঁড়াইলা গোস্বামী সম্মুখে হর্ষ হৈয়া॥
গোরক্ষক বেশ, মাথে উষ্ণীষ শোভয়।
দুগ্ধ ভাণ্ড হাতে করি গোস্বামীরে কয়॥

(৫ম তরঙ্গ ; ভক্তিরত্নাকর)

গোবর্দ্ধনে অবস্থান কালে শ্রীনিবাস এবং নরোত্তমও গোপবালক বেশী

কৃষ্ণের দর্শন লাভ করেছিলেন। গোপবালকবেশী কৃষ্ণের বর্ণনায় উল্লিখিত হয়েছে—

সম্মুখে দেখয়ে এক গোপের কুমার॥
অপূর্ব্ব উষ্ণীষ মাথে, সুন্দর শরীর।
করে এক যষ্টিমাত্র, অত্যন্ত সুধীর॥

(৬ষ্ঠ তরঙ্গ ; ভক্তিরত্নাকর)

এই প্রসঙ্গে গোপগণের যষ্ঠি ব্যবহারের বর্ণনাও লক্ষণীয়।[১১] কোজাগরী পূর্ণিমায় ব্রজধামে দুগ্ধজাত দ্রব্যাদির দ্বারা কোজাগরী পূজা করবার রীতি প্রচলিত—

ব্রজের পুরাণ রীতি নিশি কোজাগরে।
দুগ্ধ দ্রব্য দিয়া পূজা করে ঘরে ঘরে॥

(করুণানিধান বিলাস ; পৃঃ ২৮৭)

পশ্চিমে বা মারোয়াড়ে উৎপন্ন কৃষি পণ্যের মধ্যে অন্যতম প্রধান গম, যব ইত্যাদি। পশ্চিমের অধিবাসী লাখা নামক এক ভক্তকে কৃষ্ণ কর্তৃক যব-গম দানের বিষয়ে উল্লিখিত হয়েছে—

তাহে পরিতোষ কৃষ্ণ ছদ্মরূপ ধরি।
বলদে বলদে বহু গম যব ভরি॥
আসিয়া ঢালিয়া দিলা আঙ্গিনার মাঝে।
দুগ্ধবতী দুটি গরু আনে দুগ্ধ কাজে॥

(একবিংশ মালা ; ভক্তমাল ; বসুমতী সংস্করণ। ৫ম)

চৈতন্য পিতৃদেবের উদ্দেশে পিণ্ডদান উপলক্ষ্যে গয়ায় উপস্থিত হয়ে যে সব ভোজ্যদ্রব্য ভক্ষণ করেছিলেন তার অধিকাংশই ছিল ময়দাজাত। পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে যে পশ্চিমে কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে প্রধান যব-গম ইত্যাদি।

খিচড়ি লুচিবি পুয়া[১২] রুটি খিরী জত।
পশ্চিমার তাল (? ভাল) দ্রব্য কহিব তা কত॥

(গৌরাঙ্গ বিজয় ; চূড়ামণি দাস ; পৃঃ ১০৯)

নিত্যানন্দের নির্দেশানুযায়ী মাধবেন্দ্র পুরী বৃন্দাবন অভিমুখে গমন কালে পথে তিনি বারাণসীতে গিয়ে উপস্থিত হলে সেখানকার ন্যাসীরা তাঁকে যে সব খাদ্যদ্রব্য দিয়েছিলেন, তাদেরও অধিকাংশই ছিল ময়দাজাত—

রুটি পুয়া লুচি (পু) রী পিষ্টক পরমান্ন।
অন্ন ব্যঞ্জন কৈল পুরী সন্নিধান॥

(গৌরাঙ্গ বিজয়; চূড়ামণি দাস; পৃঃ ১০)

পশ্চিমে বিবাহোপলক্ষ্যে কন্যার পিতাকে পণ দেওয়ার রীতি প্রচলিত। জামাল পুরের এক ধনী ব্যক্তি দেবকীনন্দন সর্বত্র 'ভাইয়া' বলে পরিচিত ছিলেন। তিনি তাঁর প্রথমা পত্নীর মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার দ্বার পরিগ্রহ করেন। এজন্য তাঁকে কন্যার পিতাকে পণ দিতে হয়েছিল। কন্যার ভাষায়—

পিতা মাতা না জানি কতেক ধন পাইয়া।
অবলা আমাকে দিল কূপেতে ডারিয়া॥

(সপ্তদশমালা; ভক্তমাল; বসুমতী সংস্করণ। ৫ম)

গ. কাশী

ষোড়শ শতাব্দীতে কাশী, বেদান্তের শঙ্কর ভাষ্য চর্চার উল্লেখযোগ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। সমসাময়িক কালের গ্রন্থে তার পরিচয় পাওয়া যায়। শতানন্দ খানের পুত্র এবং শ্রীভগবান আচার্যের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গোপাল ভট্টাচার্য কাশী থেকে শঙ্কর ভাষ্য শিখে এসেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে—

গোপাল ভট্টাচার্য নাম—তাঁর[১৪] ছোট ভাই।
কাশীতে বেদান্ত পড়ি গেলা তাঁর ঠাঁই॥

(অন্ত্যলীলা; ২য় পরিচ্ছেদ; চৈ. চ)

পরবর্তীকালেও বেদান্ত চর্চার কেন্দ্ররূপে কাশীর খ্যাতি ছিল অক্ষুণ্ণ। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত একাধিক গ্রন্থে কাশীতে বেদান্ত চর্চার বিষয় উল্লিখিত হতে দেখা গিয়েছে—

কাশীর ব্রাহ্মণ জেন দেবগণ
বেদান্তে পণ্ডিত রাগ।
অপূর্ব্ব বসন ভালেতে চন্দন
মধ্যেতে রুলির দাগ॥

(তীর্থমঙ্গল; বিজয়রাম সেন)

জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত 'কাশী খণ্ডে'র অন্তর্গত কাশী পরিক্রমাতেও কাশীস্থিত অধিবাসীদের বিভিন্ন বৃত্তির বিষয় বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লিখিত হয়েছে—

কেহ বেদাধ্যায়ী কেহ লিখন পঠন॥ ৮৮

কাশী ব্যতীত সপ্তদশ শতাব্দীতে পুনা নগরীও বেদান্ত চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। এগার সিন্দূরের নিকটবর্তী 'ভিটা দিয়া' গ্রামের লক্ষ্মীনাথ লাহিড়ীর একমাত্র পুত্র রূপচন্দ্র মহারাষ্ট্রের অন্তর্গত পুনানগরীতে বেদ পাঠের জন্য গমন করেছিলেন বলে জানা যায়—

জগন্নাথ দর্শন কৈলা আনন্দিত হিয়া॥
সেথা হৈতে[১৫] মহারাষ্ট্র পুনানগরীতে।
বেদাদি পড়িতে গেলা হরষিত চিতে॥

(১৯শ বিলাস ; প্রেমবিলাস)

ঘ. দাক্ষিণাত্য

দাক্ষিণাত্যের ধনী ব্যক্তিগণের স্নানের সময় বাজনা বাজাবার রীতি প্রচলিত ছিল। আবার ভক্তিমার্গানুসারে এঁরা স্নানকার্য সম্পাদনের জন্য সঙ্গে করে অনেক বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ নিতেন। প্রসঙ্গক্রমে ধনী ব্যক্তিদের দোলায় আরোহণের রীতিও উল্লেখযোগ্য। রায় রামানন্দ সম্বন্ধে বর্ণিত হয়েছে—

হেনকালে দোলায় চড়ি রামানন্দ রায়।
স্নান করিবারে আইলা বাজনা বাজায়॥
তাঁর সঙ্গে আইলা বহু বৈদিক ব্রাহ্মণ।
বিধিমতে কৈল তেঁহো স্নানাদি তর্পণ॥

(মধ্যলীলা ; ৮ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

চৈতন্যদেব নীলাচলে গমনকালে 'অম্বুলিঙ্গ ঘাটে' উপস্থিত হলে সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হ'ল দক্ষিণরাজ্যের অধিকারী রামচন্দ্র খানের। রামচন্দ্র খান—

দেখিয়া প্রভুর তেজ ভয় হৈল মনে।
দোলা হৈতে সত্বরে নামিলা সেইক্ষণে॥

(অন্ত্যখণ্ড ; ২য় অধ্যায় ; চৈ. ভা)

দক্ষিণদেশে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী মানুষের ছিল বাস। চৈতন্যদেব তাঁর দাক্ষিণাত্য ভ্রমণকালে অনেকের সংস্পর্শে এসেছিলেন—

দক্ষিণ দেশের লোক অনেক প্রকার।
কেহো জ্ঞানী কেহ কর্মী পাষণ্ডী[১৬] অপার॥

সেইসব লোক প্রভুর দর্শন প্রভাবে।
নিজ নিজ মত ছাড়ি—হৈলা বৈষ্ণবে ॥
বৈষ্ণবের মধ্যে রাম-উপাসক সব।
কেহো তত্ত্ববাদী, কেহো হয় শ্রী বৈষ্ণব ॥

(মধ্যলীলা ; ৯ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

দক্ষিণদেশে যাঁরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী ছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। কেউ কেউ ছিলেন আবার তত্ত্ববাদী। মাধ্বাচার্যের ভক্তগণ যে শঙ্কর সম্প্রদায়ের মায়াবাদিগণ থেকে পৃথক ছিলেন তা বুঝাবার জন্য তৎকালে তাঁদের 'তত্ত্ববাদী' বলে অভিহিত করা হ'ত। তাঁরা শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত অদ্বৈতবাদ খণ্ডন করে ভগবৎ-তত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তত্ত্ববাদীরূপে অভিহিত হ'বার এটাই ছিল কারণ। এতদ্ব্যতীত শ্রী সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ ছিলেন। এঁদের কেউ ছিলেন লক্ষ্মী-নারায়ণের উপাসক, কেউ ছিলেন আবার রামচন্দ্রের উপাসক। রামানুজ সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণের মূলগুরু হলেন লক্ষ্মী। লক্ষ্মীর অপর নাম শ্রী। সেইজন্য রামানুজ সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবগণ 'শ্রীবৈষ্ণব' নামে অভিহিত হতেন।

দাক্ষিণাত্যের বৈষ্ণবগণের অনেকে আবার শালগ্রাম শিলা পূজা করতেন

মধ্যদেশ দক্ষিণ দেশের দেখ রীত।
সর্ব্ব বৈষ্ণবেতে শালগ্রাম সুপূজিত ॥

(ষষ্ঠ মালা ; ভক্তমাল ; বসুমতী সংস্করণ।৫ম)

দক্ষিণদেশের বৈষ্ণবগণের অনেকেই যে লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ছিলেন, 'ভক্তিরত্নাকরে'ও তার প্রমাণ পাওয়া যায়। ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কটভট্ট এবং প্রবোধানন্দ নামক তিনজন লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক বৈষ্ণব চৈতন্য প্রভাবে শেষ পর্যন্ত গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন।

শ্রীব্যেঙ্কট ভট্টের নিবাস দক্ষিণেতে।
বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ বিজ্ঞ সকল শাস্ত্রেতে ॥
ত্রিমল্ল, ব্যেঙ্কট আর শ্রী প্রবোধানন্দ।
এ তিন ভ্রাতার প্রাণধন গৌরচন্দ্র ॥
লক্ষ্মীনারায়ণ উপাসক এ পূর্বেতে।
রাধাকৃষ্ণ রসে মত্ত প্রভুর কৃপাতে ॥

(১ম তরঙ্গ; ভক্তিরত্নাকর)

দক্ষিণদেশে বহু বৌদ্ধেরও বাস ছিল। চৈতন্য দক্ষিণদেশে পরিভ্রমণে গেলে তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা শুনে বৌদ্ধগণ আসলেন তাঁর সঙ্গে তর্ক করতে—

পাষণ্ডীর গণ আইল পাণ্ডিত্য শুনিয়া।
গর্ব করি আইল সঙ্গে শিষ্যগণ লৈয়া॥
বৌদ্ধাচার্য মহাপণ্ডিত নিজ নবমতে।[১৭]
প্রভু আগে উদ্‌গ্রাহ করি লাগিলা কহিতে॥

(মধ্যলীলা ; ৯ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

দাক্ষিণাত্যে বিশেষত কাঞ্জিভেরামে অসংখ্য শিবলিঙ্গ থাকায় এটি 'দক্ষিণ কাশী' নামে অভিহিত হ'ত। চৈতন্য শিবকাঞ্চীস্থিত শৈবগণকেও বৈষ্ণবধর্মে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।

শিবকাঞ্চী আসি কৈল শিব-দরশন।
প্রভাতে বৈষ্ণব কৈল সব শৈবগণ॥

(মধ্য লীলা ; ৯ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

মল্লারদেশে অর্থাৎ বর্তমান মালাবার প্রদেশে এক শ্রেণীর সন্ন্যাসীর বাস ছিল। এঁরা 'ভট্টমারি' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁরা অস্ত্রশস্ত্র ধারণ করে সন্ন্যাসীর বেশে বিচরণ করতেন। এঁরা ছিলেন নিষিদ্ধ কদাচার পরায়ণ। এঁরা মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি ক্রিয়ায় ছিলেন বিশেষ পারদর্শী—

আমলী তলাতে রাম দেখি গৌরহরি।
মল্লার দেশেতে আইলা যাঁহা ভট্টমারি॥

(মধ্যলীলা ; ৯ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

চৈতন্যের সঙ্গী কৃষ্ণদাস নামক ব্রাহ্মণকে ভট্টমারিগণ স্ত্রীলোকের প্রলোভনে প্রলুব্ধ করলে চৈতন্য ভট্টমারিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের কার্যের সমালোচনা ও প্রতিবাদ করলে—

শুনি সব ভট্টমারি উঠে অস্ত্র লঞা।
মারিবারে আইল সবে চারিদিগ ধাঞা।
তার অস্ত্র তার অঙ্গে পড়ে হাত হৈতে,
খণ্ড খণ্ড হৈল ভট্টমারি পলায় চারিভিতে।

(মধ্য লীলা ; ৯ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ)

এইভাবে প্রাচীন ও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্য থেকে বঙ্গেতর ভারতের

ভৌগোলিক ও সামাজিক জীবনের বহু উল্লেখযোগ্য উপাদান আমরা পাই, যার ঐতিহাসিক গুরুত্ব অপরিসীম।

জগন্নাথের সেবা

মধ্যযুগে রচিত একাধিক গ্রন্থে, বিশেষতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্য চরিতামৃতে' শ্রীক্ষেত্রস্থিত জগন্নাথদেবের সেবার বিস্তৃত বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। মন্দিরের যাঁরা সেবক বা তত্ত্বাবধায়ক, তাঁরা পরিচিত 'পড়িছা' নামে। জগন্নাথের রক্ষক পাণ্ডারা পরিচিত 'দয়িতা' নামে। এরা কায়স্থ কুলোদ্ভূত। জগন্নাথের যারা পাচক, তাদের বলা হয় 'সোয়ার', আর যিনি প্রধান পাচক, তাঁকে বলা হয় 'মহাসোয়ার'। জগন্নাথের আয়-ব্যয়ের হিসাব লেখেন যিনি তাঁকে বলা হয় 'লিখন-অধিকারী'।

শেষরাত্রে জগন্নাথের শয্যা থেকে ওঠার সময়। এই শয্যা থেকে ওঠাকে বলা হয় 'শয্যোত্থান'।

আরদিন মহপ্রভু নিজগণ লঞা।
জগন্নাথ দেখিলেন শয্যোত্থানে যাঞা॥

[অন্ত্যলীলা ; ১০ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

নিশান্তে জগন্নাথকে নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য শঙ্খ বাজান হয়ে থাকে। আচমনান্তে এই শঙ্খ বাজান হয়। এই শঙ্খ পরিচিত 'পাণিশঙ্খ' নামে—

হেনকালে জগন্নাথের পাণিশঙ্খ বাজিলা।
স্নান করি মহাপ্রভু দরশনে গেলা॥

[অন্ত্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

প্রত্যহ প্রাতঃকালে জগন্নাথকে যে ভোগ প্রদান করা হয় তা পরিচিত 'উপভোগ' বা 'বল্লভভোগ' নামে। অনেকে আবার 'শীতলভোগ'ও বলে থাকে। সম্ভবতঃ প্রস্তর নির্মিত ভাঁড়ে অথবা রত্নময় ভাণ্ডে কিংবা রত্ন খচিত প্রস্তরময় ভাণ্ডে এই ভোগ নিবেদন করা হয় বলে এই প্রাতঃকালীন ভোগ 'উপলভোগ' নামে পরিচিত।

মহাপ্রভু জগন্নাথের উপলভোগ দেখিয়া।
নিজগৃহে যান এই তিনেরে[১৮] মিলিয়া॥
[মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ, চৈ. চ]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য সারাদিনে জগন্নাথের উদ্দেশে সর্বমোট চুয়ান্নবার ভোগ নিবেদন করা হয়ে থাকে এবং প্রতিবারে বহুশত ভার অন্নভোগ প্রদত্ত হয়।

আচার্য্য[১৯] কহে নীলাচলে খাও চৌয়ান্ন বার।
এক একবারে অন্ন খাও শত শত ভার॥
[মধ্যলীলা, ৩য় পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

জগন্নাথের একপ্রকার ভোগের নাম 'গোপাল বল্লভ ভোগ'।

হেনকালে গোপাল বল্লভ ভোগ লাগাইল।
শঙ্খ ঘণ্টা আদি সহ আরতি বাজিল॥
[অন্ত্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ, চৈ. চ]

এই 'গোপাল বল্লভভোগ' গুড়, কর্পূর, গোলমরিচ, এলাচ, লবঙ্গ, ছানা, মাখন, কাবাবচিনি, দারুচিনি ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

জগন্নাথের উদ্দেশে নিবেদিত ভোগের সংখ্যা এবং পরিমাণের সঙ্গে তাদের বৈচিত্র্যও বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়—

ব্যঞ্জন লাঁকড়া মুদগসূপ ছানা বড়ি।
ভাজা ঝোল তলা নারিকেল কোরা বড়ি॥
বড় আম্লা শর্করা কাঁজিবড়া খীর ছেনা।
অমৃত গুটিকা দুগ্ধ কোরা চিনি পানা॥
মধুমণ্ডা ঘৃতমণ্ডা চিনিমণ্ডা পিঠা।

*　　*　　*

অর্শো ডালিমা তার পর্যুষ কাকড়া।
সোসবড়া কন্দরণ সাতপুলি শর্করা॥
দেউলি সাকর মধুসাকর ডিআ পুলি।
মরিচা ঝাঝরি মধুস্রবা ঝিলিমিলি॥
দুঃখহরা মনোহরা খইচুর নবাত।
কৃষ্ণকেলি হংসকে ছাওয়া পারিজাত॥

হরিবল্লভ নয়নসুখ আর ডুধারি।
চন্দ্রকান্তি গঙ্গাজল অনুপাম সিকারি॥
এরণ্ডি পম্ফল খিরি খির্শা খিরড়া।
সো আরি সোমদত্তা দোহাড়া॥

[উৎকলখণ্ড ; জগন্নাথ বর্ণন ; চৈ. ম. ; জয়ানন্দ]

এমন কি প্রিয় দেবতার উদ্দেশে উড়িষ্যার বহু প্রচলিত এবং জনপ্রিয় 'পাখাল ভাত'ও নিবেদিত হয়ে থাকে—

রাজভোগ লক্ষ্মীভোগ মালি পাখাল[২০] ভাত।
নয়ন সন্তোষ ভোগ প্রিয় জগন্নাথ॥

[উৎকল খণ্ড, জগন্নাথ বর্ণন; চৈ. ম ; জয়ানন্দ]

মধ্যাহ্ন ভোগের পর জগন্নাথ থাকেন শয়নে। তাই এই সময়ে তাঁর সেবার আর কোন রূপ কার্য থাকে না। এই সময়ে জগন্নাথের সেবকগণের অখণ্ড অবসর। তারা এই সময়ে নিজ নিজ গৃহে গিয়ে বিশ্রাম সুখ ভোগ করে—

সেবক সব গতাগতি করে অবসরে।

[অন্ত্যলীলা, ৪র্থ পরিচ্ছেদ; চৈ. চ]

সন্ধ্যাবেলা জগন্নাথের ধূপের আরতি হয়। 'চরিতামৃতে' বর্ণিত হয়েছে চৈতন্যদেব এই ধূপ আরতি দেখেই সঙ্কীর্তন আরম্ভ করেছিলেন।

সন্ধ্যাধূপ দেখি আরম্ভিলা সঙ্কীর্ত্তন।
পড়িছা আনি দিল সভারে মাল্য চন্দন॥

[মধ্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

শ্রীক্ষেত্রে শয়নের কালে জগন্নাথকে প্রত্যহ স্বর্ণময় পাত্র করে দিনের সর্বশেষ ভোগ প্রদান করা হয়ে থকে—

রাত্রে শয়নের কালে সোনার থালীতে।
নিত্যানি লাগয়ে ভোগ আছে নিয়মিতে॥

[উনবিংশমালা ; শ্রীশ্রী ভক্তমাল ; বসুমতী সংস্করণ]

জগন্নাথের সর্বশেষ সেবানুষ্ঠান 'পুষ্পাঞ্জলি'। শয়নের আগে জগন্নাথের পুষ্পময় বেশ রচনা করে পরিশেষে পুষ্পাঞ্জলি প্রদান করা হয়। পুষ্পাঞ্জলি প্রদানের পরই জগন্নাথের শয়ন। সুতরাং এরপর আর তাঁর দর্শন লাভ হয় না।

কীর্তন সমাপ্তি করি দেখি পুষ্পাঞ্জলি;
সর্ব্ব বৈষ্ণব লঞা প্রভু আইলা বাসা চলি।

[মধ্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

জগন্নাথদেবের প্রতিনিধি স্বরূপ এক বিগ্রহকে উপযুক্তভাবে সজ্জিত করে নৌকায় চড়িয়ে নরেন্দ্র সরোবরের জলে বিহার করান হয়ে থাকে। এইরূপ জলবিহার জগন্নাথের 'জললীলা' নামে পরিচিত। নীলাচলে চৈতন্যদেবের অবস্থানকালে গৌড় থেকে আগত বৈষ্ণবেরা এই 'জললীলা' দর্শন করেছিলেন বলে উল্লিখিত হয়েছে—

এই মতে বৈষ্ণব সব নীলাচলে আইলা।
দৈবে জগন্নাথের সেদিন জললীলা॥

[অন্ত্যলীলা, ১০ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

জ্যৈষ্ঠ মাসের পূর্ণিমা তিথিতে জগন্নাথের স্নান যাত্রা। স্নানযাত্রার পর কৃষ্ণা চতুর্দশী পর্যন্ত জগন্নাথের অঙ্গরাগ অনুষ্ঠিত হয়। তাই এই সময়ে অপর কেউ তাঁর দর্শন লাভ করতে পারে না। এই সময়টি পরিচিত 'অনবসর' নামে—

স্নান যাত্রা দেখি প্রভু পাইল বড় সুখ।
ঈশ্বরের অনবসরে পাইল মহাদুখ॥

[মধ্যলীলা, ১১শ পরিচ্ছেদ ; চৈ চ]

অতঃপর প্রতিপদের দিন, অর্থাৎ রথযাত্রার আগের দিন বিগ্রহের নেত্র বা চক্ষুদান করা হয়ে থাকে। তাই এই দিনটি জগন্নাথের 'নেত্রোৎসব' নামে পরিচিত। এই দিন থেকে পুনরায় বিগ্রহের দর্শনলাভ হয়।

আরদিন জগন্নাথের নেত্রোৎসব নাম।
মহোৎসব হৈল ভক্তের প্রাণ সমান॥

[মধ্যলীলা, ১২শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

অনন্তর জগন্নাথের রথযাত্রা। নীলাচলে জগন্নাথদেবের সর্বশ্রেষ্ঠ উৎসব এই রথযাত্রা বা 'গুণ্ডিচা যাত্রা'। রথযাত্রার দিন সকালে জগন্নাথের 'পাণ্ডুবিজয়'[২১] অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। জগন্নাথের মন্দির থেকে রথ পর্যন্ত পথে তুলার বালিশ পাতা হয়। তারপর বিগ্রহকে সিংহাসন থেকে নামিয়ে পাণ্ডারা

বিগ্রহের স্কন্ধ, চরণ, পট্টডুরি ইত্যাদি ধরে বালিশের ওপর দাঁড় করিয়ে দেন। অতঃপর ধরাধরি করে এক বালিশ থেকে অপর বালিশে বিগ্রহকে নিয়ে যাওয়া হয়। জগন্নাথের এই ভাবে গমন 'পাণ্ডুবিজয়' নামে খ্যাত। চৈতন্যচরিতামৃতকার পাণ্ডুবিজয়ের বিস্তৃত বর্ণনা প্রদান করেছেন—

বলিষ্ঠ দয়িতাগণ যেন মত্ত হাথী।
জগন্নাথ বিজয় করায় করি হাথাহাথি॥
কতক দয়িতা করে স্কন্ধ আলম্বন।
কতক দয়িতা ধরে শ্রীপদ্মচরণ।
কটিতটে বদ্ধদৃঢ় স্থূল পট্টডোরী।
দুই দিগে দয়িতাগণ উঠায় তাহা ধরি॥
উচ্চ দৃঢ় তুলী সব পাতি স্থানে স্থানে।
এক তুলী হৈতে আর তুলী করায় গমনে॥
প্রভু পদাঘাতে তুলী হয় খণ্ড খণ্ড।
তুলা সব উড়ি যায়, শব্দ হয় প্রচণ্ড॥

[মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

এইভাবে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে তিনখানি পৃথক পৃথক সুসজ্জিত রথে আরোহণ করিয়ে সেই রথ তিনটিকে টানা হয়। রথ টানার আগে রথ চলার পথটি পুরীর রাজা স্বয়ং স্বর্ণমণ্ডিত ঝাঁটার দ্বারা পরিষ্কার করে দেন। তারপর চন্দন মিশ্রিত জলের দ্বারা পথটিকে সিক্ত করা হয়—

তবে প্রতাপরুদ্র করে আপনে সেবন।
সুবর্ণ মার্জনী লৈয়া করে পথ সম্মার্জ্জন॥
চন্দন জলেতে করে পথ নিষিঞ্চনে।
তুচ্ছ সেবা করে বৈসে রাজ সিংহাসনে॥

[মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

অতঃপর রথ টানার পালা। উড়িষ্যাবাসী গৌড় জাতীয় এক শ্রেণীর বলিষ্ঠ লোক রথ টেনে থাকে—

গৌড় সব রথ টানে করিয়া আনন্দ,
ক্ষণে শীঘ্র চলে রথ ক্ষণে চলে মন্দ।

[মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

রথ বলগণ্ডিস্থানে পৌঁছালে সেখানে জগন্নাথের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করা হয়। চন্দন পুকুরের পথ থেকে শ্রদ্ধানদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত রথের সরানকে 'বলগণ্ডি' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। পূর্বে গুণ্ডিচা মন্দির যেতে পথে শ্রদ্ধা নামে নদী পড়ত। সে সময়ে মোট ছ'খানি রথ হ'ত। তিনটি রথ পুরীর মন্দির থেকে শ্রদ্ধানদীর পশ্চিম তীর পর্যন্ত যেত। অতঃপর অপর তিন খানি রথে আরোহণ করিয়ে জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রাকে 'গুণ্ডিচা' মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হ'ত। কিন্তু শ্রদ্ধানদী মজে যাওয়ায় এক্ষণে রথের পরিবর্তনের আর কোন প্রয়োজন হয় না। কাজেই এখন মাত্র তিনটি রথ হলেই চলে। এই তিনটি রথকে বরাবর গুণ্ডিচা মন্দিরে নিয়ে যাওয়া হয়। যাইহোক বলগণ্ডিস্থানে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী সকলেই পৃথক পৃথক ভাবে জগন্নাথের উদ্দেশে ভোগ নিবেদন করে থাকেন—

চলিয়া আইলা রথ বলগণ্ডিস্থানে।
জগন্নাথ রথ রাখি দেখে ডাইনে বামে॥

* * *

সেই স্থানে ভোগ লাগে আছয়ে নিয়ম।
কোটি ভোগ জগন্নাথ করে আস্বাদন॥
জগন্নাথের ছোট বড় যত ভক্তগণ।
নিজ নিজোত্তম ভোগ করে সমর্পণ॥

[মধ্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

বলগণ্ডি ভোগের বৈশিষ্ট্য হ'ল এটা নিসকড়ি। অর্থাৎ ডাল, ভাত, রুটি, তরকারী ইত্যাদি অন্ন ব্যঞ্জনাদি ব্যতীত ঘৃতে প্রস্তুত নানাবিধ ভোজ্য বস্তু, ফলমূল, মিষ্টান্ন ইত্যাদি 'বলগণ্ডি'তে জগন্নাথের উদ্দেশে নিবেদন করা হয়ে থাকে। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলগণ্ডি ভোগের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন—

নিসকড়ি প্রসাদ আইল উত্তম অনন্ত,
চেনা[২২] পানা[২৩] পাইড়[২৪] আম্র নারিকেল কাঁঠাল;
নানাবিধ কদলক[২৫] আর বীজতাল[২৬]।
নারঙ্গ,[২৭] ছোলঙ্গ, টাবা, কমলা, বীজপুর,
বাদাম, ছোয়ারা, দ্রাক্ষা, পিণ্ড খর্জ্জুর।
মনোহরা লাড্ডু আদি শতেক প্রকার,

অমৃত গুটিকা[২৮] আদি ক্ষীরসা অপার।
অমৃতমণ্ডা, ছানাবড়া আর কপূরকেলি।
সরামৃত সরভাজা আর সরপুলী।
হরিবল্লভ সেবতী কর্পূর মালতী ;
ডালিম, মরিচা, লাড়ু নবাত[২৯] অমৃতী[৩০]।
পদ্মচিনি,[৩১] চন্দ্রকাঁতি[৩২] খাজনা খণ্ডসার,
বিয়ড়ি কদমা[৩৩] তিল খাজার প্রকার।
নারঙ্গ ছোলঙ্গ আম্র বৃক্ষের আকার,
ফুল-ফল-পত্র-যুক্ত খণ্ডের বিকার।[৩৪]
দধি দুগ্ধ দধিতক্র[৩৫] রসালা[৩৬] শিখরিণী[৩৭] ;
সলবন মুদগাঙ্কুর,[৩৮] আদা খানি খানি।
লেম্বু কুলি আদি নানা প্রকার আচার ;
লিখিতে না পারি প্রসাদ কতেক প্রকার।

[মধ্যলীলা, ১৪শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

গুণ্ডিচা মন্দিরে জগন্নাথ দ্বিতীয়া থেকে দশমী পর্যন্ত মোট নয়দিন বিশ্রাম করেন, অতঃপর একাদশী তিথিতে পুনরায় গুণ্ডিচা থেকে নীলাচলে প্রত্যাবর্তন করেন। একে বলা হয় পুনর্যাত্রা। গুণ্ডিচা মন্দির থেকে প্রত্যাবর্তনকালেও জগন্নাথের রথযাত্রা দিনের যত 'পাণ্ডুবিজয়' অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

রথযাত্রার অব্যবহিত পরবর্তী পঞ্চমী তিথিতে লক্ষীদেবী তাঁর দাসদাসী সমভিব্যাহারে মহাঐশ্বর্য প্রকটিত করে নীলাচলস্থিত মন্দির থেকে গমন করে জগন্নাথের সেবকদের এমনকি তাঁর রথটিকে পর্যন্ত প্রহার করে থাকেন। লক্ষীদেবীকে পরিহার করে জগন্নাথ 'সুন্দরাচলে' অর্থাৎ গুণ্ডিচা মন্দিরে গমন করায় জগন্নাথের প্রতি ক্রোধ প্রকাশের ছলে তাঁর দাসদাসী এবং রথটিকে পর্যন্ত লক্ষী কর্তৃক শাস্তিদান স্বরূপ এই যে প্রহার করার রীতি, এ'টি প্রসিদ্ধ 'হোরা পঞ্চমী' নামে। চৈতন্যদেব 'হোরাপঞ্চমী'র উৎসবও প্রত্যক্ষ করেছিলেন—

গুণ্ডিচাতে নৃত্য অন্তে কৈল জলকেলি।
হোরা পঞ্চমীতে দেখিল লক্ষীদেবীর কেলি॥

[মধ্যলীলা, ১ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা ষষ্ঠীতে জগন্নাথকে মাড় সমেত অধৌত নতুন শীতবস্ত্র প্রদান করা হয়। একে বলা হয় 'ওড়ন ষষ্ঠী'।

ওড়নি ষষ্ঠীর দিনে যাত্রা যে দেখিল।
জগন্নাথে পরে তথা মাড়ুয়া বসন,
দেখিয়া সঘৃণ হৈল বিদ্যানিধির মন।

[মধ্যলীলা, ১৬শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

বৃন্দাবনদাস বিরচিত 'চৈতন্য ভাগবতে'ও 'ওড়ন ষষ্ঠী'র উল্লেখ রয়েছে—

মাণ্ডুয়া বসন ঈশ্বরেরে দেন কেনে॥
এ দেশেত শ্রুতি স্মৃতি সকল প্রচুরে।
তবে কেন বিনা ধৌতে মণ্ড বস্ত্র পরে॥

[অন্ত্য খণ্ড ; ১০ম পরিচ্ছেদ ; চৈ. ভা]

শীতকালে জগন্নাথ দেবকে বহুমূল্য 'সকলাত' দেওয়া হয়ে থাকে। একবার মাধোদাস নামে জনৈক ভক্তকে শীতের প্রকোপ থেকে রক্ষার জন্য জগন্নাথ স্বয়ং নিজের সকলাত খানি দিয়েছিলেন—

পুরীর ভিতরে একদিন মাধোদাস।
রাত্রিযোগে রহে শীতকাল মাঘ মাস॥
শীত লাগে বুঝিয়া স্নেহেতে জগন্নাথ।
অঙ্গ হৈতে উঠাইয়া দিলা সকলাত॥
প্রাতঃকালে দেখে সবে মাধবের গায়।
সকলাত বহুমূল্য শ্রীঅঙ্গের হয়॥

[উনবিংশ মালা, শ্রীশ্রীভক্তমাল ; বসুমতী সংস্করণ]

'মহোৎসব' উপলক্ষে জগন্নাথকে চোদ্দ হাত দীর্ঘ তুলসী পত্রের মালা এবং 'ছুটা' নামক পানের খিলি প্রদান করা হয়ে থাকে। চৈতন্যদেব জগন্নাথের সেবকগণের কাছ থেকে এই প্রসাদীমালা এবং 'ছুটাপান' বিড়া লাভ করে পরে তা রঘুনাথ ভট্টকে প্রদান করেছিলেন।

চৌদ্দ হাত জগন্নাথের তুলসীর মালা।
ছুটা পান বিড়া মহোৎসবে পাঞা ছিলা॥

[অন্ত্যলীলা, ১৩শ পরিচ্ছেদ ; চৈ. চ]

১. The trees most commonly found growing wild in the Pargana are the nim and the Filu—Mathura ; a District Memoir by Growse (Mathura : Part II)

২. The crops most extensively grown being Joar, chana and barley—Mathura : a District Memoir by Growse (Mathura : Part II, Pargana Kosi)

The Principal crops are Joar and Chana, there being 63,000 acres under the former and 29,000 grown with Chana, out of a total area of 160, 433—Mathura : a District Memoir by Growse (Mathura : Part II Pargana Chhati.)

The Principal crops tobacco, sugar-cane, cotton, and barley bajra and joar being also largely grown, though not ordinarily to such and extent as the varieties first named wheat, which in the adjoining Parganas is scarcely to be seen of all, here forms an average crop.

(Mathura : a District Memoir by Growse ; Chap III ; Pargana Mathura)

The principal winter crops are Joar, bajra

(„ „ Chap IV, Pargana Mat)

The crops principally grown are joar, bajra are the like on 57,000 acres wheat and barley on 30 700 and chana on 4 000

(„ chap V ; Pargana Mahadan)

৩. পল ৮ ভরি বা ৮ তোলা ওজনের সমান।

৪. পত্র নির্মিত পাত্র।

৫. শ্রীজীব গোস্বামী বিরচিত 'গোপাল চম্পূ' কাব্যেও পত্র নির্মিত পাত্রের উল্লেখ রয়েছে—

নিজ ভাজনং ফলরিক্তং বভূব ন বা কিমিত তু ন বিবিক্তং চকার। গৃহাভ্যন্তরেণান্তরিতে তু তস্মিন্নিজং পত্রজ মমত্রমযত্নতয়া রত্ন পূরিতমপ্য নিভাল্য ভারমপ্য সংভাল্য তন্মাধুর্য্যা বেলাভি নিবেমবতী স্বজনানামপি শর্ম্মজননায় বহুফলাবলি বলি সমানয় নায় চ নিজ নিলয়মেব জগাম॥

পূর্ব্বং ৭ম পূঃ॥

৬. দধি ও বেসন দ্বারা প্রস্তুত ব্রজবাসীদের একপ্রকার খাদ্য।

৭. ঘোল।

৮. দধি, দুগ্ধ, মরিচ, কর্পূর ও চিনি সহযোগে প্রস্তুত খাদ্য।

৯. দুধের সর।

১০. পাগ জামা নিমা আর নবীন পটুকা।
রক্ত হেমারুণ চিত্রবর্ণে যে অধিকা॥
চারি রূপ বস্ত্র এই ব্রজযোগ্য হয়।
তৎকাল কোচাই তাহা যাতে শোভাময়॥
॥ গোবিন্দ লীলামৃত, কৃষ্ণদাস কবিরাজ; ৩য় সর্গ; অনু: যদুনন্দন দাস॥

১১. শ্রীরূপ গোস্বামী বিরচিত 'বিগগ্ধ মাধব' নাটকে বর্ণিত কৃষ্ণের বর্ণনা—
শিক্ষা বেণু ষষ্ঠি ভূমে পড়িয়া লোটায়।
ব্যাকুল উন্মত্ত প্রায় ফিরিয়া বেড়ায়॥ (পৃ ১০৩)
কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'গোবিন্দ লীলামৃতে'ও গোপ বালকবেশী কৃষ্ণের যষ্ঠী ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে—
কেহ আসি কেশবন্ধ খসাইল তার।
কেহ বেণু নিল যষ্ঠি নিল কেহ আর॥ (ঊনবিংশ সর্গ; পৃ ২২৭)

১২. 'flat pan—cakes fried in ghee pupaka.

১৩. 'Unsweetened - wheat cakes with stuffing, fried in ghee Purika.'

১৪. শ্রীভগবান আচার্য্যের।

১৫. উৎকল থেকে।

১৬. শাস্ত্রমতে বৌদ্ধরা পাষণ্ডী।

১৭. সর্বাপেক্ষা প্রাচীন শাস্ত্র বেদ। কিন্তু সেই বেদের মত অগ্রাহ্য করে বলে বৌদ্ধ শাস্ত্রকে 'নবমত' বলে অভিহিত করা হয়।

১৮. হরিদাস, রূপ ও সনাতন।

১৯. শ্রীঅদ্বৈত।

২০. পান্তা ভাত।

২১. হাত বা কোমর ধরে ছোট শিশুকে যেভাবে হাঁটান হয়, উড়িষ্যায় তাকে বলে পহান্তি। পহান্তির অপভ্রংশ 'পাণ্ডু'।

২২. ছানা

২৩. সরবৎ

২৪. পেঁড়া

২৫. কলা

২৬. তালশাঁস

২৭. লেবু বিশেষ।

২৮. মিষ্টি বিশেষ।

২৯. খণ্ড বিশেষ।

৩০. জিলিপি।

৩১. পদ্মমধুর মাড়ে প্রস্তুত চিনি।

৩২. বিড়ি কলায়ের রুটি।

৩৩. বিড়ি কলায় চূর্ণ নির্মিত কদমা।

৩৪. চিনি বা গুড় দ্বারা প্রস্তুত ফল, ফুল ও পত্রযুক্ত নারঙ্গ বৃক্ষ, ছোলঙ্গ বৃক্ষ ও আম্রবৃক্ষ।

৩৫. ঘোল।

৩৬ ক্ষীরের সঙ্গে দুধ মিশিয়ে প্রস্তুত করা হয়।

৩৭. দধি ও তক্র মিশ্রিত।

৩৮. অঙ্কুর যুক্ত ভিজামুগ।

অন্নদামঙ্গল

১৬৭৪ শকাব্দে রচিত 'অন্নদামঙ্গল' কাব্যে কবি ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর নীলাচল, মথুরা-বৃন্দাবন, সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, গুজরাট ইত্যাদি কয়েকটি স্থানের যৎকিঞ্চিৎ বর্ণনা দান করেছেন। ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনে বঙ্গেতর ভারতের কোন কোন স্থানে গমনের সুযোগ হয়েছিল। বৈষয়িক কারণে বর্দ্ধমানাধিপতির কারাগারে কবি নিক্ষিপ্ত হয়েছিলেন। কারাগার থেকে ক্রমে মুক্তিলাভ করে তিনি মহারাষ্ট্রীয় রাজধানী কটকে উপস্থিত হয়ে শিবভট্ট নামে এক দয়াবান সুবেদারের আশ্রয় প্রার্থী হন। পরে নীলাচলে শঙ্করাচার্যের মঠেও কিছুকাল অতিবাহিত করেন। অনন্তর কবি বৃন্দাবন দর্শনার্থে বৈষ্ণবগণ সমভিব্যাহারে শ্রীক্ষেত্র থেকে বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হন। বৃন্দাবন থেকে কিছুকাল পরে খানাকুলে প্রত্যাবর্তন করেন।

মানসিংহ সমভিব্যাহারে ভবানন্দ মজুমদারের দিল্লী যাত্রা বর্ণনা উপলক্ষে কবি তাঁর কাব্যে (মানসিংহ) বঙ্গেতর ভারতের কয়েকটি স্থানের বর্ণনা দান করেছেন। অবশ্য কাব্যে বর্ণিত সব ক'টি স্থানে কবি স্বয়ং গমন করেন নি সত্য, তথাপি গ্রন্থে উল্লিখিত হওয়ায় বর্ণনা গুলির গুরুত্বকে আমরা আর অস্বীকার করতে পারি না।

সর্বপ্রথম জগন্নাথ দর্শনের অভিলাষে ভবানন্দ মজুমদার মানসিংহের সঙ্গে যাত্রা করলেন। রাজঘাট অতিক্রম করে বস্তায় পৌছিয়ে তারা বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। অতঃপর মহানদী অতিক্রম করে উভয়ে কটকে এসে উপস্থিত হলেন। কটকের দক্ষিণে ভুবনেশ্বর এবং বামে বালেশ্বর। বালিহস্তা পশ্চাতে ফেলে আঠার নালা অতিক্রম করে উভয়ে শেষে নীলাচলে গিয়ে উপস্থিত হন। এখানে ছু'জনে জগন্নাথ দর্শন করলেন। দিন দশ বারো এখানে উভয়ে অতিবাহিত করলেন। নীলাচলে অবস্থানকালে তাঁরা বহুস্থান দর্শন করলেন এবং মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করলেন। তাঁরা এখানে বিমলা মূর্তিও দর্শন করেন। তারপর এখান থেকে যাত্রা করে পর্বত অতিক্রমণের পর সুবর্ণরেখা পার হয়ে তাঁরা উপনীত হলেন সীতাকোলে। এখান থেকে পুনরায় যাত্রা করে তাঁরা সেতুবন্ধ-রামেশ্বর, কৃষ্ণা ইত্যাদি নদী, কাঞ্চী প্রভৃতি দেশ পরিভ্রমণান্তে মারাঠা

বর্গীর দেশ অতিক্রম করে বহু নদ নদী, গিরি বন পার হয়ে গুজরাটে গিয়ে পৌছালেন।

গুজরাট থেকে মথুরা বৃন্দাবন এবং অন্যান্য নানাস্থানের দেব দেবী দর্শনান্তে তাঁরা উপনীত হলেন দিল্লীতে। দিল্লীতে সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে ফরমান লাভ করে ভবানন্দ নিজের দেশের দিকে যাত্রা করেন। পথে ত্রিবেণীতে স্নানের উদ্দেশ্যে প্রয়াগে এসে উপস্থিত হলেন। ত্রিবেণীতে সরস্বতী, যমুনা এবং গঙ্গা একত্রে মিলিত হয়েছে। প্রয়াগ থেকে ভবানন্দ রামচন্দ্রের স্মৃতি বিজড়িত অযোধ্যা নগরীর উদ্দেশে যাত্রা করেন। অযোধ্যায় সরযূ নদীর জলে তিনি স্নান করলেন এবং এখানকার অধিবাসীদের সঙ্গে সমগ্র অযোধ্যাপুরী দর্শন করলেন। তারপর অযোধ্যা থেকে ভবানন্দ অন্নপূর্ণা দর্শনের অভিপ্রায়ে কাশীর পথ ধরলেন। বারাণসী ধামে উপনীত হয়ে তিনি মনিকর্ণিকার জলে স্নান করে বিশ্বেশ্বর মূর্তি দর্শন করেন। ভবানন্দ কাশীতে দীর্ঘ এক মাসকাল অবস্থান করেন। অবস্থানকালে তিনি কাশী ভ্রমণ করেন। কাশীতে তিনি দেবী অন্নপূর্ণার প্রতিমা দর্শন করেন এবং তাঁর পূজা দেন। অনন্তর কাশী থেকে যাত্রা করে ভবানন্দ পঞ্চকূট বনপথ অবলম্বন করে অগ্রসর হয়ে নাগপুর, কর্নগড় পশ্চাতে ফেলে ক্রমে বৈদ্যনাথে এসে উপস্থিত হলেন। বৈদ্যনাথ ধামে বৈদ্যনাথ দর্শন করে ভবানন্দ ক্রমে রাঢ়ে এসে উপস্থিত হলেন।

'দেশ বিদেশ বর্ণন'প্রসঙ্গে কবি কয়েকটি স্থানের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ দু'একটি বিষয়েরও উল্লেখ করেছেন। কবির বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, নীলাচলে জগন্নাথের প্রসাদীভাত সকল প্রকার আচার-বিচারের অতীত। দিল্লীর পাতশার প্রতি অসন্তুষ্ট দেবী অন্নপূর্ণার কটাক্ষে সমগ্র দিল্লী থেকে সর্বপ্রকার অন্নজাতীয় দ্রব্যাদির অন্তর্হিত হওয়ার কথাও বণিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে কবি কর্তৃক দিল্লীতে প্রচলিত বিবিধ শস্যাদির উল্লেখ বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়। এসবের মধ্যে আছে ধান, চাল, মাষ, মুগ, ছোলা, অড়হর, মসুর, বরবটি, বাটুলা মটর, মাড়ুয়া, দেধান, কোদা, চিনা, ভুরা, যব, জনার, গম ইত্যাদি।

কবি প্রদত্ত বিবরণ থেকেই সহজে অনুমিত হয় যে অধিকাংশ বিবরণ তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাজাত নয়; কাল্পনিক, অনুমান ভিত্তিক অথবা অন্যের মুখে শোনা অভিজ্ঞতার ওপর নির্ভরশীল।

চতুর্থ অধ্যায়
তীর্থমঙ্গল

ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষালের পিতা এবং কন্দর্প ঘোষালের পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল আনুমানিক ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে বহুসংখ্যক লোকজন সমভিব্যাহারে গঙ্গাপথে তীর্থযাত্রা করেন। ইছামতী নদীতীরবর্তী প্রসিদ্ধ নোনাগঞ্জের নিকটস্থ ভাজনঘাট নিবাসী বিজয়রাম সেন বিশারদ ঘোষাল মহাশয়ের সহযাত্রী হয়েছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধক্রমে তীর্থযাত্রার বিবরণ অবলম্বনে বিজয়রাম রচনা করেন 'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থটি। রচনাকার্য সম্পূর্ণ হয়—১১৭৭ সালের ভাদ্রমাসে (১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে) এবং ঘোষাল মহাশয়ের আসরে সর্বজন সমক্ষে গ্রন্থটি পঠিত বা গীত হয়। অথাৎ তীর্থভ্রমণের প্রায় আট বৎসর পরে ভ্রমণ বৃত্তান্তটি লিপিবদ্ধ হয়।

'তীর্থমঙ্গল' গ্রন্থখানিকে কেবলমাত্র তথাকথিত তীর্থ পরিচয় জ্ঞাপক গ্রন্থ বলে গ্রহণ করলে চলবেনা। গ্রন্থখানি নানাবিধ কারণেই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীর বঙ্গেতর ভারতের এক বিস্তৃত অঞ্চলের প্রামাণিক চিত্রের প্রতিফলনে গ্রন্থটি বিশেষ মূল্যবান হয়ে উঠেছে। কবি বিজয়রাম তাঁর তীর্থযাত্রায় একমাত্র সহায় কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের গুণকীর্তন প্রসঙ্গে তীর্থ মাহাত্ম্য কীর্তন এবং যাত্রাকালে পথে যা ঘটেছিল, তৎসমুদয় বিবরণী বিস্তৃত ভাবে প্রকাশ করেছেন।

কবি বিজয়রাম এবং তাঁর আশ্রয়দাতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যে সময়ে আবির্ভূত হন, রাজনৈতিক দিক দিয়ে সে সময়টি বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ। ১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলা—বিহার—উড়িষ্যার—দেওয়ানী লাভ করেন এবং পলাশী যুদ্ধ বিজেতা লর্ড ক্লাইভ কোম্পানীর পক্ষে বাংলা বিহার উড়িষ্যার গভর্নর পদে বৃত হন। এই সময়ে সুদূর এলাহাবাদ পর্যন্ত ধীরে ধীরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী তথা ইংরেজদের আধিপত্য প্রসারিত হচ্ছিল। সুতরাং এই সময়ে দেশের অভ্যন্তরীণ গতিবিধি ও দেশের অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখা রাজনৈতিক প্রয়োজনেই ইংরাজ রাজপুরুষদের পক্ষে হয়ে পড়েছিল অপরিহার্য। অতঃপর লর্ড ক্লাইভ ১৭৬৭ খ্রীষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে বিলাত যাত্রা করেন। তখন তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন হারি ভেরেলস্ট।

কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের অনুজ গোকুলচন্দ্র তৎকালে ইংরাজ সরকারের দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। বাংলা বিহার উড়িষ্যার লাটসাহেব এসব প্রদেশের সংবাদাদির জন্য বিশেষ ভাবে দেওয়ান গোকুলচন্দ্রের ওপর নির্ভর করতেন। সুতরাং স্বাভাবিক কারণেই দেওয়ান গোকুলচন্দ্রকে উক্ত প্রদেশ সমূহের অভ্যন্তরীণ সংবাদ সমূহ সংগ্রহ করতে হ'ত। কবি বিজয়রামের বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, স্বপ্নে আদেশপ্রাপ্ত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র তীর্থযাত্রা করেন। কিন্তু কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রার সঙ্কল্প অবগত হয়ে অনুজ গোকুলচন্দ্রের উক্তি—

এক কাজে তিন কাজ— করহ নৌকার সাজ
পূজ গিয়া কাশীর ঠাকুর॥ ১২

—বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। এই উক্তি থেকেই অনুমিত হয় যে কৃষ্ণচন্দ্রের তীর্থযাত্রা তাঁর ধর্মজীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য হলেও একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলা বিহার উড়িষ্যা তথা সমগ্র ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সংবাদ সংগ্রহও তাঁর তীর্থ ভ্রমণের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল। এই কারণেই বিহার কাশী ইত্যাদি স্থানে গিয়ে ঐসব স্থানের প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিদের সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্র সাক্ষাৎ করেছিলেন। রাজমহলের ফৌজদার, সূর্যগড়ার শঙ্কর মজুমদার, বাড়ের রামানন্দ সরকার, পাটনার ভায়া বিষ্ণু সিংহ রায়, রাজা সেতাব রায় এবং দেওয়ান শান্তিরাম সিংহ, টিকারীতে দেওয়ান মাধবরাম, প্রয়াগের দুলাল চাটুর্য্যা, কাশীর আড় পারে রামনগরে অবস্থিত কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহ প্রমুখাদির সঙ্গে কৃষ্ণচন্দ্রের সাক্ষাৎকার এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের পুত্র মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল বিরচিত অপর গ্রন্থ 'কাশী খণ্ডে'র অন্তর্গত 'কাশী পরিক্রমা' অংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের কাশীর বিস্তৃত বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। কিন্তু সমগ্র বাংলা সাহিত্যে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কৃষ্ণদাস কবিরাজ বিরচিত 'চৈতন্য চরিতামৃত' কে বাদ দিলে এই সময় থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত একমাত্র বিজয়রাম সেন বিরচিত 'তীর্থমঙ্গলে'ই যে ভারতবর্ষের এক বিস্তৃত অঞ্চলের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে তা অস্বীকার করা চলে না।

জলঙ্গী থেকে সকলে এসে উপস্থিত হলেন রাজমহলে। রাজমহল সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটি ইতিহাস প্রসিদ্ধ নগরী। এ'টি গঙ্গার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। রাজমহলে শত শত উচ্চ অট্টালিকা সকল বর্তমান। পাঁচক্রোশ

পরিমিত নগরীটিতে গৃহসকল ঘন সন্নিবিষ্ট। বহু সংখ্যক মুদিখানা এবং স্থানে স্থানে হাটবাজার ও ঘড়িখানাও বর্তমান। রাজমহলে সর্বদা নহবৎ বাজার কথা উল্লিখিত হয়েছে। দু'দিন মাত্র রাজমহলে অতিবাহিত করে সকলে পুনরায় রওনা হয়ে গেলেন। দূরবর্তী মেঘাকৃতির পর্বত সকল সকলের দৃষ্টিগোচর হ'তে লাগল। এইসব পর্বতের ওপর ভীষণাকৃতির চোহাড় গণের বসতি।[১] চোহাড় গণের গলায় হাঁসুলী, কাণে কুণ্ডল, হাতে নড়ী বা লাঠি। এক হাতে তাদের বালা, পায়ে তাদের মল। চোহাড়েরা কৃষ্ণচন্দ্রকে একটি করে টাকা এবং কদলী উপঢৌকন দিল। ক্রমে সকলে এসে উপস্থিত হলেন সকরী গলিতে।[২] একদিকে পর্বত এবং অপরদিকে গঙ্গা। মাঝখান দিয়ে অগ্রসর হয়ে সকলে সকরী গলিতে এসে পৌছালেন। সেদিন সকলে সকরী গলিতে অতিবাহিত করেন। পরদিন প্রভাতে পুনরায় যাত্রা করে বামে গঙ্গা প্রসাদ তৈল্যাগাড়ি[৩] রেখে সন্ধ্যার সময় এসে পৌছালেন জাহ্নবীর তীরে। পুনরায় এখান থেকে রওনা হয়ে লক্ষীপুর এবং শ্রামপুর বামে রেখে নৌকাযোগে বটেশ্বর[৪] পর্বতাভিমুখে অগ্রসর হতে থাকেন। বটেশ্বরে পর্বতোপরে ছিলেন মহাবটেশ্বর নামে এক দেব বিগ্রহ। এতদ্ব্যতীত আরও বহু সংখ্যক দেববিগ্রহ অধিষ্ঠিত ছিলেন। সহযাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বটেশ্বর উপস্থিত হয়ে ভৈরবনাথ, ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি বিগ্রহের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করলেন। এরপর পাথরঘাটা ফেলে সকলে এসে উপস্থিত হলেন আড়পারে। পরদিন প্রভাতে পুনরায় যাত্রা করে কাহলগ্রামস্থিত[৫] রাজার বাড়ি অতিক্রম করে খাগড়ার কাছে এসে পৌছালেন। পরদিন আবার সকলে ডহরগড়, ধীরনগর ইত্যাদি দক্ষিণে রেখে বরাবর অগ্রসর হয়ে ভাগলপুর সুজাগঞ্জ বামে রেখে শিবগঞ্জে এসে উপনীত হলেন। এরপর গোপালপুরের ভাটো ফেলে তাঁরা গিয়ে হাজির হলেন জাঙ্গিয়ায়।[৬] জাঙ্গিয়ার বাম পাশে একটি সুদৃশ্য পর্বত বিত্তমান। পর্বতের উপরে খোয়াজ বচকরণী পীর আসীন। জাঙ্গিয়ার দক্ষিণ পাশে জলমধ্যে এক পর্বত বিত্তমান। পর্বতগাত্রে রাক্ষস বানর ইত্যাদির চিত্র খোদিত রয়েছে। পর্বতের উপরে গৌরীশঙ্কর বিগ্রহ বর্তমান। কৃষ্ণচন্দ্র পর্বত উপরে গিয়ে হর গৌরীর পূজা দিলেন। এরপর বামে জাঙ্গিয়া এবং ঘোড়ঘাট, দক্ষিণে কাশী পাড়ার হাট ফেলে কোদালিঘাটা, সাহোঁধন পীরের মোকাম, পর্বত উপরে পীর যবনের উঠানি, তার পশ্চিম ভাগে সীতাকুণ্ড

রেখে অগ্রসর হতে থাকলেন। সীতাকুণ্ডে রয়েছে উষ্ণ প্রস্রবণ, হিন্দুরা এখানে পিণ্ডদান করে থাকে। অতঃপর সকলে উপনীত হলেন মুঙ্গেরে। মুঙ্গেরের কেল্লা প্রসিদ্ধ। এ'টি প্রস্তর নির্মিত। কেল্লাটির ভেতরে বহুসংখ্যক মসজিদ, একশত জমাদার এবং শত শত সিপাইয়ের অবস্থান। এখানে অঙ্গাধিপ দাতা কর্ণের স্মৃতি বিজড়িত স্থান বিদ্যমান রয়েছে। কথিত আছে এখানে কর্ণ প্রত্যহ সওয়া মন পরিমান স্বর্ণ বিতরণ করতেন। মুঙ্গেরে বহু হাটবাজার। এখান থেকে চোকিঘাটা এবং স্থর্যনালা অতিক্রম করে সকলে এসে উপস্থিত হলেন স্থর্যগড়াতে।[৭] এখানে শঙ্কর মজুমদারের গৃহে একদিন অতিবাহিত করে তার পর যাত্রা করে বাড়েতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।[৮] বাড়ের পশ্চিমে গিয়ে রামানন্দ সরকার কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। এরপর দেবীপুর হয়ে সকলে উপস্থিত হলেন বৈকুণ্ঠপুরে।[৯] এখানে গৌরীশঙ্কর নামে প্রসিদ্ধ দেবতার পীঠস্থান। কৃষ্ণচন্দ্র গৌরীশঙ্করের পূজা দিলেন। তার পর যাত্রা করে গেলেন ফতুয়া সহরে[১০]। এখানে পুনঃ পুনা নদী তীর্থস্থান হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে সকলে শ্রাদ্ধাদি করে থাকেন।

বামে রাজা রামনারায়ণ এবং জাফর খাঁর উদ্যান, লালগোলা, রেকাবগঞ্জ, মারুগঞ্জ, আদামোট ইত্যাদি অতিক্রম করে শেষে ফরাসের কুঠীঘাটে এসে উত্তরণ করলেন। পাটনায় উপস্থিত হয়ে কৃষ্ণচন্দ্র বিষ্ণুসিংহের কাছে সংবাদ পাঠালেন। বিষ্ণুসিংহ নানাবিধ ভেট প্রেরণ করলেন। তাঁরই প্রাসাদে সকলের থাকার ব্যবস্থা হ'ল। চারশ যাত্রীর সকলেই বিষ্ণুসিংহের প্রাসাদে রইলেন।

পাটনা সহরটি চারক্রোশ ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। সমস্ত সহর জুড়ে অসংখ্য হাট-বাজার। গঙ্গার ধারে অসংখ্য গৃহাদি বিদ্যমান। বহু গৃহের ওপর নিশান উড়ছিল। এখানকার সব ভাল, কিন্তু অপরিচ্ছন্ন সঙ্কীর্ণ গলিগুলি পাটনার কলঙ্ক স্বরূপ। সে সময়ে পাটনার সুবেদার ছিলেন রাজা সিতাব রায়। কৃষ্ণচন্দ্র সিতাব রায়ের কাছে ঘড়ি ইত্যাদি ভেট প্রেরণ করলেন। ভেট দেখে সিতাব রায় ত মহাখুশী। একদিন কৃষ্ণচন্দ্র স্বয়ং উপযুক্ত সাজে সজ্জিত হয়ে পালকীতে চড়ে সুবেদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন। সিতাব রায় কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গে আলাপ করে খুবই সন্তুষ্ট হলেন। ঘোড়া, শাল ইত্যাদি তিনি কৃষ্ণচন্দ্রকে উপঢৌকন দিলেন। কয়েকদিন পাটনায় অতিবাহিত করার পর অতঃপর সকলে পাটনা থেকে এসে উপস্থিত হলেন ফতুয়ায়। পাটনার প্রধান

কুঠীয়াল মনসারামও কৃষ্ণচন্দ্রের সঙ্গী হলেন। এখানে পুনঃ পুনা এবং গঙ্গার সঙ্গমস্থলে সকলে স্নান তর্পণাদি সম্পন্ন করলেন। তারপর এখান থেকে যাত্রা করে সকলে গিয়ে পৌছালেন পরস্থরায়। এখান থেকে হিলসা সহর[১১] অতিক্রম করে পৌছালেন ইছলামপুরে।[১২] ইছলামপুর সহরটি খুবই মনোরম। সহরের চারদিকে সারি সারি সড়ক বর্তমান। নদীর অনুপস্থিতির ফলে এখানকার অধিবাসীরা সকলে ইদারার জল পান করে। পাটনা থেকে সকলে এসে উপস্থিত হলেন গয়ায়। পথিমধ্যে ছাব্বিশটি স্থানে কড়ি দিতে হ'ল। এই সকল টাকা পেতেন মাধবরাম। গয়ার রাজা রামনারায়ণের একটি বড় অতিথিশালা ছিল। এখানেই কৃষ্ণচন্দ্র এসে উঠলেন।

গয়ার বসতি পঞ্চক্রোশ স্থান ব্যাপী পরিব্যাপ্ত। গয়ার একদিকে ফল্গুনদী এবং অপর তিনদিক অত্যুচ্চ পর্বত বেষ্টিত। দূরস্থিত পর্বতগুলিকে নিকটবর্তী বলে মনে হয়। এখানকার রমণীরা পরমাসুন্দরী।

কৃষ্ণচন্দ্র ফল্গুতীরে গিয়ে শ্রাদ্ধাদি করলেন। ফল্গুতীর সদা সর্বদা গদাধরের জয়ধ্বনিতে মুখরিত। ফল্গু-শ্রাদ্ধের পর কৃষ্ণচন্দ্র রামশিলা, কাকবলি, রামপদ ইত্যাদি স্থানেও পিণ্ডদান করেন। রামশিলা আকাশ প্রমাণ উঁচু। রামশিলার ওপরে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি বিদ্যমান। রামশিলার পর সকলে রামহ্রদে পিণ্ডদান করে কাকবলিতে[১৩] পিণ্ড দিলেন। এরপর কৃষ্ণচন্দ্র গেলেন প্রেতশিলায়। গয়া থেকে এই স্থানের দূরত্ব তিন ক্রোশ। প্রেতশিলাও সুউচ্চ। এছাড়া সকলে পঞ্চতীর্থেও পিণ্ডদান করলেন। এই পঞ্চতীর্থের অন্তর্ভুক্ত হ'ল উত্তর মানস, উদীচী, কনখল, দক্ষিণ মানসতীর্থ এবং জীবলোল। এরপর সকলে গিয়ে উপস্থিত হলেন ধর্মারণ্যে। তারপর গেলেন বোধগয়া। ব্রহ্মসরে সকলে স্নান ও তর্পণ সমাধা করলেন। কাকবলিতেও সকলে পিণ্ডদান করলেন। তারপর সরাকরা ভাঙ্গলেন। বিষ্ণুরুদ্র ব্যতীত ছ'দিনে সকলে ষোল বেদীতেও পিণ্ডদান করেন। তাছাড়া সকলে গয়েশ্বরীও দর্শন করলেন। ষোল বেদীর অন্তর্ভুক্ত হ'ল ব্রহ্মপদ, কার্তিকপদ, সত্যপদ, দক্ষিণাগ্নিপদ, আহবনীয় পদ, চন্দ্রপদ, দধীচি পদ, গণেশ পদ, সূর্যপদ, মাতঙ্গপদ, করণ পদ, ক্রৌঞ্চপদ, পঞ্চগণেশ, কাশ্যপদ, গার্হপত্য পদ এবং অগস্ত্য। এসব ছাড়াও সকলে রামগয়া, সীতা কুণ্ড, গয়াকূপ, মুণ্ডপিঠ, আদিগয়া, ধৌতপদ, ভীমগয়া ইত্যাদি অষ্টতীর্থেও পিণ্ডদান করেন। সীতাকুণ্ডে বালির পিণ্ডদানের

রীতি প্রচলিত। অক্ষয়বটে সকলে দানসাগর করে পিণ্ডদান করেন। তাছাড়া এখানে সকলে বিশেষ বিশেষ ফলত্যাগে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হলেন। বিষ্ণু পদে পুনর্গয়া করে গদাধর এবং গয়েশ্বরীর পূজা সম্পন্ন করে, বিষ্ণুপদ দর্শনান্তে বিষ্ণুপদের ওপর কৃষ্ণচন্দ্র আটতোলা পরিমিত সোনা দান করলেন। তারপর গদাধর দর্শন করে এবং অন্যান্য প্রস্তর নির্মিত দেব বিগ্রহ সকলের উদ্দেশে প্রণাম নিবেদন করে সকলে গয়া থেকে টিকারী নামক সহর সম্মুখে রেখে অগ্রসর হতে থাকেন। টিকারীতে মহারাজ সুন্দর সার আবাস[১৪] গৃহ কেল্লা ইত্যাদি এক ক্রোশ পরিমিত স্থানে বিস্তৃত। টিকারীতে কৃষ্ণচন্দ্রের উপস্থিতির সংবাদে দেওয়ান মাধবরাম স্বয়ং তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এই মাধবরাম ছিলেন দক্ষিণদেশের অধিবাসী। এর গৃহে সকলে অবস্থান করেন। তারপর মাধবরাম কৃষ্ণচন্দ্রকে কোচগ্রামের পূর্বমাঠ পর্যন্ত পৌছিয়ে দিয়ে গেলেন। কোচগ্রামে বৃষ্টিপাত অত্যন্ত বিরল। এখানকার অধিবাসীরা ইদারার জল পান করে কোনক্রমে জীবন রক্ষা করে থাকে। কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁর সহযাত্রীরা আদিগঙ্গা পুনঃ পুনার[১৫] জল স্পর্শ করে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন। ক্রমে তাড়াড়া নামক সহর, শোন নদী অতিক্রম করে গিয়ে পৌছালেন সরসরা[১৬] নামক সহরে। সরসরা সহরটি বেশ বড়, কিন্তু বহু দীর্ঘাকৃতির গলি বিদ্যমান। শোন নদীর ওপর রোটাসগড় নামক পর্বত বর্তমান। এই পর্বতের ওপর হরিশচন্দ্রের বাটী[১৭] ছিল। সকলে সম্রাট ঔরঙ্গজেবের কবর[১৮] দেখে খরুমাবাজ দক্ষিণে রেখে জাহানাবাজে[১৯] গিয়ে উপনীত হলেন। এখান থেকে ঘোড়া এবং ডুলী নিয়ে ফাকড়াবাজের মধ্য দিয়ে বামে রামকড়ি ফেলে মোহনিয়া সরাইয়ের সন্নিহিত বাগানে রাত্রি যাপন করেন। তারপর লোকের কাঁধে চড়ে কর্মনাশা নদী অতিক্রম করলেন।[২০] তারপর বদরবাজ, জগদীশ সরাই, মঙ্গল সরাই,[২১] অতিক্রম করে অগ্রসর হতে লাগলেন। পথে বেণীমাধবের ধ্বজা দৃষ্ট হতে লাগল। অতঃপর নৌকাযোগে সকলে গঙ্গাপার হলেন। পৌছালেন কাশীতে।

কাশীর উত্তর ভাগে বরুণা নদী এবং দক্ষিণে অসি নদী বহমানা। বরুণাতে সকলে স্নানাদি সেরে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে উপস্থিত হলেন বাঙালী টোলায়। মণিকর্ণিকা, পঞ্চতীর্থ[২২] ইত্যাদি স্থানে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করলেন। এরপর রামনাথ শীল নামীয় একজনের কাছে সব দ্রব্য সামগ্রী গচ্ছিত

রেখে রামদেব মুকটি ও রামহরি সরকারকে কাশীতে শিবস্থাপনের জন্য রেখে সকলে প্রয়াগ অভিমুখে যাত্রা করলেন। মৃজামুরাদ অতিক্রম করে মহারাজ গঞ্জে[২৩] স্নানাদি সেরে মাধব সরাই হয়ে গোপীগঞ্জে[২৪] পৌছালেন। এরপর জগদীশ সরাই বামে রেখে দু' ক্রোশ বিস্তৃত পলাশ বনের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে সকলে উপস্থিত হলেন প্রয়াগের পূর্ব পারস্থিত ঝুচি [২৫] নামক গ্রামে। গঙ্গাতীরস্থিত এক বালাখানায়[২৬] স্নান, পূজা সমাপনান্তে সকলে শিবদর্শন করতে গেলেন। গৌতম আশ্রমে অবস্থিত শিব বিগ্রহ দর্শন করে যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞকুণ্ডেও গিয়ে উপস্থিত হলেন। পরে সকলে গিয়ে হাজির হলেন বেণীমাধবের দরবারে।

প্রয়াগ থেকে বরাবর যাত্রা করে কৃষ্ণচন্দ্র বেচারাম ঠাকুর নামে পরিচিত প্রয়াগের এক ব্রাহ্মণের বাগানে আশ্রয় নিলেন। বেণীমাধব দর্শন, গঙ্গাতীরে দানোৎসর্গ, পিণ্ডদান, মস্তকমুণ্ডন ইত্যাদি সেরে সকলে কেল্লাতে গিয়ে হাজির হলেন।

প্রয়াগস্থিত কেল্লাটি অপূর্ব নির্মিত। কেল্লার ভেতরে রয়েছে অক্ষয়বট, দেখে সকলে গেলেন পাতালভুবনে। পাতালভুবনের স্থানে স্থানে অনেক লিঙ্গমূর্তি বিদ্যমান। গয়াস্থিত ষোলবেদীর ন্যায় আকৃতি সম্বলিত বহু দেব মূর্তি পাতাল ভুবনের স্থানে স্থানে বিদ্যমান। সকলে মিলে দশাশ্বমেধে স্নান তর্পণাদি সেরে ভরদ্বাজ আশ্রমে গেলেন। এখানে ভরদ্বাজ ঋষির মূর্তি ব্যতীতও অপরাপর বহু মূর্তি বিদ্যমান। আশে পাশে বহু শিবলিঙ্গও বর্তমান। সবকিছু দর্শন করে সকলে পৌছালেন গোদাবরী নদীর তীরে।[২৭] এইস্থানে স্নান সেরে গেলেন সরস্বতীর তীরে। পঞ্চতীর্থ এবং ব্রাহ্মণ ভোজনাদি সম্পন্ন করে কৃষ্ণচন্দ্র পুনরায় কাশীর উদ্দেশে রওনা হলেন।

প্রয়াগ থেকে যাত্রা করে দক্ষিণে বামে বহুগ্রাম ফেলে অবশেষে সকলে বিন্ধ্যবাসিনীতে এসে উপস্থিত হলেন। বিন্ধ্য পর্বতের অবস্থান হেতু স্থানটি বিন্ধ্যবাসিনী নামে পরিচিত। বিন্ধ্য পর্বত গুহায় বিন্ধ্যবাসিনী দেবী অবস্থিত। বিন্ধ্যবাসিনীর পূজা সেরে সকলে মৃজাপুরে[২৮] এসে উপস্থিত হলেন। গঙ্গার তীরে অবস্থিত মৃজাপুর বেশ বড় সহর এবং এখানে সব কিছু সামগ্রী খুব সুলভ। এখান থেকে কৃষ্ণচন্দ্র দুলিচা, গালিচা, সতরঞ্চি ইত্যাদি ক্রয় করলেন।[২৯] অনেকে শিল, জাঁতা ইত্যাদিও ক্রয় করল এখান থেকে অগ্রসর হয়ে

বহু গ্রাম পেরিয়ে চণ্ডাল হাড়[৩০] নামক সহর ছাড়িয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন।

চণ্ডাল গড়ে গঙ্গাতীরস্থিত দুর্গটি (চুনার দুর্গ) অতীব সুন্দর। অবশেষে রাত্রি প্রায় দশ দণ্ডের সময় সকলে কাশীতে গিয়ে পৌছালেন। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র কন্দর্প ঘোষালের নামে কন্দর্পেশ্বর শিব প্রতিষ্ঠা করলেন। শিব প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে কৃষ্ণচন্দ্র কাশীস্থিত ফকির, বৈষ্ণব, বিধবা, কাঙ্গালী, গঙ্গাপুত্র প্রভৃতিদের ভোজন করালেন। কৃষ্ণচন্দ্র কাশীনাথ, অন্নপূর্ণা এবং কালভৈরবের বেশ কয়েকবার করে পূজা করলেন তাছাড়া কেদারেশ্বর বিশ্বেশ্বর এবং ভাণ্ডেশ্বর প্রমুখ দেবগণেরও অর্চনা করলেন। দুর্গাকুণ্ড ইত্যাদি কাশীস্থিত সব কুণ্ডে অনেকে স্নান করলেন।

কাশী নগরটি প্রস্তর নির্মিত। এখানে বৃহদাকৃতির বালাখানা সব বিদ্যমান। স্থানাভাববশত এখানকার অধিবাসীরা নূতন গৃহাদি নির্মাণের পরিবর্তে প্রাচীন গৃহকেই উর্ধ্বে বর্ধিত করে তাতে বাস করে। প্রায় দশ সহস্র মহারাষ্ট্রীয় গঙ্গাপুত্রের বাস এখানে। কাশীর রমণীদের রূপ লাবণ্য অতুলনীয়। এখানকার ব্রাহ্মণেরা বেদান্ত শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তির অধিকারী। এঁদের কপালে চন্দন এবং রুলীর দাগ। কাশীতে সহস্র দণ্ডীর বাস। এদের কৃষ্ণচন্দ্র ভোজনে আপ্যায়িত করলেন এবং প্রত্যেককে একটি করে খারুয়াবস্ত্র দান করেন। কাশীতে গঙ্গার ধারে মাধবের ধ্বজা বর্তমান ধ্বজা উচ্চে প্রায় দুই শত হাত।[৩১] ধ্বজায় আরোহণ করলে কাশীস্থিত সকল তীর্থস্থানই দৃষ্টিগোচর হয়। কৃষ্ণচন্দ্র এই ধ্বজায় আরোহণ করেন। এইবার স্বদেশাভিমুখে রওনা হবার পালা।

নৌকায় যাত্রারম্ভ করে পথিমধ্যে কাশীর রাজা বলবন্ত সিংহের শ্রীরামনগরস্থিত বাটীটি দর্শন করলেন এবং নিকটস্থ ঘাটে নেমে বলবন্ত সিংহের গৃহে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। রামনগর থেকে যাত্রা করে জুড়া গ্রাম অতিক্রম করে সকলে গাজীপুরে পৌছালেন। গাজীপুর সহরটি তিনক্রোশ বিস্তৃত এবং সহরটিতে বহু লোকের বাস। এখানে সকলে বাদশাহ নির্মিত বাটীটি দেখলেন। তারপর এখান থেকে যাত্রা করে পৌছালেন মুরদপুরে। এখান থেকে যাত্রা করে দক্ষিণে গোমপুর এবং বামে কর্মনাশা নদী অতিক্রম করে অগ্রসর হতে লাগলেন। কর্মনাশায় শ্রীরামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত লিঙ্গদেব রামেশ্বর বিদ্যমান। কৃষ্ণচন্দ্র রামেশ্বরের পূজার্চনা করলেন। এরপর বামে উজিরা

এবং দক্ষিণে দুর্গানদী ফেলে ভোজপুরের[৩২] অন্তর্গত অর্জুনপুর নামক স্থান ফেলে ক্রমে ক্রমে মাজীঘাট, ঝিগড়া, শোননদী এবং দেবীগঙ্গাকে রেখে সেরপুর হয়ে দানাপুরে পৌঁছালেন এখানকার ইংরাজ নির্মিত কেল্লাটি দেখে সকলেই প্রশংসা করলেন। দানাপুর থেকে যাত্রা করে সকলে পৌঁছালেন পাটনার ঘাটে। এখানে কৃষ্ণচন্দ্র অধিকাংশ সহযাত্রীকে দেশে প্রত্যাবর্তনের নির্দেশ দিয়ে স্বয়ং কয়েকজনকে নিয়ে বিষ্ণুসিংহের গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। একমাস কাল কৃষ্ণচন্দ্র এখানে অতিবাহিত করলেন এবং নিজের প্রয়োজনীয় কার্যাবলী সমাধা করলেন। দ্বিজ বিশ্বনাথকে গয়ায় ফৌজদার এবং নন্দলালকে বিশ্বনাথের পেশকার নিযুক্ত করলেন। রামকৃষ্ণ কেরাণী নামক একজনের গৃহেও কৃষ্ণচন্দ্র দিন তিনেক অতিবাহিত করেন। অবশেষে পাটনা থেকে যাত্রা করে ফতুয়া সহর, চোকীঘাটার ঘাট, দরাপুর, সূর্যগড়া হয়ে মুঙ্গেরে পৌঁছালেন। এখানে তিনি সীতাকুণ্ড দর্শন করলেন এবং পিণ্ডদান করলেন। সীতাকুণ্ডের জল খুব গরম। অত্যধিক উষ্ণতার জন্য কুণ্ডের জল স্পর্শের অতীত। মুঙ্গের থেকে যাত্রা করে বামে জাঙ্গিয়া ফেলে বরাবর সুলতানগঞ্জে[৩৩] এসে উপস্থিত হলেন। এখানকার তলোয়ার, ছুরি ইত্যাদি খুব প্রসিদ্ধ। সুলতানগঞ্জের বটেশ্বর নামক পর্বতে গৌরীশঙ্করের মন্দির বিদ্যমান। সকলে গৌরীশঙ্করের মন্দিরে গিয়ে বিগ্রহ দর্শন করলেন। তারপর রওনা হয়ে ভাগলপুরের খালে দক্ষিণে চম্পানগর রেখে ভাগলপুর অতিক্রম করে সুজাগঞ্জ, পাথরঘাটা, সাহাবাজ, পীরপৈঁতি[৩৪] তৈল্যগড়ি, সকরি গলি, রাজমহল অতিক্রম করে পৌঁছালেন মুর্শিদাবাদে।

কাশীখণ্ড

কন্দর্প ঘোষালের পৌত্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠপুত্র ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল ১১৫৯ বঙ্গাব্দে (ইং ১৭৫১) জন্মগ্রহণ করেন। জয়নারায়ণ মাত্র পনের বছর বয়সেই বাংলা, সংস্কৃত, হিন্দী, ফারসী এবং ইংরেজী ভাষায় বুৎপত্তি অর্জন করেন। জয়নারায়ণের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে তৎকালীন বাংলার গভর্ণর ওয়ারেন হেষ্টিংস তদানীন্তন দিল্লীর বাদশাহ মহম্মদ জাহান্দার

শার কাছ থেকে এক সনন্দ আনিয়ে দেন। এই সনন্দে দিল্লীর বাদশাহ জয়নারায়ণকে 'মহারাজ বাহাদুর' উপাধিতে ভূষিত করেন এবং তিন হাজারী মনসবদার পদে নিযুক্ত করেন। ১২০০ বঙ্গাব্দে জয়নারায়ণ কাশীতে 'করুণা-নিধান' নামে এক রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। বালকদের শিক্ষার জন্য একটি বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করেন। কাশীতে দীর্ঘকাল বসবাসের পর ১২২৮ বঙ্গাব্দে ৬৯ বছর বয়সে মণিকর্ণিকা তীর্থে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। কাশীতে অবস্থানকালে জয়নারায়ণ কাশীর অবস্থা যেমন অবলোকন করেছিলেন, তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কাশীখণ্ডে'র উপসংহারে কয়েক অধ্যায়ে 'কাশী পরিক্রমা' নামক অংশে তা লিপিবদ্ধ করেছেন। জয়নারায়ণ যে সব বিষয় লিপিবদ্ধ করে গেছেন, তার মধ্যে আছে কাশীস্থিত ঘাটগুলির বর্ণনা, কাশীর 'ঘাটিয়া' ব্রাহ্মণগণের বিবরণ, এখানকার দেবমন্দির, কাশী-বাসিনী ধর্মপ্রাণা রমণী, এখানকার ধর্মব্রতাদির অনুষ্ঠান, কাশীর দ্রষ্টব্যস্থল সমূহ, এখানকার শিল্পীদের রচিত শিল্পদ্রব্যাদি, সাধারণের ব্যবহার্য দ্রব্যাদির বিবরণ, সাম্বৎসরিক উৎসবানুষ্ঠান, এখানকার ব্রাহ্মণদের বেদাধ্যয়ন ইত্যাদি। বাস্তবিক কাশী পরিক্রমার লিপিকাল অনুযায়ী উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কাশীর এক পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণিক চিত্র গ্রন্থটি থেকে লাভ করা যায়। তবে এই প্রসঙ্গে স্মরণ রাখতে হবে যে, লিপিকালের (১৮০৯) অন্ততঃপক্ষে ১২।১৩ বছর আগেই গ্রন্থটি রচিত হয়ে থাকবে।

কাশীতে গঙ্গা অর্ধচন্দ্রাকৃতিতে প্রবাহিত। অসি সঙ্গম থেকে বরুণা সঙ্গম পর্যন্ত কাশীতে অসংখ্য ঘাট বিদ্যমান। তন্মধ্যে জয়নারায়ণ কতকগুলির উল্লেখ করেছেন। যেমন—অসি ঘাট, ভদনী ঘাট, পরেশনাথ ঘাট, সাজাদা ঘাট, বৈদ্যনাথ ঘাট, নির্জ্জলী ঘাট, হিন্দু ঘাট, দন্তী ঘাট, হনুমান ঘাট, শ্মশান ঘাট[৩৫], লালী ঘাট, কেদার হাড়ার ঘাট, কোঙর স্বামীর ঘাট, ক্ষেমেশ্বর ঘাট, সদানন্দ ঘাট, চৌষট্টি যোগিনী ঘাট ইত্যাদি। সে সময়ে মোট ঘাটের সংখ্যা ছিল সত্তর। তারমধ্যে অসি, শ্মশান, মশান, যমেশ্বর ইত্যাদি আটটি মাত্র ঘাট ছিল কাঁচা। বাকি সত্তরটির মধ্যে যাটটি ঘাটই ছিল প্রস্তর নির্মিত।

চতুঃষষ্ঠী ঘাট থেকে গোঘাট পর্যন্ত পথে বহু দ্বিতল, ত্রিতল এমনকি চারতল বিশিষ্ট গৃহও পরিলক্ষিত হ'ত। কাশীর সব ক'টি ঘাটেই 'ঘাটিয়া'

ব্রাহ্মণদের বসতি ছিল। প্রতিটি ঘাটের ওপর বৃহদাকৃতির ছত্র লক্ষিত হ'ত। যে সব ব্যক্তি গঙ্গাস্নান করতে যেতেন, ঘাটিয়া ব্রাহ্মণেরা তাদের জিনিস পত্র রক্ষা করতেন এবং স্নানার্থীদের সঙ্কল্প পাঠ করাতেন। স্নানান্তে ঘাটিয়ারা যাত্রীদের গায়ে নানাবিধ ছাপ ও তিলক কেটে দিতেন। বিনিময়ে যাত্রীদের কাছ থেকে তাঁরা কড়ি, তাম্রমুদ্রা ইত্যাদি লাভ করতেন।

চৈত্র-বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে কাশী খুব উত্তপ্ত বলে জীব-জন্তুরা দগ্ধ হ'ত। এই সময়ে পুণ্যাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিরা নিজ নিজ অর্থব্যয়ে গঙ্গাতীরে ছত্রের ব্যবস্থা করে দিতেন। মীরঘাট থেকে ব্রহ্মার ঘাট পর্যন্ত ত্রিতল, চারতল এমনকি পাঁচতল বিশিষ্ট গৃহাদি পরিলক্ষিত হ'ত। গঙ্গাতীরে নানা জাতীয় মন্দির ছিল বিদ্যমান। এগুলির মধ্যে পঞ্চ গঙ্গা ঘাটের উপরিস্থিত 'শ্রীমাধব রায়ের ধরারা' নামে পরিচিত মন্দিরটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধরারার গগনচুম্বী শীর্ষদেশটি ছিল একশ পনের হাত সমান উচ্চতা বিশিষ্ট। নব্বই হাত পরিমাণ উচ্চতার পর ধরারায় বসার জায়গা ছিল। এখানে বসে সমগ্র কাশীর শোভা দৃষ্টিগোচর হ'ত। বহু দুঃখী ব্যক্তি এই ধরারা থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করত।

নিশাবসানে সাধুশ্রেণীর ব্যক্তিরা গাত্রোত্থান করে প্রাতঃ কৃত্যাদি সমাপন করে কেউ বা রাম নাম, কেউ আবার শিবের নাম, কেউ হরিনাম স্মরণ করতে করতে গঙ্গায় স্নানের উদ্দেশ্যে রওনা হতেন। সন্ধ্যাদি তর্পণ সমাপনান্তে বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা দর্শনান্তে কেউ নিত্যযাত্রা কেউ বা তিথিযাত্রা করতেন।

কাশীর শিল্পীরা কি কি শিল্প দ্রব্যাদি প্রস্তুত করতেন, জয়নারায়ণ তারও বিশদ বিবরণ দান করেছেন। জোলারা তৈরী করত কিমখাপ[৩৬], জামদানী[৩৭] শাড়ী[৩৮], একপাটা[৩৯], সাঙলা[৪০], গুদড়[৪১], ধনুকপাটা[৪২], কারচোব,[৪৩] ইত্যাদি। এছাড়া নানাবিধ শাড়ী, ধুতি, রেশমী পাড় যুক্ত বস্ত্র, রেশমী বাব[৪৪], রেশম কিনারী[৪৫], গোলবদন[৪৬], মস্রু[৪৭], নানা প্রকারের ফুলাম[৪৮], আমরু[৪৯], সতরঞ্চি, ছুলিচা[৫০], কম্বল, আসন ইত্যাদিও কাশীতে প্রস্তুত হ'ত। কাশীর অধিকাংশ মানুষই মাথায় পাগড়ী ব্যবহার করতেন। এখানকার পরিধেয় বস্ত্রাদির মধ্যে ছিল ধুতি, পায়জামা, আঙ্গা[৫১] ইত্যাদি। কদাচিৎ লোকে জামা পরতেন। কোমর বন্ধ প্রায় দৃষ্টিগোচর হ'তনা বললেই চলে। কাশীতে

দ্বিজ, ক্ষত্রিয়, রাজপুত, আহির ইত্যাদির মধ্যে বহু বীর পুরুষের সাক্ষাৎ পাওয়া যেত। এদের কোমরে কাটারী, ঢাল, তলোয়ার, কাছড়ি[৫২] কিংবা কোমর বন্ধ দেখা যেতনা। কাশীর সঙ্কীর্ণ গলি গুলিতে প্রায়ই হত্যাকাণ্ড অনুষ্ঠিত হ'ত।

কাশীর মহাজনদের মধ্যে কেউ দিতেন হুণ্ডী, কেউ ছিলেন জহুরী, কেউ আবার সোনা-রূপা বিক্রয় করতেন। কাশীতে সে সময়ে দর্শনার্থী সন্ন্যাসীদের শত শত মঠ দৃষ্ট হ'ত। এই দর্শনার্থী সন্ন্যাসীদের অনেকেই বাহ্যত উদাসীনের মত আচরণ করতেন, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এঁরা ছিলেন গৃহী। এঁদের প্রত্যেকেই সওদাগরী অথবা মহাজনী কারবার করতেন। এঁদের এক একজনের গৃহও ছিল সুবিশাল। নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হতেন এঁরা। কারো কণ্ঠে শোভা পেত শৃঙ্খল সহ স্বর্ণখচিত কদমফুল, কারও কানে থাকত মণিযুক্ত স্বর্ণ গুল্ফ,[৫৩] কারো গলায় শোভা পেত প্রবাল বা স্বর্ণ নির্মিত হার।

কাশীতে বহু দণ্ডীরও ছিল বসতি। দণ্ডীদের অনেকে স্বধর্ম-কর্ম পালন করতেন। দণ্ডীদের কারো কারো মঠে ছিলেন ঠাকুর, আবার কারো কারো মঠে ঠাকুরের পরিবর্তে ঠাকুরাণী লক্ষিত হ'ত। দণ্ডীদের গৃহ হ'ত খুব পরিপাটি। অবধূতদের দেহ ছিল বিভূতি ভূষিত। এরা ছিলেন দিগম্বর। শিরে শোভা পেত জটারাজি, পরণে কারো কোপীন, কারো আবার ব্যাঘ্রচর্ম, আবার কারো শৃঙ্গযুক্ত কৃষ্ণ অজিন। কেউ ঊর্ধ্ব একবাহু, কেউ আবার নিস্পৃহ পরমহংস দিগম্বর। মণিকর্ণিকার তীরে এরকম শত শত অবধূতের ছিল বসতি।

জয়নারায়ণ কাশীর দেবমন্দির গুলিরও পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা দান করেছেন। কাশীতে রাণী ভবানী নির্মিত চারি বাটী দেবালয়ের উল্লেখ দেখা যায়। উত্তর বাটীতে জয়দুর্গা, দক্ষিণ বাটীতে শ্যাম মূর্তি, মধ্যবাটীরপূর্বে বিশালাক্ষী, দক্ষিণে রাধাকৃষ্ণ মূর্তি সহ এক সখী। উত্তর দিকে বাল গোপালের মূর্তি, অধোস্থানে বিশাল তারামূর্তি বিরাজিত। নদীয়ার কারিগরগণের প্রস্তুত অপূর্ব পাষাণ নির্মিত শিবলিঙ্গও এখানে বিরাজমান। পথের ওপর দেখা যেত ঘড়িখানা[৫৪] এবং নহবৎখানা। ছত্রবাটীতে[৫৫] অনুষ্ঠিত হ'ত দুর্গোৎসব। কাশীর দুর্গামন্দির একশত একটি চূড়া সম্বলিত। তখনকার দিনে এই মন্দির নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল পঞ্চাশ হাজার মুদ্রা। রাণী অহল্যাবাই প্রতিষ্ঠিত বিশ্বেশ্বর বাটীটিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরটি সম্পূর্ণভাবে প্রস্তর নির্মিত।

দুই মঠ মধ্যে নাট মন্দির শোভিত। পশ্চিম মন্দিরে দণ্ডপাণীশ্বর মূর্তি বিরাজিত, পূর্বদিকে স্বয়ং লিঙ্গবর বর্তমান, নৈঋ‍ত কোণে লক্ষ্মী সহ শ্রীমাধব, বায়ু কোণে স্বর্ণময় পার্বতী প্রতিমা, ঈশান কোণে আনন্দ ভৈরবের মূর্তি। মন্দিরের দক্ষিণে প্রস্তর নির্মিত সুবিশাল বৃষমূর্তি আসীন। মন্দির সংলগ্ন নহবৎখানা এবং ঘড়িখানা। মন্দিরের ওপরে স্বর্ণ কলস শোভিত। কথিত আছে এই মন্দিরটি নির্মাণে ব্যয় হয়েছিল তিন লক্ষ মুদ্রা।

মণিকর্ণিকার ঘাটের ওপরে দু'টি সুন্দর মন্দির বর্তমান। বিষ্ণু মহাদেব নামে পরিচিত এক মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শ্রীঅন্নপূর্ণার বাটীও বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। বাটীটির পূর্বে মন্দির, পশ্চিমে নাটমন্দির। বায়ুকোণে পরশুরামেশ্বর, ঈশান কোণে সপ্তাশ্ববাহন সূর্যমূর্তি ; অগ্নিকোণে গণেশের মূর্তি, নৈঋ‍ত কোণে কুবেরেশ্বর এবং পশ্চিমে শ্রীরামচন্দ্রের মূর্তি বিরাজিত। এই অন্নপূর্ণার বাটীতে প্রত্যহ শত শত ব্রাহ্মণ ভোজন করতেন। কমপক্ষে দু'লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে এই অন্নপূর্ণার বাটীটি নির্মিত হয়েছিল।

কাশীতে বহু সংখ্যক বৈষ্ণবেরও ছিল বাস। এখানে অনেক আখড়া ধারীও[৫৬] ছিলেন। কাশীস্থিত গোপাল লালের সিদ্ধ বাটীটিও বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। গোপাল লালের সেবার জন্যে নির্দিষ্ট ছিল লক্ষ মুদ্রা। এখানে বৈষ্ণবেরা সদা সর্বদা গীত বাদ্যে মত্ত থাকতেন। বৃন্দাবনের ঝাঁকি দর্শনের মত গোপাল লালেরও ঝাঁকি দর্শন ছিল প্রচলিত। কাশীর অপরাপর স্থানেও সে সময়ে বহু বৈষ্ণব ধর্ম সাধনার কেন্দ্র বর্তমান ছিল।

কাশীতে রামানন্দী[৫৭], শ্যামানন্দী[৫৮], নিমানন্দী[৫৯], নানকপন্থী, কবীর পন্থী, অঘোরপন্থী[৬০], ফকির, সুন্দরাসাহী[৬১], বৌদ্ধ, গৌড়ীয় বৈষ্ণব প্রভৃতি নানা শ্রেণীর ভক্তগণের ছিল বসতি। কাশীর অধিবাসীরা ভোজন করতেন রুটি, ভাত, শাক, নানাবিধ তরকারী, পুরী, কচুরী, ছোহেরি, শিখরিণী, পোতল, পকৌড়ি, আচার, চাটনি ইত্যাদি। তাছাড়া দধি, দুগ্ধ, ঘৃত ইত্যাদিও ছিল।

এখানকার অধিবাসীরা বিশেষতঃ স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ অলঙ্কার ব্যবহার করতেন। এইসব অলঙ্কারের মধ্যে থাকত--পাইজোর, বাঁকরি[৬২], বাঁকজোল[৬৩], নূপুর, পঞ্চরি[৬৪], মকরা সকরা[৬৫], গোলাকৃতির মল। পাদাঙ্গুলে পরিধানের জন্য ছিল আঙ্গট[৬৬], বিছা এবং ঘুঙুর। কারো কারো হাতে শোভা পেত কনক রচিত গণ্ডারের চুড়ি, কারও বা নীল চুড়ি, আবার কারো হাতে রত্ন সম্বলিত

কনক কিঙ্কিণী শোভা পেত। রত্ন খচিত স্বর্ণময় পৈছিও কেউ কেউ পরিধান করতেন। কারও অঙ্গুরীয় থাকত দর্পণে শোভিত, কেউ আবার বাহুতে পরিধান করতেন কনকমণ্ডিত বাজুবন্দ, জরির নির্মিত কাঁচুলি। গলায় শোভা পেত হীরা, জড়োয়া, মণি খচিত চিক। বক্ষোস্থলে শোভা পেত মোহনমালা, কারো আবার উরুদেশ শোভা পেত মুক্তা মালায়। কর্ণাভরণের মধ্যে ছিল মণি ঢেড়ি, ঝুমকা ইত্যাদি। কেউ কেউ পঞ্চমুক্তা সম্বলিত নথ পরিধান করতেন। কারো নাকে আবার শোভা পেত নোলক। পরিধেয় বস্ত্রাদির মধ্যে ছিল বেনারসী শাড়ী, শোষণী, মট্রাদার শাড়ী[৬৭], ডোরাকাটা জামদানি, গোটাদার ঝপপান, জরির কিনারা সম্বলিত কাঁকরেজা, রেশমী কিম্মিজি ইত্যাদি।

পাঁচ সাতজন যুবতীকে নানাবিধ বেশে সুসজ্জিত হয়ে নগর ভ্রমণে বার হতে দেখা যেত। এইবার কাশীতে যে সব আচার-অনুষ্ঠান, পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হ'ত, তার পরিচয় গ্রহণ করা যেতে পারে। চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের তৃতীয়া পর্যন্ত কাশীতে গণগৌরী পূজার রীতি প্রচলিত। এই সময়ে একটি পুরুষ ও একটি নারী মূর্তি নির্মাণ করে মূর্তি দু'টিকে সুসজ্জিত করা হ'ত। প্রাতঃকালে মূর্তি দু'টিকে পূজা করে বৈকালে দুজন নারী এই মূর্তিদ্বয়কে বাদ্য ভাণ্ড সহ গঙ্গাতীরে নিয়ে যেতেন। এই সময়ে অপরাপর নারীরাও এদের অনুগমন করতেন। দুই চার দণ্ড গঙ্গাতীরে বিশ্রাম করে উপস্থিত নারীরা দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে গিয়ে গান গাইতে শুরু করতেন। পরে মূর্তিদ্বয়কে নিয়ে সকলে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতেন। ষষ্ঠী না আসা পর্যন্ত প্রত্যহ সকালে মূর্তিদ্বয়ের পূজা এবং বৈকালে যথারীতি মূর্তিদ্বয় সহ গঙ্গাতীরে উপনীত হওয়া চলতে থাকত। ষষ্ঠীর দিন সকালে মূর্তিদ্বয়ের যথাবিহিত পূজার্চনার পর বৈকালে গঙ্গায় বিসর্জন দেওয়া হ'ত।

জ্যৈষ্ঠমাসে যে সিত বা শুক্ল একাদশী, তা কাশীতে পরিচিত ছিল 'নির্জলা' নামে। এইদিন সকলে উপবাসী থাকতেন। এই দিনটিতে কাশীবাসীরা সকলে গোরুর গাড়ীতে করে গঙ্গায় গিয়ে উপস্থিত হতেন। তারপর সকলে তুম্বী[৬৮] নিয়ে সন্তরণে মত্ত হতেন। গঙ্গার জলে এই সময় দৃষ্টিগোচর হ'ত কেবল সহস্র সহস্র মুণ্ড। অনেকে আবার এইদিন নিজ নিজ হাতিয়ার সহ সন্তরণের সাহায্যে গঙ্গা অতিক্রম করতেন। তারপর দু'দলে

বিভক্ত হয়ে গঙ্গার পাড়ে পরস্পর কাটাকাটিতে অংশ গ্রহণ করতেন। অতঃপর গাভীদের গঙ্গাস্নান করান হ'ত। এই উপলক্ষ্যে কাশীবাসী সকলে আহীরদের[৬৯] নানাবিধ দান-সামগ্রী উপঢৌকন দিতেন।

ভাদ্রমাসের কৃষ্ণপক্ষের তৃতীয়া তিথিতে কাশীর হিন্দুস্থানী রমণীরা উপবাস করতেন আর সেই সঙ্গে গাইতেন কাজরী গীত।[৭০] প্রাতে কাদা নিয়ে কাশীবাসী সকলে খেলায় প্রবৃত্ত হতেন। অতঃপর দ্বিপ্রহরের সময় সকলে গঙ্গাস্নান করতেন। শুক্লা তৃতীয়াতে অনুষ্ঠিত হ'ত দ্বিতীয়ার ব্রত। এই দিন-টিতে পূরবিয়ারা সকলে শঙ্কর-পার্বতীর পূজার্চনা করতেন। পুরবিয়া রমণীরা এই উপলক্ষে নানাবিধ আভরণে ভূষিত হতেন। শেষ রাত্রে সকলে গঙ্গাস্নানের জন্য গৃহ থেকে নিষ্ক্রান্ত হ'তেন। এই সময়ে কাশীর রমণীরা নূতন নূতন বস্ত্রও পরিধান করতেন।

গণেশ চতুর্থীর দিন কাশীর বাজারে বিক্রয় হ'ত মৃন্মুণ্ড গণেশ মূর্তি। মহারাষ্ট্রীয় এবং গুজরাটীরা এই মৃন্মুণ্ড গণেশ মূর্তি ক্রয় করে গৃহে নিয়ে যেতেন। তারপর ক্ষুদ্রাকৃতির কলাগাছ রোপন করে তার তলায় গণেশ-গৌরীর মূর্তি স্থাপন করে পূজায় প্রবৃত্ত হতেন। অপরপক্ষে আপামর জনসাধারণ এই সময় গঙ্গাস্নান করে পরলোকগত আপনার জনের স্মৃতির উদ্দেশে পিণ্ডদান করতেন। গঙ্গাতীরবাসী ঘাটিয়া ব্রাহ্মণেরা ঘাটের ওপর বসে জলস্থিত যজমানদের মন্ত্র পড়াতেন।

শুক্লপক্ষে কাশীতে অনেকেই নবরাত্রি পালন করতেন। এই সময়ে সকলে জল, দুধ ও ফলমূলাদি আহার করতেন। নিজ নিজ গৃহে কলস স্থাপন করে দিবারাত্র সকলে পূজার বিধান পালন করতেন। সপ্তমী, অষ্টমী এবং মহা-নবমীতে দ্বাদশী থেকে বিংশতি বর্ষীয়া মহারাষ্ট্রীয় ও গুজরাটী স্ত্রীলোকেরা উপযুক্ত বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে মন্দির ও দেবালয়ে পঞ্চাশটি প্রদীপের গাছ স্থাপন করতেন। তারপর সকলে মিলে নৃত্যগীত সহকারে ঐ প্রদীপের গাছটিকে প্রদক্ষিণ করতেন। কাশীতে এই অনুষ্ঠানটি 'গর্ববালীলা' নামে পরিচিত। কোন পুরুষ মানুষ কিন্তু এই নৃত্য-গীতানুষ্ঠান প্রত্যক্ষ করতে পারতেন না। অবশ্য কেউ কেউ যে গোপনে এই অনুষ্ঠান প্রত্যক্ষ না করতেন, এমন নয়। তবে বলাবাহুল্য তা ছিল নিয়মবিরুদ্ধ।

কাশীতে একমাত্র বাঙ্গালী টোলাতে দুর্গোৎসব অনুষ্ঠিত হ'ত। এখানে

বলিদান ছিল নিষিদ্ধ। কেবল দুর্গা পূজার ক'দিনই কাশীতে বলিদান হ'ত

প্রতিপদ থেকে শুরু করে একাদশী তিথি পর্যন্ত কাশীবাসী সকলে রামলীলা যাত্রার আয়োজন করতেন। তিন-চারটি স্থানে এই সময়ে যাত্রার আয়োজন অনুষ্ঠিত হ'ত। কিন্তু চিত্রকূটে অনুষ্ঠিত যাত্রাই ছিল সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য এবং প্রধানতম। শাস্ত্রসম্মত বিষয় অবলম্বনে এইসব যাত্রা অনুষ্ঠিত হ'ত। কোনপ্রকার গীত, বাদ্য অথবা নৃত্য এইসব যাত্রায় স্থানলাভ করত না। চিত্রকূটে জন্মযাত্রা অনুষ্ঠিত হবার পর ক্রমে ক্রমে অপরাপর স্থানেও যাত্রার আয়োজন অনুষ্ঠিত হ'ত। বিশ্বামিত্রের আশ্রমে রাক্ষসী বিনাশের পর জনক গৃহে জানকীর সঙ্গে শ্রীরামচন্দ্রের শুভ পরিণয় অনুষ্ঠিত হ'ত। এর পরই হ'ত রামচন্দ্রের বনবাস। তারপর ক্রমে ক্রমে শূর্পনখার নাসিকা ছেদন, খর দূষণাদি মারীচ বধ প্রভৃতির পর সীতাহরণ স্থান পেত। অতঃপর সুগ্রীবের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে রামচন্দ্র কর্তৃক বালিনিধন সংঘঠিত হ'ত। সমুদ্রের ন্যায় বরুণা নদী অতিক্রম করে বিজয়াতে রামচন্দ্র কর্তৃক দশাননের সংহার সাধিত হ'ত। সবশেষে রামচন্দ্রের জয়লাভ। অবশেষে একাদশী গত হলে ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন ঘটত। একটি বিশালাকৃতির সুশোভিত বিমানে রামচন্দ্র, জানকী, লক্ষ্মণ, বিভীষণ, জাম্বুমান এবং হনুমানকে বসিয়ে বত্রিশজন কাহার সেটিকে কাঁধে করে নিত। সুগ্রীব ও অঙ্গদ বিমানের দু'ধারে ছত্র ধরে থাকত। লক্ষ লক্ষ মানুষ এই সময়ে রামচন্দ্রের জয়ধ্বনিতে মুখরিত হয়ে উঠত। তুরী, ভেরী, সানি, টিকরা, দামামা, ঝর্ঝরী, বীণ প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সকল বাজতে থাকত। সকলে আনন্দিত চিত্তে রামচন্দ্র প্রমুখাদির ওপর পুষ্প বর্ষণ করত। এইভাবে বিমানে বাহিত হয়ে অবশেষে মাঝপথে ভরতের সঙ্গে রামচন্দ্রের মিলন সংঘটিত হ'ত। এই 'ভরত মিলন' অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়েই কাশীতে রামযাত্রার পরিসমাপ্তি ঘটত।

কার্তিক মাসে কাশীতে পঞ্চ গঙ্গার বিধান পালনের রীতি ছিল প্রচলিত। এই সময়ে এক যাম নিশা শেষে সকলে গঙ্গাস্নানের জন্য যেতেন। সকলের হাতেই শোভা পেত একটি করে বাতি। আবাল-বৃদ্ধ-বনিতা সকলের উপস্থিতিতে পথে ভীড় জমে যেত। গঙ্গার ঘাটে বাজতে থাকত টিকরা, সানাই ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র সকল। কোন স্থানে আবার হিন্দুস্থানী বালক নর্তক রাধাকৃষ্ণ ও গোপ গোপী সেজে নাচ গানে প্রবৃত্ত হ'ত। উষাকালে সকলে গঙ্গাস্নান

করে তারপর নিজ নিজ গৃহাভিমুখে রওনা হতেন। সন্ধ্যাকালে কাশীবাসী সকলে গঙ্গাতীরে উপস্থিত হয়ে নিজ নিজ দীপ প্রজ্বলিত করতেন, বিশ্বেশ্বর অন্নপূর্ণা এবং অন্যান্য দেবস্থানেও ঘৃতদীপ দান করা হ'ত। গঙ্গাতীর এই সময় অসংখ্য দীপের আলোতে অপূর্ব শোভাধারণ করত।

দ্বাদশী তিথিতে কাশী-ধামে 'তুলসী বিবাহে'র আয়োজন অনুষ্ঠিত হ'ত। এই সময় শ্রীমূত্তিকে দোলায় চড়িয়ে রাত্রিকালে নগরে পরিভ্রমণ করান হ'ত। শ্রীমূত্তির সঙ্গে বহু মহারাষ্ট্রীয় বরযাত্রী হিসাবে অনুগমন করতেন। অতঃপর শ্রীমূর্ত্তিকে উপস্থিত করা হ'ত তুলসী ভবনে। সেখানে তুলসীর বিবাহাদি সমাপনের পর সকলে আনন্দ সহকারে বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন।

ভূত-চতুর্দশী তিথিতে কাশীতে দীপান্বিতা উৎসব মহা সমারোহে অনুষ্ঠিত হ'ত। এই সময়ে প্রজ্বলিত অসংখ্য দীপের আলোকে সমগ্র কাশীপুরী বিচিত্র শোভাধারণ করত। একমাত্র বাঙ্গালী টোলায় এই সময় শ্যামাপূজার আয়োজন করা হ'ত। কাশীর অন্যত্র শ্যামা পূজার আয়োজন হ'ত না। ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা চতুর্দশী তিথিতে 'বিশ্বেশ্বর যাত্রা' অনুষ্ঠিত হ'ত। কাশীবাসী সকলেই এইদিন বিশ্বেশ্বরের মন্দির দর্শন করতে যেতেন। প্রত্যূষ থেকে রাত্রি পর্যন্ত বিশ্বেশ্বর মন্দির জনসমাগমে পূর্ণ থাকত। প্রতিপদ থেকে শুরু করে পূর্ণিমা পর্যন্ত কাশীধামে হোলী পর্ব অনুষ্ঠিত হ'ত। পাঁচ-সাত জন যুবক এই সময়ে একত্রে মিলিত হয়ে ডম্ফ নিয়ে গীত-বাদ্যে মত্ত হ'ত। কাশীধামের সর্বত্রই এই দৃশ্য পরিলক্ষিত হ'ত। দশমীর পর একাদশীতে উৎসব মত্ত জনতার সংখ্যা যেন বৃদ্ধি পেত। তেমাথা যুক্ত পথের ওপর স্থানে স্থানে রচনা করা হত বেদী ; ফুল, ফুলের মালা ও ফাগের দ্বারা ঐ বেদী সজ্জিত করা হ'ত। তারপর সকলে টিকারার বাদ্যসহ নৃত্য গীতে প্রবৃত্ত হ'ত। এই সময়ে দু'টি কাষ্ঠনির্মিত পুতুলকে একত্রিত করে অত্যন্ত কুরুচিপূর্ণভাবে তাদের দ্বারা অঙ্গভঙ্গী প্রদর্শন করান হ'ত।

চতুর্দশীর দিন সকালে কাশীতে স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলে কেসরিয়া[১২] গোলাপী, কুসুম প্রভৃতি রঙে রঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করতেন। পূর্ণিমার রাত্রে সকলে বহ্নিলীলায় অংশগ্রহণ করতেন। সমগ্র কাশীর সর্বত্র তেমাথা ও চৌমাথায় কাঠ ইত্যাদি দাহ্য পদার্থ স্তূপীকৃত করে তাতে অগ্নি সংযোগ করা হ'ত। বহ্নিপূজা উপলক্ষে সকলে বিনিদ্র রজনী যাপন করতেন। পরের

দিন সকলে বহ্নিপূজার ভস্ম নিয়ে ক্রীড়ায় মত্ত হতেন।

পরের মঙ্গলবারে অনুষ্ঠিত হ'ত নৌকাখণ্ডের। নগরীর সকলে ভোজনপর্ব সমাধা করে দুর্গাযাত্রা দর্শনের জন্য গমন করতেন। দুর্গাযাত্রা দর্শন করতে যাবার সময়ে সকলে নানাবিধ অলঙ্কারে ভূষিত হতেন। অলঙ্কারের মধ্যে ছিল গুম্ফ[৭২] বিজটা[৭৩] ইত্যাদি। সকলেই এইসময় রঙীন পাগড়ী ব্যবহার করতেন। কদাচিৎ কেউ সাদা পাগড়ী পরতেন। কেউ কেউ আবার কিঙ্মিজি ধুতি[৭৪] পরতেন। দুর্গা দর্শনান্তে সকলে এসে হাজির হতেন গঙ্গা এবং অসির সঙ্গমস্থলে। গঙ্গাতীরে উপস্থিত থাকত পলোয়ার, বজরা, পিনিস, ডিঙ্গি ইত্যাদি। এইসব নৌকায় শয্যা প্রস্তুত করে সকলে গঙ্গা অসি সঙ্গমস্থলে নৌকারোহণ করতেন। সারারাত ধরে নৌকাগুলি চলে পরদিন প্রাতঃকালে পঞ্চ গঙ্গাঘাটে নৌকাগুলির যাত্রা সমাপ্ত হ'ত। বড় বড় পাটলিগুলিতে পাঁওরিয়াগণ[৭৫] নৃত্য করত। আর ভাউয়া যুবকগণ[৭৬] নৌকামধ্যে নানাবিধ রঙ্গ ব্যঙ্গ করত। নৌকা বিহারের মধ্য দিয়েই কাশীতে হোলী পর্ব শেষ হ'ত।

কাশীতে রন্ধন দ্রব্যাদির মধ্যে একমাত্র সুস্বাদু ছিল অড়হর ডাল। দিবাভাগে কাশীতে সকলে চীনা[৭৭], মাড়ুয়া[৭৮], সামা[৭৯], সিঙ্গাড়া[৮০] ইত্যাদি ভোজন করতেন।

বাঙ্গালী টোলার রাণামহল্লার ঘাটে অবস্থিত বন্দীদেবী। পঞ্চক্রোশী যাত্রাকালে এই দেবীকে দর্শন ও পূজা করার রীতি প্রচলিত। নাবিকদের বিশ্বাস ছিল যে কাশীতে এই দেবীর পূজা বাধ্যতামূলক। কারণ পূজা না করে নৌকা ছাড়লে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

---

১. হিন্দী চুহড়ার, নিকৃষ্টজাতি। মানভূম এবং সাঁওতাল পরগণা বাসী পার্বত্য, ভূমিজ, কোল প্রভৃতি জাতিকে চুড়ার বা চোহাড় বলে।

২. গঙ্গারতীরে অবস্থিত ভাগলপুর জেলার একটি নগর।

৩. তেলিয়াগলি ; সকরী গলি থেকে ১২ মাইল দূরে গঙ্গার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত গ্রাম।

৪. ভাগলপুর জেলার কহলগার পার্শ্ববর্তী এক অতি প্রাচীন স্থান।

৫. ভাগলপুর জেলাস্থিত গঙ্গাতীরবর্তী একটি অতি প্রাচীন সহর।

৬. জাহাঙ্গীরা ; ভাগলপুর জেলার একটি পরগণা ও তার প্রধান নগর।

৭. সুরজগড় ; মুঙ্গের জেলার একটি পরগণা ও তার প্রধান সহর।

৮. পাটনা জেলার একটি মহকুমা ও তার প্রধান নগর, গঙ্গার তীরে অবস্থিত।

৯. পাটনা জেলার একটি প্রসিদ্ধ নগর, ফতোয়া সহর থেকে ৫ মাইল পূর্বে গঙ্গার কূলে অবস্থিত।

১০. ফতোয়া, পাটনা জেলার প্রসিদ্ধ নগর, পুনপুন ও গঙ্গার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত।

১১. পাটনা জেলাস্থিত বিহার মহকুমার একটি গণ্ডগ্রাম। পাটনা থেকে ফতোয়া হয়ে গয়া পর্যন্ত যে পথ গেছে, তার পাশে অবস্থিত। খুব সমৃদ্ধ নগরী ছিল।

১২. পাটনা জেলাস্থিত বিহার মহকুমার একটি নগর। এর অপর নাম অতসরাই।

১৩. যমরাজ, ধর্মমাজ ও তাঁদের দুটি কুকুরের উদ্দেশে বলি দিয়ে তারপর কাকদের উদ্দেশে বলিদানের ব্যবস্থা আছে।

১৪. সুন্দরসিংহ, টিকারী রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বীরসিংহের পুত্র।

১৫. পুনপুন নামে দুটি নদী গঙ্গায় পড়েছিল। বর্তমানে একটি মাত্র পুনপুন দেখতে পাওয়া যায়। যে নদীটি ফতোয়া সহরের কাছে গঙ্গায় পড়েছে তার নাম ছোট পুনপুন। অপর নদীটি পাটনার দিকে আরও কিছু উত্তরে গঙ্গায় মিশেছিল। এটি বড় পুনপুন নামে অভিহিত হ'ত। কবি ছোট পুনপুনকেই আদিগঙ্গা বলেছেন।

১৬. সাসেরাম বা সহস্রারাম। সাহাবাদ জেলার অন্তর্গত সাসেরাম নামক মহকুমার অন্তর্ভুক্ত।

১৭. মহারাজ হরিশ্চন্দ্র।

১৮. প্রকৃত পক্ষে তাঁরা শেরশাহের কবর দেখেছিলেন।

১৯. জাহানাবাজ, সাহাবাদ জেলার একটি নগর।

২০. কর্মনাশা নদীর জলস্পর্শ করতে শাস্ত্রের নিষেধ আছে।

২১. মোগলসরাই, বারাণসী জেলার প্রসিদ্ধ সহর।

২২. জ্ঞান বাপী, নন্দিকেশ, তারকেশ, মহাকালেশ্বর ও দণ্ডপাণি।

২৩. গোরখপুর জেলার একটি প্রসিদ্ধ নগর।

২৪. কাশী থেকে প্রয়াগ যাবার পথে অবস্থিত একটি নগর।

২৫. ঝুসী, এলাহাবাদ নগরের পরপারে গঙ্গাতীরে অবস্থিত একটি অতি প্রাচীন গ্রাম।

২৬. দরজা জানলা বিহীন গৃহবৎ বহিঃ বারান্দা।

২৭. ভরদ্বাজ আশ্রম থেকে গোদাবরীর দূরত্ব অনেকখানি। সম্ভবত এখানে গোদাবরীর পরিবর্তে যমুনা হবে।

২৮. মীর্জাপুর, যুক্তপ্রদেশের বিখ্যাত জেলা এবং গঙ্গাতীরস্থ উক্ত জেলার প্রধান নগরী।

২৯. মীর্জাপুরের কার্পেট ও আসন বিখ্যাত। মাটির ও পাথরের বাসনের জন্যও মীর্জাপুর প্রসিদ্ধ।

৩০. চনার বা চুনার। চুনার মীর্জাপুর জেলার একটি নগর, গঙ্গার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত।

৩১. জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশী পরিক্রমা'য় এর উচ্চতা আনুমানিক ১১৫ হাত বলা হয়েছে।

৩২. যুক্তপ্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটি নগর।

৩৩. ভাগলপুর জেলার গঙ্গাতীরবর্তী একটি গণ্ডগ্রাম।

৩৪. পীরপৈঁতি, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটি সমৃদ্ধ গ্রাম।

৩৫. এখানে শ্রীশ্মশানেশ্বর বর্তমান।

৩৬. স্বর্ণ ও রৌপ্য সূতায় গাঁথা রেশমী বস্ত্র।

৩৭. জরির ফুল দেওয়া উৎকৃষ্ট মসলিন বস্ত্রবিশেষ।

৩৮. জগদ্বিখ্যাত বেনারসী শাড়ী।

৩৯. অতি সূক্ষ্ম এক সূতায় প্রস্তুত; এ'টি 'একসূতি' নামে খ্যাত।

৪০. এক প্রকার রেশমী অন্তর্বাস, এটি 'সাঙ্গী' নামেও খ্যাত।

৪১. মোটা রেশমী বস্ত্রভেদ।

৪২. সাদা রেশমী জমির ওপর খুব সরু জরির ফিতা পাড় থাকলে সেই বস্ত্র বিশেষের নাম হয় ধনুক পাটা।

৪৩. ভেলভেটের ওপর খুব ভারী ও জাঁকাল সলমার কাজকে কারচোব বলে।

৪৪. রেশমে প্রস্তুত বস্ত্রভেদ।

৪৫. যে কাপড়ের কিনারায় রেশমের ফিতা থাকে।

৪৬. ডুরি বা ফুলদার রেশমী বস্ত্রভেদ।

৪৭. চলিত মশরু। তুলা মেশান একপ্রকার রেশমী বস্ত্র।

৪৮. স্থুল কার্পাস বস্ত্রভেদ, এতে রেশমের ফুল ও বুটি থাকে।

৪৯. ফুলদার রেশমী বস্ত্রভেদ ; চলিত নাম হিমরু।

৫০. মোটা সতরঞ্চি।

৫১. আঙরার জামা।

৫২. কাছ।

৫৩. কর্ণাভরণ বিশেষ।

৫৪. যেখানে ঘড়ি থাকে।

৫৫. ছত্রের জন্য নির্দিষ্ট বাটী, সাধারণত অতিথিকে অন্ন দেওয়া হয়।

৫৬. যে সব সন্ন্যাসী বা বৈরাগী আখড়ায় থাকে।

৫৭. রামানন্দ প্রবর্তিত এক উপাসক সম্প্রদায়।

৫৮. এক শ্রেণীর উপাসক সম্প্রদায়।

৫৯. বৈষ্ণবদের মধ্যে এরা চতুর্থ সম্প্রদায়।

৬০. উপাসক সম্প্রদায় ভেদ ; এরা নানাবিধ কুৎসিত ও ঘৃণ্য ব্যবহার করে থাকে।

৬১. সুথরা নামেই খ্যাত; ক্ষুদ্র উপাসক সম্প্রদায়।

৬২. বেঁকি; এক প্রকার পদাভরণ।

৬৩. এদেশে বাঁকমল নামে খ্যাত।

৬৪. এক্ষণে গুজরি পঞ্চ নামে খ্যাত।

৬৫. এক প্রকার মল; এর মুখের দিকটি মকরাকৃতি।

৬৬. আঙ্গট আঙ্গুলে পরার অলঙ্কার।

৬৭. রেশমী বস্ত্র ভেদ।

৬৮. শুষ্ক অলাবুর খোলা।

৬৯. গোপজাতি বিশেষ।

৭০. একটি মেলা।

৭১. এক প্রকার কৃষ্ণ বর্ণের ফুল, এর থেকে রঙ হয়।

৭২. গোঁফহার।

৭৩. এক প্রকার তাবিচ।

৭৪. হিন্দীতে 'কির্মি' শব্দের অর্থ পলাশ ফুল। 'কির্মিজি' অর্থে ঐ রঙয়ের বর্ণবিশিষ্ট অর্থাৎ ঘোর লাল।

৭৫ নীচকুলজাতি রমণী ; নাচগান এদের ব্যবসা।

৭৬. ভাবপ্রকাশকারী; যারা হস্ত পদ মুখাদি চালনার দ্বারা নানা ভাবভঙ্গী প্রকাশ করে।

৭৭. চীনাক তৃণধান্য বিশেষ।

৭৮. হিন্দী=সংস্কৃত মড়ক॥ তৃণধান্য ভেদ।

৭৯. সংস্কৃত শ্যামাক॥ তৃণধান্য ভেদ।

৮০. হিন্দী সিঙ্গাড়া ; সংস্কৃত শৃঙ্গাটক ; এদেশে পানিফল নামে পরিচিত।

পঞ্চম অধ্যায়

তীর্থ ভ্রমণ

যদুনাথ সর্বাধিকারী রচিত 'তীর্থভ্রমণ' গ্রন্থটি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজনরূপে সঙ্গত কারণেই চিহ্নিত হবার যোগ্য। এর সমপর্যায়ের গ্রন্থ পূর্ববর্তীকালে কেন, পরবর্তী কালেও তেমন রচিত হয়েছে কিনা সন্দেহ আছে। লেখক ১৮৫২ সাল থেকে ১৮৫৭ সাল পর্যন্ত এই সুদীর্ঘ-কাল ভারতবর্ষের উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থানগুলি ব্যাপকভাবে পর্যটন করেন। এবং পরবর্তীকালে সেই ভ্রমণ বৃত্তান্তের রোজ নামচাই 'তীর্থ ভ্রমণ' নামে প্রকাশিত হয়। লেখক স্বয়ং মন্তব্য করে বলেছেন :

'তীর্থাদি ভ্রমণ করিলে নানাদেশ এবং নানা মত মনুষ্য (ও) তাহাদিগের কৃত ব্যবহার দেখা যায়।'

বাস্তবিক, তীর্থস্থান সমূহের মাহাত্ম্যের সঙ্গে সেই সেই স্থানের সমাজ চিত্র, লোক-চরিত্র রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ইত্যাদি বহুবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের বর্ণনায় বঙ্গেতর ভারতের গুরুত্বপূর্ণ এবং নির্ভরশীল ইতিহাসে পরিণত হয়েছে তাঁর গ্রন্থটি।

পণ্ডিত কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য সঙ্গত কারণেই গ্রন্থটি সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন :

'কোন বাঙ্গালী বোধ হয় ইহার পূর্বে কিংবা পরে তীর্থ পর্যটনে নির্গত হইয়া এ প্রকার ভ্রমণ বৃত্তান্ত লিখিয়া যান নাই।'

এই প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়, 'তীর্থ ভ্রমণে'র প্রায় একশত বৎসর পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত বিজয় রাম সেনের 'তীর্থ মঙ্গলে'ও বঙ্গেতর ভারতের এক উল্লেযোগ্য অংশের চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। তবু গ্রন্থের বিশালতায়, বিস্তৃত অঞ্চলের বর্ণনায়, সর্বোপরি সমাজ চিত্র, লোক চরিত্র, আচার ব্যবহার ইত্যাদি সংক্রান্ত নানবিধ তথ্যের সমাবেশে আলোচ্য 'তীর্থভ্রমণ' যে অধিকতর

শুরুত্বের অধিকারী হয়ে উঠেছে, তা অনস্বীকার্য।

গোবিন্দপুরের চটী থেকে ছ'ক্রোশ পার্বত্যময় পথে রাজগঞ্জ।[১] রাজগঞ্জ থেকে ছ'ক্রোশ দূরবর্তী হল তোপচাঁচির চটী। এই চটী পর্যন্ত পাহাড়ের চড়াই-উৎরাই জরাসন্ধের গড়। এখানেই অবস্থিত পরেশনাথের পাহাড়। এ অঞ্চলে পরেশনাথের অনুরূপ উচ্চতায় আর কোন পাহাড় নেই। পরেশনাথের উচ্চতা হবে প্রায় তিন ক্রোশ। পাহাড়টি নানাবিধ ফল, ফুল, লতা ও বৃক্ষ দ্বারা শোভিত। বনমধ্যে হিংস্র জন্তুদের বাস। পাহাড়ের একেবারে সর্বোচ্চ শিখরে অবস্থিত পরেশনাথের মন্দির। মন্দিরে বণিকদের কুলদেবতা প্রস্তর নির্মিত বিবস্ত্র সন্নাবগির[২] মূর্তি অবস্থিত। ফাল্গুনী পূর্ণিমার সময়ে এই পাহাড়ের নীচে অবস্থিত মধুবনে[৩] পরেশনাথের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। পাহাড়ের ওপরে রয়েছে পুষ্করিণী এবং পুষ্পোদ্যান।

পরেশনাথের পাহাড়ের নিকটস্থ মধুবন থেকে পাহাড়ের ধারে ধারে জরাসন্ধের কেল্লার ধার হয়ে ছ'ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে পড়ে ডুমরিচটী। চটীটির বিস্তার প্রায় এক মাইল। চটীটির বৈশিষ্ট্য হ'ল এ'টি চতুর্দিকে পাহাড় দ্বারা বেষ্টিত। বগোদরের চটী থেকে ডুমরিচটীর দূরত্বের ব্যবধান সাত ক্রোশ। আবার বগোদর থেকে আটকার দূরত্ব সাড়ে চার ক্রোশ। আটকা থেকে বরকাট্টার দূরত্বও সাড়ে চার ক্রোশের মতন। বরকাট্টা থেকে বরশোতের ব্যবধান হ'ল চার ক্রোশ। বরশোত থেকে বরহির দূরত্ব পাঁচ ক্রোশ। চোপারণ এখান থেকে ছ' ক্রোশ দূরবর্তী। একই দূরত্বের ব্যবধানে ভেলুয়া। মাঝে পড়ে ভয়ঙ্কর জঙ্গল। ভেলুয়ায় আছে প্রস্তর নির্মিত একটি বৃহদাকৃতির সেতু। ভেলুয়াস্থিত গভীর বন থেকে ছ' ক্রোশ দূরবর্তী হ'ল বারা। বারা থেকে সরঙ-এর দূরত্ব দু' ক্রোশ। কুশলা নদী এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে বহমানা। এর পর দু' ক্রোশ অন্তরে বোধগয়া। বোধগয়া থেকে গয়াধামের দূরত্ব তিন ক্রোশ। গয়ায় রয়েছে ব্রহ্মযোনির পাহাড়। সেতুয়ারা বিষ্ণুমন্দিরের ধ্বজা দেখিয়ে যাত্রীদের কাছ থেকে অর্থ আদায় করে। বিষ্ণুমন্দিরের পূর্ব দিকে রামার্ত বৈষ্ণবের আখড়া। এই আখড়ায় সীতা, রাম, রাধাকৃষ্ণ এবং অন্যান্য নানাবিধ শালগ্রাম শিলা বিদ্যমান। এর পর দ্বারে অবস্থিত গয়েশ্বরী দেবী। ইনিই গয়াধামের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। এছাড়াও মহাপীঠ এবং গদাধরের ভৈরবও বিদ্যমান এখানে। এরপর রাণী অহল্যাবাই স্থাপিত শ্বেত প্রস্তর নির্মিত রাম,

সীতা, আলাহিদা ঠাকুরবাড়ী। এই ঠাকুর বাড়ীর পূর্বদিকে গদাধরের মন্দির। এই মন্দিরে গণেশ এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মূর্তি বিদ্যমান। অতঃপর দ্বারে অবস্থিত ১৪৮৪ ঘর গয়ালের বৈঠক কাছারি। তারপরে অবস্থিত ঘণ্টাঘর। পূর্বদিকে ষোলবেদী এবং পশ্চিমে প্রস্তর নির্মিত বিষ্ণুমন্দির।

গয়ায় পিণ্ড-শ্রাদ্ধাদি দান করার রীতি তিন প্রকারের। প্রথম ক্ষাপরেল প্রথা। এই প্রথায় ৪৫ বেদীতে শ্রাদ্ধ করার রীতি। দ্বিতীয় হ'ল দর্শনী প্রথা। এই প্রথায় ৩৫ বেদীতে শ্রাদ্ধ করার রীতি। তৃতীয় এক দৃষ্ট প্রথা। এই প্রথায় ৪ বেদীতে শ্রাদ্ধ করতে হয়। গয়ায় ফল্গু, প্রেতশিলা, ব্রহ্মকুণ্ড, রামশিলা, রামকুণ্ড, কাকবন, উত্তর মানস, উদীচী, কনখল, দক্ষিণ মানস, ব্রহ্মসরোবর ইত্যাদি বেদীতে পিণ্ডদান করতে হয়। গয়াস্থিত ষোলবেদী—ব্রহ্মপদ, রুদ্রপদ, বিষ্ণুপদ, কার্ত্তিকপদ, গার্হস্থ্য পদ, আরোহিণী পদ, সত্য পদ, দক্ষিণাগ্নি পদ, অশ্বাথপদ, সূর্য পদ, চন্দ্র পদ, দধীচী পদ, মার্কণ্ড পদ, কর্ণ পদ, ইন্দ্র পদ ও গণেশ পদ—এই ষোলটি বেদী মণ্ডপ মধ্যে অবস্থিত। গয়াস্থিত 'গো প্রচার' নামক পাহাড়ে গো বৎসের পদচিহ্ন বর্তমান। এই পাহাড়ে পিণ্ডদান ও গোদান করার রীতি প্রচলিত। গদালোল একটা গদাকৃতির বিরাট প্রস্তর একটা পুষ্করিণীতে প্রোথিত রয়েছে। এ'টি পরিচিত 'ভীমের গদা' নামে। এখানেও শ্রাদ্ধ করার রীতি প্রচলিত। বিষ্ণুপদ গয়াসুরের মস্তকোপরি অবস্থিত। এখানে ক্ষাপরেল গয়ার তিনদিন পিণ্ডদান হয়। শেষদিনে পিণ্ডদান করে অক্ষয় বটে দান করে সুফল নেওয়ার রীতি প্রচলিত।

গয়াস্থিত ষোল বেদীর পাশে অবস্থিত চারবেদী—অগস্ত্য পদ, কাশ্যপ পদ গজকরণ পদ ইত্যাদি এই চারটি বেদীতে মহারাষ্ট্রীয়, তৈলঙ্গী, পাঞ্জাবী এবং মারোয়াড়ীরা শ্রাদ্ধাদি করে থাকে। কিন্তু বাঙ্গালীরা এর চার বেদীতে শ্রাদ্ধাদি করেনা। গয়াক্ষেত্রের প্রতিটি পিণ্ডবেদীতে শ্রাদ্ধাদি করে, তার পর দ্বাদশ পুরুষের পিণ্ডদান করে। অতঃপর পিতৃ-মাতৃকুল, জ্ঞাতি কুটুম্ব, বন্ধু বান্ধব ইত্যাদি সকলের উদ্দেশে পিণ্ডদান করতে হয়। সকলের পিণ্ডদান করা হলে পরিশেষে মাতৃ-পিতৃ ষোড়শী করার রীতি প্রচলিত। মাতৃ ষোড়শী করার সময় ক্রন্দন করতে হয়। কেবল মহারাষ্ট্রীয়েরা অন্নের পিণ্ডদান করে থাকে। কিন্তু আর আর সকলেই যব, গোধূম, তণ্ডুল চূর্ণ একত্রিত করে ঘৃত, মধু,

তিল ইত্যাদি যোগে পিণ্ডদান করে থাকে। গয়ায় কেবল বিষ্ণুপদে পিণ্ডদান করলেই গয়া করা সিদ্ধ হয়।

গয়াস্থিত প্রেতশিলার ব্রাহ্মণগণ 'ধামী ব্রাহ্মণ' নামে পরিচিত। প্রেতশিলা ও রাম শিলাতে স্বর্ণ রৌপ্যের চিহ্ন বর্তমান। এই দুই পাহাড়ে আরোহণ করে তবে শ্রাদ্ধাদি করতে হয়। প্রেতশিলার নীচে ব্রহ্মকুণ্ড। পর্বতোপরি প্রস্তর নির্মিত একটি কক্ষে শ্রাদ্ধাদি করতে হয়। ঈশানে স্বর্ণ চিহ্ন বিদ্যমান। এর উপরেও পিণ্ডদান করার রীতি প্রচলিত।

গয়ায় ব্রহ্মযোনি পাহাড়ের শীর্ষদেশে সূর্যদেবের মন্দির। মন্দিরের পশ্চিমে ব্রহ্মযোনি ছিল যন্ত্রাকৃতি। পূর্বে যোনি পথ দিয়ে জন্ম পরীক্ষা করা হ'ত।

ফল্গুনদীর পূর্বপারে রাম গয়া এবং সীতাকুণ্ড। সীতাকুণ্ড এখন নদীর গর্ভে। এখানে বালির পিণ্ড দেওয়া হয়। রামগয়া নদী তীরে পর্বত ওপরে। গয়াকূপে ভূতযোনি প্রাপ্ত মানুষের উদ্দেশে পিণ্ডদানের রীতি। ধোতপদ পর্বতোপরি, দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম হাঁটু গেড়ে এখানে পিণ্ডদান করেছিলেন। সেখানে তাঁর হাঁটুর চাপে পাথর ক্ষয় হয়ে গহ্বরে পরিণত হয়েছিল। তাই 'ভীমগয়া' নামে পরিচিত।

ভাদ্রমাসে ইন্দ্রদ্বাদশীতে বিষ্ণুপদে ফল্গুনদীতে দুধের স্রোত পরিলক্ষিত হয়। ফল্গু নদীর জল অন্তর্হিত ভাবে প্রবাহিতা। ধর্মারণ্য বোধগয়ার আড়পারে অবস্থিত। গয়া ক্ষেত্রস্থিত বিষ্ণুমন্দিরে হিন্দু ধর্মাবলম্বী ব্যতীত আর কারও প্রবেশাধিকার নেই।

গয়াস্থিত গয়ালীরা বেশ সমৃদ্ধ। দিনান্তে এদের প্রত্যেকেই একবার অন্ততঃপক্ষে বিষ্ণুমন্দির প্রদক্ষিণ করে পদচিহ্ন দর্শন ও স্পর্শ করে থাকে। যদুনাথ যে সময়ে গয়া পরিভ্রমণ করেছিলেন, সে সময়ে গয়া সহরে সর্ব-সাকুল্যে বসতি ছিল দশ হাজার ঘরের। তখন মুসলমানরা বাস করত সহরের বাইরে। গয়া সহরের উত্তর দিকে অবস্থিত সাহেবগঞ্জ। সাহেবগঞ্জ চাঁদনী চকের মত; এখানে পেতল, কাঁসা, কম্বল, সতরঞ্চি, গালচে, লুই ইত্যাদি দোকানের পৃথক পৃথক চকবন্দী। নানাবিধ লাঠিও এখানে বিক্রীত হয়।

গয়া সহরটি প্রাচীর বেষ্টিত। চতুর্দিক পাহাড়ের দ্বারা পরিবেষ্টিত। পাহাড়ের ওপরে সহর। গয়া পাথরের তৈরী বাসনের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকার খাদ্যদ্রব্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য পুরী, কচুরী, নাড়ু, পেঁড়া ইত্যাদি।

গয়া থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত যমুনা নামক স্থান। যমুনা থেকে চার ক্রোশ দূরে পঞ্চাননপুর। এখান থেকে গো পাঁচ ক্রোশের পথ। গো থেকে পুনপুনা দশক্রোশ। পুনপুনা থেকে দাউনগর পাঁচ ক্রোশ দূরবর্তী। পড়োড়ি এখান থেকে পাঁচ ক্রোশের পথ। পড়োড়ি থেকে আকড়ি পুনরায় পাঁচ ক্রোশ। এখান থেকে শোণের পাথার আবার দেড় ক্রোশের পথ। এখান থেকে তিন ক্রোশ গেলে তবে সরসরাম।[৪] সরসরাম প্রাচীন সহর। এখানকার ছুলিচা, গালচে, সতরঞ্চ ইত্যাদি বিখ্যাত। সরসরাম থেকে পাঁচ ক্রোশের পথ শিবসাগরের সরাই। এখান থেকে জাহানাবাদ পুনরায় পাঁচ ক্রোশ। জাহানাবাদ থেকে মোহনিয়া ছয় ক্রোশ। মোহনিয়া থেকে ছ'ক্রোশ দূরে কর্মনাশা নদী বহমানা। এই নদীর জল কেউ স্পর্শ করে না। কর্মনাশা নদী থেকে জগদীশের সরাই চার ক্রোশের পথ। জগদীশের সরাই থেকে ছুলাইপুর আবার আট ক্রোশের পথ। ছুলাইপুর থেকে কাশী তিন ক্রোশ।

কাশীর দক্ষিণে অসি, উত্তরে বরুণা নদী। মধ্যস্থলে কাশী, আনন্দ কানন, গৌরী পীঠ, মহাশ্মশান, উত্তরবাহিনী গঙ্গা, চক্রতীর্থ, মণিকর্ণিকা। গঙ্গার পশ্চিম কূলে কাশী। কাশীতে অনেকগুলি ঘাট বর্তমান।

রাত্রি চারদণ্ড গতে কাশীস্থিত বিশ্বেশ্বরের মন্দিরে আরতি হয়। এই সময় পাঁচজন ব্রাহ্মণ বিশ্বেশ্বরের ছ'দিক বেষ্টন করে বসেন। পূর্বদিকের দ্বারে উপবিষ্ট ব্রাহ্মণ সর্বমান্য। এঁরা পুরুষানুক্রমে আরতির পাণ্ডা। প্রথমে বিশ্বেশ্বরকে দুধের দ্বারা অভিষিক্ত করা হয়। একপোয়া পরিমিত দুধ লাগে অভিষেকে। একটি সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট ঘটি দিয়ে বিশ্বেশ্বরের মাথায় দুধের ধারা দেওয়া হয়। পরে এক সের পরিমিত শুদ্ধ গঙ্গাজলেও ধারা দেওয়া হয়। তারপর ঘি এবং চিনি দিয়ে বিশ্বেশ্বরকে বিশেষভাবে মর্দিত করা হয়। অতঃপর চন্দন লেপন করে বিশ্বেশ্বরের সর্বাঙ্গে সর্পাকৃতি করা হয়। বিগ্রহের মাথায় দেওয়া হয় রক্ত চন্দন।

আতপ চাল, দূর্বা, বিল্বপত্র ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত অর্ঘ্য প্রদান করে নানাবিধ পুষ্পমাল্য দ্বারা ভূষিত করে পরিশেষে আরম্ভ হয় আরতি। পাঁচজন ব্রাহ্মণ একসঙ্গে পাঁচটি পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে আরতি করেন।

বিশ্বেশ্বরের মন্দির মহারাজ রণজিৎ সিংহ কর্তৃক সুবর্ণমণ্ডিত। মন্দিরের

চারপাশে নানাবিধ দেবদেবীর প্রতিমূর্তি। প্রধান দ্বার দক্ষিণ অভিমুখী। পশ্চিমদিকে যে ক্ষুদ্র দ্বার, তার বাইরে ভৈরবনাথ। ভৈরবনাথ দর্শনের পর বিশ্বেশ্বরের কাছারিতে যেতে হয়। উত্তর দিকের পশ্চিম দ্বারে পার্বতী মূর্তি। পূর্বদ্বারে স্থাপিত অন্নপূর্ণা মূর্তি। দক্ষিণদিকের পূর্বধারে শিব এবং বিশ্বেশ্বরের নন্দীশ্বর বিদ্যমান। এই মন্দির চারটি দ্বার বিশিষ্ট। পশ্চিম দ্বারের সামনেই অবস্থিত নাট মন্দির। নাট মন্দিরের ঠিক মাঝখানে হরিশচন্দ্র স্থাপিত শিব। নাটমন্দিরের পশ্চিমে দণ্ডপাণীশ্বর শিব। নাটমন্দিরে ও অপরাপর স্থানে রাজাদের স্থাপিত শিবমূর্তি বিরাজমান। মন্দিরের পশ্চিমদিকে সভামণ্ডপ। এই সভামণ্ডপেও অনেকগুলি শিবলিঙ্গ এবং অন্যান্য দেব-দেবীর মন্দির বিদ্যমান।

উত্তরে 'জ্ঞানবাপী' নামে প্রসিদ্ধ কূপ। উত্তর দিকে বিশ্বেশ্বরের প্রাচীন মন্দির। এই মন্দিরের উত্তরে পঞ্চপাণ্ডবের তৈরী পাঁচটি শিব। এই মহল্লার পশ্চিম ফটকের উত্তরদিকে ঢুণ্ঢী গণেশ। ফটকের দক্ষিণে অন্নপূর্ণার বাটী।

দেবী অন্নপূর্ণার বাটীতে ঈশাণ কোণে কুবেরেশ্বর, অগ্নিকোণে সূর্য নারায়ণ, নৈঋ‌ত কোণে গণেশ এবং পশ্চিম দিকে চতুর্ভুজ নারায়ণ। রাস্তার উত্তরে অক্ষয়বট এবং বড় হনুমান। দক্ষিণে শনৈশ্চর দেবতা। এর পশ্চিমে বিশ্বেশ্বরের গদী।

পঞ্চক্রোশ বিশিষ্ট কাশী অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি। উত্তরবাহিনী গঙ্গা। অসি সঙ্গম-স্থলে সঙ্গমেশ্বর শিব। কাশীস্থিত চৌষট্টি যোগিনীর ঘাটে কেদারেশ্বর শিব বিদ্যমান। কাশীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ স্থান কেদারেশ্বর ঘাট। এই স্থানে গৌরীকুণ্ড, চক্রতীর্থ, আদিমণিকর্ণিকা এবং মহাশ্মশান।

কেদারেশ্বরের বাটীটি বৃহৎ। বাটীর মধ্যস্থলে কেদারের পিণ্ডাকৃতি মূর্তি। বাটীর ভেতরে চারদিকে নানা দেব দেবীর মূতি সকল বর্তমান। মন্দিরের উত্তরপার্শ্বে অন্নপূর্ণা, কার্ত্তিক, গণেশ এং পার্ব্বতী মূর্তি। দক্ষিণ দিকে তৈলঙ্গ দেশীয় ধাতুনির্মিত রাম-সীতা এবং নারায়ণ মূর্তি। পশ্চিমে লক্ষ্মী নারায়ণ এবং কালীদেবী। দক্ষিণপার্শ্বে নারায়ণ এবং সর্বত্র শিবময়। পূর্বদিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা। ঘাটের উত্তরাংশে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব এবং তৎস্থানে অনেক দেবদেবী বিদ্যমান। ঘাটের দক্ষিণাংশে মঞ্চোপরি মহাশ্মশানবাসী শিব বর্তমান।

দক্ষিণ মানসে অবস্থিত প্রধান প্রধান দেবদেবীদের তীর্থ মধ্যে উল্লেখযোগ্য

কেদারেশ্বর, নীলকণ্ঠেশ্বর, চিন্তামণি, গণেশ, ছোট হনুমান, লোলার্ক তীর্থ, লোকার্কেশ্বর, লোলার্কাদিত্য, অমরেশ্বর, অর্কবিনায়ক, অসিসঙ্গম, জগন্নাথজীউ, পুষ্করতীর্থ, কুরুক্ষেত্রতীর্থ, দুর্গাকুণ্ড, দুর্গাবিনায়ক, দুর্গাদেবী, ভদ্রকালী, কুক্কুটেশ্বর, মহামায়া, রেণুকা, তিলেভাণ্ডেশ্বর প্রভৃতি।

জগন্নাথজীর বাটীর ভেতরের পূর্বদিকে অবস্থিত রাধাকৃষ্ণ বিগ্রহ। দক্ষিণ-দিকে নৃসিংহদেব, পশ্চিমে শ্রীরাম-লক্ষ্মণ, ভরত, শত্রুঘ্ন ও জানকী এই পাঁচ মূর্তি।

তিলেভাণ্ডেশ্বর জালার আকৃতি সদৃশ। এই বিগ্রহ প্রতিদিন তিল পরিমাণ বৃদ্ধি পান। লোলার্কতীর্থ এক কুণ্ড। কুণ্ডের জল সকল সময়ে বর্ণান্তরিত হয়। দুর্গাকুণ্ড প্রকৃতপক্ষে একটি পুষ্করিণী। কুণ্ড মধ্যে বৃহদাকৃতির মৎস্য ও কচ্ছপ ছিল। দুর্গাবিনায়ক পূর্ব-দক্ষিণ কোণে অবস্থিত। দক্ষিণ দিকে দুর্গাদেবীর ভবন। ভবনে দশভুজা মূর্তি বিদ্যমান। মন্দিরের পশ্চিমদিকের দক্ষিণকোণে কালী মূর্তি বিরাজমান। কাশীতে একমাত্র দুর্গাদেবীর বাটী ভিন্ন অপর কোথাও ছাগাদি বলিদানের প্রথা নেই।

কাশীর পশ্চিমস্থিত দেবদেবী ও তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য পাতালেশ্বর, পুষ্পদন্তেশ্বর, গরুড়েশ্বর, অগস্ত্যেশ্বর, লোপামুদ্রা, কাশ্যপেশ্বর, হরিকেশব, বিমলাদিত্য, ধ্রুবেশ্বর, সূর্যকুণ্ড, সাম্বাদিত্য, লক্ষ্মীকুণ্ড, লক্ষ্মণদেবী, রামকুণ্ড, রামেশ্বর, লবেশ্বর, কুশেশ্বর, বটুকনাথ, কামাখ্যাদেবী, বৈদ্যনাথ, শঙ্খধারা, শঙ্খুকর্ণ এবং মহাদেব। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে আরও অনেক সংখ্যক দেবদেবীর মূর্তি বিরাজমান।

উত্তর মানসে অবস্থিত উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান ও বিগ্রহের মধ্যে মণিকর্ণি-কেশ্বর, সিদ্ধবিনায়ক, সঙ্কটাদেবী, বশিষ্ঠ, বামদেব, হরিশ্চন্দ্রেশ্বর, আত্মবীরেশ্বর, মঙ্গলেশ্বর, বুধেশ্বর, বৃহস্পতীশ্বর, নাগেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর, গভস্তীশ্বর, মঙ্গলাগৌরী, ময়ূখাদিত্য, লছমন বাবা, বিন্দুমাধব, পঞ্চগঙ্গেশ্বর, পাপভক্ষেশ্বর, কালভৈরব, নবগৃহেশ্বর, দণ্ডপাণিভৈরব, মহাকালেশ্বর, রত্নেশ্বর, কৃত্তিবাসেশ্বর, বৃদ্ধকালতীর্থ, অমৃতকুণ্ডতীর্থ, ধন্বন্তরী-কূপ, ঋণমোচন, পাপমোচন, কপালমোচন, তরণী, বৈতরণী তীর্থ এবং লাট ভৈরব। লাটভৈরবে ভৈরবের দণ্ড এবং ভৈরবের জাঁতা বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত বাগীশ্বরী, গুহ, যাগেশ্বর, ঈশ্বরগঙ্গা, গণেশ, জম্বু-কেশ্বর, মন্দাকিনী তীর্থ, ভূত-ভৈরব, নিবাসেশ্বর, কন্দুকেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বর, জ্যেষ্ঠা-গৌরী, জ্যৈষ্ঠেশ্বর, কাশীদেবী, সপ্তসাগরতীর্থ, করণঘাট তীর্থ, চিত্রগুপ্তেশ্বর,

চিত্রঘণ্টাদেবী, পশুপতীশ্বর, লাঙ্গলেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, অপ্সরেশ্বর, তারকেশ্বর, নন্দীকেশ্বর, জ্ঞানেশ্বর, জ্ঞানবাপী ইত্যাদি প্রধান প্রধান দেবদেবী এবং তীর্থক্ষেত্র সমূহ অবস্থিত।

কাশীস্থিত পঞ্চতীর্থের মধ্যে সঙ্গমতীর্থে সঙ্গমেশ্বর শিব। দশাশ্বমেধ তীর্থে দশাশ্বমেধেশ্বর ও শীতলা দেবী। বরুণাসঙ্গমে বরুণা সঙ্গমেশ্বর, আদিকেশব ইত্যাদি। পঞ্চগঙ্গাতীর্থে পঞ্চগঙ্গেশ্বর ও বিন্দুমাধব। মণিকর্ণিকা-তীর্থে মণিকর্ণিকেশ্বর শিব। এতদ্ভিন্ন বিশ্বেশ্বর, অন্নপূর্ণা এবং ঢুন্টিরাজ গণেশ।

কাশীর দুর্গাকুণ্ড থেকে কদম্বেশ্বর আড়াই ক্রোশ। লেঙ্গুটিয়া হনুমান থেকে ভীমচণ্ডী তিনক্রোশ। ভীমচণ্ডীতে চণ্ডীবিনায়ক এবং চণ্ডীদেবীর অধিষ্ঠান। ভীমচণ্ডী থেকে সিন্ধুসাগরের দূরত্ব তিন ক্রোশ। সিন্ধুসাগর থেকে রামেশ্বর চার ক্রোশ। বরণা ঘাটের ওপরে রামেশ্বর শিব। রামেশ্বর থেকে শিবপুর তিন ক্রোশ। শিবপুর থেকে সারঙ্গতলাব চার ক্রোশ। সারঙ্গ তলাবে দশ অবতারের ঝাঁকি অনুষ্ঠিত হয়। কপিলধারায় কপিলেশ্বর শিব বিদ্যমান।

কাশীতে দেবদেবী ও তীর্থস্থানের সংখ্যা অগণিত। কাশী খুব প্রাচীন সহর। সহরস্থিত প্রস্তরনির্মিত অট্টালিকাসমূহ বৃহদাকৃতির। ঘনবসতি পূর্ণ কাশীতে দুটি বাটীর মধ্যস্থলে মাত্র দেড় হাত পরিমিত পথ বর্তমান। কাশীতে বহুসংখ্যক সঙ্কীর্ণ গলি বিদ্যমান। এক একটি ফটকের মধ্যে ছয় সাতটি করে গলি বর্তমান। গলি মধ্যে প্রবেশ করে পথের সন্ধান লাভ খুব দুরূহ ব্যাপার। কাশীতে বহু সংখ্যক গঞ্জ ও বাজারের অবস্থিতি। এদের মধ্যে ত্রিলোচনগঞ্জ, বিশ্বেশ্বর গঞ্জ, বাবুর বাজার, চেৎগঞ্জ, খেজুরা, চক-চাঁদনী, নূতন চক, ঠঠেরি বাজার, চৌখাম্বা বাজার, মছলি হাট্টা, রেশম কটরা, কেনারী পট্টি, সেকেন্দার গঞ্জ, গন্ধি কটরা, বাদশাহী বাজার, বাঙ্গালী টোলার বাজার, তরকারী বাজার, দশাশ্বমেধের বাজার, মানস সরোবরের বাজার উল্লেখযোগ্য।

কাশীতে তরী তরকারী সের বা মণদরে বিক্রয় হ'ত না। পানেরও বাজার হয় এখানে। পান বিক্রয় হয় গাট্টা দরে। দুই শতটি পানে এক গাট্টা।

চক-চাঁদনীতে মনোহারী দোকানের অবস্থান। চকের শোভা বিকালবেলায় দৃষ্ট হয়। ঠঠেরি বাজারে কাঁসা, পেতল, তামা ইত্যাদির বাসন বিক্রয় হয়ে

থাকে। চৌখাম্বার বাজারে সকল দ্রব্যাদির দোকান অবস্থিত। এখানে উৎকৃষ্ট তামাকের দোকানও আছে। বড়বাজারে হালুইকরদের দোকান। দালমণ্ডী বাইদের থাকবার স্থান। মছলিহাট্টাতে বিক্রয় হয় মৎস্য। রেশম কটরায় রেশমের দোকানসমূহ বর্তমান। এখানে জোলাগণ 'বারাণসী' শাড়ী তৈরী করে থাকে। কেনারিপট্টিতে—গোটাকেনারি, কিরণ, জরি, পাল্লা, ভিল্লা, গখরু, বিনাবট ইত্যাদির দোকান। জহুরী পট্টিতে জহরতের অঙ্গুরীয়, মোতি প্রবালাদির দোকান। সেকেন্দরগঞ্জে বিক্রয় হয় গম, যব, তিসি, সরিষা ইত্যাদি দ্রব্য সকল। গন্ধি কটরাতে আতর, গোলাপ, ফুলেল ইত্যাদি সুগন্ধি দ্রব্যাদি বিক্রয় হয়। সটীতে বিক্রয় হয় আম।

অসিসঙ্গম কাশীর প্রান্তভাগ। সহর মধ্যভাগে অবস্থিত নয়। তিনদিকে মাঠ। পূর্ব্বদিকে উত্তরবাহিনী গঙ্গা, তার পূর্ব্বপারে রামনগর। কাশীর রাজা চেৎ সিংহের প্রাসাদ এইস্থানে। স্থানটি খুব মনোরম। কাশী সহরের ভেতরে যতটা গরম, এখানে সে তুলনায় উত্তাপের পরিমাণ কিছু কম। তবু গ্রীষ্মে প্রচণ্ড গরম অনুভূত হয়। রৌদ্রের তাপে বাইরে বেরোন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

ভাদ্রমাসের শুক্লা তৃতীয়াতে কাশীপ্রদেশে তিল-তৃতীয়া নামক এক ব্রত অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। এই ব্রতানুষ্ঠানে স্ত্রীলোকগণ সারাদিন উপবাসী থেকে রাত্রে হরগৌরী পূজা করে। সঙ্গতি অনুযায়ী এইদিন সকলে নূতন নূতন বস্ত্র ও অলঙ্কারে সুসজ্জিত হয়ে মঙ্গলাগৌরী দর্শন ও পূজা করতে যায়।

গণেশ চৌথের দিন কাশীতে রাত্রিবেলা গণেশ পূজা হয়। এইদিন কাশীস্থিত মহারাষ্ট্রীয়দের প্রায় প্রতিটি গৃহেই বেদপাঠ এবং নৃত্য গীতাদির আয়োজন লক্ষিত হয়ে থাকে।

ভাদ্রমাসের শুক্লাদ্বাদশী তিথিতে কাশীতে বরণাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এইদিন বরণাসঙ্গমে স্নান তর্পণ এবং আদিকেশব ও বরণেশ্বরের যাত্রার আয়োজন লক্ষিত হয়। শারদীয়া পূজার সময় দুর্গাবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয় নবরাত্রের মেলা।

কাশী থেকে চার ক্রোশ রাজার তলা ও মেড়ুয়াডিহি। মেড়ুয়াডিহি থেকে পাঁচ ক্রোশ তামেচাবাদ। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ মহারাজগঞ্জ। মহারাজ গঞ্জ থেকে গোপীগঞ্জ পুনরায় পাঁচ ক্রোশের পথ। গোপীগঞ্জ থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে হাড়িয়া। হাড়িয়া থেকে হনুমান গঞ্জের দূরত্ব দুই ক্রোশ। এখান থেকে পুনরায় আট ক্রোশ গেলে তবে ঝুশীগ্রাম। ঝুশী থেকে নৌকাযোগে গঙ্গাপার

হয়ে একক্রোশ গেলে ত্রিধারা বেণীঘাট এবং প্রয়াগতীর্থ।

প্রয়াগী সকল অত্যন্ত অর্থলোলুপ এবং নির্দয় প্রকৃতির। এলাহাবাদ সহরটি উত্তম। সহরটি পাঁচ ক্রোশ বিস্তৃত। সহরমধ্যে পাঁচটি প্রধান বাজার। দারাগঞ্জ সহরে বেণীমাধবের মন্দির অবস্থিত। কর্নেলগঞ্জে অবস্থিত ভরদ্বাজ মুনীর আশ্রম। কিটগঞ্জ, মুঠিগঞ্জ, কটরা বাজার, ছাউনীতে বড় বাজার চক। এইস্থানে কোতয়ালী সহরের প্রধান বাজার বর্তমান। এই বাজারের পশ্চিমে ফুতগঞ্জের বাজার। এতদ্ভিন্ন এখানকার বেণী কিনারার বাজার, উত্তরদিকে অবস্থিত বেড়ুয়াঘাটের বাজার প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। প্রয়াগ তীরে ষোলশত প্রয়াগী পাণ্ডার বসতি ছিল যে সময়ে যদুনাথ প্রয়াগ পর্যটনে গিয়েছিলেন।

প্রয়াগে যুক্তবেণী, গঙ্গা-যমুনার সঙ্গম, অন্তঃসলিলা সরস্বতী বিদ্যমান। প্রয়াগের প্রধান দেবতা বেণীমাধব। প্রয়াগে প্রবেশমাত্র মস্তকমুণ্ডন এবং তীর্থোপবাস করবার রীতি প্রচলিত। এইখানকার দেবদেবী এবং তীর্থস্থান সমূহের মধ্যে অক্ষয়বট, ভরদ্বাজ, সোমেশ্বর শিব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। যমুনার তীরে ত্রিবেণী সঙ্গমে স্থাপিত কেল্লাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এটি প্রস্তরনির্মিত। কেল্লার ভেতরে অক্ষয়বট। এতদ্ব্যতীত বাদশাহের শীশমহল, আয়না মহল, লাল-মহল, দেওয়ান-আম, খাস ইত্যাদিও কেল্লার মধ্যেই অবস্থিত। কেল্লায় প্রায় কুড়ি হাত নীচে অন্ধকার ভূমিমধ্যে অবস্থিত প্রসিদ্ধ অক্ষয়বট। বিনা আলোয় এই স্থানে প্রবেশ প্রায় অসম্ভব বলা চলে। এই স্থানে দু'টি বৃক্ষ অবস্থিত। প্রথম বৃক্ষটি আসল অক্ষয়বট নয়। আসল অক্ষয়বট এর পর প্রায় কুড়ি হাত নিচে গেলে দেখা যায়। গাছটি বক্রভাবে বিরাজমান। এর নীচে সরস্বতী এবং উপরে কেল্লা। প্রয়াগের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর।

প্রয়াগ থেকে আটক্রোশ দুর্গাগঞ্জ। এখান থেকে আবার দুইক্রোশ ইমামগঞ্জ। ইমামগঞ্জ থেকে গোলামীপুর আট ক্রোশ। এর পরে ভূধরের সরাই। ভূধরের সরাই থেকে চৌধুরীর সরাই দশ ক্রোশ। চৌধুরীর সরাই থেকে বারো ক্রোশ কুঙরপুর। কুঙরপুর থেকে খাজুয়া পুনরায় পাঁচ ক্রোশ। খাজুয়া থেকে আটক্রোশ কানপুর। কানপুর সহরটি গঙ্গার নিকটেই। কানপুরের উত্তর পশ্চিমে আটক্রোশ বিঠোর।[৬] বিঠোরে বাল্মীকি মুনির তপোবন, সীতার বনবাসস্থান এবং লবকুশের জন্মভূমি অবস্থিত। বিঠোর থেকে কান্যকুব্জের

দূরত্ব ছয় ক্রোশ।[৭] কান্যকুব্জে কনৌজ ব্রাহ্মণগণের বসতি। কান্যকুব্জ সহরটি অতি প্রাচীন। সহরটি গঙ্গার তীরে অবস্থিত। পূর্বে এখানে অনেক পণ্ডিতের বাস ছিল। সহরটির নানাস্থানে শিবমন্দির এবং অপরাপর দেবালয় বিদ্যমান। এখানে গঙ্গা পার হলেই লক্ষ্ণৌ সহরের শুরু।

গোমতী নদীর তীরে অবস্থিত লক্ষ্ণৌ সহরটি উপযুক্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। স্থানটি অতি উত্তম। লক্ষ্ণৌয়ের অধিবাসীরা অত্যন্ত উগ্র স্বভাবের এবং মহাবলশালী। লক্ষ্ণৌয়ে নবাবের বাটী দুর্গ মধ্যে বাটীটি অতি উত্তম এবং সাততলা বিশিষ্ট। লক্ষ্ণৌয়ে মচ্ছিভবন নামে এক বৃহৎ বাটী বর্তমান। এই বাটীর ভেতরে ফল ফুলের বাগান এবং পুষ্করিণী অবস্থিত। নবাবদের কবরস্থান এবং কোষাগার এর মৃত্তিকার ভেতর। মচ্ছিভবনের চতুষ্পার্শ্বে কামান বসান আছে। এখানে মৃত নবাবদের ধন-সম্পত্তি গজগির[৮] করে রাখা হত।

লক্ষ্ণৌ সহর পরিভ্রমণান্তে যদুনাথ অযোধ্যায় সরযূ নদী অতিক্রম করেন। অযোধ্যায় রামচন্দ্রের রাজধানী বলে পরিচিত স্থানসমূহ বন-জঙ্গলে পূর্ণ। এর মধ্যে লোকের বসতি এবং রাম-সীতার মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। রামনবমী তিথিতে অযোধ্যায় মেলা অনুষ্ঠিত হয়। অযোধ্যায় রামাৎ বৈষ্ণবগণের বাস। এঁদের সংখ্যা তখন ছিল প্রায় পাঁচ-ছয় হাজারের মত। রামের জন্মভূমি এবং হনুমানগড়িতে এঁদের বসতি। এঁরা সর্বদাই সাধন-ভজনায় মত্ত থাকতেন। অযোধ্যায় বৃহৎ বৃহৎ হনুমান দেখতে পাওয়া যায়। যে স্থানে রামচন্দ্রের সিংহাসন ছিল, সে স্থানটি উচ্চ দ্বীপের ন্যায়। অযোধ্যার রাজধানীর বিস্তার ছিল প্রায় দশ ক্রোশ ব্যাপী।

যদুনাথ মিথিলায় গঙ্গা পার হয়ে ভ্রমণ করলেন। ইতিমধ্যে নৈমিষারণ্যও[৯] ভ্রমণ করলেন। নৈমিষারণ্যে, সে সময় ছিল বহু সন্ন্যাসীর বাস। নানাবিধ পুষ্পে বনটি ছিল সুশোভিত। অতঃপর এখান থেকে যদুনাথ অযোধ্যার পথ হয়ে উপনীত হলেন সেকেন্দ্রায়। সেকেন্দ্রা থেকে চার ক্রোশ গেলে চতুর্মুখে রাস্তা। ঈশানের পথে ফরেক্কাবাদ[১০] ইত্যাদি এবং পশ্চিমের পথে আগ্রা। এই পথ দিয়ে চার ক্রোশ গেলে পড়ে বেউর গ্রাম। এখান থেকে বিগরাইয়ের বাজার সরাই দু'ক্রোশ গেলে মিঠেপুরের বাজার সরাই। মিঠেপুর থেকে শকুয়াবাদের[১১] বাজার এবং শকুয়াবাদের বাজারের বারো ক্রোশ দূরবর্তী রাজারটাল। এখান থেকে যাত্রা করে যদুনাথ পুনরায় পাঁচ ক্রোশ পরে উপস্থিত হলেন

উশানীতে। উশানীতে তিল, চানা, ছাতু প্রভৃতি জলযোগ করে গিয়ে উপস্থিত হলেন খাঁদানি গ্রামে। খাঁদানি গ্রাম থেকে মথুরা-বৃন্দাবনের পথ দু'টি—একটি পথ পশ্চিম মুখে আগ্রা হয়ে এবং অপরটি ঈশান মুখে বলদেব হয়ে।[১২] যদুনাথ এই শেষোক্ত পথেই বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। নয় ক্রোশ যাবার পর যদুনাথ গিয়ে উপস্থিত হলেন বলদেবে। এখানে বলদেবের সুবৃহৎ মূর্তি অবস্থিত। এখানকার পাণ্ডাগণ ভীমাকৃতি এবং অত্যন্ত নিষ্ঠুর। পূর্বদিকে বলদেবকুণ্ড, ভোগমন্দির ইত্যাদি অবস্থিত। বলদেবের প্রসাদ পুরী এবং কচুরি।

বলদেব থেকে পাঁচ ক্রোশ গেলে ব্রহ্মাণ্ড ঘাট।[১৩] যদুনাথ যমুনাতে স্নান করে মহাবন[১৪] পরিভ্রমণ করে শ্রীকৃষ্ণের জন্মভূমি, সূতিকাগৃহ, ষষ্ঠীপূজার গৃহ, ধূলাখেলার স্থান ইত্যাদি দর্শন করলেন। অতঃপর এখান থেকে গোকুল দর্শন করে যমুনা অতিক্রম করে দুই ক্রোশ গিয়ে যদুনাথ মথুরায় পৌছালেন। মথুরায় বিশ্রামঘাটে স্নান, মুকুট দর্শন, ধ্রুবঘাটে শ্রাদ্ধাদি করে মথুরামণ্ডল দর্শনান্তে পুনরায় তিন ক্রোশ গিয়ে তিনি বৃন্দাবনে প্রবেশ করলেন। বৃন্দাবনে গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহন—এই তিন প্রধান দেবালয়।

মথুরায় প্রধান ঘাট চব্বিশটি। এই সকল ঘাটে স্নান-দানের রীতি প্রচলিত। মথুরা নগরীর উত্তর দ্বার জয়সিংহ এবং দক্ষিণদ্বার 'কো' নামে পরিচিত। বসুদেব কংসভয়ে ভীত হয়ে তাঁর সদ্যোজাত সন্তান কৃষ্ণকে কারাগার থেকে নিয়ে যখন নন্দালয় অভিমুখে যাচ্ছিলেন, সেই সময়ে যমুনা নদীর মধ্যস্থলে তাঁর ক্রোড় থেকে কৃষ্ণ পড়ে যান। বসুদেব তখন পুত্রশোকে ঐ স্থান থেকে নাকি বলেছিলেন, 'কো মেরে বালকো হরণ কিয়া?'—অর্থাৎ 'কে আমার পুত্রকে হরণ করলেন।' বসুদেবের এইরূপ উক্তিতে যমুনার মধ্যস্থলে নাকি চড়ার সৃষ্টি হয় এবং বসুদেব পুনরায় কৃষ্ণকে ফিরে পান। তদবধি স্থানটি 'কো' নামে পরিচিত হয়। কো গ্রামটি যমুনার ঠিক মধ্যস্থলে। গ্রামটির বৈশিষ্ট্য এই যে, কখনও যমুনার জলে পূর্ণ হয় না। অথচ উল্লেখযোগ্য, গ্রামের দুই দিক দিয়েই কিন্তু যমুনা প্রবাহিত।

মথুরায় বহুসংখ্যক দেবদেবীর বিগ্রহ বিদ্যমান। মথুরা নগরে সে সময়ে প্রায় একলক্ষ বসতি ছিল। এখানে সাম, যজুঃ, ঋক্‌ ও অথর্ব এ চারিবেদের ব্রাহ্মণ ছিল। মৈথিলী, দ্রাবিড়ী ও কাশ্মীরিগণ মহাপণ্ডিত এবং বেদশাস্ত্রে

ছিলেন সুপণ্ডিত। মথুরায় 'চৌবেগণ' 'মিঠেচৌবে' নামে পরিচিত এতদ্ব্যতীত মথুরায় 'কড়ুয়া' চৌবেদেরও বাস ছিল। কান্যকুব্জ ব্রাহ্মণগণের মধ্যে দু'টি শ্রেণী দোবে এবং চৌবে। কড়ুয়া চৌবেগণ ব্যবসা-বাণিজ্য শাস্ত্র অধ্যয়ণ, আবার অনেক সময় সিপাহির কার্যও করত। যারা মিঠে চৌবে, তারা কেবল যাত্রীদের কর্মাদি করত। যে সকল যাত্রী মথুরা-বৃন্দাবন পর্যটনে এসে থাকে, কড়ুয়া চৌবেগণ তাদের চৌবে হয়ে মথুরা পরিক্রমা, স্নানদান, শ্রাদ্ধ ইত্যাদি করিয়ে উপার্জন করে। চৌবেরা অশিক্ষিত। এরা অত্যধিক সিদ্ধি ভক্ষণ করে। এরা সারাদিনে সর্বমোট চারবার সিদ্ধি ভক্ষণ করে। এই চারবারে সিদ্ধির চারটি নাম প্রচলিত। প্রাতঃকালের নামে কাকাবাসী ; মধ্যাহ্নের নাম ভোগ-বিলাসী, বৈকালে পরিচিত দৌলতবাসী নামে এবং সন্ধ্যার পর পরিচিত হয় সত্যনাশী নামে। এদের গৃহকার্য সকল সম্পাদন করে স্ত্রীলোকেরা। চৌবেরা প্রাতে উঠেই সিদ্ধি আর লোটা ডুরি নিয়ে বাগিচাতে গমন করে। বাগিচা একটি ঘেরা স্থান। এখানে একটা অশ্বথ অথবা বট, কখনও বা নিম কিংবা যজ্ঞডুমুর অথবা বাবলা গাছ থাকে। বৃক্ষ যাই হোক না কেন, একটি মাত্র বৃক্ষ থাকলেও তা বাগিচা নামে পরিচিত হয়। এই বাগিচাতে থাকে এক জোড়া মুগুর। আর আছে এখানে কুস্তীর আখড়া। এই বাগিচাতে সিদ্ধি খেয়ে প্রাতঃকৃত্য সম্পাদন করে চৌবেগণ কুস্তী করতে থাকে। অতঃপর বেলা দু' প্রহরের সময় পুনর্বার ভাঙ্গ খেয়ে তারপর স্নান করতে যায়। স্নানান্তে গৃহে গমন করে রুটি আহার করে। আহারাদির পর গৃহ থেকে বেরিয়ে যায়। পুনরায় গভীর রাত্রে ভাঙ্গ ভক্ষণ করে মত্ত অবস্থায় গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। চৌবেনীদের উপার্জিত নাড়ু, পেঁড়া, অমৃতি, বরফি, রাবড়ী ইত্যাদি ভক্ষণ করে এবং নিদ্রা যায়। চৌবেদের উপার্জনের স্থান বিশ্রাম ঘাট। এই ঘাটে স্নানান্তে যে যা দান করে, তা চৌবেদের প্রাপ্য। যার যে পুরোহিত, চৌবে দান দ্রব্যাদিও তারই প্রাপ্য। মথুরায় নানাদেশীয় শেঠদের বসতি। সুরাট, বোম্বাই, গুজরাট, উজ্জয়িণী, আজমীঢ়, বিকানীর গোয়ালিয়র, উদয়-পুর, জয়পুর, ভরতপুর, পাঞ্জাব, দিল্লী, লক্ষ্ণৌ, ফরকাবাদ, বিঠৌর, কোটা, বুন্দেলখণ্ড, বেতুর, কাশী, মির্জাপুর প্রভৃতি স্থানের শেঠগণ ছিলেন খুব ধনী।

মথুরাস্থিত দ্বারকাধীশ নীলকান্ত, পোখরাজ, মুক্তা প্রভৃতি মুল্যবান আভরণে সজ্জিত। দ্বারকাধীশকে তিন সময় নতুন নতুন পোশাকের দ্বারা সজ্জিত

করা হয়। অচল যাত্রা উৎসবে দ্বারকাধীশের চিত্রপটটি কেবলাত্র মন্দিরের বাইরে আনা হয়। যে স্থানে দ্বারকাধীশের মন্দির, ঐ স্থানে কৃষ্ণ নাকি কংস বধের পর রাজসিংহাসন স্থাপন করেছিলেন। এজন্য এই স্থানে মথুরানাথ লক্ষ্মীনারায়ণ স্থাপিত আছেন। যখন কৃষ্ণ দ্বারকাগমন করেন, তখন লক্ষ্মী নারায়ণ মূর্তি পটে ছিলেন।

নিকটে কংসটীলা। যমুনাতীরে কংস রাজার অন্তঃপুর যেস্থানে অবস্থিত ছিল, সেইখানে অবস্থিত কেল্লাটি ভগ্নদশাপ্রাপ্ত। কংসের বাটী থেকে রঙ্গভূমি পর্যন্ত কংসালয়। এ'টি মধুপুরী নামেও পরিচিত। মধুপুরীর চারটি দ্বার এবং চারটি দ্বারে চারটি অনাদি শিব অধিষ্ঠিত। এদের মধ্যে পূর্বদ্বারে পিপুড়েশ্বর। দক্ষিণদ্বারের শিব রঙ্গেশ্বর। পশ্চিমদ্বারে ভূতেশ্বর। এখানে পাতালপুরী বিদ্যমান। মাহেশ্বরী দেবীর মহাপীঠ ভগবতীর এখানে অঙ্গপতন হয়েছিল। উত্তরদ্বারে অবস্থিত গোকর্ণেশ্বর। এই চার শিব মধুপুরী রক্ষায় আসীন। গোকর্ণেশ্বরের মন্দির যমুনার তীরে।

ধ্রুবটীলা,[১৫] সপ্তঋষিটীলা,[১৬] বালটীলা,[১৭] কংসটীলা[১৮] প্রভৃতি স্থানসমূহও মথুরামণ্ডলের অন্তর্গত। এতদ্ব্যতীত একটি পর্বত ওপরে প্রস্তর পিণ্ডাকৃতি মহাবিদ্যাদেবী চোবেদের ইষ্টদেবী।

কৃষ্ণের জন্মভূমি কংসের কারাগারের মধ্যে। এর কিছু দূরেই পোতরাকুণ্ড। এই কুণ্ডে দেবকী নাকি তাঁর প্রসবের বস্ত্র সমূহ প্রক্ষালন করেছিলেন। এর দক্ষিণে বজ্রস্থাপিত কেশবদেব মূর্তি আসীন। বলদেবের মন্দির অবস্থিত বিপুড়েশ্বর শিবের দক্ষিণে। সহরের মধ্যে টীলার ওপর কুব্জানাথের মন্দির। চুড়িওয়ালা শেঠের বাটীতে অবস্থিত মদনমোহনের মন্দির। এই সব দেবালয়ে ঝুলন অনুষ্ঠিত হয় পনের দিন ধরে। কিন্তু দ্বারকাধীশের মন্দিরে ঝুলন হয় এক মাস ব্যাপী। দেওয়ালী এবং ভরত-বিলাপে সমগ্র মধুপুরীকে সুসজ্জিত হতে দেখা যায়।

মধুপুরীস্থিত যমুনার যে সকল ঘাটে স্নান-তর্পণ-দান ইত্যাদি করবার রীতি প্রচলিত, তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য মথুরার পঁচিশটি ঘাট ও তীর্থ। এদের অন্যতম বিশ্রান্তঘাট। বিশ্রান্তঘাটের দক্ষিণে বারোটি ঘাট এবং উত্তরেও বারোটি ঘাট অবস্থিত। কৃষ্ণ এবং বলরাম কংস বধের পর যে ঘাটে বসে বিশ্রাম করেছিলেন, তাই পরিচিত 'বিশ্রামঘাট' নামে। বিশ্রামঘাটে একটি মন্দির বর্তমান। মন্দির

অভ্যন্তরে অবস্থিত একটি গদির ওপর নানাবিধ পুষ্প ও চন্দনে শোভিত একটি মুকুট বিদ্যমান। এ ঘাটটি চৌবেদের অধিকারভুক্ত। এখানে স্নান দানাদি করলে তা চৌবেদের প্রাপ্য হয়। এই ঘাটে প্রতিদিন সময়ে সময়ে পূজা আরতি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা দশমী তিথিতে এখানে কংস বধ লীলার আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। সন্ধ্যার সময় কংস বধ লীলা অনুষ্ঠিত হবার পর, কৃষ্ণ ও বলরাম সাজে সজ্জিত দু'টি বালক বিশ্রান্ত ঘাটে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করে।

মথুরাধামে প্রচলিত কংসমেলা সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। মথুরাস্থিত চৌবেগণের সকলেই মল্লযুদ্ধের বেশ ধারণ করে, রঙ্গভূমির মাটি অঙ্গে মর্দন করে, গলায় মালা পরিধান করে, গদাকৃতি একটি লাঠি ধারণ করে প্রচুর পরিমাণে সিদ্ধি ভক্ষণ করে। তারপর উন্মত্ত অবস্থায় 'শুরসে শুরসে' ধ্বনি করে বিকট-মূর্তিতে নৃত্য করতে করতে নগর পর্যটনে বের হয়। এইরূপে বহু দল বের হয়। চারদণ্ড বেলা থাকতে কংসটীলার ওপরে স্থাপিত মঞ্চের ওপরে ঢাল তরবারিতে সজ্জিত একটি কৃত্রিম কংসের মূর্তি বসিয়ে রাখা হয়। বেলা দু'দণ্ড থাকতে কৃষ্ণ-বলরামের সাজে সজ্জিত দু'জন চৌবে বালক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণ করে রঙ্গভূমির চারদিকে ভ্রমণ করতে থাকে। পরিশেষে সন্ধ্যার কিছু পূর্বে বংশী, শিঙ্গা প্রভৃতির শব্দ মাত্র চৌবেগণ পূর্বোক্ত কংস মূর্তিকে লাঠির দ্বারা আঘাত করতে থাকে। তার পর কংস মূর্তির এক এক টুকরো ধ্বংসাবশেষ লাঠির আগায় নিয়ে লম্ফ-ঝম্প সহকারে কংসটীলা থেকে নেমে আসে। তারপর কৃষ্ণ-বলরাম রূপী বালক দু'টিকে বেষ্টন করে নৃত্য করতে থাকে। পরে কৃষ্ণ এবং বলরাম রূপী চৌবে বালক দু'টিকে কাঁধে করে বিশ্রান্তঘাটে নিয়ে গিয়ে আরতি করে।

বিশ্রান্তঘাটে কার্তিকমাসে যমদ্বিতীয়ায়[১৭] স্নানের মেলা উপলক্ষে বহু জনসমাগম ঘটে। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই দিন যমুনাতে স্নান করলে নাকি যম যন্ত্রণা ভোগ করতে হয় না। স্নানের পর যমুনাতে বস্ত্র ইত্যাদি প্রক্ষালন করা নিষেধ। স্নানের পর প্রত্যেকে সাধ্যমত কিছু কিছু দান করে থাকে।

বিশ্রান্ত ঘাটের দক্ষিণে—গার্গ তীর্থ ঘাট, যোগতীর্থ ঘাট, প্রয়াগ ঘাট, রাম ঘাট, কঙ্খলতীর্থ ঘাট, তিন্দুকতীর্থঘাট, সূর্যঘাট, ধ্রুবঘাট, ঋষিতীর্থঘাট,

মোক্ষতীর্থঘাট, ক্রোটতীর্থ ঘাট ও বৃদ্ধিতীর্থঘাট—এই বারোটি ঘাট অবস্থিত। বিশ্রান্তঘাটের উত্তরদিকে—বরাহক্ষেত্র, বসুদেবঘাট, বৈকুণ্ঠঘাট, ধারাপত, ঘণ্টাভরণ, সোমতীর্থ, কৃষ্ণগঙ্গা, চক্রতীর্থ, সরস্বতীসঙ্গম, দশাশ্বমেধ, গার্গী, সারঙ্গী, নবসঙ্গম—এই দ্বাদশটি ঘাট বিদ্যমান। দশহরার দিন অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠ-মাসের শুক্লা দশমীতে কৃষ্ণগঙ্গাস্নানে বহু জনসমাগম ঘটে থাকে।

ধ্রুবটীলায় ধ্রুবের মূর্তি এবং তাঁর পদচিহ্ন বর্তমান। বলি রাজার তপস্যাস্থান বলিটীলা নামে পরিচিত। বলিটীলায় বলিরাজার মূর্তি অধিষ্ঠিত। কলিযুগের তপস্যার স্থান কলিযুগটীলা। সপ্তঋষির তপস্যার স্থান সপ্তর্ষিটীলা। সরস্বতী সেতু অতিক্রম করে দশাশ্বমেধের ঘাট এবং নওরঙ্গা বাদের মেগাজিন পর্যন্ত চারক্রোশ মথুরা সহর। মথুরা প্রস্থে এক ক্রোশ। এখানকার রমণীরা শ্রীসম্পন্না। চৌবেদের স্ত্রীরা ঘাঘরা পরিধান করে না। শাড়ী, উড়নি ইত্যাদি ব্যবহার করে। মথুরার খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য দধি, পেড়া, খাজা, কুমড়োর মেঠাই ইত্যাদি। মথুরার চৌবেগণ অধিক পরিমাণে মিষ্টান্নাদি ভক্ষণ করে।

রাধাকৃষ্ণের বিহারক্ষেত্র রূপে বৃন্দাবন বহুল পরিচিত। বৃন্দাবনের রক্ষক চারদেবী, চারবট, চারঈশ্বর এবং চারটি সরোবর। বৃন্দাবনে মহোৎসব, নৃত্য-গীত ইত্যাদি লেগেই থাকে। সহরে ঘনবসতি। এখানে বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীদের প্রভাব অত্যধিক।

বৃন্দাবনে প্রবাহিত যমুনাতে—কালীদহ, গোপালঘাট, সূর্যঘাট, প্রস্কন্দন তীর্থঘাট, যুগলঘাট, বিহারঘাট, আবিরঘাট, সিঙ্গারঘাট, চীরঘাট, ভ্রমরঘাট, কেশীঘাট ও রাজঘাট—এই বারোটি ঘাট আসীন। এদের মধ্যে কালীদহের সীমা চার ক্রোশ বিস্তৃত। কালীদহের ঘাটের উত্তরে এক ক্রোশ গমন করলে একটি উচ্চ টীলার ওপর সফরি মুনির আশ্রম অবস্থিত। এই গ্রামটির নাম সনরক এবং দ্বিতীয় গ্রামটির নাম ভণরক। কার্তিকী শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে কালীদহে কালীয় মর্দনের মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সময়ে কাষ্ঠদ্বারা বহুফণা বিশিষ্ট কুণ্ডলাকৃতি একটি সাপ নির্মাণ করে কালীদহ নৌকাযোগে ভ্রমণ করান হয়। অপরাহ্ণকালে কৃষ্ণবেশী একটি বালক কদম্ববৃক্ষ থেকে পূর্বোক্ত সাপের ওপর পতিত হয়ে কালীয় মর্দনের অভিনয় করে থাকে। পরে ঐ বালককে আরতি করে বাদ্য সহকারে গৃহে নিয়ে যাওয়া হয়। গৃহে

প্রত্যাবর্তনের প্রাক্কালে এক চরকিবাজিতে অগ্নি সংযোগ করা হয়। এবং এই অগ্নিসংযোগের মাধ্যমে মেলার পরিসমাপ্তি ঘটে।

কার্ত্তিকী শুক্লা ত্রয়োদশীতে কেশীঘাটে সন্ধ্যার পূর্বে সূর্যাস্তকালে কেশীবধের অভিনয় অনুষ্ঠিত হয়। কৃষ্ণ বেশী একজন কাগজ নির্মিত একটি ঘোড়াকে সংহার করে। কেশীঘাটে সতীর কেশ পতিত হওয়ায় এ'টি কেশ পীঠ বা কেশীঘাট নামে পরিচিত। মথুরার চোবেদের বালক বালিকার অন্নপ্রাশনের সময় এই ঘাটে মস্তক মুণ্ডন করবার রীতি প্রচলিত।

কার্তিকী শুক্লা দ্বাদশী তিথিতে কেতকীবনে কৃষ্ণের দাবানল ভক্ষণের অভিনয় ও এই উপলক্ষে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। নিকটস্থ গৌঘাটেও কার্তিকী শুক্লাষ্টমীতে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়।

শ্রাবণমাসে ব্রজে সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোক রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনায় মগ্ন থাকে। এই সময়ে সকল ব্রজবাসিনী নিজ নিজ গৃহমধ্যে ঝুলনের গীত গেয়ে থাকে। কেউ লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হয় না। ঝুলনের সময় বৃন্দাবনস্থিত দেবালয় সমূহ উত্তমরূপে সজ্জিত করা হয়। সকল দেবালয়েই বিগ্রহ ঝুলন চৌকিতে ঝুলতে থাকেন। এঁদের মধ্যে শ্যামসুন্দর, রাধাদামোদর, বৃন্দাবনচন্দ্র এবং কৃষ্ণচন্দ্র—এই কয়টি বিগ্রহ কেবল ঝুলন চৌকিতে ঝোলেন না। কারণ এই সকল বিগ্রহকে সিংহাসন থেকে অন্যত্র স্থানান্তরিত করবার রীতি নেই। এই সময়ে বৃন্দাবনের স্থানে স্থানে নৃত্যগীত এবং মহোৎসব অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়।

বৃন্দাবন থেকে এক ক্রোশ ভোজনটীলা। কৃষ্ণ নাকি এই ভোজন টীলায় রাখালদের সঙ্গে মুনিদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ভিক্ষা অন্ন ভক্ষণ করেছিলেন। স্থানটি তাই 'ভোজনটীলা' নামে পরিচিত। একটি মন্দির এখানে উচ্চ টীলাটির ওপর অবস্থিত। মন্দিরে কৃষ্ণের গোষ্ঠ সাজের একটি মূর্তি বর্তমান। ভোজন-টীলা থেকে অর্দ্ধক্রোশ অক্রূরঘাট। অক্রূর যখন কৃষ্ণ ও বলরামকে মধুপুরে নিয়ে গিয়েছিলেন, সেইসময়ে পথিমধ্যে অক্রূর এই স্থানে তাঁর রথ রেখে যমুনাতে স্নান-তর্পণাদি করেছিলেন। এখানে অবস্থিত একটি মন্দির মধ্যে কৃষ্ণ বলদেব অক্রূর মূর্তি বিদ্যমান। অক্রূরঘাটে যমুনার জল স্পর্শ করবার রীতি প্রচলিত। এই স্থান থেকে আড়াই ক্রোশ দূরে মথুরামণ্ডলে ভূতেশ্বর শিব বিদ্যমান। নিকটেই পাতালদেবী অর্থাৎ মাহেশ্বরী দেবী বিদ্যমান। ভূতেশ্বর

থেকে তিন ক্রোশ মধুবন। মধুবনে 'কৃষ্ণকুণ্ড' নামে একটি কুণ্ড বর্তমান। মধুবন থেকে দুই ক্রোশ শান্তনুকুণ্ড। এখানে একটি পর্বতের ওপরে একটি মন্দির মধ্যে রাজা শান্তনু এবং শান্তনুবিহারী ঠাকুর অধিষ্ঠিত। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে বেহুলাবন এবং বেহুলাকুণ্ড অবস্থিত। বেহুলাবন থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড এবং ললিতা প্রভৃতি অষ্টসখীর কুণ্ড। পূর্বদিকে শ্যামকুণ্ড এবং পশ্চিমে রাধাকুণ্ড। ঈশানে ললিতাকুণ্ড অবস্থিত। রাধাকুণ্ডের উত্তরে রাধার প্রতিমূর্তি বর্তমান। পূর্বোত্তরে গোবিন্দদেবের মন্দির। রাধাকুণ্ড থেকে এক ক্রোশ গোবর্দ্ধন পর্বত। গোবর্দ্ধন পর্বতটি বৃহৎ, কিন্তু তেমন উচ্চ নয়। গোবর্দ্ধন পর্বতের ওপরে গোপালের মন্দির। মন্দিরে কৃষ্ণ যে মূর্তিতে গোবর্দ্ধন পর্বতকে মূর্তিমান করে পূজার দ্রব্যাদি ভক্ষণ করেছিলেন, সেই মূর্তি বর্তমান।

প্রথমেই কুসুম সরোবর। কুসুম সরোবরের পরে উদ্ধবটীলা এবং উদ্ধবকুণ্ড। এখানে উদ্ধব বলরাম এবং জগন্নাথের মূর্তি বর্তমান। এর পরে নারদকুণ্ড। কুণ্ডের কাছে নারদ মুনির প্রতিমূর্তি, পরে ভানুকুণ্ড। ভানুকুণ্ডের-পর অবস্থিত মানসীগঙ্গা, চাকলেশ্বর শিব ও চক্রতীর্থের ঘাট। মানসীগঙ্গার মধ্যস্থলে গোবর্দ্ধনের মুখ এবং গোপালের মুকুট বর্তমান। এখানে একটি ভগ্ন পর্বত বিদ্যমান।

গোবর্দ্ধন পরিক্রমের তীর্থগুলির মধ্যে—হরদেবঠাকুর, ব্রহ্মাকুণ্ড, ঋণমোচন, পাপমোচন, নিবৃত্তকুণ্ড, দানঘাটী, চন্দ্রসরোবর, চন্দ্রবিহারী ঠাকুর, বল্লভাচার্যের বৈঠক, কমলকুণ্ড, কৃষ্ণকুণ্ড, অপ্সরা কুণ্ড, পুছরিগ্রাম, পুছরিলোটা, আশুসুরভিকুণ্ড, ঐরাবতকুণ্ড, কদমখণ্ডী, গোবিন্দস্বামীর বৈঠক, হরজিকুণ্ড (হরিদ্রা কুণ্ড), যতিপুরাগ্রাম ও বিছুয়াকুণ্ড উল্লেখযোগ্য।

গোবর্দ্ধনের অধিবাসীরা অত্যন্ত বলশালী। গোবর্দ্ধন থেকে দীগগ্রাম সাত ক্রোশ। দীগগ্রাম লাঠাবন নামেও পরিচিত। এর নিকটেই রূপ সরোবর। দীগগ্রাম থেকে নয় ক্রোশ কাম্যবন, পথিমধ্যে চরণ-পাহাড়। তার পরেই কাম্যবন। কাম্যবনে বহুসংখ্যক দেব দেবী এবং তীর্থ বর্তমান। কাম্যবনে 'বিমলকুণ্ড' নামে একটি কুণ্ড বর্তমান। এখানে বিমলাদেবীও বর্তমান। কাম্যবন সাত ক্রোশ। প্রথমে যশোদাকুণ্ড, এর পরে সূর্যকুণ্ড, অতঃপর লুকলুককুণ্ড, তারপর চরণপাহাড়। চরণপাহাড়ে কৃষ্ণ, বলরাম এবং

গোপালগণের গোবৎসাদির পদচিহ্ন বর্তমান। এখানে নূপুরাকৃতির ফল দৃষ্টিগোচর হয়। নীচে ক্ষীরোদ সাগর। একটি গ্রামের পরেই পাদ পেছলা ফেলবার পাহাড়। এই পাহাড়ের ওপরে ভীমেশ্বরীর গোফা। এর পর গোচারণকালে কৃষ্ণ বনমধ্যে যে স্থানে ভোজন করতেন, থালাকৃতি সেই 'ভোজনথালি' বর্তমান। এর নীচে অবস্থিত কৃষ্ণকুণ্ড। কাম্যবনের ঠিক মধ্যস্থলে অবস্থিত গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহনের মন্দির। গোবিন্দের মন্দিরের দক্ষিণে অবস্থিত বৃন্দাদেবী, মধ্যে গোবিন্দ এবং উত্তরে জগন্নাথ। তাছাড়া কাম্যবনে রাজা যুধিষ্ঠিরের বনবাসকালীন যজ্ঞস্থান চৌরাশি স্তম্ভের গৃহও বর্তমান। তা ছাড়া পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী এবং অপরাপর অনেক দেবদেবীর মূর্তিও এখানে লক্ষিত হয়ে থাকে।

কাম্যবন থেকে ছয় ক্রোশের দূরত্বে বরসান। বরসানের নিকটস্থ এক পাহাড়ের কিঞ্চিৎ উচ্চ স্থানে রাধা আলতা পরিধান কালে নানাবিধ চিত্র বিচিত্র করেছিলেন—সেই সকল চিহ্ন বর্তমান। অদূরেই অবস্থিত দেহকুণ্ড নামে পরিচিত এক সরোবর। পাহাড়ের ওপরে শ্রীরাধার মন্দির, পরে বৃষভানুর পিতামহী ভানুপত্নীসহ এক বাটীতে বিরাজমান। নীচে বৃষভানু রাজা পত্নীসহ অপর এক বাটীতে সমাসীন। পাহাড়ের নীচে অষ্টসখীরকুণ্ড নামে পরিচিত একটি বাটী। এই বাটীতে অষ্টসখীর মূর্তি বিরাজমান। পাহাড়ের পশ্চিমে অবস্থিত দানঘাটী। বরসানের স্ত্রীলোকগণ বেশ বলিষ্ঠ।

বরসান থেকে দুই ক্রোশ সঙ্কেতবট। এখানে সঙ্কেতবিহারী ঠাকুরের পাশে একটি বটমূলে যোগমায়াদেবী অধিষ্ঠিতা। পর্বত ওপরে গোষ্ঠের বেশে মধ্যস্থলে কৃষ্ণ এবং বলরাম, আর এদের দুই পাশে নন্দ-যশোদার প্রতিমূর্তি অবস্থিত। পাহাড় পরিক্রমণ করে এক ক্রোশ ঐরাবত কুণ্ড। ঐরাবত কুণ্ড থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত পবন-সরোবর। এখান থেকে শ্বাসকুণ্ড পুনরায় দুইক্রোশ। নন্দগ্রাম থেকে কৃষ্ণ এক নিঃশ্বাসে নাকি এই স্থানে এসে দাঁড়াতেন, তাই স্থানটি পরিচিত শ্বাসকুণ্ড নামে। এরপরে কদম্বখণ্ডি, পরে অবস্থিত সূর্যকুণ্ড এবং তার পর বটেন গ্রাম। বটেন গ্রামে আয়ান ঘোষের বাটী অবস্থিত। এর পশ্চিমে অবস্থিত কিশোরীকুণ্ড। কুণ্ডের ঈশানে অবস্থিত জাবট। জাবট থেকে খদিরবন তিন ক্রোশ।

নন্দগ্রাম থেকে শেষশায়ী এগার ক্রোশের পথ। এখান থেকে পুনরায় সাত

ক্রোশ গেলে তবে সূর্যকুণ্ড। প্রথম তিন ক্রোশ 'কোকিলবন' নামে পরিচিত। কোকিলবনে অধিষ্ঠিত কোকিলবিহারী ঠাকুর। নিকটেই অবস্থিত কৃষ্ণকুণ্ড। কোকিল বন থেকে কাঠ নিয়ে অন্যত্র যাবার রীতি নেই। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী বনের বাইরে কাঠ নিয়ে গেলে অন্ধ হবার সম্ভাবনা। কোকিলবন থেকে সূর্যকুণ্ড চার ক্রোশ। সূর্যকুণ্ড হয়ে চার ক্রোশ গেলে তবে শেষশায়ী। শেষশায়ীতে ভগবানের অনন্তশয্যার মূর্তি এবং ক্ষীরোদ সাগর নামে পরিচিত এক পুষ্করিণী বিদ্যমান।

শেষশায়ী থেকে সেরগড় সাত ক্রোশ। এখানে বহুসংখ্যক দেবালয় বিদ্যমান। সেরগড় থেকে নন্দঘাট নয় ক্রোশ। পথিমধ্যে পড়ে অক্ষয়বট এবং পরে যমুনার তীরে গোপ-গোপীদের কুলদেবতা বলে পরিচিত কাত্যায়নী দেবী। এর অদূরেই চীরঘাট। চীরঘাট থেকে তিনক্রোশ নন্দঘাট। নন্দঘাট অতিক্রম করলে পড়ে ভদ্রবন এবং ভদ্রবনের পর পড়ে ভাণ্ডীরবন, তারপর বেলবন। এই বেলবনের কাছেই অবস্থিত কেশীঘাট। ভাণ্ডীরবনস্থিত এক দেবালয়ে শ্রীদামগোপালের মূর্তি বিরাজমান। বেলবনে অবস্থিত লক্ষ্মীদেবীর মূর্তি। বেলবনের পূর্বে দুই ক্রোশ গমন করলে পড়ে মানস সরোবর। মানসসরোবরের দক্ষিণে মানবিহারী ঠাকুর। মানস সরোবর থেকে তিন ক্রোশ পানিঘাট। নন্দঘাট থেকে এই পানিঘাটের দূরত্ব বারো ক্রোশ। পানিঘাট থেকে লোহা-বনের দূরত্ব তিন ক্রোশ। লোহাবনে একটি কুণ্ড বর্তমান। এই কুণ্ডের জলে লৌহদ্রব্য দান করবার রীতি প্রচলিত। লোহাবন থেকে দু' ক্রোশ গেলে আন্দিনান্দি নামে পরিচিত বন। এখানে আনন্দীকুণ্ড নামে এক পুষ্করিণী বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত আন্দিনান্দি নামে এক দেবীও এখানে অধিষ্ঠিতা। আন্দিনান্দি থেকে চারক্রোশ দূরে অবস্থিত বলদেব এবং বলদেব থেকে তিন ক্রোশ গেলে মহাবন বা গোকুল। গোকুলে নন্দ ঘোষের বাটীতে কৃষ্ণের স্মৃতিবিজড়িত বহু স্থান বিদ্যমান। গোকুল থেকে এক ক্রোশ ব্রহ্মাণ্ডঘাট। এইখানে কৃষ্ণ যশোদাকে নাকি উদরমধ্যে ব্রহ্মাণ্ড দেখিয়েছিলেন। গোকুল থেকে উত্তরে তিন ক্রোশ রাওল গ্রাম অবস্থিত।

প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী সর্বপ্রথমে দুধ, যমুনার জল এবং বেলপাতার সাহায্যে গোপীশ্বর মহাদেবের পূজার্চনা করে তবে বৃন্দাবনস্থিত যুগলরূপ দর্শন করতে হয়।

নিকুঞ্জবনে বহুসংখ্যক তমাল এবং অপরাপর বৃক্ষরাজি অবস্থিত। নিকুঞ্জ-

বনে অবস্থিত একটি মন্দিরে চিত্রপটে রাধাকৃষ্ণের যুগলমূর্তি সমাসীন। এই স্থানে প্রত্যহ রাত্রে পুষ্পশয্যা করে রাখা হয়। বনমধ্যে অদ্যাবধি রাত্রিকালে কোন মানুষ অথবা জীবজন্তু অবস্থান করতে পারে না। মন্দিরমধ্যে পুষ্প শয্যা করে মন্দিরের ঘর দৃঢ়ভাবে রুদ্ধ করে রেখেও দেখা যায় পরদিন প্রভাতে ঐ শয্যা মলিন এবং শয্যায় শয়নের চিহ্ন বর্তমান।

বৃন্দাবনের আদি মহাদেব বনখণ্ডেশ্বর। বৃন্দাবনে বংশীবট অবস্থিত। রামঘাটের নিকট অবস্থিত রামস্থলী অক্ষয়বট। ভাণ্ডীরবটে শ্রীদাম গোপালের প্রতিমূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এই স্থানে একটি কূপ বিদ্যমান। এই কূপের জলে স্নান করতে হয়।

মথুরা বৃন্দাবন পর্যটন শেষ করে যদুনাথ চার ক্রোশ দূরে অবস্থিত শশাগ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। শশা থেকে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত শোঁক, এখান থেকে চারক্রোশ দূরে অবস্থিত কুম্ভীরা[২০] সহর। সহরটি চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে ভরতপুরের রাজার কেল্লা। কুম্ভীরা থেকে নয়ক্রোশ দূরে অবস্থিত হেলেনাগ্রাম। হেলেনাগ্রাম থেকে আট ক্রোশ দূরে অবস্থিত ক্ষুদ্র সহর মৌয়া। মৌয়া থেকে চারক্রোশ দূরে অবস্থিত বিশড়া গ্রাম। মানপুর নামক গ্রাম পর্যটনান্তে এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত সেকেন্দরা নামক গ্রামে গিয়ে যদুনাথ উপস্থিত হলেন। সেকেন্দরা থেকে আট ক্রোশ দূরে দেশা নামক গ্রাম। দেশা থেকে আটক্রোশ দূরে অবস্থিত মোহনপুরা নামক গ্রাম। মোহনপুরা থেকে দশ ক্রোশ জয়পুরের ঘাটদরজা। পথিমধ্যে জঙ্গল। চতুর্দিকে পর্বত এবং এদের মাঝখান দিয়ে পথ। পাহাড়ের মুখেই ঘাট। এখানে জয়দেব মুনি কর্তৃক স্থাপিত রাধামাধব মূর্তি। ঘাটদরজা থেকে তিন ক্রোশ জয়পুর। জয়পুর সহরটি প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সহরের রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত। জয়পুরস্থিত দোকানের নিয়মানুযায়ী, যে অঞ্চলে যে দ্রব্যের দোকানগুলি অবস্থিত, সেই স্থানে অন্যদ্রব্যের দোকান অনুপস্থিত।

জয়পুরের রাজা বাটীর মধ্যে অবস্থিত গোবিন্দদেবের মন্দির শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত গোবিন্দদেব রত্নসিংহাসনে বিদ্যমান। মূর্তির বামভাগে শ্রীমতী এবং দক্ষিণাংশে পানের বাটা হাতে রাজকন্যার মূর্তি বিরাজিত। মঙ্গল আরতি এবং শয়ন আরতি কেবলমাত্র রাজ-অন্তঃপুরস্থিত স্ত্রীলোকগণ দর্শন করে থাকেন। প্রাতে শৃঙ্গার ভোগের পূর্বে যে আরতি হয় এবং বৈকালিক

গোবিন্দদেবের ধূপ ও সন্ধ্যার আরতি সকলেই দর্শন করতে পারে।

জয়পুর রাজার বাটীটি অত্যন্ত উত্তম। এ'টি শ্বেতপ্রস্তরে নির্মিত। জয়পুর সহরটি জল-স্থলে সুশোভিত। পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত এই সহর। সহরে তেহারা পাহাড়ে কেল্লা বিদ্যমান। সহরের উত্তরদিকস্থিত পাহাড়ে পূর্বে সেনাদের বাস ছিল। এই পাহাড়ের ওপর মজবুত কেল্লা অবস্থিত। রাজকোষাগারের বহুমূল্য রত্নরাজি এই কেল্লার মধ্যে সঞ্চিত থাকত। জয়পুরের প্রাচীন রাজধানী অম্বরে পাহাড়ের ওপরে শিলাদেবী[২১] বর্তমান। জয়পুরের জল বড় লবণাক্ত। জয়পুরের চুড়ি, জুতা, কাপড়ের রঙ প্রভৃতি খুব প্রসিদ্ধ।

জয়পুর থেকে রঘুনাথ প্রথমে বকড়ু গ্রামে এবং অতঃপর এখান থেকে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত পাড়ু গ্রামে গিয়ে পৌঁছালেন। এখান থেকে বাঁদরি সুদরি, বাঁদরি সুদরি থেকে দশ ক্রোশ দূরে কৃষ্ণগড়ে গিয়ে যদুনাথ পৌঁছালেন। কৃষ্ণগড় পাহাড়ের ওপর অবস্থিত একটি সহর। এখানকার দই খুব উৎকৃষ্ট। সহরের প্রান্তে অবস্থিত একটি পর্বত। কৃষ্ণগড় থেকে পাঁচক্রোশ বাণ নদী। এই নদী থেকে সম্বর লবণ প্রস্তুত হয়। এখান থেকে পাঁচক্রোশ দূরে অবস্থিত কাউড়ি নামক গ্রাম। কাউড়ি থেকে সাতক্রোশ দূরে বুড়া পুষ্কর। বুড়া পুষ্কর থেকে এক ক্রোশ দূরে ব্রহ্ম পুষ্কর। পুষ্কর তীর্থের তীরে শিবালয় স্থাপিত। পুষ্করতীর্থে তিনটি পুষ্কর বর্তমান—বুড়া পুষ্কর, মধ্য পুষ্কর এবং কনিষ্ঠ পুষ্কর।

পুষ্করে একটি পাহাড় বর্তমান। এ'টি সাবিত্রী পাহাড় নামে পরিচিত। সাবিত্রীপাহাড় উচ্চতায় প্রায় তিন ক্রোশ। পাহাড়ের ওপরে সাবিত্রীদেবীর মন্দির। মন্দির মধ্যে সাবিত্রী ও সরস্বতী দুই মূর্তি বিদ্যমান। মন্দিরের পশ্চাতে একটি কুণ্ড অবস্থিত।

পুষ্করতীর্থের পাশে অবস্থিত দেবালয়। এখানকার পাণ্ডাগণ বেদপাঠী। এখানকার ঘাটগুলি হল—বরাহঘাট, শিবঘাট, কোটিতীর্থের ঘাট, রাজঘাট, নৃসিংহ ঘাট, বিশ্রান্তঘাট, বদরীঘাট, চীরঘাট, গৌঘাট, ব্রহ্মঘাট, সাবিত্রীঘাট, স্বরূপঘাট, সপ্তর্ষিঘাট, চন্দ্রঘাট ও ইন্দ্রঘাট।

পুষ্করতীর্থের পূর্বদিকে অবস্থিত চন্দ্রঘাট। এই ঘাটে হরগৌরীর মূর্তি আসীন। বরাহঘাটে বরাহদেবের মন্দির বর্তমান। কুণ্ডের পশ্চিমে ব্রহ্মার মন্দির অবস্থিত। পুষ্করতীর্থের পরিক্রম পঞ্চক্রোশী। পথ পর্বতের ভেতর দিয়ে। মধ্যে মধ্যে বহু তীর্থক্ষেত্র বিদ্যমান। মরীচি, অঙ্গিরা, অত্রি,

পুল, পুলস্ত্য প্রভৃতি মুনিগণের কুটীর অবস্থিত। নাগ পর্বতে নাগকুণ্ড নামে একটি কুণ্ড বর্তমান। গৌমুখকুণ্ডে স্নান তর্পণাদি করবার রীতি প্রচলিত। পছকুণ্ড বা জমদগ্নিকুণ্ডের নিকটেই জমদগ্নি মুনির তপস্যার স্থান। বামদেবকুণ্ডের নিকটেই বামদেব ঋষির তপস্যার ক্ষেত্র। ভৃগুকুণ্ডের নিকটে ভৃগুমুনির তপস্যার স্থান। অগস্ত্যকুণ্ডের নিকটে অগস্ত্যমুনির তপস্যার স্থান এবং কপিলকুণ্ডের নিকটেই অবস্থিত কপিলমুনির আশ্রমের স্থান।

আজমীর যাবার পথে প্রথম ঘাটেই অবস্থিত কপিলাশ্রম। পঞ্চমুনির আশ্রম পর্বতের গুহামধ্যে। কপিল আশ্রম হয়ে পর্বতের গুহাতে প্রবেশ করে প্রায় চারশত হাত গভীরে গেলে কপিলেশ্বর শিবের দর্শন মেলে। বরাহঘাটের নিকটে অবস্থিত অটমটেশ্বর শিব। সমভূমি থেকে প্রায় আট হাত নীচে শিবের অবস্থানক্ষেত্র। পুষ্করতীর্থের আদিদেব অটমটেশ্বর। পুষ্করে সর্বপ্রথমে এই অটমটেশ্বর শিবের পূজা করবার রীতি প্রচলিত। পর্বতের গুহামধ্যে প্রায় অর্দ্ধপোয়া সুড়ঙ্গপথে গমন করলে তবে নীলেশ্বর শিবের দর্শন লাভ হয়।

পুষ্করতীর্থ থেকে আজমীরের দূরত্ব আট ক্রোশ। পুষ্করে পাহাড়ের ওপরে অবস্থিত রাজার কেল্লা। মাড়োয়ারের রাজধানী অত্যন্ত সুশোভিত নগর। এখানকার শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত বাসনাদি, দেবদেবীর নানাবিধ মূর্তি, নানাবিধ খেলনা ইত্যাদি প্রসিদ্ধ।

আজমীরে হিন্দু এবং মুসলমান সকলেই খাজা সাহেব নামে এক পীরের দর্শন করে থাকে। এই স্থানে চন্দ্রনাথ নামে এক অনাদি শিব বর্তমান। আজমীরে মুসলমান অধিবাসীর সংখ্যাই বেশী। আজমীর থেকে কৃষ্ণগড় দশ ক্রোশ। কৃষ্ণগড় থেকে পড়াসনি পুনরায় দশ ক্রোশের পথ। পড়াসনি গ্রাম থেকে যদুনাথ এসে উপস্থিত হলেন দুদু নামে পরিচিত এক গ্রামে। 'দু থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত বড়েনা নামক গ্রাম। বড়েনা থেকে ছয়ক্রোশ বাউড়ি। বাউড়ি থেকে আটক্রোশ জয়পুর সহর। জয়পুর থেকে যদুনাথ অতঃপর ঘাটদরজা এবং ঘাটদরজা থেকে দশক্রোশ মোহনপুরায় পৌছান। মোহনপুরা থেকে দশক্রোশ দোলাগ্রাম। দোলাগ্রাম থেকে পুনরায় দশক্রোশ সেকেন্দরা। সেকেন্দরা থেকে বেলোড়া আরও দশ ক্রোশ। বেলোড়া থেকে দশ ক্রোশ ছোকরাবার। ছোকরাবার থেকে এগার ক্রোশ গাগর আনি। গাগর থেকে দশক্রোশ শোঁক। শোঁক থেকে ছয়ক্রোশ সসা। এখান থেকে মথুরা চার

ক্রোশের পথ।

বৃন্দাবন থেকে যত্নাথ কোররি নামক এক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। কোররি থেকে দশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত খয়ের নামে এক গ্রাম। খয়ের থেকে দশক্রোশ খুরজা। খুরজায় প্রচুর কম্বল প্রস্তুত হয়। খুরজা থেকে আট ক্রোশের পথ গোলাচি। এখান থেকে ছয়ক্রোশ হাপর। এখান থেকে অপর এক গ্রাম হয়ে যমুনার মিরাটে গিয়ে উপস্থিত হন যত্নাথ। মিরাট সহরটি খুব উত্তম। সহরের বসতি তিন ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত। মিরাট থেকে দশক্রোশ মজফরনগর। মজফরনগর থেকে কাজিকাপুর এগার ক্রোশের পথ। কাজিকাপুর থেকে রুড়কি বারো ক্রোশ। রুড়কি থেকে জলাপুরে এবং জলাপুর থেকে হরিদ্বারে গিয়ে যত্নাথ উপস্থিত হলেন। জলাপুর থেকে হরিদ্বারের দূরত্ব মাত্র তিন ক্রোশ। হরিদ্বারের নীলপর্বতে চণ্ডী এবং নীলকণ্ঠেশ্বরের মন্দির বিগুমান! পাহাড়ের ওপর প্রায় তিন ক্রোশ আরোহণ করতে হয়। পর্বতের শিরোদেশে অবস্থিত চণ্ডীদেবীর মন্দির। মন্দির মধ্যে চণ্ডীর প্রস্তরনির্মিত মূর্তি বিরাজমান। নীল পর্বতের পূর্বদিকে অর্ধ ক্রোশ উচ্চ অপর একটি শৃঙ্গ বর্তমান। এই শৃঙ্গে অঞ্জনাদেবী অধিষ্ঠিত। পাহাড়টির দক্ষিণ অংশ দিয়ে অবতরণ করতে হয়। অবতরণকালে নানা দেবদেবীর মূর্তি দৃষ্টিগোচর হয়। অর্ধপথে নীলকণ্ঠেশ্বর শিব দেখতে পাওয়া যায়।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে এক ক্রোশ গেলে একটি পাহাড়ের নীচে বিশ্বকেশ্বর শিব বর্তমান। হরিদ্বারের অনতিদূরে অবস্থিত কন্‌খল। কন্‌খলে দক্ষেশ্বর শিব বিরাজমান। দক্ষেশ্বর শিবের কাছ থেকে দক্ষিণ পশ্চিম কোণে অর্ধক্রোশ গেলে সতীকুণ্ড। কথিত আছে এই সতীকুণ্ডেই নাকি সতী দেহত্যাগ করেছিলেন। কুণ্ডের পশ্চিমে একটি শিবমূর্তি বিগুমান।

হরিদ্বারস্থিত হরপিড়ির ঘাটের কিছু দূরে দক্ষিণাংশে অবস্থিত পর্বতটির চড়াই চারক্রোশ। এই পর্বতের ওপরে অবস্থিত সূর্যকুণ্ড। হরিদ্বারস্থিত অপরাপর তীর্থগুলি হল—নীলধারা, ত্রিধারা, পঞ্চধারা, সপ্তধারা ইত্যাদি।

হরিদ্বারে কুম্ভমেলা উপলক্ষে বিরাট মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই মেলা উপলক্ষে বহু দূর দুরান্ত থেকে তীর্থ পর্যটনকারীর সমাবেশ ঘটে। হরিদ্বার থেকে যত্নাথ বদরীনাথ এবং কেদারবদরী দর্শনকরবার অভিপ্রায়ে যাত্রা করলেন। ক্রমে যত্নাথ এসে পৌছালেন হৃষীকেশে। হৃষীকেশে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত এবং

শত্রুঘ্নের চারটি দেবালয় বিদ্যমান। হৃষীকেশ থেকে এক ক্রোশ লছমনঝোলা। ঝোলার কাছেই লক্ষ্মণের মন্দির। লছমনঝোলা থেকে ছয় ক্রোশ ফুলাড়ি। ফুলাড়ি পর্যন্ত স্থান লক্ষ্মণের তপোবন নামে পরিচিত। ফুলাড়ি থেকে ছয়ক্রোশ বিজলী। বিজলী থেকে মহাদেবকী চটী আটক্রোশ। বিজলী থেকে ব্যাসকী চটী দশ ক্রোশের পথ। এখানে ব্যাস ঝোলা বর্তমান। ব্যাস আশ্রম থেকে দেবপ্রয়াগ ছয় ক্রোশের পথ। দেবপ্রয়াগে ভাগীরথী এবং মন্দাকিনীর সঙ্গম ঘটেছে। দেবপ্রয়াগ থেকে গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী গমনের পৃথক পৃথক পথের শুরু। গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রী গমনের পথ অত্যন্ত বিপদসঙ্কুল। পাহাড়ের ওপর পাকদণ্ডীতে যেতে হয়। যাত্রা পথে অগ্নির খুব উত্তাপ, উত্তম শীতবস্ত্র এবং কুশের জুতা ব্যবহার করতে হয়। পর্বত উপর থেকে এক ভুর্জপত্রের বৃক্ষের মূল থেকে উত্তর দিক দিয়ে যে ধারা পতিত হচ্ছে তা যমুনোত্রী। এই দুই ধারা গঙ্গা এবং যমুনা, এক বৃক্ষের মূল দিয়ে পতিত। গঙ্গোত্রী এবং যমুনোত্রীতে যাবার সময় যমুনা থেকে অনেকগুলি ছিকা অতিক্রম করতে হয়। ছিকার অর্থ—নদী কি গঙ্গার দুই পারের পাহাড়, তাতে বৃক্ষাদি-সকল বর্তমান। ঐ বৃক্ষে মোটা দড়ি দুই পারে বাঁধা আছে। তাতে একজন বসতে পারে এরূপ ছোট একটি মেচের আকার, তার চার কোণাতে দড়ি দেওয়া, ঐ দড়ি শিকার মত ঝুলান, তাতে আংটা লাগান। ঐ আংটা ওপরের দড়িতে গলান আছে, তার মুখে দুই দড়ি বাঁধা আছে। যে পারে যখন আসে, সেই পারের লোক ঐ দড়ি ধরে টেনে নেয়। যে পার থেকে অতিক্রম করবে সেই পারের লোক দুলিয়ে ঠেলে দেয়।

দেব প্রয়াগ থেকে রাণীবাগ ছয়ক্রোশের পথ। এখানে গৌতম-আশ্রমে গৌতম মুনির মূর্তি বর্তমান।

শ্রীনগরে টেরির রাজার কেল্লা বিদ্যমান। শ্রীনগর পার্বত্য সহর। নগরটি পর্বত মধ্যে অবস্থিত। শ্রীনগর থেকে শিরোবগড়ার চটী দশ ক্রোশ। শিরোব-গড়া থেকে রুদ্রপ্রয়াগের পূর্বপারে পানচাকি বর্তমান।

রুদ্রপ্রয়াগে ঝোলা অতিক্রম করে প্রয়াগে স্নান তর্পণাদি করা বিধি। কিন্তু প্রয়াগে অবতরণের পথ খুব দুর্গম এবং ভয়ংকর। রুদ্র প্রয়াগে রুদ্র নারায়ণের মূর্তি বর্তমান। রুদ্র প্রয়াগ থেকে যদুনাথ এবং তাঁর সঙ্গীরা গিয়ে পৌছালেন গুপ্তকাশী। গঙ্গা ও যমুনা গুপ্তপথে এসে এই স্থানে আত্মপ্রকাশ

করেছে। গঙ্গার ধারা এখানে উত্তর অভিমুখী এবং যমুনার ধারা পশ্চিম অভিমুখী। এখানে বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মূর্তি বর্তমান। বিশ্বেশ্বর ও অন্নপূর্ণার মন্দিরের সামনে একটি বৃহৎ কুণ্ড বর্তমান। এই কুণ্ডে গঙ্গা এবং যমুনার জল পড়ছে। তুম্বনাথের পাহাড় গুপ্তকাশীর কাছেই। পর্বতের শীর্ষদেশে তুম্বনাথের মন্দির। পর্বত এবং পর্বতস্থিত মন্দিরটি বরফে আবৃত থাকে।

তুম্বনাথের পাহাড়ের কাছেই পাটন চটী। পাটন চটী থেকে ছ'ক্রোশ চড়াই ত্রিযুগ নারায়ণের পাহাড়। ত্রিযুগ নারায়ণের মন্দির পর্বতের শীর্ষদেশে অবস্থিত। মন্দিরে চতুর্ভুজ নারায়ণের মূর্তি বিদ্যমান। মন্দিরের সম্মুখস্থ নাটমন্দিরে মহাদেবের তিনযুগের ধুনি জ্বলছে। মন্দিরের বাইরে পাঁচটি কুণ্ড এবং নানা দেব দেবীর মূর্তি সকল বর্তমান। পর্বতের অধিবাসীদের সকলেরই পরিধানে কম্বল। সকলের মাথায় কম্বলের টুপী অথবা পাগড়ী। পার্বত্য অধিবাসীরা অর্থ অপেক্ষা ছুঁচ ও বিড়ি পেলে বেশী পুলকিত হয়। ত্রিযুগ নারায়ণের মন্দির থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যদুনাথ ঝিলমিল চটী এবং এখান থেকে মুড়কাটায় গিয়ে উপস্থিত হন। কথিত আছে শনির দৃষ্টিতে গণেশ নাকি এই স্থানে মুণ্ডহীন হয়েছিলেন। এখান থেকে ছয় ক্রোশ গৌরীকুণ্ড। গৌরীকুণ্ডের জল বেশ উষ্ণ। এখানে হরগৌরী, লক্ষ্মীনারায়ণ প্রভৃতি বিগ্রহ বিদ্যমান।

গৌরীকুণ্ড থেকে চারক্রোশ ভীমগড়া। স্বর্গারোহণের সময় দ্বিতীয় পাণ্ডব ভীম নাকি এই স্থানে প্রবল শীতে পতিত হয়েছিলেন। ভীমগড়া থেকে চারক্রোশ পাহাড়ে আরোহণ করলে কেদারনাথের কাছে উপস্থিত হওয়া যায়। কেদার নাথে যাবার পথ বরফাবৃত। কেদারনাথ এবং বদরিনারায়ণের মন্দির প্রবল বরফ পাতের জন্য ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পর থেকে অক্ষয়তৃতীয়া পর্যন্ত—বন্ধ থাকে। এই সময়ে মন্দিরের অভ্যন্তরে একটি করে ঘৃতের প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয় এবং অসিমঠ ও যোশীমঠে কেদারনাথ এবং বদরীনারায়ণের ছয় মাসকাল পূজার্চনা অনুষ্ঠিত হয়।

কেদারনাথের মহিষমূর্তি। মন্দিরের বাইরে এবং অভ্যন্তরে বহুদেবদেবী, মুনি ঋষিদের প্রতিমূর্তি চিত্রিত। নাটমন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপিত নন্দিকেশ্বর। কেদারনাথের মন্দিরের উত্তরে তিনক্রোশ উত্তর অভিমুখে হিমলিঙ্গেশ্বর শিব সমাসীন। কেদারনাথের মন্দিরের উত্তরাংশ থেকে ঈশান কোণে ধবলগিরি

দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এ'টিই পরিচিত কৈলাস পর্বত নামে। কৈলাসে হরপার্বতীর মন্দির অবস্থিত।

কেদারনাথের পাহাড় থেকে বদরী নারায়ণের ব্যবধান তিন ক্রোশ। কেদারনাথের পাহাড় থেকে বদরীনারায়ণের পাহাড় উত্তমরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। পুনরায় যাত্রা করে ভীমগড়া, গৌরীকুণ্ড হয়ে যদুনাথ অসিমঠে গিয়ে উপস্থিত হলেন। ভীমগড়া থেকে গৌরীকুণ্ডের দূরত্ব চারক্রোশ। আবার গৌরীকুণ্ড থেকে ঝিল্‌মিল্ চটীর দূরত্ব ছয় ক্রোশ, এখান থেকে অসিমঠের দূরত্ব দশক্রোশ। অসিমঠ থেকে দশক্রোশ পুথিবাসা। পুথিবাসা থেকে বারোক্রোশ বামনী চটী। বামনী চটী থেকে ক্ষেত্রপালের দূরত্ব পুনরায় বারোক্রোশ। ক্ষেত্র পাল থেকে পিপড়কুঠী আট ক্রোশ। পিপড়কুঠী থেকে গরুড়গঙ্গা ছয় ক্রোশের পথ। গরুড় গঙ্গা থেকে ছয় ক্রোশ কুমার চটী। কুমার চটী থেকে আট ক্রোশ বিষ্ণু প্রয়াগ। বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে দুই ক্রোশ চড়াই অতিক্রম করলে যোশী মঠ। এই যোশীমঠেই বদরীনারায়ণের গদি অবস্থিত। যোশীমঠ থেকে পাণ্ডুকেশ্বর আটক্রোশ। অলকানন্দা তীরে পাণ্ডবগণ স্থাপিত শিব বিরাজমান। যদুনাথ পাণ্ডুকেশ্বর শিব এবং চতুর্ভুজ নারায়ণ দর্শন করে মৌত্তজের চটী হয়ে এখান থেকে আট ক্রোশ চড়াই বদরীনারায়ণের পাহাড় অভিমুখে রওনা হলেন। প্রথম চারক্রোশ চড়াই অতিক্রম করবার পরই বরফাবৃত ভূমি শুরু হতে দেখা যায়। আটক্রোশ অতিক্রমের পর অলকানন্দের ওপর এক পুল এবং তার অদূরেই অবস্থিত বদরীনারায়ণের মন্দির।

বদরীনারায়ণের পাহাড়ে তপ্তকুণ্ড বর্তমান। তপ্তকুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে কুড়ি হাত এবং প্রস্থে ষোল হাত। ঝরণার উষ্ণ জল এই কুণ্ডে এসে পড়েছে। পরশ পাথর নির্মিত দ্বিভুজাকৃতির নরনারায়ণরূপে বদরীনারায়ণ বিরাজমান। মন্দির মধ্যে নানা দেবদেবী এবং ঋষিগণের মূর্তি। বদরীনারায়ণ পাহাড় পরাশর ঋষির তপস্যার ক্ষেত্র। প্রস্তর নির্মিত পরাশর মুনির দেহ যোগাসনে তপস্যাকারে বর্তমান। এখানে বাজারে মহাপ্রসাদ বিক্রয় হতে দেখা যায়। পুরীর ন্যায় এখানেও রান্নার সকল প্রকার উপকরণ দিয়ে পাত্রগুলিকে পর পর সাজিয়ে পাক করবার রীতি প্রচলিত।

বদরীনারায়ণ থেকে যদুনাথ ব্রহ্মকপালে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তপ্তকুণ্ডের পূর্বদিকে, অলকানন্দার পশ্চিমতটে, নারদকুণ্ডের দক্ষিণ এবং বিষ্ণুচক্রের উত্তরে

এই ব্রহ্মকপাল অবস্থিত।

তপ্তকুণ্ড, সূর্যকুণ্ড, নারদকুণ্ড, উর্দ্ধরেতকুণ্ড, বিষ্ণুকুণ্ড, নাগরাজকুণ্ড ও সঙ্গম-স্থল—এই সাতটি স্থানে স্নান করবার রীতি প্রচলিত।

বদরীনারায়ণের মন্দির থেকে সহস্রধারা তিন ক্রোশের পথ। সহস্রধারা থেকে ভোটের রাজ্য নয় দিনের পথ। ভোটে সকলেই মদ্য-মাংস ভক্ষণ করে। এখানে কুকুর, কম্বল এবং উত্তম ঘোড়া পাওয়া যায়। এই দেশে শ্বেত চামরও জন্মে। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অতিশয় বলশালী। অতঃপর প্রত্যাবর্তনের পালা।

বদরীনারায়ণ থেকে দশ ক্রোশ পাণ্ডুকেশ্বর। এখান থেকে দশ ক্রোশ কুমারচটী। কুমারচটী থেকে পিপড়কুঠী হয়ে আট ক্রোশ ক্ষেত্রপাল। ক্ষেত্রপাল থেকে নন্দপ্রয়াগ। নন্দপ্রয়াগ থেকে দশ ক্রোশ গোবিন্দকুঠী। গোবিন্দ কুঠী থেকে দুই ক্রোশ দূরে আলমোড়ায় যাবার পথ। গোবিন্দকুঠী থেকে যদুনাথ কর্ণপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হলেন। কর্ণপ্রয়াগে কর্ণমুনির আশ্রম এবং মূর্তি বিদ্যমান। কর্ণপ্রয়াগ থেকে আটক্রোশ গেলে শিমকুঠী। শিমকুঠী থেকে আটক্রোশের পথ মেলচৌরী। মেলচৌরী থেকে পাঁচক্রোশ লোহাগড়। লোহাগড় থেকে দুইক্রোশ আমবাগ। আমবাগ থেকে তিন ক্রোশ আসলে তবে বুড়া-কেদার। বুড়া-কেদারে কৌশল্যা নদীর পূর্বপারে কেদারনাথ বিরাজমান। বুড়া-কেদার থেকে কানাগের চটী হয়ে আটক্রোশ দূরে কৌশল্যা নদীর ধারে চটী। কৌশল্যা নদী অতিক্রম করলে একটি দোলা দেখতে পাওয়া যায়। এই দোলায় দুলতে হয়। কৌশল্যা নদী অতিক্রম করে পাহাড়ের মধ্য দিয়ে আটক্রোশ গেলে চিকলি। এখান থেকে রামনগরের বাজার দুইক্রোশ। চিকলি থেকে আটক্রোশ চিন্‌খা। চিন্‌খা থেকে বার ক্রোশ কাশীপুর। কাশীপুরে বহু ধনাঢ্য মুসলমান এবং বেনিয়ার বাস। কাশীপুরে আম, তরমুজ, কাঁকড়ি ও ফুটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। কাশীপুর থেকে যদুনাথ গিয়ে পৌঁছালেন নৈনীতালে। নৈনীতালে একটি কুণ্ড রয়েছে। পর্বত উপরে তালেশ্বর ভৈরব বিদ্যমান। কাশীপুর থেকে সম্বলমুরাদাবাদ চৌদ্দ ক্রোশ। গোমা থেকে দানপুর বার ক্রোশ। দানপুর থেকে কোয়েল দশ ক্রোশ। কোয়েলে তরমুজ, খরমুজা, কাকড়ি, ফুটি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে জন্মায়। কোয়েলে বৃহদাকৃতির বাঁধাকপি পাওয়া যায়। এখান থেকে বেশরা ষোল

ক্রোশ। বেশরায় লাড্ডু, পেড়া, বরফি, জিলিপি, অমৃতি, মুদ্গল, মগধ, শেও, পুরি, কচুরি, পাকড়ি, দই, দুধ, রাবড়ি, খোয়া ইত্যাদি ও নানাবিধ আচার মোরব্বা প্রভৃতি পাওয়া যায়। বেশরায় বহু দেবালয় বর্তমান। বেশরা থেকে মানসসরোবর ছয় ক্রোশের পথ। মানসসরোবরের নিকট মাঠগ্রাম। মাঠগ্রাম থেকে যমুনার কেশীঘাট চারক্রোশ। যদুনাথ মানসসরোবর থেকে নৌকাতে যমুনা অতিক্রম করে বৃন্দাবনে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

কেদারনাথ, বদরীনারায়ণে আহার্য দ্রব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যব, গম, মক্কা, আটা প্রভৃতি। এখানকার পার্বত্য ব্যক্তিগণ অত্যন্ত সত্যবাদী। এরা ভুলেও কখন মিথ্যা কথা বলে না। এরা চৌর্যবৃত্তি কিংবা বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতিও জানে না। সকলেই কঠিন পরিশ্রম করে জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। এ অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণ অত্যধিক পরিশ্রমী। এখানকার স্ত্রীলোকেরাই ক্ষেতিকর্ম করে। পুরুষগণ কেবলমাত্র জমি ঠিক করে দেয়। এ অঞ্চলের সকলেই মৎস্য মাংসাদি ভক্ষণ করে থাকে। পরিধেয় বস্ত্রের মধ্যে কম্বল। স্ত্রীলোকগণ আপন পরিশ্রমের দ্বারা অর্জিত অর্থের দ্বারা আভরণাদি ক্রয় করে। বন্য পুষ্পের দ্বারা স্ত্রীলোকেরা সজ্জিত হয়। এখানকার অধিবাসীদের আহারের নির্দিষ্ট কোন সময় নেই, ক্ষুধা পেলেই এরা আহার করে। এদের সঙ্গে থাকে রুটি এবং মাংস। এতদ্ভিন্ন বনের ফলও এরা আহার করে। কাঠ আহরণের জন্য সকলকেই বনে পরিভ্রমণ করতে হয়। মূল্যবান আভরণে ভূষিত যারা তারাও বন থেকে কাঠ সংগ্রহ করে পিঠে বেঁধে বিক্রয় করে থাকে। নিজেদের শ্রমে এবং ছাগ মেষাদি পালন করে এরা অলঙ্কার করে থাকে। ক্ষেতে যে শস্য উৎপন্ন হয়, তাতেই সকলের আহারের সংস্থান হয়ে যায়। পর্বতের শৃঙ্গে যাদের বসতি, তাদের অনেক নীচু থেকে জল নিয়ে যেতে হয়। স্ত্রীলোকগণ জলের কলস কানিতে বসিয়ে পিঠে করে দুই ক্রোশ পর্যন্ত ওপরে ওঠে, এমনকি প্রয়োজন হলে আরও অধিকদূর পর্যন্ত ওঠে। উত্তরখণ্ডের সর্বত্রই প্রায় জল সুলভ।

বৃন্দাবন থেকে যদুনাথ প্রথমে চৌমুয়া নামক গ্রাম এবং তারপরে এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত যাওয়া গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখান থেকে কুশী চার ক্রোশের পথ। কুশী সহরটি খুব ক্ষুদ্র। এখানে তুলা এবং ভূষির আমদানী রপ্তানী হয়ে থাকে। কুশী থেকে ছয়ক্রোশ কোটবন ও সূর্যকুণ্ড।

অতঃপর এখান থেকে চার ক্রোশ হোড়েল গ্রাম। হোড়েল গ্রাম থেকে চার ক্রোশ বনচারিগ্রাম। বনচারিগ্রাম থেকে পাঁচ ক্রোশ পরত্তল গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে পাথরওয়ারি দেবীর মন্দির। পরত্তল থেকে ছয়ক্রোশ বল্লভগড়। এখান থেকে ছয় ক্রোশ ফরিদাবাদ গ্রাম। ফরিদাবাদ থেকে পাঁচ ক্রোশ দিল্লী সহরের পুরাতন কেল্লা। এস্থান থেকে তিন ক্রোশ কাবেলি দরজা, কাবেলিদরজা থেকে তুই ক্রোশ সবজিমণ্ডি।

দিল্লী থেকে যত্নাথ তোল আড়া, পূজানিগ্রাম, পূজানিগ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত রাইগ্রাম, রাইগ্রাম থেকে ছয় ক্রোশ দূরে অবস্থিত রশৌনি-গ্রাম এবং এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ শ্যাম হালকি পড়াউ গিয়ে উপস্থিত হলেন।

শ্যামগাল থেকে পাণিপথ সহরের দূরত্ব সাত ক্রোশ। পাণিপথে বহু ধনী মুসলমানের বসতি। এখানকার জাঁতি খুব প্রসিদ্ধ। পাণিপথ থেকে ছয় ক্রোশ মরহুদার পড়াউ। এখান থেকে কর্নাল সহরের দূরত্ব ছয় ক্রোশ। কর্নাল থেকে ছয় ক্রোশ মরহুদার পড়াউ। এখান থেকে ছয় ক্রোশ গিয়ে থানেশ্বরে কুরুক্ষেত্র নামক প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান।

থানেশ্বর থেকে পৃথুদক তীর্থ দশ ক্রোশ। থানেশ্বরের সামনে একটি কুণ্ড অবস্থিত। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই কুণ্ডের জলে অগ্নি সংস্কার নিষেধ। কুণ্ডের জল নিয়ে অগ্নিতে উত্তপ্ত করতে গেলে জলের পাত্রটিই নাকি বিদীর্ণ হয়ে যায়। আবার বিপরীত ক্রমে এই কুণ্ডের জল ঘটপূর্ণ ভাণ্ডারে স্থাপন করলে ভাণ্ডার পূর্ণ থাকে। থানেশ্বর থেকে ভীমকুণ্ড তু'ক্রোশ। এইস্থানে নাকি ভীষ্মের শরশয্যা হয়েছিল। ভীমকুণ্ডের দক্ষিণদিকে উচ্চস্থান। এই স্থানেই নাকি ভীষ্ম শরশয্যায় ছিলেন। কুণ্ড থেকে তু'ক্রোশ দক্ষিণে বাণগঙ্গা।

কর্ণখেড়া আপগয়ার কাছে একটি উচ্চস্থানে বিদ্যমান। কথিত আছে, কর্ণ যুদ্ধের পূর্বে এইস্থানে একশত মন স্বর্ণ দান করতেন। যে স্থানে কুরুরাজ যজ্ঞ করে ধ্বজা তুলেছিলেন তা কুরুধ্বজাতীর্থ অথবা নাভিতীর্থ নামে পরিচিত। দধীচী মুনির তপস্যার স্থান সনহ্রদ। কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের সময় কৃষ্ণ অর্জুনের রথের অশ্বের জলপানের জন্য যে সরোবরটির সৃষ্টি করেছিলেন, তা পরিচিত লক্ষ্মীকুণ্ড নামে। লক্ষ্মীকুণ্ডের অপর নাম কুরুক্ষেত্রতীর্থ। কুরুক্ষেত্রতীর্থের মৃত্তিকা রক্তবর্ণ। বর্ষাকালে কুরুক্ষেত্রের সকল ভূমিই রক্তবর্ণ ধারণ করে।

চক্রতীর্থ নামক স্থানে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের প্রাক্কালে কৃষ্ণ নাকি তাঁর স্থদর্শন চক্রটি রেখেছিলেন। ইন্দ্ররাজ গুরুপত্নী অপহরণের পাপে গৌতমমুনির শাপে যেখানে ভগ্নাঙ্গ হয়ে তপস্যা করেছিলেন সেই স্থানটি ইন্দ্রতীর্থ নামে পরিচিত। বশিষ্ঠ মুনির তপস্যার স্থল বশিষ্ঠপ্রাচী। মহাদেবের তপঃস্থল রুদ্রকূপ। দুর্গাকূপে সতীর গুল্‌ফদেশ পতিত হয়েছিল। স্থানটি তাই গুল্‌ফ পীঠ নামে পরিচিত। এখানকার অধিষ্ঠিত দেবী ভদ্রকালী। কুবেরের তপস্যাস্থল কুবেরতীর্থ। হর-পার্ব্বতীর বিহারক্ষেত্র বিহারতীর্থ। ব্যাসদেবের তপস্যাস্থল দ্বৈপায়ন হ্রদ। এটি কুরুক্ষেত্র থেকে ষোল ক্রোশ।

কুরুক্ষেত্র থেকে তিন ক্রোশ পিপলি তারপর সাতক্রোশ তেওড়া। পরে তিন ক্রোশ সাহাবাদের পড়াউ। সাহাবাদ থেকে দুক্রোশ মার্কণ্ডের রেতি। অতঃপর ছয়ক্রোশ পরে টগরিনদী এবং পরে তিন ক্রোশ দূরে বাণগঙ্গা। পরে আম্বালা। আম্বালায় নানাবিধ খাদ্যদ্রব্য, বস্ত্র, পিতল, কাঁসা রূপা, সোনা ইত্যাদির তৈরী উত্তম দ্রব্যাদি পাওয়া যায়। আম্বালা থেকে দুক্রোশ কাগানদী। এর দু'ক্রোশ পরে মগনের সরাই। অতঃপর ছয় ক্রোশ পরে রাজপুরা গ্রাম। রাজপুরা থেকে বেলোরা চারক্রোশের পথ। এর দুই ক্রোশ পরে পাতড়াশির সরাই। এখান থেকে সরেন্দা ছয় ক্রোশ। সরেন্দা সহরটি খুবই ছোট। এখানে নর্মদেশ্বর নামে দশবাহু শিবলিঙ্গ বর্তমান।

সরেন্দা থেকে আটক্রোশ খয়ের সরাই। এর সাত ক্রোশ পরে লস্করের সরাই। লস্করের সরাই থেকে চার ক্রোশ দূরে হাই পড়াউ। এখান থেকে পুনরায় নয় ক্রোশ গেলে তবে লুধিয়ানার পড়াউ। লুধিয়ানা সহরটি প্রায় দুই ক্রোশ বিশিষ্ট। এখানকার পশমবস্ত্র এবং উর্ণা নামক বস্ত্রাদি বিশেষ প্রসিদ্ধ। নদীর তীরে একটি প্রাচীন কেল্লা বিদ্যমান। লুধিয়ানা থেকে সতলেজ নদীর দূরত্ব চার ক্রোশ। সতলেজ নদী থেকে এক ক্রোশ বালুকাময় ভূমি অতিক্রম করলে তবে ফোলবের। ফোলবেরে রাজা রণজিৎ সিংহের প্রথম দুর্গটি অবস্থিত। এখান থেকে ফাগুয়াড়া দশ ক্রোশের পথ। ফাগুয়াড়া থেকে ওঝা নদী অতিক্রম করলে চারক্রোশ পরে অবস্থিত বেহালাগ্রাম। এখান থেকে তিন ক্রোশ হরেলা গ্রাম। হরেলা থেকে চার ক্রোশ হুশিয়ার পুরের ছাউনি। হুশিয়ারপুর সহরটি খুব প্রাচীন। এখানকার কাষ্ঠনির্মিত কৌটা, পেতলের ওদনা প্রভৃতি বিখ্যাত। হুশিয়ারপুর থেকে ভাঙ্গানদী অতিক্রম করে

গেলে ক্রমে বৌটাগ্রাম এবং বৌটাগ্রাম থেকে চারক্রোশ দূরে আমবাগ নামক গ্রাম অবস্থিত। এখান থেকে রাজপুরা গ্রাম আটক্রোশের পথ। পাহাড় মধ্যে লোকের বসতি। পর্বতের শীর্ষে মহিষমর্দিনী দেবী অধিষ্ঠিত। রাজপুরা থেকে কুলুকীহট্ট চারক্রোশের পথ। পরে তুই ক্রোশ গেলে গরণিগ্রাম। এখান থেকে অনতিদূরে ব্যাসানদী ও চম্পাগ্রাম। চম্পার ঘাট থেকে পূর্ব অভিমুখে তু'ক্রোশ পরে কালেশ্বর নামক শিব বিগুমান। এরপর নদী অতিক্রম করে প্রায় পাঁচক্রোশ পরিমিত পথ অতিক্রম করলে জালন্ধর পীঠ। সতীর জিহ্বা এইস্থানে পড়েছিল। পর্বতের মধ্যস্থলে জোয়ালাদেবীর মন্দির। মন্দির মধ্যে দেবীর জ্যোতিঃ প্রজ্বলিত। মন্দিরের মধ্যস্থলে একটি কুণ্ড। কুণ্ডের উত্তরদিকে জ্যোতিঃ বিগুমান। মন্দিরের উত্তরদিকের দেওয়ালে যে জ্যোতি রয়েছে তাই আদি। এই জ্যোতির সম্মুখেই জোয়ালা দেবীর পূজা পুষ্পাঞ্জলি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। মহাদেবীর সিংহাসনের পশ্চিমোত্তর কোণে যে প্রবল জ্যোতিঃ বিগুমান, তার নাম হিঙ্গলাজ। ঐ জ্যোতির মধ্যে পেড়া, তুগ্ধ প্রভৃতি প্রদান করা হয়। সিংহাসনের পূর্ব দিকেও এক জ্যোতিঃ বিরাজিত। এটি অন্নপূর্ণা নামে পরিচিত। মন্দিরের বাইরে উত্তরদিকে তুটি জ্যোতিঃ প্রকাশিত। দ্বারের পূর্বদিকে এক গুপ্ত জ্যোতিঃ বিরাজমান। দিবাকালে এই জ্যোতির তেমন উত্তাপ না থাকলেও রাত্রিকালে উত্তাপ প্রবল হয়ে ওঠে।

মন্দিরের উত্তরে গোরক্ষনাথের গদি। গদির উত্তরে পাহাড়ের মধ্যস্থানে বিগুমান বিল্বকেশ্বর শিব। বিল্বকেশ্বর শিবের নিকটেও তুটি জ্যোতিঃ প্রজ্বলিত। মহাপীঠের রক্ষাকল্পে উন্মত্ত নামে ভৈরব এই মন্দিরের অর্ধক্রোশ অন্তরে বর্তমান। বর্তমানে উন্মত্তেশ্বর অপ্রকট হয়ে পর্বত গহ্বরে অধিষ্ঠিত। এই পর্বত ওপরে নর্মদেশ্বর নামে এক লিঙ্গ স্থাপিত। দেবীর মন্দির থেকে অর্ধক্রোশ দূরস্থিত পর্বতের ঈশান কোণে উন্মত্তেশ্বর শিব বিগুমান। মহাদেবীর মন্দির স্বর্ণমণ্ডিত এবং মন্দিরের দ্বার রৌপ্য খচিত।

প্রাতে মঙ্গল আরতি অনুষ্ঠিত হবার পর মহাদেবীকে তুধ, পেড়া ভোগ দেওয়া হয়। এর পরে হয় খিচুড়ি ভোগ। মধ্যাহ্নে অন্ন-মৎস্য মাংসাদির ভোগ হয়। সন্ধ্যায় দেবীর অভিষেক স্নান, পূজারতি প্রথম গদিতে, এর পর কুণ্ড মধ্যে, তার পর উত্তর পশ্চিমকোণে হিঙ্গলাজ দেবীকে পরে অন্নপূর্ণাকে। মন্দিরে পূজারী সকল জ্যোতির পূজা এবং আরতি করে তার পর ভাণ্ডার মধ্যে

প্রবেশ করে আরতি করেন। যে পূজারী যখন পূজায় নিযুক্ত থাকেন, তাঁকে সে সময়ে ব্রহ্মচর্যে থাকতে হয়। মহাদেবীর জ্যোতিঃ পর্বতের প্রায় সকল স্থানেই বর্তমান—তবে কোথাও তা প্রকটিত আবার কোনস্থানে তা অপ্রকটিত।

জালন্ধর পীঠের পরিক্রম আটচল্লিশ ক্রোশ। এখানে কালেশ্বর শিব, চতুভুজ নারায়ণ, কাশ্যপনাথ শিব, ত্রৈলোক্যনাথ শিব, কাঁগড়ায় বাণগঙ্গা এবং পাতাল গঙ্গার সঙ্গমস্থল, কেল্লামধ্যে অম্বিকাদেবী ও শীতলা দেবী এবং কালভৈরব, কেল্লার বাইরে এবং সহরের ভেতরে ইন্দ্রেশ্বর শিবের অধিষ্ঠান। পরে অবস্থিত বজ্রেশ্বরী মহাদেবী। বজ্রেশ্বরী মহাদেবীর নিকট থেকে তিন ক্রোশ উত্তরে পর্বত ওপরে জয়ন্তীদেবী এবং তিন ক্রোশ পশ্চিমে গঙ্গেশ্বর ভৈরব অবস্থিত। এখান থেকে দুই ক্রোশ পশ্চিমে পর্বতের ওপরে অবস্থিত অঞ্জলি দেবী। কাঁগড়া স্তনপীঠ নামে পরিচিত। বাণগঙ্গা থেকে পূর্বাভিমুখে গেলে পড়ে বৈদ্যনাথ শিব। বেলুয়া নদীর তীরে অবস্থিত বৈদ্যনাথের মন্দির। ক্ষীরগঙ্গা থেকে তিনক্রোশ দূরে অবস্থিত মহাকাল, দক্ষিণদিকে ব্যাসানদীর তীরে অবস্থিত কুঞ্জদ্বার। কুঞ্জদ্বারে অবস্থিত কুঞ্জনাথ শিব। অতঃপর এখান থেকে সুজানপুরের ঠাকুর প্রতিষ্ঠিত মুরলীমনোহর এবং তারপর টিরাতে অবস্থিত রাজার কেল্লা। সুজানপুর থেকে বিল্বকেশ্বর শিব দর্শন করে যদুনাথ নাদত্তনে অবস্থিত নর্মদেশ্বর শিব দর্শন করলেন। এখান থেকে কালেশ্বর এসে তবে জোয়ালাজি পৌছাতে হয়। জোয়ালাজির পাণ্ডাদের বাস পর্বত ওপরে।

রাত্রি দশ দণ্ডের পর মহাদেবীর শয়ান হয়। দেবীর শয়ন খাটের ওপর। উত্তম বিছানা করে তাতে পুষ্পশয্যা করে আভরণাদি তার উপর দিয়ে দেবীর শয়ান হয়। তার পর মন্দিরের দ্বার রুদ্ধ করা হয়।

জোয়ালাদেবী দর্শনের পর মণিকরণ রেওড়েশ্বর। এখান থেকে যদুনাথ ব্যাসানদীর নাদত্তনের ঘাট অতিক্রম করে নাদওন সহরে উপস্থিত হলেন। এটি রাজা উমেদচন্দ্রের রাজধানী। নাদওন সহরটি খুব ক্ষুদ্র। নাদওন থেকে ফতেপুর তিন ক্রোশের পথ। ফতেপুর থেকে এক ক্রোশ দূরে রাওল এবং রাওল থেকে পুনরায় এক ক্রোশ দূরে পর্বতের চড়াই, দুই ক্রোশ পরে হামিরপুর। ফতেপুরের চটী থেকে লম্বুড় তিন ক্রোশ। লম্বুড় পাহাড়ের চড়াই উতরাই অতিক্রম করে যদুনাথ গিয়ে পৌছালেন গোপালপুর গ্রামে।

গোপালপুর থেকে চারক্রোশ চড়াই অতিক্রম করলে তবে রাজার তলাও। এখান থেকে তুই ক্রোশ চড়াই এবং তিন ক্রোশ উতরাই অতিক্রমের পর রেওয়াড়েশ্বরের কুণ্ড। কুণ্ডের তীরে মণ্ডীর রাজধানীর এক শিবালয় অবস্থিত। শিবালয়ে নর্মদেশ্বর শিব বিগ্রহ বর্তমান। সম্মুখেই অবস্থিত নন্দীকেশ্বর, কাল প্রস্তরে নির্মিত।

রেওয়াড়েশ্বর তীর্থ কুণ্ড মধ্যে প্রস্তর, ওপরে মৃত্তিকা, তদুপরি বৃক্ষাদি বিদ্যমান। এই পর্বত জলে ভেসে বেড়ায়। এটি 'বেড়া' নামে পরিচিত। কুণ্ডটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে তুই ক্রোশের সমান। জলমধ্যে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, হনুমান, তুর্গা, গণপতি এবং ধরমধারী অর্থাৎ লোমশমুনি এই সাতটি বেড়া বিদ্যমান। এদের মধ্যে ছয়টি বেড়া সারা বৎসর ভেসে বেড়ায়। তুর্গার বেড়াটি শ্রাবণ-ভাদ্র এই তুই মাস ভাসে। এই বেড়াটি সকল বেড়ার তুলনায় বৃহৎ। বিষ্ণুর বেড়াটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তিন হাতের সমান। লোমশমুনির বেড়াটি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে পাঁচ হাত। গণেশের বেড়াটি একদিকে প্রশস্ত এবং অপর এক দিকে সরু শুণ্ডাকৃতি। হনুমানের বেড়াটি ছোট এবং গোলাকৃতি।

রেওয়াড়েশ্বর কুণ্ডের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে লোমশমুনির গদি এবং মূর্তি বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ, গণেশ এবং পার্বতীর মূর্তিও বিদ্যমান। কুণ্ড থেকে তিন ক্রোশ দূরে এক পর্বতের ওপরে নয়নাদেবী অধিষ্ঠিত। স্থানটি নয়নপীঠ নামে পরিচিত। নয়নপীঠে ভোটদেশীয় এবং মহাচীনদেশের বহু তীর্থযাত্রীরা এসে থাকে। চীনদেশীয় তীর্থযাত্রীরা ব্রহ্মার বেড়াকে অতিশয় মান্য করে থাকে। ভোটদেশীয় স্ত্রীপুরুষগণ সকলেই মদ্য-মাংসভোজী। সারারাত্র ধরে কুণ্ড প্রদক্ষিণ এবং তৎসহ ভজন করে থাকে। যারা লোকনাথের শিষ্য, তারা অষ্টধাতু নির্মিত একটি যন্ত্র এবং দক্ষিণহস্তে মালা জপ করতে করতে কুণ্ড পরিক্রমা করে থাকে।

রেওয়াড়েশ্বরের কুণ্ড থেকে দেড়ক্রোশ চড়াই এবং ছয় ক্রোশ উতরাইয়ের পর মণ্ডী নগর। মণ্ডীনগর, ব্যাসানদীর তীরে পাহাড়মধ্যে অবস্থিত। মণ্ডীনগর, রাজা বনবীর সেনের রাজধানী ছিল। এখানে ভূতেশ্বর নামক শিব বিদ্যমান। এই শিব অত্যন্ত প্রাচীন। মন্দিরে গৌরীমূর্তিও বর্তমান। রাজাকে এই ভূতেশ্বর শিব দর্শনার্থে সারাদিনের মধ্যে অন্ততঃ একবারের জন্য মন্দিরে আসতে হয়। পাহাড়ের ওপরে এক শ্যামা কালী মূর্তি অধিষ্ঠিত।

মণ্ডীনগরে এক 'দেব-মেলা' অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলায় রাজার অধিকারে যে সব স্থানাদি, সেই সব স্থানের সকল দেবদেবীকে সকলে মিলে মণ্ডীনগরে এনে আটদিন পর্যন্ত মেলার আয়োজন করে থাকে। এই মেলায় প্রায় দেড়শত দেবদেবীর আগমন ঘটে। দেবদেবীদের মূর্তির সঙ্গে পাহাড়ীরাও এসে সমবেত হয। সঙ্গে থাকে তাদের পাহাড়ীয়া বাদ্য সকল। মণ্ডীর রাজার রাজধানীতে লোহা এবং লবণের আকর বর্তমান।

মণ্ডীনগর থেকে ব্যাসানদী অতিক্রম করলে প্রাচীন নগরী পারমণ্ডী পড়ে। এখান থেকে যদুনাথ বহু চড়াই উতরাই অতিক্রম করে জজরু কুফরুতে গিয়ে পৌছালেন। মণ্ডীওয়ালা রাজার রাজ্য পার হলে পড়ে বেজত্তর গ্রাম। বেজত্তর থেকে অর্দ্ধক্রোশ পূর্বদিকে এক গ্রামে পাণ্ডবগণ স্থাপিত একটি শিবালয়। মন্দিরটির চারটি দ্বারে চার দেবমূর্তি বিদ্যমান। এক দ্বারে মহিষ-মর্দিনী, দ্বিতীয় দ্বারে চতুর্ভুজ নারায়ণ, তৃতীয় দ্বারে গণেশ এবং চতুর্থদ্বারে অবস্থিত শিব। বেজত্তর থেকে ব্যাসানদীর দূরত্ব দু'ক্রোশ। এস্থান থেকে বহু চড়াই উতরাই অতিক্রম করে যদুনাথ বিওড় গ্রামে গিয়ে পৌছালেন। বিওড় গ্রাম থেকে বামুনকোঠী গ্রামের দূরত্ব এক ক্রোশ। কিঞ্চিৎ নীচে পার্বতীয় মানুষের বাস। স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই কম্বলের বস্ত্র পরিধান করে থাকে। বামুনকোঠী থেকে এক ক্রোশ আসলে তারপর নদী অতিক্রম করে তিন ক্রোশ পরে অবস্থিত জরি গ্রাম। এখান থেকে বিষ্ণুকুণ্ড সাড়ে চার ক্রোশ। গঙ্গার ধারে ধারে কিছুদূর গেলে পড়ে মণিকরণতীর্থ। রাজা জগৎ-সিংহের দেবালয় মণিকরণ তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। পশ্চিমে বিষ্ণুকুণ্ড, উত্তরে হরেন্দ্র পর্বত, পূর্বে ব্রহ্মনাল, দক্ষিণে পার্বতী গঙ্গা। এই সীমার মধ্যে দৈর্ঘ্যে দুই ক্রোশ এবং প্রস্থে দুই ক্রোশ স্থান মণিকরণ। পার্বতী গঙ্গা এবং হরেন্দ্রগঙ্গার জলে যেখানে সঙ্গম হচ্ছে, তার ওপরে অবস্থিত দুটি কুণ্ড। মণিকরণ পূর্বে কুলান্তপীঠ নামে পরিচিত ছিল। হরেন্দ্র পর্বত থেকে আগত ঝরণার ন্যায় জলরাশি উষ্ণ। হরেন্দ্র পর্বতের উষ্ণজল পার্বতী গঙ্গাতে মিলিত হয়ে ত্রিধারার সৃষ্টি করেছে। এই স্থানটি ব্রহ্মনাল নামে পরিচিত। ব্রহ্মনাল থেকে উর্ধ্বে বারোক্রোশ গেলে পড়ে মানতলাব। মানতলাবে যেতে হলে ক্ষীরগঙ্গা অতিক্রম করতে হয়।

মানতলাব পর্ব্বতের পশ্চিম দক্ষিণে অবস্থিত ক্ষীরোদ। ক্ষীরোদ পরিচিত

ক্ষীরগঙ্গা নামে। ক্ষীরোদের জলরাশি দুধের মতন। জলের ফেনা হাতে করে ভক্ষণ করলে দুধের সরের মত স্বাদ্ লাগে।

বরফের জন্য যেখানে ক্ষীরোদ সেখানে যাওয়া প্রায় দুঃসাধ্য। ক্ষীরোদের জলই মানতলাবের নিকট ক্ষীরগঙ্গা নামে প্রবাহিত হচ্ছে। হরেন্দ্র পর্বত মধ্যে এক দেবী বিদ্যমান। ইনি নয়না দেবী নামে পরিচিত। পর্বতের নীচে মণিকরণ তীর্থে একটি মন্দির বর্তমান। ঐ মন্দিরের দ্বার সর্ব্বদা রুদ্ধ। কেবলমাত্র বৈশাখ—শ্রাবণ এবং দশহরাতে নয়না দেবীর মন্দিরে আগমন ঘটে। তখন কেবলমাত্র নয়ন অর্থাৎ দু'টি চক্ষুর দর্শন হয়।

মণিকরণ থেকে বিষ্ণুকুণ্ডের দূরত্ব দেড়ক্রোশ। এখান থেকে জরিগ্রামের দূরত্ব প্রায় সাড়ে চার ক্রোশ। এখান থেকে বামনকোঠী পাঁচক্রোশ। বামনকোঠী থেকে নদী অতিক্রম করে চারক্রোশ চড়াই-উতরাই অতিক্রম করলে বিজলীশ্বর মহাদেবের অবস্থান। এই মহাদেব বারো বৎসর অন্তর নাকি বজ্রপাতের ফলে চূর্ণ হয়ে যান। পরে ঐসকল খণ্ড একত্রিত করে মাখন দিয়ে বেঁধে দিলে পূর্বমত শিবমূর্তি প্রস্তুত হয় বর্তমানে মহাদেবের কাছে যে ধ্বজা বর্তমান, তার ওপরেই বজ্রপাত হয়ে থাকে। বিজলীশ্বর মহাদেবের কাছে থেকে চার-ক্রোশ উতরায়ের পর কুল্লু সহর—রাজা জ্ঞানসিংহের রাজধানী। কুল্লু সহরটি বেশ ভাল। এখানে প্রচুর পরিমাণে আফিং হয়। সহর মধ্যে দেব দেবীর মন্দির বর্তমান। তন্মধ্যে রামসীতা, নৃসিংহজী পরশুরামের মন্দির প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। পরশু রামের মন্দিরের দরজা বারো বৎসর অন্তর খোলা হয়।

কুল্লু থেকে বেজওরের দূরত্ব—বারোক্রোশ। বেজওর থেকে দু'ক্রোশ রোপড়। এখান থেকে চার ক্রোশ পরে ভোলচি। তারপর পুনরায় চারক্রোশ পরে কুমাদ। কুমাদ থেকে দু'ক্রোশ দূরবর্তীনদী—অতিক্রমের পর চড়াই অতিক্রম করে জরু-কুফরু। এখান থেকে কিছু উতরাইয়ের পর ছয় ক্রোশ চড়াই অতিক্রম করলে পর্বতের উপর ফুটাখল নামক স্থান। এখান থেকে আধ ক্রোশ নিচে ফুটাখল গ্রাম। এখান থেকে তিন ক্রোশ গোমা গ্রাম। গোমা গ্রাম থেকে দু' ক্রোশ চড়াই—অতিক্রম করলে হীরাবাগ এবং এর দু' ক্রোশ পরে সমরুট গ্রাম। এখান থেকে যদুনাথ ক্রমে বৈদ্যনাথে পৌছলেন। এখানে পর্বত ওপরে শিবালয় এবং নীচে ক্ষীরগঙ্গা। এখানে বৈদ্যনাথ, সিদ্ধিনাথ, কেদারনাথ, ইন্দ্রেশ্বর, গণপতেশ্বর, কাশীর বিশ্বেশ্বর, রাবণেশ্বর, ভূতেশ্বর

ও মহাকাল—এই নয়টি শিবমূর্তি বিত্তমান। বৈদ্যনাথ থেকে চারক্রোশ করল গ্রাম। এখান থেকে চারক্রোশ ব্যেবারণা গ্রাম। বৈদ্যনাথ থেকে পরত্তল বারো ক্রোশ। পরত্তল থেকে চার ক্রোশ ধরমসা। এখানে ভাগশু শিব বিদ্যমান। ধরমসা থেকে দু' ক্রোশ নাথনা নামে গ্রাম। এখান থেকে এক ক্রোশ নগরোট নামে গ্রাম। এখান থেকে চারক্রোশ দূরে কাংগাড়া দেবীর ভবন অবস্থিত। দেবীর নাম বজ্রেশ্বরী। কপালী নামে ভৈরব। এখানে দেবীর স্তন পতিত হয়েছিল।

জালন্ধর পীঠে পাঁচটি মহাদেবী অধিষ্ঠিত—বজ্রেশ্বরী, জ্বালামুখী, অম্বিকা, অঞ্জনী জয়ন্তী এবং কপালী, উন্মত্ত, কালভৈরব, ভালেশ্বর ও মন্দিরেশ্বর নামে পাঁচটি ভৈরব বিদ্যমান। পর্বতের ঠিক মধ্যস্থলে বজ্রেশ্বরী দেবীর ভবন অবস্থিত। দেবীর প্রতিমূর্তি রূপার পাত্রে খোদিত। আসল মূর্তি গোলাকৃতি পাথরের। দিবাভাগে মহাদেবীর অন্নভোগ অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে মৎস্য, মাংস যাই উপস্থিত হয়, তাই ভোগে দেওয়া হয়ে থাকে। সন্ধ্যার পর দেবীর-স্নান, অভিষেক এবং পূজা। পরে পুরি, আর্দ্র চণক, ঘৃতসিক্ত দুধ ভোগ দেওয়া হয়। এর পর হয় আরতি। মহাদেবীর ভবন থেকে দুইক্রোশ চড়াই অতিক্রম করলে তবে কাংড়ার রাজার কেল্লা। কেল্লামন্দিরে অম্বিকা দেবী এবং কালভৈরব বিদ্যমান। কেল্লার পশ্চিমে পাতাল গঙ্গা। এর পশ্চিমে জয়ন্তী পর্বত। পর্বতটি তিন ক্রোশ সমান উঁচু। পর্বতের শিরোভাগে জয়ন্তী দেবী এবং ভালেশ্বর শিব অধিষ্ঠিত। স্থানটি কপালপীঠ নামে পরিচিত। মহাদেবী ভবন থেকে কাংড়া সহর একক্রোশ। কাংড়া থেকে গণেশ ঘাটির পাহাড় চার ক্রোশ। গণেশ ঘাটির পাহাড়টি দু' ক্রোশ সমান উচ্চ। এখান থেকে রাণীতলা চারক্রোশ। রাণীতলা থেকে বামপুরা নামক গ্রাম ছয়ক্রোশ। এখান থেকে চার ক্রোশ দূরে জ্বালামুখীর জোয়ালজীর মন্দির। কাংড়া থেকে জোয়াল জীর মন্দির বিশ ক্রোশের পথ। অতঃপর যদুনাথ চিন্তাপূরণী দেবীর দর্শন উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। প্রায় সাড়ে ছয় ক্রোশ দূরে পর্বত ওপরে চিন্তা-পূরণী দেবীর মন্দির। পথিমধ্যে ডেরা ও খাদ্য নামে গ্রাম। চিন্তাপূরণী দেবীর কোন বিগ্রহ নেই, গোলাকৃতি একটি প্রস্তর মাত্র। স্থানটি মহাপীঠ নামে পরিচিত। এখান থেকে যদুনাথ হুশিয়ারপুর হয়ে দু' ক্রোশ দূরে অবস্থিত বেজোড়ার কেল্লা দেখে, এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরের

রাজেশ্বরী দেবীর মন্দির ইত্যাদি পরিভ্রমণান্তে নদীরতীরে অবস্থিত বড়ণী নামক গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বড়ণী গ্রাম থেকে চারক্রোশ রামপুরাগ্রাম। রাম পুরা থেকে পাঁচ ক্রোশ জেজো পর্বত। এই পাঁচ ক্রোশ পথে জল পাওয়া যায় না। জেজো থেকে চড়াই—উতরাই অতিক্রম করে যদুনাথ গিয়ে পৌছলেন সোয়াদ নদীর তীরে অবস্থিত সন্তোকগড়ে। সন্তোকগড় থেকে দক্ষিণাভিমুখে সিমুলা সেপাটু পাহাড়ের রাস্তা এবং পূর্বদিকে নয়নাদেবী যাবার পথ। এখান থেকে তিন ক্রোশ সতলজ নদী।

বরমপুর থেকে যুবগ্রাম তিন ক্রোশ। যুবগ্রামে শিবদোয়ালা বর্তমান। এখান থেকে চারক্রোশ পার্বত্যসঙ্কুল পথ অতিক্রম করলে তবে কোট নামে গ্রাম। এখানে পর্বত ওপরে কল্লার রাজার একটি কেল্লা বর্তমান। রাজার বাটী বিলাস পুরে। অদূরে পর্বত উপরে নয়না দেবীর মন্দির। সাড়ে তিন ক্রোশ চড়াইয়ের পথ অতিক্রম করলে প্রথমে দেবীর পদচিহ্ন দৃষ্ট হয়। পরে পর্বতের শিরোভাগে দেবীর ভবন লক্ষিত হয়। ভবন মধ্যে অপরাপর দেব বিগ্রহের মধ্যে শিব, কালী, লক্ষ্মী-নারায়ণ এবং বটুক ভৈরবের মূর্তি বিদ্যমান। নয়না দেবীর মন্দির সম্মুখে ব্যাঘ্র মূর্তি প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। নয়না দেবীর মন্দির থেকে অর্দ্ধক্রোশ নীচে একটি সুড়ঙ্গে বটুক—ভৈরব গুপ্ত রয়েছেন। দেবীর নয়ন পতিত হয়েছিল বলে স্থানটি নয়ন পীঠ নামে পরিচিত।

কোটের কেল্লার কাছ থেকে আটক্রোশ গেলে বরমপুরস্থিত ব্যাসানদীর ঘাট। ব্যাসানদী অতিক্রম করে তিন ক্রোশ গেলে সোয়াদ নদীর তীরে অবস্থিত সন্তোকগড়, রাজা রামসিংহ জায়গীরদারের কেল্লা। সন্তোকগড় থেকে দশক্রোশ জেজো থেকে তিনক্রোশ পরে জেদি আড়াগ্রাম পরে দুইক্রোশ মানপুর নগর। মানপুর থেকে হুশিয়ারপুরের দূরত্ব দশ ক্রোশ। হুশিয়ারপুর থেকে হরেণাগ্রামের দূরত্ব সাত ক্রোশ। হরেণাগ্রামে উত্তম গুড় পাওয়া যায়। হরেণা থেকে রেহালার দূরত্ব চার ক্রোশ। রেহালা থেকে সাতক্রোশ ফাগুড়া গ্রাম। ফাগুড়া থেকে দশ ক্রোশ কোনর। কোনর থেকে সতলেজ নদীর দূরত্ব দুই ক্রোশ। নদী অতিক্রম করে তিন ক্রোশ গেলে লুধিয়ানার কেল্লা, এর পরে সহর। লুধিয়ানা থেকে পনের ক্রোশ দূরে লস্করের সরাই। এখান থেকে আধক্রোশ দূরে বিদ্যাপুরের গ্রাম। বিদ্যাপুর থেকে ছয় ক্রোশ খুল্যের সরাই। এখান থেকে আটক্রোশ বাড়াগ্রাম। এখান থেকে তেরো

ক্রোশ দূরে রাজপুরার সরাই। রাজপুরা থেকে নয় ক্রোশ দূরে মোগলের সরাই। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে একটি নদীকে অতিক্রম করে আরো দু' ক্রোশ গেলে আম্বালা সহর। এখান থেকে কশৌলির পাহাড় ত্রিশ ক্রোশ। আম্বালা থেকে যদুনাথ ক্রমে এসে উপস্থিত হলেন পানিপথ সহরে। পানিপথ থেকে রশৌলি গ্রাম হয়ে পৌছালেন পূজানি গ্রামে। পূজানি গ্রাম থেকে ক্রমে এসে উপস্থিত হলেন দিল্লীতে।

দিল্লীর উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত কাশীর দরজা , বামাবর্তে মহরি দরজা, কাবেলী দরজা, লাহোর দরজা, ফরাশখানার খিড়কি, আজমীর ঘাট দরজা তোরকমান দরজা, দিল্লী দরজা, বাহাদুর আলি খাঁর খিড়কি, দবিরাগঞ্জ ঘাট দরজা, রাজঘাট দরজা, জেরঝরকা খিড়কি, কলকাতা দরজা, নিগমবোধ খিড়কি, নিগমবোধ দরজা, কেল্লারঘাট দরজা, লাল দরজা এবং খাজনা খিড়কি। এই সব দ্বার দিয়ে লোকে যাতায়াত করে থাকে। এই সব দ্বারের মধ্যে দিল্লী, আজমীর, লাহোর, কাবেলী, কাশ্মীরী এবং কলকাতা দরজা প্রধান।

যদুনাথের পরিভ্রমণকালে দিল্লী ছিল পঞ্চক্রোশী সহর। হীরা, জহরত, মোতি, চুণী, পান্না, জরি, তিল্লা, কালাবতু অর্থাৎ সোনারূপার তার খচিত নানাবিধ বস্ত্রাদি সে সময়ে পাওয়া যেত। স্থানে স্থানে ছিল কাষ্ঠস্তম্ভে কাষ্ঠনির্মিত দীপাধার। নিশাকালে এই সব দীপের আলোকে নগরের পথ সকল আলোকিত হ'ত। দিল্লীর মধ্যস্থলে জুম্মা মসজিদ। রাজধানীর লোকজন "সুসভ্য, সুবেশ, সু-আবাস, সুভাষ, সচ্চরিত্র ও স্বধর্মে সুপবিত্র"। হিন্দুরা প্রাতঃকালে যমুনার জলে স্নান, পূজা ইত্যাদি করত। সন্ধ্যাকালে হিন্দু-মুসলমান সকলেই কেউ অশ্বে, কেউ গজে, কেউ উটে, কেউ রথে, কেউ মনুষ্যযানে, কেউ গোযানে, কেউ চেরেটে, কেউ পাল্কীতে, কেউ তানজান, কেউ বোচা, কেউবা ডোলি প্রভৃতিতে ভ্রমণ করত।

দিল্লীর স্থানে স্থানে অনেকগুলি বাজার—মনসুরকাচক, বদনপুরা, কাঞ্চনী-গলি, সামলমলকী দেড়ড়ি, পঞ্জাবী কটরা, হাপশ খাঁকা ফটক, খাড়ি বাউড়ি, লালকূয়া, সীতারামকী বাজার, মলুকাকী গলি, আমনিকা মহল্লা, দরিয়া বাজার, উর্দ্দু বাজার, চাঁদনী চক, জহুরী বাজার, খাস বাজার, খানবকা বাজার, পাল্লা বাজার, নয়া বাজার ইত্যাদি বর্তমান। এতদ্ভিন্ন দিল্লীতে অবস্থিত কালে

মসজিদ, চিতলি কবর, কাজিকা হোজ, কৌড়িয়া পুল, খজুরকী মসজিদ ইত্যাদি।

সে সময়ে সপ্তব্যূহদ্বার অতিক্রম করলে তবে দিল্লীশ্বরের অন্তঃপুরে প্রবেশ করা যেত। প্রথম ব্যূহ মধ্যে সহর ও আঠারটি দ্বার, দ্বিতীয় ব্যূহমধ্যে সহরের দোকান, তৃতীয় দ্বার ও চতুর্থ ব্যূহমধ্যে ছিল এক রাজসিংহাসন। চতুর্থ ব্যূহতে মহাতাব বাগ। এর পরে আঁধিয়ারী বাগ। শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত মোতি মসজিদ। ষষ্ঠ ব্যূহতে যমুনার পশ্চিমদিকে এক উত্তম ভবন। ভবনটির নাম দেওয়ান-ই খাস। সপ্তম ব্যূহ এই বাটীর দক্ষিণে।

দিল্লীতে কালাবর্তু তিল্লার কাজ উত্তম। প্রায় সব কয়টি বাজারেই গোটা জরি, পাল্লা, কালাবর্তু ও টুপির দোকান বর্তমান। খালাসী লাইন থেকে দিল্লীদরজা গেটের দূরত্ব দু'ক্রোশ এবং পরে প্রাচীন দিল্লী, প্রাচীন কেল্লা এবং রাজাদের পুরান কেল্লাসকল প্রায় দুই ক্রোশ পথ। এরপরে এক ক্রোশ আরবের সরাই। পূর্বে আরবদেশীয় সওদাগর সকল যখন দিল্লীতে আসত, তখন তারা এই সরাইয়ে থেকে বাণিজ্য করত। আরবের সরাইয়ের পর ভুলভুলুড়ি মসজিদ। মসজিদটি বহু প্রাচীন। মসজিদটির সকল দ্বারই এক আকৃতির। মসজিদে যত চিহ্ন দিয়েই প্রবেশ করা হোক, বাইরে যাবার সময় কিন্তু অন্য দ্বার দিয়ে বের হতে হয়। এখান থেকে আড়াইক্রোশ পরে পর্বত ওপরে বাহাপুর নামে গ্রাম। এই গ্রাম থেকে যদুনাথ কালকাদেবীর মন্দির পর্যটন করে চারক্রোশ দূরে অবস্থিত কুতব সহরে গিয়ে পৌছালেন। একটি বেদীর ওপর গোলাকৃতি প্রস্তর কালকাদেবী নামে পরিচিত। দেবীর স্বরূপ, বস্ত্র, গন্ধপুষ্প এবং অলঙ্কার দ্বারা আবৃত থাকে। চৈত্র ও আশ্বিন মাসে নবরাত্রকালে এখানে বেশ বড় মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। কালকাদেবীর মন্দির থেকে এক ক্রোশ চেরাগ দিল্লী ও গ্রাম। এখান থেকে সেখসরা গ্রাম পুনরায় এক ক্রোশ। পুনরায় এক ক্রোশ গেলে তবে বেগমপুরা গ্রাম। এখান থেকে পুনরায় এক ক্রোশ গেলে তবে যোগমায়া দেবীর মন্দির। এই মহাদেবী পৃথ্বীরাজার কেল্লার মধ্যস্থলে বিদ্যমান। দেবীর সমীপে সর্ব্বদাই একটি ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকত। পৃথ্বীরাজের যজ্ঞভূমি এবং রাজধানী গড়মধ্যে। পর্ব্বতের গড়টি চতুর্দিকে বেষ্টিত।

পৃথ্বীরাজের রাজপ্রাসাদ থেকে আধক্রোশ কুতবসহর। সহরের ভেতর দিয়ে

গুড় গ্রামে যাবার পথ গেছে। কুতব সহর থেকে গুড় গ্রামের দূরত্ব নয় ক্রোশ।

যোগমায়ার মন্দির থেকে চারক্রোশ মদবশা। পরে চার ক্রোশ দিল্লীর আজমীর দ্বার। দিল্লীস্থিত ইন্দ্রপ্রস্থ থেকে গড়মুক্তেশ্বর ত্রিশ ক্রোশ, গঙ্গাদেবী-তীর্থ। কথিত আছে যে, মুক্তেশ্বর শিব পাণ্ডবগণ স্থাপিত। এখান থেকে হস্তিনাপুরের দূরত্ব ত্রিশ ক্রোশ। হস্তিনা পরিবর্তিত হয়েছে বনে। এই বনে কুন্তীশ্বর নামে পরিচিত শিব বিদ্যমান।

দিল্লীতে যমুনার নিগমবোধের ঘাটের ওপর প্রতি রবিবার গায়কদের মজলিস অনুষ্ঠিত হ'ত। সহরের বিশিষ্ট গায়কেরা এই মজলিসে অংশগ্রহণ করতেন। যমুনার তটে নিগমবোধের ঘাটে নৃসিংহ চতুর্দশীর মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সময় প্রহ্লাদ চরিত্র পঠিত হয়। হিরণ্যকশিপুর কাগজ নির্মিত এক বৃহৎ মূর্তি প্রস্তুত করা হয়। নৃসিংহ চতুর্দশীতে স্তম্ভ থেকে ভগবান নৃসিংহের রূপ ধারণ করে সন্ধ্যার সময় দৈত্যের বিনাশ সাধন করা হয়। এই সময় নানা দেবদেবী এবং লক্ষ্মীদেবীকেও নিগমবোধের ঘাটে উপস্থিত করা হয়।

যদুনাথ দিল্লী-দরজা থেকে পরিশেষে বৃন্দাবন অভিমুখে যাত্রা করলেন। প্রথমে তিনি গিয়ে পৌছালেন চৌমুরিয়া গ্রামে। চৌমুরিয়া গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরে বদরপুর গ্রাম। বদরপুর গ্রাম থেকে দু' ক্রোশ বজরপুর গ্রাম। বজরপুর গ্রাম থেকে দেড় ক্রোশ ইদরানকী সরাই। এখান থেকে দু'ক্রোশ ফরিদাবাদ গ্রাম। ফরিদাবাদ গ্রাম থেকে চার ক্রোশ বল্লামগড়, রাজা লহর সিংহের রাজ্য। এখান থেকে চার ক্রোশ বগলাগ্রাম। এখান থেকে চার ক্রোশ পরত্তল গ্রাম। গ্রামের প্রান্তভাগে পাথরওয়ারী দেবীর বাগান। পরত্তল থেকে চার ক্রোশ দূরে বনচারী, ছয় ক্রোশ দূরে হোড়েন এবং দু' ক্রোশ দূরে অবস্থিত কোটবন। কোটবন থেকে দু' ক্রোশ দূরে কুশী। এখান থেকে চার ক্রোশ সাতুই। পরে ছয় ক্রোশ চৌমুয়া এবং পরের পাঁচ ক্রোশ বৃন্দাবন।

বৃন্দাবনস্থিত ধ্রুবঘাটের নিকট থেকে তিন ক্রোশ নওরঙ্গাবাদ। এখান থেকে ফার সরাই ছয় ক্রোশের পথ। সরাই থেকে গৌঘাট সাত ক্রোশ। গৌঘাট থেকে দু'ক্রোশ সেকেন্দরাবাগ। সেকেন্দরাবাগ থেকে আগ্রা দু'ক্রোশের পথ।

আগ্রা সহরটি উত্তর-দক্ষিণে দৈর্ঘ্যে দু'ক্রোশ, পূর্ব-পশ্চিমে প্রস্থে একক্রোশ

বিস্তৃত। আগ্রার টুপী, চাদর, আদিয়া, কোরতা, গুড়গুড়ি, আলবোলা, ফরশী, সতরঞ্চি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। আগ্রা অতি প্রাচীন সহর। হিন্দুদের রাজত্বকালে এর নাম ছিল অগ্রবন। মুসলমানদের রাজত্বকালে আকবর এর নাম করেন আকবরাবাদ। পরবর্তীকালে মহারাষ্ট্রীয়গণ এর নাম করে আগরা। আগ্রাস্থিত কেল্লাটি ঠিক যমুনার ওপরে অবস্থিত। কেল্লাটি উত্তর দক্ষিণে বিস্তৃত। পশ্চিম এবং দক্ষিণদিকে কেল্লার দরজা। কেল্লাটি প্রস্তরে নির্মিত। এইরূপ কেল্লা এলাহাবাদ এবং চণ্ডালগড় ব্যতীত অপর কোন স্থানে নেই। কেল্লার মধ্যে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত মোতি মসজিদ। মোতি মসজিদের পূর্ব দক্ষিণে দেওয়ান-ই-আম ও দেওয়ান-ই-খাস। দেওয়ান-ই-আমে অবস্থিত হাওয়াখানা। এর দক্ষিণে শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত আবাসস্থল শীশমহল। শীশমহলের দক্ষিণে অবস্থিত দেওয়ান-ই-খাস।

আগ্রার কেল্লা থেকে দেড় ক্রোশ দক্ষিণে সাজাহান এবং মমতাজের কবর তাজমহল। চারতলা বিশিষ্ট কবরস্থান।
নীচে সাজাহান এবং মমতাজের কবর দু'টি বিদ্যমান। ওপর তলাতে এই দুই কবরের অনুরূপ আকৃতি বিশিষ্ট দু'টি কবর বর্তমান। কবরস্থানের গৃহের চতুষ্পার্শ্বের দেওয়ালে শ্বেত প্রস্তরের ওপরে লাল, নীল, সবুজ, গোলাপী ইত্যাদি নানা রঙের বৃক্ষ, লতা, পাতা, ফল, ফুল ইত্যাদি খোদিত। কবরের ওপরে উচ্চভাগে একসা মোরগের ডিম। চতুর্থ তলার ওপরে এক হাওয়াখানা বুরুজ। চারকোণে চারটি বৃহৎ ও উচ্চ শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত স্তম্ভ বিদ্যমান। চারতলা বাটীর ওপরে গম্বুজ, চারতলা একত্র হিসাবে আট মহল উচ্চতা বিশিষ্ট। সম্মুখস্থিত পুষ্পোদ্যানের মধ্যস্থলে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত চবুতরাটি দৈর্ঘ্যে এবং প্রস্থে ষোল হাত করে। সুরম্য উদ্যানের চতুষ্পার্শ্বে প্রস্তরের বাঁধা পথ। এখান থেকে কিছুদূরে অবস্থিত তাজগঞ্জ। আগ্রা থেকে যমুনা নদী অতিক্রম করে তবে রামবাগে পৌছাতে হয়। আগ্রাস্থিত কেল্লার ঘাট থেকে নাগরীয়ার চড়ার দূরত্ব আটক্রোশ। নাগরীয়া থেকে চিনবাস গামের দূরত্ব ছয় ক্রোশ। চিনবাস থেকে বটেশ্বরের দূরত্ব নয় ক্রোশ। বটেশ্বরে বটেশ্বর শিব, গৌরীশঙ্কর ইত্যাদি বর্তমান। বটেশ্বর সে সময়ে ছিল ভাদড়িয়া রাজার রাজ্য। যমুনার ধারে এবং নগরীমধ্যে দু'শতটি দেবালয়ে শিবমূর্তি স্থাপিত। বটেশ্বরের সীমা নয় ক্রোশ পর্যন্ত বিস্তৃত। কার্তিকী

পূর্ণিমায় বটেশ্বরে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ব্রজভূমের মধ্যে বটেশ্বরের মেলাই প্রধান। বটেশ্বর থেকে সাত ক্রোশ দূরে অবস্থিত বিক্রমপুর গ্রাম। বিক্রমপুর থেকে আটক্রোশ পান্না, ভাদড়িয়া রাজার বাটী। এখান থেকে স্থল-পথে বটেশ্বরীর দূরত্ব সাত ক্রোশ। পান্নার পরে অবস্থিত নওগাঁ থেকে ভাদড়িয়ারাজ মহেন্দ্রসিংহের কেল্লা ভবন প্রভৃতির দূরত্ব চারক্রোশ। গ্রামটির নাম ঘাট্‌কো। ঘাট্‌কো থেকে যদুনাথ গেলেন ইটয়া। ইটয়া থেকে জলপথে দশক্রোশ এবং স্থলপথে পাঁচক্রোশ চণ্ডোলী গ্রাম। চণ্ডোলী গ্রামের নিকটস্থ চড়ার আড়পারে অবস্থিত আদোনী গ্রাম। আদোনী গ্রামে অবস্থিত দেবীর কাছে ষষ্ঠীতে ছটের মেলা উপলক্ষে বলিদান করা হয়। চণ্ডোলী থেকে জল পথে ছয় ক্রোশ ভরে গ্রাম। এখানে ভরের রাজার বাটী এবং কেল্লা বিদ্যমান। ক্রমে এখান থেকে যদুনাথ গিয়ে উপস্থিত হলেন অরুয়ায়। অরুয়া থেকে বারো ক্রোশ দূরে অবস্থিত খরতলা গ্রাম। এখান থেকে কাল্‌পী স্থলপথে তিন ক্রোশের ন্যায়। কাল্‌পীতে অনেকগুলি বাজার বিদ্যমান। তন্মধ্যে উল্লেখযোগ্য বড়বাজার এবং গণেশগঞ্জ। গণেশগঞ্জে গুড়, মিছরি, চিনি প্রভৃতির ক্রয় বিক্রয় হয়। কাল্‌পীর জিরে খুব প্রসিদ্ধ। এখানে দই, দুধ, মাখন, পেড়া, খুয়া, বরফি, মেঠাই প্রভৃতি পাওয়া যায়। এখানকার তামাক খুব সুলভ। কাল্‌পী থেকে যদুনাথ গিয়ে উপস্থিত হলেন কোলহেদ নামক গ্রামে। এখান থেকে চার ক্রোশ বাবকণি গ্রাম। জলপথে চারক্রোশ গড়াত নামে গ্রাম। এখান থেকে সাত ক্রোশ হামিরপুর। হামিরপুর থেকে বুন্দেল খণ্ডের দূরত্ব দশক্রোশ। আবার হামিরপুর থেকে বেটুয়া নামক গ্রামের দূরত্ব চারক্রোশ। এখান থেকে দুই ক্রোশ মোত্তই নামে গ্রাম। পুনরায় এক ক্রোশ গেলে শুনোলী গ্রাম। এর পর পড়ুয়া। জলপথে পাঁচক্রোশ কোরণিগ্রাম। হাকিমপুরের পর প্রয়াগ পর্যন্ত চরখা মরখা নামক দুই কুখ্যাত দস্যুর সেই সময়ে ছিল উৎপাত। ক্রমে বারা গ্রাম এবং বারা গ্রামের পাঁচক্রোশ দূরবর্তী মড়ওরিনামক গ্রাম ভ্রমণ করে যদুনাথ মড়য়রিগ্রামের দুই ক্রোশ দূরবর্তী প্রদন গ্রামে গিয়ে উপস্থিত হলেন। তারপর এখান থেকে চেল্লাতারা নামক সহরে গিয়ে পৌঁছালেন। যমুনার কাছে মোগলপুর নামে গ্রাম। চেল্লার বাজার থেকে এক ক্রোশ তারাগ্রাম। চেল্লারবাজার থেকে ছয় ক্রোশ জোহারপুর। জোহারপুর থেকে এক ক্রোশ ধোরপুর নামক গ্রাম।

ফরিগ্রাম এবং ফরিগ্রাম থেকে দুই ক্রোশ দূরবর্তী লভেটাগ্রামে গিয়ে যদুনাথ উপস্থিত হলেন। লভেটাগ্রাম থেকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী হটমপুর নামক গ্রাম। এখান থেকে জরলি গ্রাম এবং জরলি গ্রাম থেকে এক ক্রোশ দূরবর্তী মারথা-গ্রামে গিয়ে যদুনাথ উপস্থিত হলেন। মারথা গ্রামের সংলগ্ন চরথা গ্রাম। চরথা মরথা থেকে দু'ক্রোশ দূরে অবস্থিত সরখণ্ডি গ্রাম। এখান থেকে জল-পথে কৃষ্ণপুরের দূরত্ব ছয়ক্রোশ। কৃষ্ণপুর থেকে কিছুদূরে অবস্থিত কৃষ্ণগড়ের ঘাট। ঘাটের ওপর রাবণ-মহীরাবণের মূর্তি বিদ্যমান। এখান থেকে স্থলপথে রাজাপুর আটক্রোশের পথ। রাজাপুর থেকে গড়হা নামে গ্রাম পুনরায় এক ক্রোশের পথ। গড়হা থেকে এক ক্রোশ লকনপুর। লকনপুর থেকে এক ক্রোশ কল্যাণপুর। এখান থেকে দু'ক্রোশ দূরে মইগ্রাম। মইগ্রাম থেকে সাড়ে তিন ক্রোশ রাজাপুর। রাজাপুর থেকে দশক্রোশ চিত্রকূটের ঘাট। চিত্রকূটের ঘাট থেকে ত্রিশ ক্রোশ দক্ষিণে রিসা। রাজাপুর থেকে পাঁচক্রোশ দূরবর্তী কামতাপুর। এবং পরে দুই ক্রোশ দূরে যমুনার কিনারায় অবস্থিত পাহাড়। পরে রাওড় নামে গ্রাম। এখান থেকে যদুনাথ প্রথমে পরদোঙা এবং পরদোঙা থেকে দু'ক্রোশ দূরবর্তী প্রতাপপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রতাপপুর থেকে এক ক্রোশ দূরে উত্তরপারে অবস্থিত সিমরি এবং দক্ষিণ পারে অবস্থিত গরহাট্টা। পুনরায় এক ক্রোশ গেলে তবে সওড়া নামে গ্রাম। সওড়া থেকে এক ক্রোশ নশীপুর, ময়না এবং সেরগড় নামে পরপর তিনটি গ্রাম। সেরগড়ের চড়া থেকে চারক্রোশ দূরে যমুনার জলের মধ্যস্থলে এক পর্বত। পর্বতটি আলা সাহেবের হাওয়াখানা নামে পরিচিত। এখান থেকে অর্দ্ধ ক্রোশ পরে উত্তরপারে অবস্থিত পালপুর এবং দক্ষিণপারে তারাপুর। তারাপুর থেকে যদুনাথ পুনরায় এলাহাবাদে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এলাহাবাদের কেল্লার নিকটস্থ আরইন গ্রামে সোমেশ্বর নাথ নামে পরিচিত শিবের মন্দির। আরইন গ্রামের দক্ষিণে ঝুশী গ্রাম। ঝুশী গ্রামে গৌতম মুনির আশ্রম বিদ্যমান। প্রয়াগতীর্থ থেকে সাত ক্রোশ দূরবর্তী লকটুয়া গ্রাম। এখান থেকে দুইক্রোশ দূরে গঙ্গার তীরে অবস্থিত শরশা নামে গ্রাম। শরশা গ্রাম থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বারা নামক গ্রাম। বারাগ্রাম থেকে জলপথে আটক্রোশ বকুরা গ্রামের চড়া। চড়াই সংলগ্ন ইটুহারা গ্রাম। ইটুহারা

থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বস্থলাবাদ গ্রাম। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত কালিঞ্জর গ্রাম। পরে বেরঙা গ্রাম। বেরঙা গ্রামের পর হেঁড়নি গ্রাম এবং তার পরে গেঙ্গারোয়া গ্রাম। এর পর নগরদা গ্রাম। এখান থেকে অর্দ্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত সারনাথ শিব। অতঃপর ছ'ক্রোশ দূরে অবস্থিত ভোরাগ্রাম, এর ছ'ক্রোশ দূরে নওগাঁ, নওগাঁর এক ক্রোশ পরে দলিপটী গ্রাম এবং গোপালপুরা গ্রাম, পরে বেরাশপুরা। বেরাশপুরা থেকে ছ'ক্রোশ রামপুর গ্রাম। রামপুর থেকে প্রায় চারক্রোশ দূরে অবস্থিত বিন্দুবাসিনী দেবীর নগর। গঙ্গাতীরে ঘাটের ওপর কিছুদূর গমন করলে বিন্ধ্যাচল নিবাসিনী মহাদেবীর মন্দির। মন্দিরে সিংহবাহিনী চতুর্ভুজ দেবীর ষোড়শ বর্ষীয়া কন্যাকৃতি গঠন। পশ্চিমে অপর এক মন্দিরে মহাকালীর মূর্তি বিদ্যমান। এর পশ্চিমে অপর এক মন্দিরে মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী এবং মহাকালীর মূর্তি বিদ্যমান। গঙ্গাতীরে বিন্ধ্যপর্বতের ওপর যোগমায়ার মন্দির। যোগমায়া অষ্টভুজা। দেবীর মূর্তি দেওয়ালে গাঁথা।

বিন্ধ্যাচলবাসী প্রায় সকলেই মৎস্য-মাংসভোজী। স্ত্রী প্রধান দেশ। স্ত্রী লোকেরা বেশ বলশালী। বিন্ধ্যাচল থেকে ছ' ক্রোশ দূরে অবস্থিত মৃজাপুর। তুলা, তিসি, বস্ত্র প্রভৃতির ক্রয়-বিক্রয়ের কেন্দ্র। গঙ্গার ঘাটগুলি পাথরে বাঁধান। ঘাটের ওপরে শিব স্থাপিত। এখানে সর্বমোট পঁচিশটি ঘাট বর্তমান। সহরমধ্যে অনেকগুলি দেব-দেবী স্থাপিত। এখানে ছুলিচা, গালিচা, লাল প্রস্তর নির্মিত শিল, জাঁতা, চৌকী, পেতলের বাসন, বাটলো প্রভৃতি বিখ্যাত। অমাবস্যা এবং একাদশী তিথিতে এখানে কাপড় ও কাঁসারির দোকানে ক্রয়-বিক্রয় বন্ধ থাকে। মৃজাপুর থেকে জলপথে ষোল ক্রোশ চণ্ডালগড়। চণ্ডালগড়ে পাহাড়ের ওপরে একটি কেল্লা বিদ্যমান। এখানকার মৃন্ময়পাত্র অত্যন্ত মজবুদ এবং সৌন্দর্যসম্পন্ন। দোকানে দোকানে মৃন্ময়পাত্র, হুঁকা, কলকে, গুড়গুড়ি, গোড়িয়া, গুড্ডিশোরা, চাদান প্রভৃতি সজ্জিত দেখা যায় চণ্ডালগড় থেকে তিন ক্রোশ দূরে ছোট কলকাতা। ছোট কলকাতা থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত রাইপুরিয়া গ্রাম। এখান থেকে পুনরায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত রামনগর। রামনগরের অপর নাম ব্যাসকাশী। ব্যাসকাশীতে ব্যাসের স্থাপিত শিব এবং ব্যাসের মূর্তি বর্তমান। রামনগর থেকে কাশীর অসিঘাট অর্দ্ধক্রোশ এবং বরুণা নদীর দূরত্ব তিন ক্রোশ।

কাশী থেকে যদুনাথ যাত্রা করে প্রথমে গোমতী, তার পর দু'ক্রোশ দূরবর্তী সৈয়দপুরের গঞ্জে গিয়ে পৌছালেন। এখান থেকে তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত জাউলে গ্রাম। অতঃপর যদুনাথ গাজীপুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। গাজীপুর মুসলমান প্রধান দেশ। লালদরজা থেকে কোট পর্যন্ত চকবাজার। এখানকার রেউড়ি খুব প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত পেড়া, বরফি, মুদ্গল, মতিচুর, গজা, চাঁদসাই, নিমকি ইত্যাদিও পাওয়া যায়। গাজীপুরে নানাবিধ বস্ত্র তৈরী হয়। এখানকার মোওর কাপড় অতিশয় উত্তম। গাজীপুরে যে পরিমাণে আতর, গোলাপ প্রভৃতি হয়, তেমনটি আর অন্যত্র দেখা যায় না। এখানে গোলাপের বাগান অসংখ্য। এখানকার চুড়িও খুব প্রসিদ্ধ। গাজীপুরের পূর্বনাম গাধিপুর। এখানে গাধিরাজার বাটী এবং কেল্লা বিদ্যমান। এটি কোট নামে পরিচিত। গাজীপুরে উৎকৃষ্ট আফিম জন্মে।

গাজীপুর থেকে দু'ক্রোশ দূরে অবস্থিত বাবলাবন। পরে দু'ক্রোশ বীরপুর। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে চৌসর। এর দেড় ক্রোশ পরে বগসর। বগসরে একটি কেল্লা বর্তমান। বগসর থেকে পাঁচ ক্রোশ দক্ষিণে ভোজপুরের রাজ্য। উত্তর পারে বেলিয়া। পরে তিন ক্রোশ হরদি। দক্ষিণ পারে ডুবলি গ্রাম। এখান থেকে দু'ক্রোশ দূরে হালিম্‌গ্রাম। এর এক ক্রোশ পরে মানিমগ্রাম। মানিমগ্রাম থেকে সাত ক্রোশ দূরে ভবানিয়া গ্রাম। তারপর পদসিনা গ্রাম। যদুনাথ অতঃপর গিয়ে উপস্থিত হলেন ডোমরার রাজার অধিকারভুক্ত ত্রিভবানী গ্রামে। ত্রিভবানী থেকে চারক্রোশ দূরে রিবিলগঞ্জ। রিবিলগঞ্জ দক্ষিণ পারে। উত্তর পারে আগ্রাম। রিবিলগঞ্জ থেকে সাত ক্রোশ দূরে ডুরিগঞ্জ। ডুরিগঞ্জের এক ক্রোশ নীচে বালুয়া গ্রামের চড়া। এখান থেকে পুনরায় তিন ক্রোশ দূরে অবস্থিত সেরগড়ের বাজার। এখানে শোনভদ্রা নদী প্রবাহিত। অতঃপর দানাপুরের সীমানার শুরু। দানাপুর সহরটি পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত। অতঃপর যদুনাথ ভোজপুর, বাঁকিপুর প্রভৃতি হয়ে গয়ার উদ্দেশে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে পাটনা। পাটনা অতি প্রাচীন সহর। বাঁকিপুর থেকে চক্‌বাজার মেরুগঞ্জ পর্যন্ত বিস্তৃত পাটনা সহর। এখানে আতা, ডালিম, পিয়ারা প্রভৃতি বৃহৎ আকারের পাওয়া যায়। পেড়া, বরফি, গুজিয়া, জিলাপি, মুদ্গল, গোলাপজাম, চাঁদসাই, ঘেওর, গজা, খুরমা, মেঠাই, অমৃতি, সুতফেণী, ইত্যাদি নানাজাতীয় মিষ্টান্ন এখানে

পাওয়া যায়। পশ্চিমের দেশগুলির মধ্যে একমাত্র পাটনাতেই মর্তমান কলা পাওয়া যেত। এখানে এইকলা 'মোহনভোগ' নামে পরিচিত। পাটনায় পেতলের হাঁড়ি এবং অপরাপর পেতলের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয়। এতদ্ব্যতীত তুলিচা গালিচা, সতরঞ্চ, আসন প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পাটনায় পাটনদেবী ঠাকুরাণী বিদ্যমান।

পাটনা থেকে যাত্রা করে যদুনাথ আড়াই ক্রোশ দূরে পড়সার চটী অতিক্রম করলেন। এখান থেকে দু'ক্রোশ দূরে পুনপুনা নদী প্রবাহিত। 'পুনপুনা' নদী 'আদিগঙ্গা' নামে পরিচিত। পশ্চিমদেশীয় যারা এই পথে গয়াক্ষেত্রে গমন করে, তারা এইখানে শ্রাদ্ধাদি করে থাকে। এ'স্থান থেকে এক ক্রোশ দূরে মুসলমান অধ্যুষিত ডুব্‌রিগ্রাম। ডুব্‌রিগ্রাম থেকে এক ক্রোশ পিপুল-ঘুটির চটী। এখান থেকে পুনরায় এক ক্রোশ দূরে মুরহর নদী। অতঃপর এক ক্রোশ পরে নাদওয়ানের চটী। এখান থেকে দু'ক্রোশ গেলে মশৌড়ি গ্রাম। মশৌড়ি থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে জাহানা গ্রাম। গ্রামের প্রান্তে দরধা নদী। পুনরায় দু'ক্রোশ গেলে টেটা গ্রাম। পরে এক ক্রোশ মকদম-পুরের চটী। মকদমপুর গ্রামের প্রান্তে যমুনা নদী প্রবাহিত। যমুনা অতিক্রম করে তিন ক্রোশ গমন করলে বেলা-চটী। বেলা-চটী থেকে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত নেউনার চটী। পরে সাড়ে চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করলে তবে গয়াক্ষেত্রস্থিত রামশিলার পাহাড়। এখান থেকে এক ক্রোশ সাহেবগঞ্জ। সাহেবগঞ্জ থেকে পুনরায় এক ক্রোশ দূরবর্তী বিষ্ণুমন্দির।

গয়াক্ষেত্র থেকে যাত্রা করে যদুনাথ পুনরায় বেলাচটী, মকদমপুরের চটী, দরধা নদী, জাহানা, মশৌড়ি হয়ে মশৌড়ি থেকে দু'ক্রোশ দূরে অবস্থিত নাদাওয়ানের চটীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। নাদাওয়ানের চটী থেকে তিন ক্রোশ দূরে পুনপুনা নদী। এখান থেকে আড়াইক্রোশ দূরে পড়সার চটী। এখান থেকে পাটনাস্থিত সবজিবাগ হয়ে নৌকা যোগে গঙ্গার তীর ধরে যেতে যেতে ছট্ পূজা দেখলেন। সহরের সমস্ত স্ত্রীলোককে বস্ত্রালঙ্কারে ভূষিত হয়ে রোসন চৌকি, টিকারা, তাসা ইত্যাদি বাদ্য সহকারে ছট্ পূজার নানাজাতির ফল, পাঁচ কলাইয়ের অঙ্কুর, নানাবিধ পক্বান্ন, পুরি, কচুরি ইত্যাদি খাদ্যদ্রব্য এবং কাঁদি কাঁদি পাকাকলা, একটি নতুন প্রদীপ, এক চাঙ্গারি কুলা, আলতা, হরীতকী, বয়ড়া, লালসুতা, পান, ইক্ষু,

সুপারি নিয়ে ঘাটে ঘাটে সর্বত্র বসে থাকতে দেখলেন। সূর্যোদয়ে সকলে স্নান করে সূর্যনারায়ণের পূজাদি করে বেলা চারদণ্ড মধ্যে গঙ্গাতীর থেকে আপন আপন গৃহে তারা প্রত্যাবর্তন করে। এইদিন এদেশে কারও বাড়ীতে রান্না হয় না। সকলে পূর্বদিনের প্রস্তুত পক্বান্ন ভোজন করে। এই মেলার শুরু পঞ্চমীতে এবং শেষ সপ্তমীতে। পশ্চিমদেশে স্থানে স্থানে ছট্‌পূজার সময় ভিন্ন ভিন্ন। কাশীতে চৈত্র থেকে আষাঢ়—এই চারমাসের শুক্লাষষ্ঠীতে ছট্‌পূজা অনুষ্ঠিত হয়। বৃন্দাবনে ছট্‌পূজা অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসের ষষ্ঠীতে। গুজরাট, বোম্বাই, তৈলঙ্গ, দ্রাবিড়, পুনা, সেতারা, সাগর, জব্বলপুর, নর্মদা, নাগপুর প্রভৃতি স্থানে জ্যৈষ্ঠ মাসের ষষ্ঠীতে বাসীদ্রব্য ভোজন করবার রীতি প্রচলিত।

পাটনা থেকে তিনক্রোশ গেলে চকের ঘাঠ। এর এক ক্রোশ পরে মারু গঞ্জ। মারুগঞ্জের বরফি খুব প্রসিদ্ধ। এখান থেকে চারক্রোশ দূরে ফতুয়ার ঘাট। পরে দু'ক্রোশ বৈকুণ্ঠপুর বাজার এবং এর তিন ক্রোশ পরে অবস্থিত বেণীপুর নামক গ্রাম। বেণীপুর থেকে ছ'ক্রোশ রূপম গ্রাম। রূপম গ্রাম থেকে তিন ক্রোশ বাড়গ্রাম। বাড়গ্রাম থেকে পাঁচ ক্রোশ দূরে মকিয়াপুর মো। এখান থেকে চারক্রোশ দূরে দরিয়াপুর। দরিয়াপুরের পর সূর্যগড়া এবং সূর্যগড়া থেকে দশ ক্রোশ মুঙ্গের, জরাসন্ধগড়। মুঙ্গেরের প্রস্তরনির্মিত বাসনপত্র প্রসিদ্ধ। এখানে নানাবিধ পাখী—ময়না, শ্যামা, লাল-বুলবুল, টিয়া, টুনী, ফরাজ, কাজলা, মদনা, চন্দনা, মার, সারস প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত মুঙ্গেরে বাঁশের চাঙ্গারি, ডালা, ছোট ধুচুনি, চুপড়ি, রঙ-বেরঙের সাজি প্রভৃতিও লক্ষিত হয়। মুঙ্গের থেকে জলপথে ছয় ক্রোশ সীতাকুণ্ড যাবার ঘাট। ঘাট থেকে দু'ক্রোশ দক্ষিণে গেলে পর্বতের নিকটে সীতাকুণ্ড অবস্থিত। কুণ্ডের জল অতিশয় উষ্ণ। কিন্তু রামকুণ্ড, লক্ষ্মণকুণ্ড, ভরতকুণ্ড, শত্রুঘ্ন প্রভৃতি অপরাপর কুণ্ডের জল শীতল। মুঙ্গের থেকে স্থলপথে সীতাকুণ্ডের দূরত্ব দু'ক্রোশ মাত্র। সীতাকুণ্ড থেকে দু'ক্রোশ বুড়ুয়াডিমা গ্রাম। এখান থেকে জাঙ্গিরা পুনরায় ছয় ক্রোশ। জাঙ্গিরা জহ্নুমুনির তপস্যার স্থল। পাহাড়ের চতুষ্পার্শ্ব গঙ্গা দ্বারা পরিবেষ্টিত। গঙ্গার মধ্যে পর্বত। পর্বতের ওপর জহ্নুমুনি স্থাপিত শিব বিদ্যমান। জাঙ্গিরা থেকে ভাগলপুরের দূরত্ব দশ ক্রোশ। এখান থেকে পাঁচ ক্রোশ অন্তরে ইংলিশ বাজার। পুনরায় পাঁচ ক্রোশ পরে কহল-গাঁর

বাজার। এখানে জলের মধ্যে তিনটি পর্বত বিদ্যমান। পর্বত তিনটি ভীমের ঝিঁক নামে পরিচিত। এতদ্ব্যতীত স্থানে স্থানে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অনেকগুলি পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ ভূমি বর্তমান। কহল-গাঁ থেকে তিন ক্রোশ পাথরঘাটা। এখানে জলের মধ্যে বহু পাথর বর্তমান। এখান থেকে দু'ক্রোশ পরে কুশী নদীর মোহানা; পরে পাঁচক্রোশ পীরপৈঁতি। পীরপৈঁতি থেকে দশ ক্রোশ দূরত্ব সাঁকড়ি গলির পাহাড়ের। পুনরায় তিনক্রোশ কুড়িখোলা। কুড়িখোলা থেকে পাঁচ ক্রোশ গেলে তবে রাজমহল। রাজমহলের মাটি, ঝাঁটা এবং লৌহনির্মিত দ্রব্যাদি প্রসিদ্ধ। এখান থেকে আট ক্রোশ দূরে নিমতলা নামক গ্রাম। নিমতলা থেকে লক্ষীপুর চারক্রোশের পথ। লক্ষীপুর থেকে নয় ক্রোশ কানসাটের বাজার। এখানে ক্ষুদ্রাকৃতি পাহাড় এবং গভীর জঙ্গল বিদ্যমান। এর এক ক্রোশ পরে শিবগঞ্জ। শিবগঞ্জের তসরের কাপড় খুব সস্তা। অতঃপর গঙ্গা ও পদ্মার সঙ্গমস্থল।

---

১. মানভূম জেলার জয়নগর পরগণার অন্তর্গত। সরকারী মানচিত্রে 'রাজভিটা' নামে পরিচিত।

২. জৈন শ্রাবক। বুদ্ধ ও জনৈক তীর্থঙ্কর উভয়ের মতাবলম্বী শিষ্যই প্রাচীন বৌদ্ধ ও জৈন শাস্ত্রে 'শ্রাবক' নামে পরিচিত।

৩. তোপচাঁচির পশ্চিমে দু' ক্রোশ ব্যাপী মধুবন।

৪. প্রাচীন 'সহস্রারাম' পরে 'সরসরাম' এবং বর্তমানে 'সসেরাম' নামে পরিচিত।

৫. সম্রাট আলতামাসের নামানুসারে স্থানটির নাম তামাসাবাদ বা তামো-চাবাদ হয়েছে।

৬ বিঠুর বা বিঠোর। যুক্তপ্রদেশের কানপুর জেলার একটি নগর। কানপুর সহর থেকে বার মাইল উত্তর পশ্চিমে গঙ্গার দক্ষিণ কূলে অবস্থিত।

৭. যুক্তপ্রদেশের ফারাক্কাবাদ জেলার অন্যতম প্রধান সহর।

৮. ইঁট বা পাথর দিয়ে গাঁথা।

৯. গোমতী তীরবর্তী এই নৈমিষারণ্য, বর্তমানে নিমসর নামে খ্যাত।

১০. (ফরুখাবাদ) গঙ্গার পশ্চিম কূলবর্তী যুক্তপ্রদেশস্থ ফরাক্কাবাদ জেলার প্রধান সহর।

১১. যুক্ত প্রদেশের মৈনপুরী থেকে পনের মাইল পশ্চিমে অবস্থিত গ্রাম।

১২. মহাবন থেকে ছয় মাইল দূরে নগরটি অবস্থিত।

১৩. মহাবনের পার্শ্ববর্তী একটি প্রসিদ্ধ ঘাট।

১৪. মথুরা জেলার মহাবন তহশীলের একটি প্রাচীন নগর। মথুরানগরের তিন ক্রোশ দক্ষিণে যমুনার অপরপারে অবস্থিত।

১৫. ধ্রুব এখানে তপস্যা করেছিলেন।

১৬. সনক, সনাতন প্রমুখ সাতজন ঋষি এখানে তপস্যা করেছিলেন।

১৭ বলিরাজার তপস্যার স্থান।

১৮. কংস রাজার মল্লযুদ্ধ স্থান।

১৯. ভ্রাতৃদ্বিতীয়া।

২০. অধুনা 'কুম্ভের' নামে খ্যাত। ভরতপুর থেকে এগার মাইল উত্তর-পশ্চিমে দীগ যাবার রাস্তার ওপরে অবস্থিত।

২১. এই দেবী আগে মথুরাতে কংসরাজার রঙ্গস্থলে শিলারূপে ছিলেন। এই শিলার ওপরেই দেবকীর সন্তানদের আছড়ে মারা হ'ত।

ষষ্ঠ অধ্যায়
সংবাদ প্রভাকর, সুরধুনী, কাশ্মীর কুসুম ও দেবগণের মর্ত্যে আগমন

'সংবাদ প্রভাকর' খ্যাত, ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদক, সাংবাদিক এবং কবি হিসাবেই সমধিক পরিচিত। কিন্তু এ ব্যতীত তাঁর অপর একটি পরিচয় ছিল—পর্যটনকারী হিসাবে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে একাধিক বার তিনি সমগ্র পূর্ববঙ্গ, উত্তরবঙ্গের কিয়দংশ এবং বঙ্গেতর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন, এবং সাংবাদিকের দৃষ্টি নিয়ে এই সকল স্থানের বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণ বিষয়ক অভিজ্ঞতা তৎকালীন সংবাদ প্রভাকরে 'ভ্রমণকারি বন্ধুর লিখিত বিষয়' শিরোনামায় পত্রাকারে প্রকাশিত হয়েছিল [১]। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত লিখিত এই সকল বিবরণ থেকে এই সব স্থান সমূহের পূর্ণাঙ্গ এবং নির্ভরযোগ্য পরিচয় পাওয়া যায়। লেখক তাঁর সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তিকে ভাবালুতার দ্বারা আচ্ছন্ন করে ফেলেন নি। তাঁর অভিজ্ঞতা নিছক প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বর্ণনাতেই নিঃশেষিত হয়ে যায় নি লক্ষ্য করা যায়।

ঈশ্বরচন্দ্র প্রথম বার গিয়েছিলেন (১২৫৬) ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিম প্রদেশ সমূহে এবং এই সময়ে তিনি একবৎসর অতিবাহিত করেছিলেন। ভ্রমণ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত গুপ্ত কবির বিবৃতিটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য—

"এক বৎসর অতীত হইল আমি উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমন করিয়াছিলাম সংপ্রতি দুই দিবস হইল শ্রীশ্রী৺বারাণস্যাদি ধাম দর্শন করনান্তর কলিকাতা মহানগরে প্রত্যাগত হইয়াছি, আমার অনবস্থান সময়ে সহকারী সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু শ্যামাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রভাকরের গুরুতর কর্ম যে প্রকারে নিষ্পাদিত করিয়াছেন বোধকরি তাহাতে আপনার দিগের সংপূর্ণ সন্তোষ জন্মিয়া থাকিবেক, সম্বৎসর পর পুনরায় আমি স্বকার্য্যে প্রবৃত্ত হইলাম"।[২]

শারীরিক অসুস্থতাবশত বায়ু সেবনের জন্য এবং সেইসঙ্গে দেশভ্রমণের অভিপ্রায়ে ঈশ্বর গুপ্ত ১২৬১ সালের অগ্রহায়ণ মাস থেকে ঐ বৎসরের চৈত্র

মাসের কিছুকাল পর্যন্ত উত্তরবঙ্গের একাংশ এবং পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ অঞ্চল পরিভ্রমণ করেছিলেন। ঈশ্বর গুপ্তের ভাষায় ঃ

"রাজশাহী, পাবনা, ফরিদপুর, বিক্রমপুর, রাজনগর, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, জাফরগঞ্জ, ঢাকা, রায়পুর, দালালবাজার, লক্ষীপুর, শান্তিসীতা, ভুলুয়া,[৩] সুধারাম, চন্দ্রশেখর, শম্ভুনাথ, সীতাকুণ্ড, বাড়বাকুণ্ড, কুমারীকুণ্ড, লবণাখ্যং, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, বরিশাল, নলছিটি, মহারাজগঞ্জ, গুরুধাম, তুসখালী, নেয়ামতি, সাহেবের ঘাট, সুন্দরবন, বাদাবন, প্রাণসায়ের, টাকীনন্দপুর, বাগুড়ী, পুঁড়া, খোড়গাছি, বাদুড়ে, বসুরহাট, চাঁদুড়ে, গোলাপনগর, বনগাঁ, কৃষ্ণগঞ্জ, শিবনিবাস, হাঁসখালি ও রাণাঘাট প্রভৃতি পুরাতন ও অভিনব নগর, গ্রাম ও গঞ্জ এবং তীর্থস্থান সকল ভ্রমণ ছলে অতিক্রম পূর্ব্বক এতন্নগরে প্রত্যাগত হইয়া পুনর্ব্বার সম্পাদকীয় আসনে আরূঢ় হইলাম"[৪]।

ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর দ্বিতীয়বার পর্যটনের অভিজ্ঞতা যেরূপ সবিস্তারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন প্রথম বারের অভিজ্ঞতা সেইরূপ বিস্তৃতভাবে লিপিবদ্ধ করেননি। মোটের ওপর বাংলা সাহিত্যের ভ্রমণ বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে গুপ্তকবির 'ভ্রমণকারি বন্ধু' ছদ্মনামে লিখিত বিষয় সমূহ যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী তাতে সন্দেহের অবকাশ মাত্র নেই।

কুমিল্লা থেকে যাত্রা করে ঈশ্বরচন্দ্র মহারাজ রাজকৃষ্ণ বাহাদুরের বিখ্যাত গঙ্গামণ্ডল জমিদারি সদর কাছারি জাফরগঞ্জে উপনীত হলেন। বাস্তবিক গঙ্গামণ্ডলের ভূমি অত্যন্ত উর্বর। এখানে নানাবিধ শস্য বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। সামান্যতম ভূমিও পতিত থাকেনা। তবে গোমতী প্রভৃতি নদীর জল বর্ষাকালে অনেকাংশ প্লাবিত করে শস্যের সমূহ ক্ষতিসাধন করে। গোমতী প্রভৃতি নদীগুলি যদিও আকারে ক্ষুদ্র, বর্ষায় এরা ভয়াবহ রূপ ধারণ করে। বর্ষাকালে পর্বতের জল নেমে অনেক সময়েই বন্যার সৃষ্টি করে।

ত্রিপুরায় গোমতীকে 'গুমতি' নামে অভিহিত করা হয়। চূর্ণি নদীর ঘূর্ণি অপেক্ষা গোমতীর ঘূর্ণি ভয়ঙ্কর। তবে গোমতীর পরিসর চূর্ণির মত। গোমতী মণিপুরের নিকটস্থ পর্বত থেকে নির্গত হয়ে মেঘনায় এসে মিলিত হয়েছে।

এর জল সর্বত্র উত্তম নয়। গোমতীনদীর উভয় তীরস্থ জমিই অত্যন্ত উর্বর। এই নদীর তীর ব্যতীত ত্রিপুরার অন্য কোথাও তামাক হয় না।

ত্রিপুরায় প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু উৎপন্ন হয়। এতদ্ব্যতীত অড়হর, মুগ, কলাই, তিল,

সরিষা ও অন্যান্য তরকারী প্রভৃতি বহুল পরিমাণে জন্মায়। এখানকার নদীতে মাছ পাওয়া যায় না। নানা দেশের ব্যবসায়ী এখানে চাল, অড়হর, তামাক প্রভৃতি কিনতে আসে। এখানে চাল খুব সুলভ।

বারাণসী থেকে এলাহাবাদ পর্যন্ত যে পথটি গেছে তা অত্যন্ত রমণীয়। এলাহাবাদ থেকে কানপুর, ফরাক্কাবাদ, মথুরা, বৃন্দাবন, দিল্লী এবং মিরাট প্রভৃতি স্থানসমূহে যাতায়াতের পথগুলি সুন্দর। কিছুদূর অন্তর পথিমধ্যে দোকান, সরাই পুষ্করিণী, কূপ প্রভৃতি বর্তমান। তবে এই সব স্থানে বাঙ্গালী-দের উপযোগী আহার্য দুর্লভ। আট দশ ক্রোশ অন্তর একটি করে মঞ্জিল, নানা দেশের অসংখ্য লোক দিবারাত্র এইসব স্থানে গজে উটে ঘোড়ায় গমনাগমন করে থাকে। ঈশ্বরচন্দ্র এলাহাবাদ পর্যন্ত গমন করে গ্রীষ্মের আধিক্যবশতঃ কাশীতে প্রত্যাবর্তন করতে বাধ্য হন। কারণ চৈত্রমাসের শেষ থেকে জ্যৈষ্ঠমাস পর্যন্ত এইসব স্থানসমূহে বেলা এক প্রহরের পর থেকে সন্ধ্যার কিছু পূর্ব পর্যন্ত 'লু' চলতে থাকে। 'লু' অনেক ব্যক্তির প্রাণনাশেরও কারণ হতে দেখা যায়। এর কোন চিকিৎসা বা ওষুধ সে সময়ে ছিল না। কেবল মাত্র কাঁচা আম দগ্ধ করে তার শাঁস গায়ে লেপন ও আহার করানো হ'ত। এতে কেউ কেউ বেঁচে যেত। বাস্তবিক, এই অঞ্চলে গ্রীষ্মের প্রবল প্রকোপ। কিঞ্চিৎ সঙ্গতিসম্পন্ন মানুষেরা এই সময়ে দিনের বেলা মাটির নীচে 'তোয়াখানা' নামক কুটীরে অথবা শীতলস্থানে শয়ন করে। রাত্রিকালে এখানকার ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলেই ঘরের ছাদে, পথের উপর কিংবা নদীতটে শয়ন করে। এখানে গ্রীষ্ম ও শীত উভয় ঋতুর প্রকোপই বর্তমান।

কাশীর বরুণা নদীর তীর থেকে বাজার তলাও পঞ্চক্রোশ পরিমিত হবে। এখানে রামনগরের রাজার বাটী, দেবালয়, সরোবর এবং বৃহদাকৃতির কূপ বিদ্যমান। বাজার তালাওয়ের সম্মুখ দিয়ে স্থলপথে মৃজাপুরে এবং প্রয়াগে উপনীত হওয়া যায়।

কাশীস্থিত বাঙ্গালী টোলা থেকে এলাহাবাদের ঝাঁসিঘাটের দূরত্ব ৩৬ ক্রোশ হবে। পথিমধ্যে রাজা সাহেবের ও অপরাপর ধনী ব্যক্তিদের নির্মিত জলাশয় ও অন্যান্য কীর্তিসমূহ বিদ্যমান। এই পথে মোহনের সরাই, মৃজামুরাদের সরাই, সৈয়াদাবাদের সরাই, মহারাজগঞ্জ, ঘুসিয়া, হাড়ি এল, তামাসাবাদ, হনুমানগঞ্জ প্রভৃতি সরাই সকল বিদ্যমান। তবে গোপীগঞ্জের সরাই সকলের

মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এখানকার সরাই সকলের অধ্যক্ষ মেথরেরা।

বাংলা সাহিত্যে দীনবন্ধু মিত্রের পরিচয় নাট্যকার হিসাবে। একদিক দিয়ে দীনবন্ধুর সঙ্গে মধুসূদনের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য লক্ষিত হয়ে থাকে। বাংলা সাহিত্যে মধুসূদন নাট্যকার হিসাবে প্রথম আত্মপ্রকাশ করলেও, শেষ পর্যন্ত কবি রূপেই প্রসিদ্ধির অধিকারী হন। অনুরূপভাবে দীনবন্ধু বাংলা সাহিত্যে সর্ব প্রথম কবি রূপেই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন,[৫] কিন্তু শেষপর্যন্ত নাট্যকার রূপেই তিনি প্রতিষ্ঠা অর্জন করেন।

তরুণ বয়সে দীনবন্ধু "সুরধুনী" কাব্যটি রচনা করেন। ১৮৭১ সালে কাব্যটির প্রথম ভাগ প্রকাশিত হয়। কবির মৃত্যুর পর কাব্যটির দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হয়েছিল। তবে অনুমান করা হয়ে থাকে যে কাব্যটির প্রকাশের অন্ততঃ ছয় বৎসর পূর্বেই দীনবন্ধু এর রচনা শুরু করেছিলেন। দীনবন্ধু-সুহৃদ বঙ্কিম কাব্যটিকে তেমন সুনজরে দেখেন নি।[৬] বাস্তবিক কাব্যশিল্প হিসাবে 'সুরধুনী' উচ্চাঙ্গের না হলেও ঐতিহাসিক গুরুত্ব কাব্যটির মর্যাদা যথেষ্ট পরিমাণে বৃদ্ধি করেছে সন্দেহ নেই। উপস্থাপনার বিচারে 'সুরধুনী'র সঙ্গে পরবর্তীকালে প্রকাশিত 'দেবগণের মর্তে আগমনে'র গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়ে থাকে।

বিষ্ণুপ্রয়াগে অলকানন্দা, মন্দাকিনী এবং জাহ্নবীর ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটেছে। শ্রীনগরের মেলার সময় মহাধূমধাম পরিলক্ষিত হয়। এই সময় একদিকে যেমন বহু জনসমাগম ঘটে, তেমনি নানাবিধ দ্রব্যাদির ক্রয়-বিক্রয় চলতে থাকে।

হরিদ্বারে 'হরিদ্বার', 'কুশাবর্ত', 'নীলধারা' প্রভৃতি ঘাট সকল বিদ্যমান। 'হরিদ্বার' ঘাটে, স্নান করলে পুণ্যার্জন হয় বলে বিশ্বাস। 'কুশাবর্ত' ঘাটে যাত্রীরা কুশ নিয়ে তর্পণাদি করে থাকে। 'হরিদ্বার', 'কুশাবর্ত' প্রভৃতি ঘাটে অসংখ্য রুই মাছ লক্ষিত হয়ে থাকে।

এখানকার 'নীলধারা' নামক ঘাটটি শিলা নির্মিত। এখানে গঙ্গা নীল রূপ ধারণ করেছে।

হরিদ্বার থেকে কানপুর পর্যন্ত যে বিশাল খালটি গেছে, তা পরিচিত 'কটলি খাল' নামে।

গড়মুক্তেশ্বরে 'মুক্তেশ্বর' নামক শিবমূর্তি বিদ্যমান। গণপতি নাকি এখানে তপস্যার বলে মুক্তি লাভ করেছিলেন। তাই এ'টি পরিচিত গড়মুক্তেশ্বর নামে। গড় মুক্তেশ্বরের অদূরেই অবস্থিত হস্তিনাপুরী।

'অনুপসহরে' পুরাকালে 'হোমানল' নামক ঋষির তপোবন বিদ্যমান ছিল। ফতেগড় এক উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র। এখানকার পথ ঘাটগুলি রমণীয়। এখানে বিপনী সকল বিদ্যমান।

পুরাতন দিল্লীর চতুর্দিক উচ্চ এবং প্রশস্ত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। শত শত রমণীয় হর্ম্যরাজি এখানে বিরাজমান। প্রস্তর নির্মিত দ্বাদশটি তোরণও এখানে বিদ্যমান। সহরের রাস্তাগুলি বেশ প্রশস্ত। এখানে 'জুম্মা মসজিদ' অবস্থিত। ঔরঙ্গজেবের তনয়ার ইচ্ছানুযায়ী এ'টি লোহিতবর্ণের শিলাদ্বারা নির্মিত হয়েছিল। মসজিদের সামনে বিশাল অঙ্গন। প্রাঙ্গণের তিন পাশে তিনটি তোরণ। মসজিদে দাঁড়ালে সমগ্র নগরটি দৃষ্ট হয়।

এখানে হুমায়ুনের কবরও বিদ্যমান। কবরের চতুর্দিকে উদ্যান অবস্থিত। মাঝে মাঝে অবস্থিত ফোয়ারা।

এখানে অবস্থিত কুতুবমিনারটি ১৬৪ হাত উচ্চতা বিশিষ্ট। এর প্রথম তিন থাক লোহিতবর্ণের প্রস্তরে নির্মিত। চতুর্থ থাকটি নির্মিত শ্বেত বর্ণের প্রস্তরে। পুনরায় পঞ্চম থাকটি লোহিত বর্ণের প্রস্তরে নির্মিত। মিনারটির পরিধি ৮০ হাত।

স্তম্ভের অদূরে অবস্থিত ভগ্ন পৃথু রাজধানী। মথুরাধামের সম্মুখেই অবস্থিত 'হরি-হুরি-গেট'। হুরিগেটে নাকি ভগবান কৃষ্ণ হোলী খেলতেন। এখানে বহু মৃত্তিকানির্মিত পাহাড় অবস্থিত। 'কংসবধ' নামে একটি মৃত্তিকা নির্মিত পাহাড় বিদ্যমান। কথিত হয়ে থাকে কৃষ্ণ এর উপরেই কংস বধ করেছিলেন।

বিশ্রাম ঘাটটি প্রস্তরনির্মিত। কংসবধের পর কৃষ্ণ নাকি এইঘাটে বসে বিশ্রাম করেছিলেন। ঘাটের মধ্যস্থলে শিলা নির্মিত স্তম্ভ বিদ্যমান।

সন্ধ্যার সময় এই স্তম্ভের ওপর বসে ব্রজবাসী সকল দীপের দ্বারা যমুনার আরতি করে। আরতির সময় এখানে শত শত লোক সমবেত হয়। এবং এই সময় কাঁসর ঘণ্টা প্রভৃতি বাজতে থাকে। যমুনার জলে লোকে ফুলের মালা নিক্ষেপ করে, দীপ প্রভৃতি ভাসিয়ে দেয়।

মথুরায় বসুদেব-দেবকীর মন্দির অবস্থিত। প্রস্তর নির্মিত বসুদেব এবং দেবকীর মূর্তি বিদ্যমান। দেবকী যেখানে প্রসবের পর সূতিকা স্নান করেছেন গোয়ালিয়রের রাজা সেই সরোবরটিকে বাঁধিয়ে দিয়েছেন।

বৃন্দাবনে বহু বৈষ্ণবের বাস। এখানে অসংখ্য রাসমঞ্চ, দোল মঞ্চ প্রভৃতি

বর্তমান। এতদ্ব্যতীত নিকুঞ্জবন, তমাল কানন, ভাণ্ডীর বন প্রভৃতি বিদ্যমান। এই সকল কাননে বহুশিখী, হরিণ-হরিণী বিচরণ করে। তা ছাড়া অসংখ্য হনুমানও এখানে দৃষ্ট হয়।

যমুনা পুলিনে অবস্থিত কেলি কদম্ব বৃক্ষ। বৃন্দাবনস্থিত লচমি শেঠের বিশাল মন্দিরটি বিখ্যাত। মন্দিরের সম্মুখে সুবর্ণময় একটি স্তম্ভ বিদ্যমান। মন্দির মধ্যে স্বর্ণ অলঙ্কারে ভূষিত লক্ষ্মী-নারায়ণের বিগ্রহ। তোষাখানায় রৌপ্য নির্মিত প্রমাণ হাতী, ময়ূর ইত্যাদি বর্তমান।

বৃন্দাবনের অসংখ্য ঘাটগুলিতে বৃহদাকৃতির কচ্ছপ সকল দৃষ্ট হয়। আকবর রাজধানী আগ্রা নগরীতে বহু অট্টালিকা, সরোবর, রমণীয় রাজপথ উদ্যান প্রভৃতি বিদ্যমান। এখানে শৈল নির্মিত বিশালাকৃতির দুর্গও বর্তমান। সাজাহান নির্মিত তাজমহলও এখানকার উল্লেখযোগ্য বস্তু। বাইশ বৎসরে বিংশতি সহস্র লোকে এ'টি নির্মাণ করেছিল। এখানকার 'শিখ মসজিদ' শ্বেত প্রস্তর নির্মিত 'মতি মসজিদ' সুবিস্তৃত সেকেন্দরাবাগ, এমদাদ উদ্যান প্রভৃতিও বিদ্যমান।

পূর্বে প্রয়াগ বেদ, স্মৃতি, ন্যায়, কাব্য, ষড়দর্শন প্রভৃতি চর্চার কেন্দ্ররূপে প্রসিদ্ধ ছিল। এখানে জাহ্নবী, যমুনা এবং সরস্বতী মিলিত হওয়ায় এর নাম যুক্ত বেণী। এখানে যাত্রিগণ উপস্থিত হয়ে মস্তক মুণ্ডন করিয়ে থাকে। প্রয়াগস্থিত দুর্গটি অতি প্রাচীন। দুর্গটি হিন্দুরাজা কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। পরে সম্রাট আকবর এর সংস্কার সাধন করেছিলেন। দুর্গটি জাহ্নবী এবং যমুনার সংযোগস্থলে অবস্থিত। যমুনার ওপর প্রকাণ্ড রেলের সেতু বিদ্যমান।

কাশীতে গঙ্গা উত্তর বাহিনী। এখানে বিশ্বেশ্বর বিদ্যমান। বারাণসীর দুই পাশ দিয়ে 'অসি' ও 'বরুণা' নদীদ্বয় প্রবাহিতা।

কাশীতে বহু ঘাট বিদ্যমান। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'অগ্নীশ্বর' 'পঞ্চ-গঙ্গা', 'ব্রহ্ম ঘাট' প্রভৃতি। মণিকর্ণিকার ঘাটে শবদাহ করা হয়ে থাকে। 'মাধরায়' ঘাটের ওপর বেণীমাধব মন্দির অবস্থিত ছিল। মন্দিরে বিষ্ণু মূর্তি ধারী বেণীমাধব বিদ্যমান ছিলেন। কিন্তু ঔরঙ্গজেব এই মন্দির ধ্বংস করে মসজিদ গঠন করেন।

কাশীতে 'রাজরাজেশ্বরী,' 'শ্রীধর', 'নারদ', 'দশ-অশ্বমেধ', 'রাজঘাট' প্রভৃতিও বিদ্যমান। কাশীতে 'জ্ঞানবাপী' নামক একটি সুড়ঙ্গ অবস্থিত।

কথিত হয়ে থাকে যে, ঔরঙ্গজেবের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য এই সুড়ঙ্গে বিশ্বেশ্বর আত্মগোপন করেছিলেন।

'দশ-অশ্বমেধ' ঘাটের ওপরে অবস্থিত মান-মন্দির। রেবাং অধিপতি জয়সিংহ রায় কর্তৃক এই মান মন্দিরটি স্থাপিত হয়েছিল।

শিকরোল পল্লীটিতে নানাবিধ অট্টালিকা এবং রমণীয় বর্ত্ম্যরাজি বর্তমান। শিকরোল সন্নিকটে কলেজ ভবন অবস্থিত। কলেজ ভবনটি বহু চূড়া সম্বলিত। সম্মুখে এক প্রশস্ত প্রাঙ্গণ বিদ্যমান।

কাশীর বাজারে নানাবিধ রত্ন অলঙ্কাররাজি, হীরকবলয়, বাজু, মুক্তা নির্মিত হার চেলী বস্ত্র, মনোহর বারাণসী শাড়ী, বিবিধ বর্ণের ধুতি, উড়ানি, জরী নির্মিত শাল, ফুলকাটা সতরঞ্জি, গালিচা, আসন, ঘটি, বাটি লোটা, থালা ও অন্যান্য নানাবিধ বিচিত্র আসন পত্র, হস্তী দন্ত নির্মিত চিরুনী, আয়না, শালপাতা মোড়া নস্যি প্রভৃতি বিক্রয় হয়।

কাশীর পরপারে স্থিত রামনগরে কাশীর রাজার অট্টালিকা বর্তমান। রামনবমীর দিন রাম নগরে রাম লীলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। রামলীলা অনুষ্ঠিত হয় রাত্রে। এইসময়ে প্রাসাদ প্রান্তর সকল কিছু আলোকে সজ্জিত হতে দেখা যায়। বহু বাজী পোড়ান হয়। কাশীর অনতিদূরেই গোমতী নদী প্রবাহিত। সুলতানপুর সুশোভিত নগরী। এ'টি একটি বাণিজ্য স্থান। বহু বণিকের যাতায়াত এখানে।

মির্জাপুর নগরটিও সুন্দর। এখানে প্রস্তর নির্মিত একটি দুর্গ বিদ্যমান। মির্জাপুরের পর গাজীপুর। এখানে বহু সংখ্যক কুসুম উদ্যান বর্তমান। বিশেষত গোলাপের বাগিচা এখানে বিস্তর। গাজীপুরও নানাবিধ ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র। এখানকার গোলাপ জল, গোলাপী আতর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানে লবণ, কলাই প্রভৃতি স্তূপীকৃত পরিমাণে দৃষ্ট হয়। চিনির কুঠীর সংখ্যাও উল্লেখযোগ্য।

বকসারে বিশ্বামিত্র ঋষির তপোবন বিদ্যমান ছিল। কথিত হয়ে থাকে এখানে অধিষ্ঠিত 'রামেশ্বর শিব' রামচন্দ্র কর্তৃক স্থাপিত।

ছাপরায় 'ঘর্ঘরা' নামক নদী প্রবাহিত। ঘর্ঘরা কুমায়ুন নামক পর্বত থেকে নিঃসৃত হয়েছে। কুমায়ুন থেকে যাত্রা করে ঘর্ঘরা ক্রমে 'কালীবাড়ী' 'গৌরীগঙ্গা' 'সতীগঙ্গা' বা 'করনালী' প্রভৃতিদের সঙ্গে মিলিত হয়ে অবশেষে

ছাপরায় এসে গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ছাপরায় গৌতম মুনির তপোবন বিদ্যমান ছিল।

দানাপুরের সন্নিকটে গঙ্গা নদীর সঙ্গে শোণ নদী মিলিত হয়েছে। শোণ নদীর উৎপত্তি স্থল বিন্ধ্যগিরি। শোণ নদীর তটে অবস্থিত 'জরাসন্ধ হর্ম্য'। শোণ নদীর জল রক্ত বর্ণের। কথিত হয়ে থাকে ভীম জরাসন্ধকে যুদ্ধে নিহত করেছিলেন। এবং জরাসন্ধের রক্ত স্রোত শোণ নদীর সঙ্গে মিলিত হওয়ায় এ'টি রক্তবর্ণ ধারণ করেছে।

শোণের কূলে অবস্থিত 'রহিতসগড়'। 'রহিতসগড়' প্রস্তর নির্মিত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী রামচন্দ্র সন্তান কুশ কর্তৃক এ'টি নির্মিত হয়েছিল। শোণের উপর সুদীর্ঘ সেতু বিদ্যমান।

দানাপুরে সৈন্যশালা বর্তমান। এখানকার পথগুলি বেশ প্রশস্ত। দানাপুরে বহু সংখ্যক চর্মকারের বাস। এখানে প্রচুর জুতা প্রস্তুত হয়ে থাকে।

পাটনায় মগধের প্রাচীন রাজধানী বিদ্যমান ছিল। পাটনার দৈর্ঘ্য উল্লেখযোগ্য হলেও প্রস্থে কিন্তু এ'টি অর্দ্ধ ক্রোশের অধিক নয়। গঙ্গা এখানে বেশ প্রশস্ত। গঙ্গাতীরে ঘাট সহ বহু হর্ম্যরাজি বিরাজমান। পাটনায় প্রচুর আফিম জন্মায়। বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবেও পাটনার যথেষ্ট প্রসিদ্ধি। এখানে লবণ, মসিনা, ছোলা, জনার, যব প্রভৃতির ব্যবসা দেখা যায়। এখানকার ডালিম পিয়াটা প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। এখানকার গোয়াল ঘরগুলি শৈলসদৃশ, বিস্তৃত এবং উঁচু। গোয়াল ঘরগুলি এমনভাবে নির্মিত হয় যে এর মধ্যে কথা বললে তার প্রতিধ্বনি হতে শোনা যায়।

পাটনায় পর বাড় বাণিজ্য কেন্দ্র হিসাবে প্রসিদ্ধ। বাড়ে বহু কুসুম কানন বিরাজমান। ফুলের প্রাচুর্য্যের জন্য কুসুম তৈল প্রস্তুত হয়ে থাকে।

মুঙ্গেরে অবস্থিত দুর্গটি অতি প্রাচীন এবং প্রসিদ্ধ। দুর্গটির তিনদিক পরিখা দ্বারা বেষ্টিত। দুর্গটিতে প্রস্তর নির্মিত চারটি দ্বার বর্তমান। দুর্গটি জরাসন্ধ নির্মিত বলে কথিত হয়ে থাকে। পরবর্তীকালে মীর কাশিম দুর্গটির সংস্কার করেন। এখানেই তাঁর রাজ দরবার অনুষ্ঠিত হ'ত। মুঙ্গেরে সীতাকুণ্ড নামক উষ্ণ জলের একটি কুণ্ড বিদ্যমান। কুণ্ডটি থেকে অবিরত গন্ধক যুক্ত ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। সীতাকুণ্ডের জল অতীব স্বচ্ছ। এখানে ষোড়শ বাজার অবস্থিত। এখানে প্রস্তুত কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যাদি,

হস্তীদন্ত নির্মিত বিবিধ বস্তু, লেখনী আধার, কৌটো, আলমারী প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। গমের গাছ দিয়ে প্রস্তুত ঝাঁপি ফুলাদার, বেণায় রচিত পাখা অতীব রমণীয়। এখানে নির্মিত বন্দুকও প্রসিদ্ধ ছিল।

মুঙ্গেরের পরে অবস্থিত ভাগলপুর। ভাগলপুর একটি বিস্তৃত নগরী।

চম্পাই নগরীটিও বেশ রমণীয়। কথিত হয়ে থাকে এইখানেই নাকি বেহুলাসতী তাঁর পতিকে হারিয়ে ছিলেন। অদ্যাপি শ্রাবণ মাসের পূর্ণিমায় এখানে বেহুলার স্মৃতিতে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এখানে অবস্থিত 'করণ গড়' নামক দুর্গটি বেশ প্রাচীন। কর্ণ নাকি এই দুর্গটি নির্মাণ করিয়েছিলেন। এবং এই স্থানেই তিনি নাকি প্রত্যহ একশত মণ স্বর্ণ দরিদ্রদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন।

এখানে নগরের অভ্যন্তরে জরাসন্ধ কারাগার বর্তমান। ভাগলপুর অতিক্রমের পর কালগ্রাম, কেড়াগোলা প্রভৃতি বর্তমান। কেড়াগোলার সন্নিকটে কুশী নদী গঙ্গার সঙ্গে মিলিত হয়েছে।

রাজমহলে নবাবদের প্রাচীন রাজধানী অবস্থিত। এখানকার তামাক খুব প্রসিদ্ধ।

রাজেন্দ্র মোহন বসু রচিত 'কাশ্মীর কুসুম' (১২৮২) গ্রন্থটি বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন হিসাবে চিহ্নিত হবার যোগ্য। মহারাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল রচিত 'কাশীখণ্ডে' যেভাবে কাশীর বিস্তৃত বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে, অনুরূপভাবে 'কাশ্মীর কুসুম' গ্রন্থেও সমগ্র কাশ্মীরের পূর্ণাঙ্গ এবং প্রামাণিক বিবরণ লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। বাস্তবিক, 'কাশীখণ্ড' কে বাদ দিলে সুদীর্ঘ সময়ের মধ্যে বিশেষ একটি স্থান অবলম্বনে বিস্তৃতাকারে বর্ণিত গ্রন্থ হিসাবে 'কাশ্মীর কুসুম' ব্যতীত অপর কোন দ্বিতীয় গ্রন্থের উল্লেখ করা চলে না। অবশ্য পরবর্তীকালে এই শ্রেণীর কয়েকখানি গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এদের মধ্যে সঞ্জীবচন্দ্রের 'পালামৌ', সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'বোম্বাই চিত্র' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

কাশ্মীরের একস্থানে সতীর কণ্ঠদেশ পতিত হয়েছিল বলে সমুদায় কাশ্মীর উপত্যকা 'সারদাপীঠ' নামে পরিচিত। 'সোপুর' নামক স্থানে সারদাদেবীর প্রতিমূর্তিও বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত কাশ্মীরী অক্ষর 'সারদা অক্ষর' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। কাশ্মীরের কোন কোন স্থানে পাণ্ডবগণের স্মৃতিপূত

নানা ধ্বংসাবশেষ এবং তাদের নির্মিত দেবালয় লক্ষিত হয়ে থাকে।

কাশ্মীরের উত্তর সীমা হিমালয় পর্বতের অন্তর্গত কারাকোরাম পর্বত শ্রেণী। পূর্ব সীমা তিব্বত, দক্ষিণ সীমা পাঞ্জাবের অন্তর্গত ঝিলম, গুজরাট, শিয়াল কোট প্রভৃতি এবং এই বিভাগের হজারা ও রাওয়ালপিণ্ডি পশ্চিম সীমা। পূর্ব থেকে পশ্চিমে কাশ্মীরের দৈর্ঘ্য ৩৫০ মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ২৭০ মাইল। কাশ্মীর উপত্যকা বিস্তৃত সমতল ভূমি। এর ওপরে বালতী বা ইসকার্দু প্রভৃতি জেলা। পূর্বে দ্রাস, লাডাক প্রভৃতি। দক্ষিণে পুঞ্চ, জম্বু, শিয়ালকোট ইত্যাদি এবং পশ্চিমে হজারা ও রাওয়ালপিণ্ডি। এর দৈর্ঘ্য প্রায় ১০০ মাইল এবং প্রস্থ গড়ে ২০ মাইল। কাশ্মীর উপত্যকার আয়তন ৮০০০ মাইল। অবশ্যই এই হিসাব যখন ভারতবর্ষ দ্বিখণ্ডিত হয়নি তখনকার। কারণ রাজেন্দ্রমোহনের গ্রন্থটি ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভের বহু পূর্বে রচিত।

সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে কাশ্মীর ৫,৫০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এর চতুষ্পার্শ্বে 'পীর' নামে পর্বতশ্রেণী বিদ্যমান। এই পর্বতশ্রেণী সারা বৎসর ব্যাপী তুষারাবৃত থাকে। অধিকাংশ পর্বতের শিখরদেশ নানা বর্ণের পুষ্প এবং তৃণে আচ্ছাদিত। শিখরদেশগুলি বেশ সুবিস্তৃত। এই রূপ শিখরদেশ 'মার্গ' নামে পরিচিত। এখানকার 'গুলমার্গ', 'সোনামার্গ' প্রভৃতি কয়েকটি এইরূপ প্রসিদ্ধ মার্গ। এই সকল মার্গে পার্বত্যজাতি সকল বাস করে থাকে।

কাশ্মীরে স্থলভাগ অপেক্ষা জল ভাগের পরিমাণ অধিক। 'বিতস্তা' নদী এর মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এই বিতস্তা নদীই এখানে 'ঝিলম নদী' নামে পরিচিত। বিতস্তা কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্ত থেকে উৎপন্ন হয়ে একেবারে অপর প্রান্ত পর্যন্ত প্রবাহিত। উপত্যকার মধ্যে এর নানা শাখা প্রশাখা বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত বিতস্তা নদী উপত্যকার মধ্যস্থিত ব্রিং, লিদ্দর, সিন্দ, পোড়া প্রভৃতি বহু পার্বত্য নদীর সঙ্গেও যে মিলিত হয়েছে তা লক্ষিত হয়ে থাকে। বিতস্তার ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে নানাবিধ মতবাদ প্রচলিত। পূর্বভাগস্থ প্রসিদ্ধ বৈরনাগের প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দূরে তিনটি উৎস বর্তমান। এদের পরস্পরের দূরত্ব আঙ্গুলের অগ্রভাগ থেকে তর্জনীর অগ্রভাগ পরিমিত স্থান। এই জন্য একে 'বিতস' এবং নির্গত জলস্রোতকে বলা হয় 'বিতস্তা' বা 'বিহৎ'। এই জলধারা যতই নিম্ন ভাগে নেমে এসেছে ততই বৈরনাগ, অনন্ত

নাগ, আচ্ছাবল, কুক্কুড়নাগ, কোশানাগ প্রভৃতি উৎস থেকে নির্গত জলরাশি এর অবয়বকে বৃদ্ধি করেছে।

এখানকার নাবিকেরা নৌকাকেই নিজেদের বাড়ী রূপে ব্যবহার করে থাকে। বালিকা, তরুণী, বৃদ্ধা সকলেই নৌকা চালনায় পটু। আকারানুযায়ী এখানকার নৌকাগুলির বিভিন্নপ্রকার নাম। তবে শিকারী বা শিকারা ও ডুঙ্গাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ।

শিকারী গুলি সাধারণত দৈর্ঘ্যে ২৫ হাত, প্রস্থে ২।০ হাত এবং গভীরতায় ১ ফুট হয়ে থাকে। আরোহীদের বসবার স্থানটি হোগলা দিয়ে ছাওয়া থাকে। ইচ্ছানুযায়ী এই হোগলার ছাদ খুলে নেওয়া যায়। শিকারীর দাঁড়গুলি, 'চাপ্পা' নামে পরিচিত। 'চাপ্পা' গুলি আমাদের দেশীয় দাঁড় অপেক্ষা অনেক ক্ষুদ্র। এগুলি নৌকার সঙ্গে রজ্জু দ্বারা বাঁধা থাকে না। কাশ্মীরের কোন নৌকাতেই কর্ণ থাকে না। শিকারীতে তিন জন থেকে দশ জন পর্যন্ত বাহক নিযুক্ত হতে দেখা যায়। শিকারী এক প্রকার প্রমোদ তরণী। সকলেই এতে করে শ্রীনগর এবং তৎসন্নিহিত স্থানগুলি ভ্রমণ করে থাকে।

ডুঙ্গাগুলি দৈর্ঘ্যে ৪০ হাত, প্রস্থে ৪ হাত এবং গভীরতায় প্রায় দেড় হাত। এ'গুলি দূরাঞ্চল ভ্রমণের উপযোগী। আবার এতেই এখানকার মাঝিরা বসবাস করে। ডুঙ্গার উপরিভাগ হোগলা দিয়ে আবৃত। এর শেষার্দ্ধভাগে মাঝিরা সপরিবারে বাস করে। এবং অপরার্দ্ধে পর্যটনকারীরা সুখে থাকতে পারে। শিকারীর ন্যায় এটিও 'চাপ্পা' দ্বারা বাহিত হয়। তবে এ'গুলি রমণীরাও চালনা করে থাকে।

কাশ্মীরস্থিত চারটি হ্রদ খুব প্রসিদ্ধ। ডাল, আঞ্চার, মানসরল এবং উলর। ডাল হ্রদ শ্রীনগরের উত্তর পূর্ব ভাগে এবং অর্দ্ধক্রোশ দূরে অবস্থিত। ছুট কোল নামক একটি খালের দ্বারা বিতস্তা নদীর সঙ্গে সংযুক্ত। দ্বিতীয় আঞ্চার হ্রদটিও শ্রীনগরের উত্তরে এবং প্রায় এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এ'টি 'নালামা' নামক খালের দ্বারা ডাল হ্রদের সঙ্গে সংযুক্ত। তৃতীয় মানস বল শ্রীনগরের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। স্থলপথে এর দূরত্ব প্রায় ৫ ক্রোশ এবং জলপথে ন্যূনধিক আট ক্রোশ। এই হ্রদটিই সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। উলর হ্রদটি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং এর মধ্য দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। এ'টি শ্রীনগরের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। স্থল পথে এর দূরত্ব ১১ ক্রোশ এবং জল পথে দূরত্ব প্রায়

১৫ ক্রোশ।

এই হ্রদ চারটি কাশ্মীর উপত্যকার সমতল ভূমিতে অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত অপরাপর কয়েকটি হ্রদ পর্বতোপরি অধিত্যকায়, পর্বতমালা দ্বারা বেষ্টিত অবস্থায় অবস্থিত। এদেরমধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'কোশানাগ,' 'শেষনাগ' এবং 'গঙ্গাবল'।

কাশ্মীরস্থিত উৎসগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য 'বৈরনাগ,' 'অনন্ত নাগ,' বায়ন, 'আচ্ছাবল', 'কুক্কুড়নাগ' এবং 'বিৎবিথর'।

কাশ্মীরে বৈশাখমাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত বসন্ত কাল। এখানে শীতকালে যে পরিমাণে বরফ পড়ে, বসন্তের সমাগম তদনুযায়ী হয়ে থাকে। বসন্ত কালে এখানে 'সর্বাদৌ বেদমুস্ক' নামক বৃক্ষের পুষ্প প্রস্ফুটিত হতে দেখা যায়। এই পুষ্প ঈষৎ হরিদ্রা আভা যুক্ত শুক্ল বর্ণের। এই সময়ে সমগ্র কাশ্মীর নানা বর্ণের পুষ্পে সজ্জিত হয়ে থাকে। বাদামপুষ্প প্রস্ফুটিত হ'লে কাশ্মীরের ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে সকলে কস্তুরা পাখীর খাঁচা নিয়ে হরিপর্বত নামক স্থানে গিয়ে উপস্থিত হয়। এখানে প্রচুর বাদাম বৃক্ষ। একটি বৃক্ষ শাখায় পাখীর খাঁচাটি স্থাপন করে এরা মাথা থেকে উষ্ণীষ খুলে বসে। অতঃপর কস্তুরা নৃত্য ও গীত আরম্ভ করলে এরাও বিভু গুণ গান শুরু করে দেয় এবং মণ্ডলাকারে পরিভ্রমণ করতে থাকে। কাশ্মীরীরা একে 'হাজার দস্তান' নামে অভিহিত করে থাকে।

জ্যৈষ্ঠ মাসে কাশ্মীরে অসংখ্য, 'জেসমিন' ফুল ফুটতে দেখা যায়। আকাশের ন্যায় রঙ বলে এখানে এ'টি 'হি আসমান' নামে পরিচিত। কাশ্মীরে গ্রীষ্মের প্রকোপ তেমন অনুভূত হয় না। এই সময়েও রাত্রিকালে শীতবস্ত্র ব্যবহার অপরিহার্য। শ্রীনগরের অনতিদূরে অবস্থিত 'গুলমার্গ' অতিশয় শীতল ও মনোরম স্থান। শ্রীনগরে উত্তাপ কিঞ্চিৎ অধিক হলে অনেকে 'গুলমার্গে' গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করে।

এখানে বর্ষাও তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। সম্বৎসরে এখানকার বৃষ্টিপাত ২০ ইঞ্চির অধিক হয়না। শীতকালে এখানে যখন বরফ পড়তে থাকে, তখন অবিশ্রান্ত ভাবে ঝড় ও বৃষ্টি হতে দেখা যায়। আশ্বিন মাস থেকেই এখানকার বৃক্ষের পাতাগুলি ক্রমশঃ বিবর্ণ হতে শুরু করে। কার্তিক মাস থেকেই কাশ্মীরে শীতকালের আরম্ভ। এই সময়ে এখানে জাফরান উৎপন্ন হতে

দেখা যায়। শ্রীনগর থেকে ৬ ক্রোশ দূরে 'পাম্পুর' নামক স্থানে জাফরান জন্মায়।

শীতকাল সমাগত দেখলে কাশ্মীরীরা আহার্য দ্রব্যাদি সংগ্রহ করে রাখতে শুরু করে। এই সময়ে লঙ্কার বৃহৎ বৃহৎ মালা সমগ্র কাশ্মীরের সর্ব্বত্র শুখাতে দেখা যায়। কার্তিক মাসের শেষ সময় থেকেই বরফ পড়তে শুরু করলেও, প্রকৃত প্রস্তাবে পৌষমাস থেকেই এখানে বরফ পাতের যথার্থভাবে সূত্রপাত হয়। এই সময়ে হ্রদ প্রভৃতি একেবারে জমে যায়। কোন কোন বৎসর বিতস্তা নদী-ও সম্পূর্ণ রূপে জমে যায়। গৃহের মধ্যে রক্ষিত পাত্রস্থিত জলও জমে যায়। এখানে এ'টি 'কটাকচু' নামে পরিচিত। এই সময়ে কাশ্মীরীদের গৃহের স্থানে স্থানে অগ্নি প্রজ্বলিত থাকে। প্রত্যেকেই তখন বুকে একটি করে 'কাঁকড়ি' স্থাপন করে। আমাদের দেশের অগ্নি সেবনের মালসা অপেক্ষা 'কাঁকড়ি' কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র। এর চারপাশ বাখারি দিয়ে বোনা এবং এর মুখ অপ্রশস্ত। আবালবৃদ্ধ বনিতা সকলেই সমগ্র বৎসর ধরে 'কাঁকড়ি' ব্যবহার করে থাকে। এরা গ্রীবা থেকে বক্ষঃস্থল পর্যন্ত এটি ঝুলিয়ে দেয়। এই জন্য কাশ্মীরীদের বক্ষে পোড়া দাগ দৃষ্ট হয়ে থাকে। শীতকালে এখানকার পুরুষেরা শাল বোনার কার্যে ব্যস্ত থাকে। স্ত্রীলোকেরা এই সময়ে শালের বুটি, হাঁসিয়া, কুঞ্জ, গলাবন্ধ প্রভৃতি তৈরী করে। শীতকালে এখানকার প্রধান খাদ্য চা এবং মাংস। এই সময়ে 'মৃণাল' ব্যতীত অপর কোন প্রকার তরকারী সুলভ নয়। কাশ্মীরীরা একে 'নদ্রু' বলে থাকে। শীতকালে কাশ্মীরে কয়েক শ্রেণীর জলচর পক্ষী প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

এখানকার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। হ্রদসমূহের জল অতিশয় স্বচ্ছ। ভূমি অত্যন্ত উর্বর। পর্বতগাত্রেও অনেক শস্য ক্ষেত্র দেখতে পাওয়া যায়। দুর্গম বলে যে সকল স্থানে কৃষিকার্য সম্ভব হয়না, সেই সকল স্থানে বাদাম, তুঁত, আখরোট প্রভৃতি বৃক্ষ সকল জন্মাতে দেখা যায়। এতদ্ব্যতীত এখানে পাইন, দেদার প্রভৃতি মূল্যবান বৃক্ষরাজিও প্রচুর পরিমাণে জন্মে থাকে। কাশ্মীরে 'পাইন', 'চীড়' নামে পরিচিত। এই পাইনের কাঠ দিয়ে এখানে বাসগৃহ, নৌকা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়। পথিক ও ডাকবাহকেরা রাত্রিকালে এর সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কাঠ দিয়ে মশাল প্রজ্বলিত করে পার্বত্য পথে গমনাগমন করে।

কাশ্মীরের প্রধান খাদ্য চাল। এখানে গম, যব ও অন্যান্য শস্য অপেক্ষা

ধানই অধিক পরিমাণে উৎপন্ন হয়। দুধ, ছানা, মাছ, মাংস, বেগুন, কড়াই শুঁটী, আলু, কপি, প্রভৃতিও এখানে প্রভূত পরিমাণে জন্মায়। এতদ্ব্যতীত সেউ, বিহি, গেলাস, কোতরনল, গোমা বগগু, তুঁতে, আঙ্গুর, আখরোট, বাদাম, আঁড়ু প্রভৃতি বহুবিধ সুস্বাদু ফল জন্মে। এখানে বাদাম চার প্রকারের . তন্মধ্যে এক প্রকারের আচ্ছাদন কাগজের ন্যায় সূক্ষ্ম বলে তা 'কাগজী' নামে পরিচিত।

কাশ্মীরে প্রায় আঠার প্রকারের আঙ্গুর দৃষ্ট হয়। এদের মধ্যে 'সাহেবী' এবং মুস্কা খুব প্রসিদ্ধ। কাশ্মীরের সর্বত্রই আঙ্গুর লতা দেখতে পাওয়া যায়। তবে এখানে আম, নারকেল, কাঁঠাল, পেঁপে প্রভৃতি ফল পাওয়া যায় না। কৃষিজাত দ্রব্যাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য, 'কেশরী' বা 'জাফরান'। এখানকার গরু অত্যন্ত খর্বাকৃতির এবং অধিকাংশ গরুই কৃষ্ণ বর্ণের কাক এখানে অপেক্ষাকৃত শ্বেতবর্ণের। কাশ্মীরে সর্প জাতীয় জীব অতিশয় বিরল। তবে অপর এক প্রকার জীব এখানে দৃষ্ট হয় যা 'পিসহু' নামে পরিচিত। যদিও আকারে খুবই ক্ষুদ্র কিন্তু অত্যন্ত বিপজ্জনক। এরা মশার ন্যায় রক্তপান করে। সহজে এদের ধরা যায় না। নখ অথবা ছুরি দিয়ে এদের বিদীর্ণ করতে না পারলে এরা সহজে মরে না।

কাশ্মীরের নানা স্থানেই লোহ সিসা প্রভৃতি ধাতু পাওয়া যায়। কাশ্মীরের অধিকাংশ গৃহই কাষ্ঠ নির্মিত। এখানে এগুলি 'লড়ী' নামে পরিচিত। প্রায়ই ভূমিকম্প হয় বলে পাকাবাড়ীর পরিবর্তে কাষ্ঠ নির্মিত গৃহাদিই এখানে দেখা যায়। অবশ্য কোন কোন গৃহের ভিত্তি ইষ্টক অথবা প্রস্তর নির্মিত দেখা যায়। হিমানীর জন্য গৃহগুলির ছাদ সমতল করা হয় না। পরিবর্তে ছাদের মধ্যস্থল উচ্চ এবং দুই পাশ ঢালু করে নির্মাণ করা হয়। কাষ্ঠ ও তক্তা সংলগ্ন করে তার ওপরে ভূর্জপত্র দেওয়া হয়। অতঃপর এর ওপর মৃত্তিকা স্থাপন করে ছাদ প্রস্তুত করা হয়। এখানকার 'লড়ী' গুলি দ্বিতল থেকে পাঁচতল পর্যন্ত উচ্চ হতে দেখা যায়। লড়ীগুলির জানালার কপাট দুই ভাগে বিভক্ত। বহির্ভাগস্থ কপাটগুলি বিচিত্র কারুকার্য বিশিষ্ট, এতে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ছিদ্র থাকে। শীতের সময় এটি কাগজ দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়। প্রতিটি প্রকোষ্ঠে একটি করে 'বোখারি'[৬] থাকে। শীতকালে 'বোখারি' ব্যতীত বাস করা দুঃসাধ্য। সম্পন্ন লোকদের অট্টালিকার প্রথম তলে থাকে হামাম। হামামগুলি এরূপভাবে নির্মিত থাকে

যে শীতল বায়ু এখানে প্রবেশ করতে পারে না। এখানে স্নানোপযোগী তারতম্য বিশিষ্ট উষ্ণ জল রাখবার ব্যবস্থা থাকে। শীতকালে এখানে স্নান অতীব প্রীতিকর। 'হামাম' প্রজ্বলিত করলে তৎপার্শ্বস্থ এবং তদুপরি সমুদায় প্রকোষ্ঠ উষ্ণ থাকে।

শ্রীনগরের প্রতিটি লড়ীর দ্বার নদীতটে স্থিত এবং তাতে নামবার সিঁড়ি থাকে। এই ঘাটকে 'ইয়ার বল' নামে অভিহিত করা হয়। লোকে নিজ নিজ নৌকা এইখানেই রাখে।

কাশ্মীরের অধিবাসীদের অধিকাংশই মুসলমান। এখানে হিন্দুগণ সংখ্যা লঘিষ্ঠ। হিন্দুরা এখানে 'পণ্ডিত' নামে খ্যাত। কাশ্মীরী পুরুষেরা গৌর বর্ণের, দৃঢ়কায়, চতুর, বুদ্ধিমান এবং আমোদপ্রিয়। কিন্তু অত্যন্ত ভীরু। কাশ্মীরী স্ত্রীলোকেরা পরমা সুন্দরী, সাধারণত লজ্জাহীনা হয়।

পুরুষদের পরিধেয় বস্ত্রাদির মধ্যে উল্লেখযোগ্য কৌপীন, আলখাল্লা,[৭] উষ্ণীষ। হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই প্রায় মস্তকমুণ্ডিত করে থাকে। স্ত্রীলোকদের একমাত্র পরিধেয় বস্ত্র হ'ল আলখাল্লা, হিন্দু মহিলাদের কেউ কেউ আবার কটীদেশে চাদর জড়িয়ে রাখে। কেউ কেউ আবার লাল বর্ণের টুপি ব্যবহার করে। এখানে স্ত্রীলোকেরা নামমাত্র অলঙ্কারে ভূষিত হয়ে থাকে। কাষ্টপাদুকা এবং 'কাঁকড়ি' এদের পরিচ্ছদের অন্তর্ভুক্ত।

কাশ্মীরীদের আচার আচরণ অত্যন্ত কুৎসিত। শীতকাল ব্যতীত অন্য সময়েও এরা বস্ত্রাদি কাচে না। পথিমধ্যে, গৃহের প্রাঙ্গণে, গৃহের অভ্যন্তরে মল মূত্রাদি ত্যাগ করে।

কাশ্মীরীরা এক বিশেষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এক গৃহস্থের সঙ্গে অপর গৃহস্থের কলহ করতে করতে সন্ধ্যা হয়ে গেলে উভয়েই নিজ নিজ প্রাঙ্গণে একটি করে ধামা ঢেকে রাখে। পুনরায় পরদিন প্রত্যুষে ঐ ধামা উত্তোলন করে কলহ শুরু করে। বেশ কয়েকদিন ধরে এইরূপ কলহ চলতে থাকে। বিবাদের সময় বিবদমান দুই পক্ষ সময়ে সময়ে নানা কুৎসিত সঙ্‌ও প্রস্তুত করে থাকে।

কাশ্মীরীদের প্রধান খাদ্য ভাত, মাছ এবং চা। কাশ্মীরীরা দুই বেলাই ভাত খায়। এরা উত্তপ্ত ভাত অপেক্ষা শীতল ভাত অধিক পছন্দ করে। এদের উপাদেয় ভোজ হল শুষ্ক কঠিন ভাত, লবণ ও লঙ্কা জর্জরিত 'কড়ম'

নামক এক প্রকার শাক, কিছু পরিমাণ মাছ এবং এক পেয়ালা চা। নস্যি কাশ্মীরীদের অত্যন্ত প্রিয়। অতিথিদেরও এরা চা ও নস্য দ্বারা আপ্যায়িত করে থাকে। এদের চা প্রস্তুতের পাত্র অত্যন্ত সুন্দর। কাশ্মীরী ভাষায় এটি 'সমার' নামে পরিচিত। 'সমার' সাধারণত ১২ বা ১৪ ইঞ্চি এবং ২৷৷০ ইঞ্চি ব্যাস বিশিষ্ট হয়। এর ভেতরে অগ্নি নিক্ষেপ করবার একটি নল আছে। এতে কয়েকটি জ্বলন্ত অঙ্গার নিক্ষেপ করলে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই চা প্রস্তুত হয়ে যায়। কাশ্মীরীরা স্থানান্তরে গমন কালে এই 'সমরবার' বা 'সমার' এবং তার আনুষঙ্গিক উপকরণ সঙ্গে নিয়ে যায়। এখানকার চা দুই প্রকারের— মিষ্ট চা এবং লবণ চা। মিষ্ট চা এরা চিনি এবং এলাচ, দারুচিনি প্রভৃতি মশলা সহযোগে প্রস্তুত করে থাকে। এর বিশেষত্ব এই যে, মিষ্ট চা দুধ দিয়ে প্রস্তুত হয় না। আহারকালে অথবা আহারান্তে এরা মিষ্ট চা পান করে না। এই সময়ে এরা লবণ চা পান করে। শীতল জলের সঙ্গে চা মিশিয়ে ফুটান হতে থাকে। অতঃপর এতে এক প্রকার ক্ষার পদার্থ দেওয়া হয়। এই ক্ষার এখানে 'ফুল' নামে পরিচিত। এ'টি তিব্বত থেকে কাশ্মীরে আমদানী হয়ে থাকে। 'ফুলে'র দ্বারা চায়ের সারাংশ শীঘ্র আকর্ষিত হয় এবং চায়ের উত্তম রঙ্ হয়। এইরূপে চা সিদ্ধ হয়ে গেলে তাতে কেবলমাত্র লবণ, কখন দুগ্ধও মিশ্রিত করা হয়। এইরূপে এখানে লবণ চা প্রস্তুত হয়। বলাবাহুল্য এই চা মিষ্টি চায়ের মত সুস্বাদু নয় তথাপি কাশ্মীরে এটা অধিক প্রচলিত। কাশ্মীরীরা আমাদের দেশের ব্যবহার্য চা পছন্দ করে না। তিব্বত ও লাডাক থেকে আনীত চা এখানকার অধিবাসীদের অধিকতর প্রিয়।

কাশ্মীরীরা শিল্পবিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী। কাশ্মীরে প্রস্তুত শালই তার নিদর্শন। এতদ্ব্যতীত কাগজের কলমদান, বাক্স, থালা, রেকাব প্রভৃতিতেও এদের শিল্প বিদ্যার উল্লেখযোগ্য স্বাক্ষর লক্ষ্য করা যায়। স্বর্ণ রৌপ্যের অলঙ্কারাদি নির্মাণের কৌশলও মন্দ নয়।

কাশ্মীরের প্রকৃত ভাষার নাম 'কাশুর', এটি সংস্কৃতের অপভ্রংশ। কিন্তু এই ভাষায় কোন পুস্তক লিখিত হয় না বা লিখবার উপায়ও নেই। কারণ উচ্চারণানুযায়ী শব্দগুলিকে লিপিবদ্ধ করবার মত কোন অক্ষর নেই। আমাদের বাংলা ভাষার সঙ্গে 'কাশুর' ভাষার গভীর সাদৃশ্য লক্ষিত হয়ে থাকে। এখানে সংস্কৃত শব্দ অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। কাশ্মীরীরা যে ভাষায়

কথা বলে তা কোন একটি মাত্র ভাষা নয়, নানাবিধ ভাষা থেকে সংগৃহীত। এরা কথোপকথনের সময় বাক্য ও পদের প্রথমে 'দপাঞ্চ' অর্থাৎ 'বলিতেছি' বা 'বলিতেছেন' এবং অনেকে ক্রিয়া পদের শেষে 'চ' ব্যবহার করে। এখানকার লোকেদের প্রকৃতি বেশ নম্র।

কাশ্মীরীরা অনেকেই পারসীক ভাষা শিক্ষা করে, পণ্ডিতেরা শিক্ষা করে সংস্কৃত। এখানকার প্রায় সকল হিন্দুই রীতিমত পূজার্চনা করে থাকে। হিন্দু-মাত্রেই প্রাতঃকালে ললাটে জাফরানের দীর্ঘ তিলক অঙ্কিত করে। এই তিলক অঙ্কনেরও একটি রীতি বর্তমান। এক সূর্যোদয়ে যে তিলক অঙ্কিত করা হয়, তা অপর সূর্যোদয়ে অপনীত হয় এবং সেইস্থানে পুনরায় নূতন একটি তিলক অঙ্কিত করা হয়। এই জন্য কাশ্মীরী হিন্দুদের ললাটে সুদীর্ঘ দাগ লক্ষিত হয়ে থাকে।

এখানকার মুসলমানেরা সিয়া ও সুন্নি এই দুই ভাগে বিভক্ত। তবে এখানে সিয়া অপেক্ষা সুন্নিদেররই সংখ্যাধিক্য।

কাশ্মীরের পথে সমতল ভূমি অত্যন্ত বিরল। অবিরাম চড়াই ও উৎরাই। কোনো কোনো চড়াই এমন সরলভাবে উঁচু হয়ে গেছে যে ঝাঁপানে[৮], রজ্জু বেঁধে টানতে হয়। বিপরীতক্রমে নামবার সময়ে রজ্জু দ্বারা তা ঝুলিয়ে দিতে হয়। আবার কোনো কোনো স্থান এমন বক্র যে, ঝাঁপান আরোহী, বাহক সকলকেই কুণ্ডলাকারে ভ্রমণ করতে হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য কাশ্মীরে অশ্ব, অশ্বেতর প্রাণী, বাহক প্রভৃতি খুবই সুলভ।

শীতকালে কাশ্মীরের সকল পথই তুষারাবৃত হয়ে যায় বলে এই সময় মনুষ্য গমনাগমনের অযোগ্য হয়ে পড়ে। বৈশাখমাসের প্রথম থেকে পুনরায় বরফ গলতে আরম্ভ করলে তবে মনুষ্য চলাচলের উপযোগী হয়। কাশ্মীরের দুর্গম পথ সমূহে অশ্বই অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে পিঠ্ঠু'[৯] নামে পরিচিত অপর এক প্রকার যানেরও প্রচলন আছে। কাশ্মীরী ভাষায় এ'টি 'কসাব' নামে পরিচিত। বাহকের পশ্চাদভাগে পৃষ্ঠ সম্বলিত ঘোড়া অথবা বৃক্ষ শাখা থেকে নির্মিত ঘোড়ার সদৃশ আসন সংলগ্ন থাকে এবং আরোহী এতে উপবেশন করে। এটাই 'পিঠ্‌ঠু' বা 'কসাব'।

জম্মু নগরীতে গ্রীষ্মের প্রকোপ খুব। জম্মুর পরে অবস্থিত দংশাল ও কিরিমচী নামক স্থান দু'টিতেও প্রচণ্ড গ্রীষ্মের প্রকোপ অনুভূত হয়ে থাকে।

অবশ্য এর পরবর্তী স্থানগুলি বেশ শীতল। শীতকালে জম্মু নগরীতে বরফ পড়ে। দংশাল ও কিরমচীতে অল্প পরিমাণে বরফ পড়তে দেখা যায়। তবে কার্তিক ও অগ্রহায়ণে 'লাড়োলাড়ী'র পর্বতে তুষারপাত হয়ে থাকে। পীর শৈলও একেবারে তুষারমণ্ডিত হয়ে ওঠে।

জম্মু নগরের পাশ দিয়ে তাবী নদী প্রবাহিত। একটি ক্ষুদ্র এবং অসংশ্লিষ্ট পাহাড়ের ওপর জম্মু অবস্থিত। সমতল ভূমি থেকে জম্মুর উচ্চতা কমপক্ষে ৫০০ ফিট। জম্মু দৈর্ঘ্যে প্রায় ২ মাইল এবং প্রস্থে ১ মাইল। এখানে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুদের সংখ্যাই অধিক। জম্মুর অধিবাসীরা 'ডোগ্রা' নামে পরিচিত। এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। তবে কাশ্মীরের নৈসর্গিক শোভা এখানে অনুপস্থিত। গ্রীষ্মকালে এখানে অত্যধিক গরম। শীতকালে কেবলমাত্র চতুষ্পার্শ্বস্থ উচ্চ গিরিশৃঙ্গ সমূহেই তুষারপাত হয়। নগর মধ্যে বরফ পড়ে না। এখানে একটিও প্রস্রবন বা জলপ্রপাত নেই। নদী বলতে এখানে একমাত্র 'তাবী' প্রবাহিত। জল ও আহার্য সামগ্রী এখানে দুইয়েরই অভাব। এখানকার গৃহাদি অনুচ্চ এবং শৃঙ্খলা পূর্বক রচিত নয়। অধিকাংশ গৃহেরই বার মহল বলে কিছু থাকে না। এখানে ছাদ নির্মাণের সময় লম্বা লম্বা রলা কাঠ সাজিয়ে তার ওপর বাঁশের চেটাই দিয়ে পরে বাকশ নামক গুল্ম বিছিয়ে দেওয়া হয়। ইষ্টক নির্মিত গৃহের ক্ষেত্রে রলা কাঠের পরিবর্তে কড়ি কাঠ এবং চেটাইয়ের পরিবর্তে তক্তা দেওয়া হয়ে থাকে। বাকশ গুল্মের ওপর এক হাত পরিমিত উঁচু করে মাটি জমিয়ে দেওয়া হয়। বৃষ্টির সময় এইরূপ গৃহে অঝোর ধারায় জল পড়তে থাকে। অধিক বৃষ্টি হলে তাই এখানে বহু গৃহ ভূমিসাৎ হয়ে যায়। জম্মুর রাজবাটীটি অবশ্য এ অঞ্চলের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্যস্থল। এখানে রাজপ্রাসাদকে 'মণ্ডী' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। রাজ-প্রাসাদের 'বারশিঙ্গ' নামক হরিণের দ্বাদশ শাখা সমন্বিত শৃঙ্গের দেওয়াল গিরি অপূর্ব সৌন্দর্যের আকর স্বরূপ। জম্মু নগরের পাহাড়ের ওপরে 'দুর্গ' অবস্থিত। এখানে একখানি কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তর নির্মিত দেবী মূর্তি অধিষ্ঠিত আছেন। লোকে এই দেবীকে অনাদি এবং স্বয়ম্ভূ নামে অভিহিত করে থাকে। প্রতি মঙ্গলবার এবং শারদীয়া শুক্লাঅষ্টমী প্রভৃতি দিনে দেবীর বৃহৎমেলা অনুষ্ঠিত হয়।

নগরের প্রবেশ দ্বারের বামদিকে রোসন আলী নামক এক দীর্ঘকায় ফকীরের এক অতিদীর্ঘ কবর লক্ষিত হয়। এখান থেকে কিয়দ্দূরে গেলে এক

সুবৃহৎ মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। এ'টি 'গুম্বট' নামে পরিচিত। 'গুম্বটে' রামচন্দ্রের মূর্তি স্থাপিত আছে। 'গুম্বটে'র নিকটেই আর একটি স্বর্ণমণ্ডিত মন্দির বিদ্যমান। এই মন্দিরে মহাদেবের লিঙ্গ, স্ফটিকময় বৃষ এবং মহারাজ গোলাপ সিংহের ভস্ম রক্ষিত আছে। জম্বুতে গুম্বট, উর্দ্ধমুস্ত গড়, জোলা-কে মহল্লা, পাকাডাঙ্গা প্রভৃতি অনেকগুলি পল্লী বর্তমান।

জম্বু নগরের পূর্ব উত্তর প্রান্ত ভাগ 'ধোনশ্রী' নামে পরিচিত। 'ধোনশ্রী' অতিক্রম করে 'বাবা নারায়ণ দাসকি চাকী'তে উপস্থিত হওয়া যায়। এই জম্বু থেকে কাশ্মীর গমনের পথ। এখান থেকে ভাবী নদীর দক্ষিণ তট দিয়ে ৪ মাইল গেলে 'নাগরোটা' নামে এক ক্ষুদ্র পল্লীতে উপস্থিত হওয়া যায়। এখানে মতিসিংহের একটি মন্দির বিদ্যমান। 'নাগরোটা' থেকে ২ মাইল দূরে 'কণ্ডোলী' নামে অপর একটি পল্লী অবস্থিত। এখান থেকে ১ মাইল পরে দংশালের দুর্গম পাহাড়ের আরম্ভ। পাহাড়ের পর ২ মাইল বিশিষ্ট এক অধিত্যকা। অধিত্যকার পরবর্তী কিয়দংশ সরল, কিন্তু ৩ মাইল দূরে অবস্থিত 'সেড্ডে' নামক স্থান পর্যন্ত পথ অতিশয় দুর্গম এবং বিপজ্জনক।

জম্বু থেকে দংশালের দূরত্ব প্রায় ১৫ মাইল। দংশাল একটি উপত্যকা। এখানে বহু লোকালয় বর্তমান। কয়েকটি সুন্দর উৎসও এখানে বিদ্যমান।

দংশাল উপত্যকার পর একটি নদী। এই নদীর পরে একটি দীর্ঘ ও বিপজ্জনক চড়াই অতিক্রম করতে হয়। এই চড়াই 'বুড়টী' নামে পরিচিত। বুড়টি আসলে 'কড়াইধার' নামক গিরিমালার একটি অত্যুচ্চ শৃঙ্গ। এরই পর সংকীর্ণ, বন্ধুর এক উপত্যকায় অবতরণ করে কিয়দ্দূরে গেলেই 'উগ্রবাণী' নামক স্থান। উগ্রবাণী থেকে কিছুদূরে অবস্থিত একটি নদী। এ'টি অতিক্রম করে 'গড়ী' নামক এক পল্লীতে উপনীত হওয়া যায়। এখান থেকে কয়েক মাইল সমভূমি এবং তার পর এক অনতিদীর্ঘ চড়াই অতিক্রম করলে কিরিমচী।

দংশালের মত কিরমচীও একটি উৎকৃষ্ট পল্লী। দংশাল থেকে কিরিমচীর দূরত্ব ১২ মাইল। এখান থেকে পুনরায় ১২ মাইল দূরে অবস্থিত মীর। মীর থেকে লান্দার দূরত্বও ১২ মাইল। মীর অতিক্রম করবার পর ৮ মাইল পর্যন্ত কেবল অবতরণ করতে হয়। তার পর একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী পার হলে একটি দুর্গম চড়াই শুরু হয়। এ'টি 'কন্না' নামে এখানে পরিচিত। কন্না দৈর্ঘ্যে

প্রায় ৩ মাইল। কন্নার ঠিক বিপরীত ভাগের উৎরাই 'চুলনা' নামে পরিচিত। চুলনার পর লান্দার। এ'টি একটি অতিশয় ক্ষুদ্র পল্লী।

লান্দার থেকে বিলাওৎ ১৫ মাইল। লান্দারের আধ মাইল পরে অবস্থিত 'লাড়োলাড়ী' বা লাড়ী লাড়ার পাহাড়। এই পাহাড় দৈর্ঘ্যে ৭॥০ মাইল। পাহাড়টি যেমন উচ্চ, তেমনই দুর্গম। পর্বতের শীর্ষে প্রস্তর খোদিত লাড়ী-পাহাড় ও চন্দ্র সূর্যের প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। কিংবদন্তী, পূর্বে কোন সময়ে কোন বর কন্যা বহু সংখ্যক বরযাত্রী সহ এই শৈল পথ দিয়ে গমন করবার কালে অতিশয় তৃষ্ণার্ত হয়ে অকাল মৃত্যু বরণ করেছিল। সেই শোকাবহ ঘটনার নায়ক নায়িকার নামানুসারে পাহাড়টির নামকরণ 'লাড়োলাড়ী' বা 'লাড়ীলাড়া'। এখানে 'লাড়ী' শব্দের অর্থ কন্যা এবং 'লাড়ো' বা 'লাড়া' শব্দের অর্থ বর। কার্তিক মাসের শেষে এখানে তুষারপাত হয়ে থাকে। এর পরে বিলাওৎ। বিলাওৎ থেকে রাম বনের দূরত্ব ৯ মাইল। এই পথে চন্দ্রভাগা নদী পড়ে। রামবন অতি উত্তম স্থান। রামবনে অনেক লোকালয় বর্তমান। এখান থেকে রামসুরের দূরত্ব ২০ মাইল। রামসুর থেকে বনহালের দূরত্ব ১৫ মাইল। বনহাল থেকে বৈরনাগ ১৫ মাইল। বৈরনাগ অত্যন্ত রমণীয় দ্রষ্টব্য স্থান। বৈরনাগ থেকে অনন্তনাগের দূরত্ব ১৬ মাইল। এ'টিও একটি রমণীয় জনপদ। অনন্তনাগ 'ইসলামাবাদ' বা 'খান বল' নামেও পরিচিত। এখান থেকে স্থল ও জল উভয় পথেই শ্রীনগরে উপনীত হওয়া যায়। অনন্তনাগ থেকে প্রায় ১ মাইল দূরে বিতস্তা নদী প্রবাহিত।

ভিম্বর থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব পার্বত্যপথে ১৪৮ মাইল। গুজরাট থেকে ভিম্বরের দূরত্ব প্রায় ২৮ মাইল। ভিম্বর একটি রমণীয় জনপদ। এ'টি 'ভিম্বর' নামক নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এর উত্তর, পূর্ব এবং পশ্চিম ভাগ অনুন্নত এবং নিবিড় তরুরাজি সমন্বিত গিরিমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত। ভিম্বর থেকে সৈদাবাদের দূরত্ব ১৫ মাইল। সৈদাবাদ একটি উপত্যকার মধ্যভাগে অবস্থিত। এ'টি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। সৈদাবাদ থেকে নাওশেরার দূরত্ব ১২॥০ মাইল। নাওশেরা একটি বৃহৎ জনপদ। নাওশেরা থেকে চংগমের দূরত্ব ১৩॥০ মাইল। চংগমও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এর চতুর্দিকে অভেদ্য পর্বতমালা বিদ্যমান। চংগম থেকে রাজৌড়ীর দূরত্ব ১৪ মাইল। চংগম থেকে ৬ মাইল দূরে কল্লর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী বর্তমান। কল্লর থেকে ৩ মাইল দূরে মোরদ নামে

অপর একটি ক্ষুদ্র জনপদ বর্তমান।

রাজোড়ী একটি বৰ্দ্ধিষ্ণু জনপদ। তাবীনদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। এখানে আলমনোট অর্থাৎ পূর্বতন মুসলমান অধিপতিদের কবরস্থান, আমখাস মোসাফের খানা, রাজবাটী, মন্দির প্রভৃতি বিদ্যমান। রাজোড়ীর পূর্বভাগে দু'টি গন্ধক মিশ্রিত উষ্ণ প্রস্রবন পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। রাজোড়ী থেকে থন্নামণ্ডীর দূরত্ব ১৪ মাইল। থন্নামণ্ডী প্রস্তর নির্মিত একটি ক্ষুদ্র জনপদ। তাবী নদীর বামতটে এ'টি অবস্থিত। রাজোড়ী থেকে থন্নামণ্ডীর পথে ফতীপুর নামক একটি ক্ষুদ্র পল্লী, হরিসিংহের বাউলী,[৯] লীড়া বাউলী প্রভৃতি দৃষ্টি-গোচর হয়।

থন্নামণ্ডী থেকে বরম গোলার দূরত্ব ১০৷৷০ মাইল। বরমগোলা একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এ'টি অত্যুচ্চ পর্বতমালা দ্বারা পরিবেষ্টিত। বরমগোলার পাশ দিয়ে স্যুরন নদী প্রবাহিত। নদীর অপর তটে একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গা বর্তমান। বরমগোলা থেকে পোশিয়ান ৮ মাইল। বরমগোলার পর এক চড়াই। চড়াইয়ের পর নদী। তার পর কুম্মী মার নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রাম। এক পথে কয়েকটি রমণীয় জলপ্রপাত বিদ্যমান। তন্মধ্যে 'নূরীচশম' বা 'আলোকময় জল প্রপাত'টি উল্লেখযোগ্য।

পোশিয়ানা একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এ'টি পর্বতগাত্রে অবস্থিত। পোশিয়ানা থেকে আলিয়াবাদ নামক সরাইয়ের দূরত্ব ১১ মাইল। পথিমধ্যে বিখ্যাত 'পীর পঞ্জাল' শৃঙ্গ অতিক্রম করতে হয়। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ১১,৪০০ ফিট। কার্তিক মাসের শেষ হ'তেই এখানে তুষারপাত শুরু হয়ে যায়। বৈশাখের পূর্বে এই তুষার দ্রবীভূত হয় না।

আলিয়াবাদ সরাই থেকে হীরপুর নামক ক্ষুদ্র জনপদটির দূরত্ব ১২ মাইল। হীরপুর রেমবিয়ারা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। হীরপুর আসতে পথিমধ্যে একটি প্রাচীন দুর্গ দৃষ্টিগোচর হয়। হীরপুর থেকে শোশিয়ান ৮ মাইল। শোশিয়ান থেকে রামুর দূরত্ব ১১ মাইল। পথিমধ্যে রামচু নামে একটি ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী অতিক্রম করতে হয়। রামচু থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ১৮ মাইল। রামচু থেকে কিঞ্চিদধিক ৬ মাইল আসলে খান্‌পুর নামে এক পল্লী। খান্‌পুর থেকে ৫ মাইল দূরে ওয়াতর নামে অপর একটি জনপদ অবস্থিত। ওয়াতরে পশম থেকে উৎকৃষ্ট মোজা এবং দস্তানা প্রস্তুত হয়। এখান থেকে শ্রীনগর ৭

মাইল। শ্রীনগরের প্রবেশদ্বারে রামবাগ নামে এক উপবন। এখানে প্রাচীর বেষ্টিত একটি মন্দিরে মহারাজ গোলাপ সিংহের ভস্ম রক্ষিত আছে। নিকট দিয়ে বিতস্তা নদীর একটি শাখা প্রবাহিত। এ'টি 'দুধগঙ্গা' নামে পরিচিত। রাজবাটীর দক্ষিণ পাশে 'হুজুরিবাগ' নামে পরিচিত এক উপবন। এখান থেকে কিয়দ্দূরে অবস্থিত 'মীরাকদল'[১০] দৃষ্টিগোচর হয়। থুন্নামণ্ডী থেকে সুরণ ১৬ মাইল। সুরণ একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এটি সুরণ নদীর বাম তটে অবস্থিত। সুরণ থেকে পুঞ্চের দূরত্ব ১৪ মাইল। পুঞ্চ একটি নগরী। এ'টি এক বিস্তৃত অধিত্যকায় অবস্থিত। সুরণ বা লেয়ার নামক নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত। পুঞ্চ থেকে কেহুটার দূরত্ব ৯ মাইল। পথিমধ্যে পড়ে দেইগোয়ার নামে এক ক্ষুদ্র জনপদ। কেহুটাও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কেহুটা থেকে আলিয়াবাদের দূরত্ব ৮ মাইল। আলিয়াবাদ থেকে হায়দ্রাবাদের দূরত্ব ৭ মাইল। পথিমধ্যে হাজীপীর নামক শৃঙ্গ অতিক্রম করতে হয়। হাজীপীর শৃঙ্গ সমুদ্রতল থেকে ৮,৫০০ ফিট উঁচু। শৃঙ্গের ওপরে জনৈক ফকিরের এক আশ্রম বিদ্যমান। হায়দ্রাবাদও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এখান থেকে উড়ীর দূরত্ব ১০ মাইল। পথিমধ্যে পড়ে তলবারী নামক এক ক্ষুদ্র জনপদ। এ'টি হায়দ্রাবাদ থেকে প্রায় ৬ মাইল দূরবর্তী। উড়ী একটি বিশিষ্ট জনপদ। এ'টি চতুর্দিকে অত্যুচ্চ পর্বত বেষ্টিত। উড়ীর উত্তর ভাগে ঝিলম নামক নদী প্রবাহিত। এর বাম তটে একটি প্রাচীন দুর্গ বর্তমান। উড়ী থেকে নাওসেরার দূরত্ব ১৪ মাইল। নাওসেরা থেকে বারমুলার দূরত্ব ১০ মাইল। বারমুলা কাশ্মীর উপত্যকার পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত। এ'টি একটি বৃহৎ জনপদ। এর নিকট দিয়ে বিতস্তা নদী প্রবাহিত। বারমুলা থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ৩০ মাইল। বারমুলা থেকে পত্তনের দূরত্ব স্থল পথে ১৪ মাইল। আবার পত্তন থেকে শ্রীনগরের দূরত্ব ১৪ মাইল।

মরি থেকে দেউলের দূরত্ব ১০ মাইল। দেউলি একটি ক্ষুদ্র জনপদ। দেউল থেকে কোহালাও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কোহালা থেকে চত্রকলাশের দূরত্ব ১১ মাইল। চত্রকলাশ থেকে রাড় ১২ মাইল। রাড় থেকে ত্রিণালীর দূরত্ব ১২ মাইল। ত্রিণালী থেকে ঘরীর দূরত্ব ১০ মাইল। ঘরী থেকে হত্তীর দূরত্ব ১২ মাইল। হত্তী থেকে চকোতী ১৫ মাইল। এ'টিও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। চকোতী থেকে উড়ীর দূরত্ব ১৬ মাইল।

আবোটাবাদ থেকে মানসেরার দূরত্ব ১৩ মাইল। মানসেরা একটি বৃহৎ জনপদ। এখান থেকে ঘরীর দূরত্ব ১৯ মাইল। ঘরীও একটি বৃহৎ পল্লী এবং এখান থেকে মোজাফেরাবাদের দূরত্ব ৯ মাইল। ঘরী থেকে প্রায় ৩ মাইল দূরে দুরবল্লী নামক পাহাড়। মোজাফেরাবাদ একটি উল্লেখযোগ্য জনপদ। এ'টি পর্বতগাত্রে অবস্থিত। মোজাফেরাবাদ থেকে হতীয়ানের দূরত্ব ১৭ মাইল। হতীয়ান থেকে কণ্ডার দূরত্ব ১১ মাইল। কণ্ডা একটি ক্ষুদ্র জনপদ। কণ্ডা থেকে কথাই ১২ মাইল। এ'টিও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এর নিকটে একটি মৃত্তিকা নির্মিত দুর্গ বিদ্যমান। কড়াই থেকে সাহদেরার দূরত্ব ১২ মাইল। কড়াইয়ের মত সাহদেরাও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। এখান থেকে গিংগল ১৪ মাইল। গিংগলও একটি ক্ষুদ্র জনপদ। গিংগল থেকে বারমুলা ১৮ মাইল এবং বারমুলা থেকে শ্রীনগর ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত।

শ্রীনগর কাশ্মীর উপত্যকার মধ্যভাগে অবস্থিত। বিতস্তা নদী শ্রীনগরের মধ্যভাগ দিয়ে প্রবাহিত। বিতস্তা নদী প্রস্থে প্রায় ১৭৬ হাতের সমান। তবে সারা বছর সমান গভীর থাকে না। সাধারণত এ'টি ১২ হাতের অধিক গভীর থাকে না। শ্রীনগর কেবলমাত্র বিতস্তা নদীর দ্বারা যে দুই ভাগে বিভক্ত তা নয়, তদুপরি মিরা কদল, হাবা কদল, ফতে কদল, জানা কদল, আলী কদল, নয়া কদল এবং সাফা কদল নামক কাষ্ঠ নির্মিত সপ্ত সেতুর দ্বারা উভয় তট সংযুক্ত। বিতস্তার দুই পাশেই অনেকগুলি বিস্তৃত খাল। নদীর উভয় পাশেই সফেদা নামক বৃক্ষ শ্রেণী। এখানে নৌকা যোগেই অধিকাংশ ক্ষেত্রে যাতায়াত হয়ে থাকে এবং এমন কি স্থল পথে সহরের অভ্যন্তরে তেমন কিছু দেখবারও নেই, সবকিছু দ্রষ্টব্য স্থলের জন্যই জল পথই প্রশস্ত।

শ্রীনগরের বাড়ী গুলি কাষ্ঠ নির্মিত। কয়েকটি মাত্র বাটী ইষ্টক নির্মিত দৃষ্ট হয়। রাজবাটী নদীর বামতটে এবং শ্রীনগরের সুবিস্তৃত ময়দানের উপর বারাদরী নামে একটি রমণীয় অট্টালিকা বিদ্যমান। মিরা কদল অতিক্রম করলে অনেকগুলি রমণীয় প্রাসাদ লক্ষিত হয়। তন্মধ্যে সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠটি রাজ প্রাসাদ। এখানে এ'টি 'সেরগড়ী' নামে পরিচিত। রাজবাটীর সন্নিকটেই নদীতটে গদাধর দেবের স্বর্ণ মণ্ডিত মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরের পাশ দিয়ে যে খাল প্রবাহিত হয়ে গেছে, তা কুট কোল নামে পরিচিত। এই খালের উপরিস্থিত সেতুটির নাম টেকী কদল। সের গড়ীর সামনে এবং নদীর দক্ষিণ

তীরে অপর যে একটি স্থান তা চুটকোল নামে পরিচিত। এ'টিই ডাল অর্থাৎ নাগরিক হ্রদে যাবার পথ।

বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত প্রসিদ্ধ বসন্ত বাগ। এই বসন্ত বাগে মহারাজা কার্তিক মাসের শুক্ল পক্ষের প্রতিপদ তিথিতে গদাধর দেবকে এনে গোবর্দ্ধন পূজা, অন্নকূট উৎসব প্রভৃতি সম্পন্ন করতেন। বসন্ত বাগের সংলগ্ন লড়ীটি পার আদালত নামে পরিচিত। এর পরে হাবা কদল নামক শ্রীনগরের দ্বিতীয় সেতুটি বিদ্যমান। অনন্তর ফতে কদল নামক তৃতীয় সেতুটিও বিদ্যমান। এখান থেকে কিয়দ্দূরেই কাশ্মীরের অতি প্রাচীন এবং অন্যতম শ্রেষ্ঠ মসজিদ সাহ হমদানের জেয়ারৎ অবস্থিত। মসজিদের বাইরের নিম্ন প্রাচীরে একটি দেবী মূর্তি খোদিত আছে। বহু হিন্দু সিঁদুর ও কুমকুমের সাহায্যে প্রত্যহ এই দেবী মূর্তির আরাধনা করে থাকে। মসজিদের বিপরীত ভাগে এবং নদীর বাম তটে নয়া মসজিদ বা পত্তর মসজিদ বিদ্যমান। এর অনতিদূরেই জানা কদল নামে শ্রীনগরের চতুর্থ সেতুটি বিদ্যমান। দক্ষিণ তটে জানালা উদ্দীনের কবরের ভগ্নাবশেষ। এ'টি 'বাদশাহ' নামে পরিচিত। বাদশাহঁ ঘাট থেকে অল্প দূরেই জুম্মা মসজিদ। জনা কদল অতিক্রম করে দক্ষিণ তটে 'মহারাজগঞ্জ' নামে বাজার। এর কিছু দূরেই আলী কদল নামক পঞ্চম সেতুটি বর্তমান। আলী কদল নামক সেতুর পরেই বুলবুল লঙ্কর নামক একটি অতি প্রাচীন মসজিদ বিদ্যমান। এর পরে ষষ্ঠ সেতু নয়া কদল বর্তমান। নয়া কদলের অনতিদূরেই দক্ষিণ তটে লচমনজু-কা-ইয়ার-বল নামে একটি ঘাট। এই ঘাটে উঠে সামান্য পথ অগ্রসর হলেই ইদ্‌গা নামে একটি রমণীয় স্থান দৃষ্টিগোচর হয়। ইদ্‌গা দৈর্ঘ্যে ১ মাইল এবং প্রস্থে ১ মাইলের এক চতুর্থাংশ। ইদ্‌গার পূর্ব দিক দিয়ে মার প্রণালী প্রবাহিত। এর উত্তর প্রান্তে কাষ্ঠ নির্মিত আলী মসজিদ বিদ্যমান। এর পর সাফা কদল নামক সপ্তম সেতুটি বিদ্যমান। সেতু অতিক্রম করবার পর বামতটে সাহ নেইমাতুল্লার মসজিদ দৃষ্ট হয়।

কাশ্মীরে বহু সংখ্যক পৌরাণিক স্মৃতি বিজড়িত দ্রষ্টব্যস্থল বিদ্যমান। এদের মধ্যে উল্লেখ্য 'শঙ্করাচার্য্যের টিব্বা'। মুসলমানেরা একে তক্তাহ সলিমান বলে অভিহিত করে থাকে। এই টিব্বা শ্রীনগরের সমতল ভূমি থেকে ১০৩৮ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই শৈল শিখরে একটি মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরে এক শিবলিঙ্গ অধিষ্ঠিত আছেন।

নগরের উত্তর প্রান্তে হরিপর্বত নামে একটি অসংশ্লিষ্ট ক্ষুদ্র পর্বত বিদ্যমান। পর্বতটি উচ্চতায় প্রায় ২৫০ ফিট। এ'টি যে প্রস্তর নির্মিত প্রাকারটির দ্বারা পরিবেষ্টিত তা দৈর্ঘ্যে প্রায় দেড় ক্রোশ, উচ্চতায় ১৮ হাত এবং প্রস্থে ৮ হাতের সমান। এর তিনটি প্রবেশ দ্বার বর্তমান। দক্ষিণ পূর্ব ভাগে অবস্থিত দরজাটির নাম কাচী-দরোয়াজা, পশ্চিমে বাচী দরোয়াজা এবং উত্তর পশ্চিমে সঙ্গীন দরোয়াজা বর্তমান। পর্বতের শীর্ষদেশে একটি প্রস্তর নির্মিত দুর্গ বিদ্যমান।

এখানকার প্রসিদ্ধ হ্রদ হ'ল ডাল হ্রদ। রাজবাটীর সম্মুখে চুটকোল নামক প্রণালী পূর্ব বাহিনী হয়ে বিতস্তা নদীর সঙ্গে এই হ্রদকে সংযুক্ত করেছে। গাত্তকদল নামক সেতু অতিক্রম করলে বাম পাশে সফেদা বৃক্ষের শ্রেণী এবং এক উপবন দৃষ্টিগোচর হয়। এখান থেকে কিছু দূরেই অবস্থিত চেনার বাগ। এর অনতিদূরেই দ্রোগজন্ অর্থাৎ ডাল হ্রদের দ্বার। ডাল হ্রদ সেরগড়ী থেকে আধক্রোশ দূরে অবস্থিত। ডাল হ্রদ দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩ ক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় দেড় ক্রোশ। এর জল অতিশয় স্বচ্ছ এবং স্বাস্থ্যকর। এতে প্রচুর পরিমাণে মাছ পাওয়া যায়। হ্রদের মধ্যে মধ্যে দ্বীপ। দ্বীপে লোকালয় বর্তমান। এখানে পদ্ম পত্র সুলভ। অনেকেই পদ্ম পত্রেই আহার করে থাকে। দ্রোগজন্ থেকে কিছুদূরে অবস্থিত বুদমর্গ নামক ক্ষুদ্র জনপদ। এর অনতিদূরে অবস্থিত ক্রালিয়ার নামক গ্রাম। এখান থেকে অতিক্রম করে গেলে সামনেই যে প্রস্তর নির্মিত সেতু দৃষ্টিগোচর হয় তা নেউইদিয়ার নামে পরিচিত। অদূরেই অবস্থিত সতু নামক বাঁধ। বাঁধটি দৈর্ঘ্যে ২ ক্রোশ এবং প্রস্থে প্রায় ৮ হাত।

ডাল হ্রদে কাশ্মীরের সুবিখ্যাত ভাসমান ক্ষেত্র বর্তমান। এই সব ভাসমান ক্ষেত্রে কৃষকেরা কৃষি কর্মাদি করে থাকে। হ্রদের জলে অসংখ্য জলজ লতা বিদ্যমান। যে স্থানের জল খুব গভীর নয়, সে স্থানের লতাগুলি জলের নীচে দেড়হাত পরিমিত রেখে অবশিষ্ট কেটে দেওয়া হয়। জলের গতি অত্যন্ত মন্দ বলে, লতাগুলি ছিন্নমূল হয়েও অন্যস্থানে যেতে পারে না। একই স্থানে পরস্পরের সঙ্গে সংলগ্ন অবস্থায় অবস্থান করে। কৃষকেরা এর ওপরে ক্রমে ক্রমে ক্ষুদ্র লতা এবং মৃত্তিকা জমাতে থাকে। এইরূপে চার পাঁচটি স্তর জমলেই তা বিলক্ষণ দৃঢ় এবং কৃষিকর্মের উপযোগী হয়ে ওঠে। এইরূপে ভাসমান ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়। যাতে এই রূপ ক্ষেত্র ভেসে যেতে না পারে তজ্জন্য

কয়েকটি লম্বাকৃতির স্থূল কাঠ এর স্থানে দিয়ে মাটিতে পুঁতে রাখা হয়। এই রূপ ভাসমান ক্ষেত্রও অপহৃত হয়। উর্বর ভূমি হলে দুষ্ট লোকে তা অপহরণ করে নিজের ক্ষেত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে দেয়।

হ্রদের অনতিদূরে 'হজরতবাল' নামে একটি গ্রাম অবস্থিত। গ্রামটি হ্রদের পশ্চিম দিকে অবস্থিত। এখানে মুসলমানদের একটি বৃহৎ মসজিদ বিদ্যমান। মসজিদে কাচের আচ্ছাদন বিশিষ্ট একটি রৌপ্য নির্মিত বাক্সে এক গাছি কেশ রক্ষিত আছে। এ'টি হজরত মহম্মদের শ্মশ্রুলোম বলে পরিচিত। বৎসরে এই স্থানে চারটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বাপেক্ষা বৃহৎ মেলা অনুষ্ঠিত হয় শ্রাবণ মাসে। হজরত বালের অনতিদূরেই অবস্থিত 'নসীম বাগ'। নসীম বাগ দৈর্ঘ্যে প্রায় ১ ক্রোশের চতুর্থাংশ এবং প্রস্থে ১ ক্রোশের অষ্টমাংশ। নসীম বাগের সামনে এবং হ্রদের উত্তর প্রান্তের মধ্যস্থলে রূপালংবা রজতদ্বীপ অবস্থিত। 'চার চেনার' নামেও এ'টি পরিচিত। দ্বীপটি জলভাগ থেকে প্রায় দু' হাত পরিমিত উঁচু।

হ্রদের উত্তর প্রান্তে রঘুনাথপুর নামে একটি ক্ষুদ্র পল্লী। এখানে একটি উৎস বিদ্যমান। হ্রদের উত্তর পূর্ব কোণে স্থিত এবং ২৪ হাত প্রশস্ত ও প্রায় আধক্রোশ দীর্ঘ একটি কৃত্রিম প্রণালী দ্বারা সংযুক্ত 'শালামার বাগ' দৈর্ঘ্যে ১১ ১১৮০ হাত পরিমিত, এবং প্রস্থে ৪১৪ হাত নিম্নদেশে, উপরিভাগ ৫৩৪ হাত পরিমিত।

শালামার বাগের নিকটেই অবস্থিত 'নিষাৎ বাগ', এর চারপাশে সফেদা বৃক্ষ শ্রেণী বর্তমান। 'নিষাৎবাগ' প্রায় ১০০০ হাত দীর্ঘ, ৭২০ হাত প্রশস্ত। হ্রদের দক্ষিণ ভাগের মধ্যস্থলে অবস্থিত 'সোনালং' বা 'সুবর্ণ দ্বীপ'। এ'টিও দৈর্ঘ্যে ৮০ হাত, প্রস্থে ৭২ হাত এবং জলের উপরিভাগ থেকে প্রায় দুই হাত উঁচু। উঁচু হ্রদের দক্ষিণ পূর্ব তট থেকে আধক্রোশ দূরে অবস্থিত একটি রমণীয় উদ্যানে একটি চশমা বা উৎস বর্তমান। এ'টি 'চশমাসাহী' নামে পরিচিত। এই উদ্যানের দৈর্ঘ্য ২২২ হাত, প্রস্থ ৮৪ হাত। হ্রদের দক্ষিণে এক অত্যুচ্চ পর্বত-গাত্রে 'পরী মহল' অবস্থিত।

কাশ্মীর কয়েকটি অবিশ্বাস্য নৈসর্গিক ব্যাপারেরও পীঠস্থান। এদের মধ্যে ক্ষীর ভবানী, জটাগঙ্গা, চলৎ শক্তি বিশিষ্ট দ্বীপ, ত্রিসন্ধ্যা, রুদ্রসন্ধ্যা বা পবন সন্ধ্যা, কাঁসরে কুঠ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য।

সায়ের মোয়াজ পাঁই[১২] পরগণায় ক্ষীর ভবানী অবস্থিত। শ্রীনগর থেকে নৌকা পথে ক্ষীর ভবানী প্রায় ৩ ঘণ্টার পথ। এখানে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপের উপকূল সন্নিকটের প্রবেশ দ্বারে একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড বর্তমান। কুণ্ডটি দশ চতুরস হাত পরিমিত এবং তিন হাত গভীর। এর মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র উচ্চাসনে ধ্বজ পতাকা সংস্থাপিত। এ'টিই ক্ষীর ভবানী নামে পরিচিত। ক্ষীর ভবানী হিন্দুদের এক প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। যাত্রীরা ক্ষীর অর্থাৎ পরমান্ন প্রস্তুত করে এই কুণ্ডে নিক্ষেপ করে দেবীর আরাধনা করে থাকে। এই জন্যই এ'টি ক্ষীর ভবানী নামে পরিচিত। এখানকার কুণ্ডের জলের বর্ণ অবিরত পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। কখনও কখনও একই বর্ণ কয়েক দিন পর্যন্ত থাকে। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী, দেবী অপ্রসন্ন হলে কুণ্ডের জল রক্তিমবর্ণ হয়ে যায়, সেই সময়ে রাজ্য মধ্যে দৈব দুর্ঘটনা সমূহ ঘটবার সম্ভাবনা থাকে।

শ্রীনগরের দক্ষিণে ডেঁসু নামক পরগণায় বনহামা নামে এক গ্রাম বর্তমান। এই গ্রামে ৫০ হাত উর্ধ্ব একটি উচ্চ ভূমি আছে। ভূমিটি ঈষৎ ঢালু ও অসমতল। ভূমির নিম্নভাগে ২০ হাত প্রশস্ত একটি নালা আছে। নালাটি সারা বৎসর ধরে শুষ্ক অবস্থায় থাকে। কিন্তু প্রতি বৎসর ভাদ্রমাসের শুক্ল পক্ষের অষ্টমী তিথিতে উচ্চভূমি থেকে জলবিন্দু নিঃসৃত হয়ে নালাটিকে পূর্ণ করে দেয়। এ'টিই জটাগঙ্গা নামে পরিচিত।

ডেঁসু পরগণার নিকটস্থ মাচিহামা নামক পরগণায় একটি বৃহৎ জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়। এই জলাশয় 'হাকের সর' নামে পরিচিত। এই জলাশয়ে দ্বীপের অনুরূপ কয়েকটি ভূমিখণ্ড রয়েছে। ভূমি খণ্ড গুলি খুব দৃঢ়। এখানে বৃহদাকৃতির বৃক্ষাদিও বর্তমান। অথচ প্রবল বাতাসে এই সমুদয় ভূখণ্ড ইতস্তত চলতে থাকে।

ত্রিং নামক পরগণায় একটি সমকোণ বিশিষ্ট কুণ্ড বর্তমান। কুণ্ডটি 'সুন্দবেরারি' নামে পরিচিত। এ'টি হিন্দুদের নিকট তীর্থক্ষেত্র স্বরূপ। বৈশাখ মাসের মধ্য থেকে জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যকাল পর্যন্ত প্রত্যহ দিবাভাগে এই কুণ্ডের সপ্তস্থান থেকে জল বিন্দু তিনবার মাত্র নিঃসৃত হয়ে কুণ্ডকে পরিপূর্ণ করে এবং কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর পুনরায় ঐ জলরাশি অন্তর্হিত হয়ে যায়। এইরূপে তিনবার আবির্ভূত ও অন্তর্হিত হয় বলে এ'টি 'ত্রিসন্ধ্যা' নামে পরিচিত।

সাহাবাদ পরগণায় একটি ক্ষুদ্র কুণ্ড বর্তমান আছে। কুণ্ডটি সাধারণত শুষ্কই থাকে। কিন্তু সময়ে সময়ে অকস্মাৎ কুণ্ডে জল দেখা যায়। এই জল কিয়ৎক্ষণ অবস্থানের পর পুনরায় অন্তর্হিত হয়ে যায়। কখনও এইরূপ কয়েক দিন মাত্র, কখনও আবার কয়েক মাস পর্যন্ত চলতে থাকে। এ'টি রুদ্র সন্ধ্যা বা পবন সন্ধ্যা নামে পরিচিত। এ'টি হিন্দুদের একটি তীর্থ ক্ষেত্র।

সাহাবাদ পরগণায় একটি বৃহৎ গিরিগুহা বর্তমান। গুহাটির নাম মণ্ডা। এর অভ্যন্তরে প্রবেশ করে অভ্যন্তরস্থ প্রস্তর ভক্ষণ করলে তা নাকি উপাদেয় লাগত। বরফের ন্যায় শীতল বলে অনুভূত হ'ত। কিন্তু ভক্ষণ করতে করতে গুহার বাইরে আসলে আর তা শীতল এবং উপাদেয় বলে বোধ হ'ত না। বর্তমানে একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড পতিত হওয়ায় গুহার প্রবেশদ্বার সম্পূর্ণরূপে রুদ্ধ হয়ে গেছে। এ'টিই এখানে প্রস্তর ভক্ষণ গৃহ নামে পরিচিত।

দেবসর নামক পরগণায় বাসুকি নাগ নামে একটি কুণ্ড বিদ্যমান আছে। বসন্ত কাল থেকে শুরু করে শস্য পরিপক্ক হওয়ার সময় পর্যন্ত কুণ্ডটি জলে পূর্ণ থাকে। এই সময়ের পরে কুণ্ডটি একেবারে শুষ্ক হয়ে যায়। এক বিন্দুও আর জল থাকে না। অতঃপর এই কুণ্ডের জল পীরপঞ্জাল নামক পর্বতশ্রেণীর বিপরীত পার্শ্বস্থ গোলাবগড় নামক কুণ্ডটিকে পরিপূর্ণ করে। এখানে ৬ মাস থাকবার পর এই জল রাশি পুনরায় পূর্বের কুণ্ডে এসে জমা হয়। অথচ উল্লেখ যোগ্য যে, এই দুই কুণ্ডের দূরত্ব কম পক্ষে ১০ ক্রোশ। শুধু তাই নয়, উভয়ের মধ্যে বহু নদী, লোকালয়, গিরি ইত্যাদিও বিদ্যমান।

লার পরগণায় 'হলদর' নামে পরিচিত একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ড বর্তমান আছে। এই প্রস্তরখণ্ডের নিকট 'হলদর জল দেও' বলে কয়েকবার উচ্চৈস্বরে চিৎকার করলেই প্রস্তরখণ্ডের গা থেকে বিন্দু বিন্দু জল নিঃসৃত হতে থাকে। শ্রীনগর পরিত্যাগ করে মুন্সিবাগ অতিক্রমের পর উজানে গেলে কয়েকটি বাঁক দৃষ্টি গোচর হয়। কোনো উচ্চস্থান থেকে এই বাঁকগুলিকে দেখলে মনে হয় যেন দোড়দার কলকা। এখানে বিতস্তা নদী এমন বক্রভাবে প্রবাহিত হয়েছে তদুপরি শঙ্করাচার্যের টিব্বাটি এমন ভাবে অবস্থিত যে কয়েক ক্রোশ পর্যন্ত যতই অগ্রসর হওয়া যাক তথাপি টিব্বাটিকে সেই দিকেই যেন সম্মুখে অবস্থিত বলে প্রতীতি হয়।

কিয়দ্দূর গমন করলে 'রামমুন্সি বাগ' নামে একটি উপবন দৃষ্টিগোচর হয়।

এই উপবনে প্রভূত সেউ, নাসপাতি, তুঁত, আঙ্গুর প্রভৃতি বৃক্ষরাজি বর্তমান।

পাণ্ড্রেতন নামক স্থানটিতে পূর্বে একটি অত্যুৎকৃষ্ট মন্দির বর্তমান ছিল। মন্দিরে বুদ্ধদেবের একটি দন্ত রক্ষিত ছিল। বর্তমানে এখানে দেবালয় এবং গৃহাদির কেবলমাত্র ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এখানে অবস্থিত একটি কুণ্ডের মধ্যে প্রস্তর নির্মিত এক অতি প্রাচীন দেবালয় দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

শ্রীনগর থেকে জলপথে ৪ ক্রোশ দূরে বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত পাম্পুর। পূর্বে এ'টি পদ্মপুর নামে পরিচিত ছিল। এখানে জাফরানের ক্ষেত্র বর্তমান।

পাম্পুরের উত্তর পূর্ব ভাগে জলপথে প্রায় দেড় ক্রোশ দূরে এক ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান। এখানে চারটি উৎস দৃষ্ট হয়। প্রথম তিনটি উৎস ফুকনাগ এবং শেষেরটি 'কালীশনাগ' নামে পরিচিত। প্রথম তিনটি উৎসের জল গন্ধক বিশিষ্ট। শেষেরটির জল ধাতু মিশ্রিত নয়।

শ্রীনগর থেকে স্থল পথে ১৭ মাইল দূরে কাশ্মীরের এক সময়ের রাজধানী অবন্তীপুর অবস্থিত।

কিয়দ্দূর গমন করলে বামতটে একটি উচ্চগিরি লক্ষিত হয়ে থাকে। গিরির শিখরদেশে একটি প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরটি সমাথং নামে এখানে পরিচিত।

অবন্তীপুর থেকে ৪ ক্রোশ দূরে অবস্থিত বিজ্‌বেহাড়া। এখানে মহারাজ গোলাপ সিংহ কর্তৃক একটি মন্দির নির্মিত হয়েছে। বিজবেহাড়া থেকে ৪ মাইল দূরে অবস্থিত খান্‌বল একটি ক্ষুদ্র জনপদ। বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তটে অবস্থিত। খান্‌বল থেকে ১ মাইল দূরবর্তী অনন্তনাগ বা ইসলামাবাদ। এ'টি অতিশয় প্রাচীন জনপদ। এখানে কয়েকটি উৎস বিদ্যমান। উৎসগুলির মধ্যে 'অনন্তনাগ' নামক উৎসটি সর্বশ্রেষ্ঠ। অনন্তনাগ থেকে ৫ মাইল দূরে উত্তরে অবস্থিত মার্তণ্ড। এ'টি হিন্দুদের একটি উল্লেখ-যোগ্য তীর্থ ক্ষেত্র। এখানে কাশ্মীরী হিন্দু এবং আগন্তুক হিন্দু সকলেই পিতৃলোকের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ডদান করে থাকে। মার্তণ্ড থেকে মাত্র দেড় মাইল দূরে অবস্থিত রায়ন নামক ক্ষুদ্র পল্লী। এখানেও একটি রমণীয় উৎস বিদ্যমান। হিন্দুদের নিকট এ'টি তীর্থ রূপে পরিচিত। রায়নের অনতিদূরে হিন্দুদের অপর প্রসিদ্ধ তীর্থ ভূমজুগুহা বিদ্যমান। এখানে বৃহৎ এবং

কয়েকটি ক্ষুদ্রাকৃতির গিরিগুহা বর্তমান। বৃহৎ গুহাদ্বয় বেশ বৈচিত্র্যপূর্ণ। এদের একটি 'কালদেবের গুফা' নামে পরিচিত। কালদেবের গুফা ঊর্দ্ধে ৬॥০ ফিট এবং প্রস্থে ৩॥০ ফিট। অনেকে বিশ্বাস করে থাকে যে গুহাটি নাকি অন্তহীন। কালদেবের গুফার কাছেই অপর একটি গুহা বিদ্যমান। এর প্রবেশদ্বার প্রায় ১০ ফিট উচ্চ, ১০ ফিট প্রশস্ত এবং অপূব খিলান বিশিষ্ট। গুহাটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮ ফিট, প্রস্থে ২৭ ফিট এবং উচ্চতায় ১৩ ফিট। এর মধ্যভাগে একটি দেবালয় বর্তমান।

অনন্তনাগের পূব ভাগে ছয় মাইল দূরে অবস্থিত আচ্ছাবল নামক উৎসটি। উৎসটি এক ক্রীড়া উপবনের প্রান্তে অবস্থিত। উপবনটি সম্রাট জাহাঙ্গীর কর্তৃক নির্মিত। উপবনে চেনার এবং অন্যান্য বহু ফলের বৃক্ষ বর্তমান।

আচ্ছাবলের দক্ষিণ পূব ভাগে আট মাইল দূরে কুক্কুড়নাগ নামক উৎসটি বিদ্যমান। কুক্কুড়নাগ থেকে ৭॥০ মাইল দূরে অবস্থিত বৈরনাগও একটি রমণীয় উৎস। এই জলাশয় রূপী উৎসের জলাধার অষ্টকোণ বিশিষ্ট। এ'টি প্রায় ১১ ফিট প্রশস্ত এবং গভীরতায় ৫০ ফিট। এই জলাশয়ে বহু মাছ দৃষ্ট হয়। কিন্তু এদের বধ নিষিদ্ধ।

পীরপঞ্জাল নামক পর্বতের শিখরদেশে কোঁশানাগ নামক পার্বত্য হ্রদটি অবস্থিত। সমুদ্রতল থেকে এর উচ্চতা ১৩০০ ফিট। হ্রদটি দৈঘ্যে আট মাইল এবং প্রস্থে দৈর্ঘ্যের অর্ধাপেক্ষা কিঞ্চিৎ অধিক। কোঁশানাগের জলে যে কয়েকটি জল প্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে হরবল বা হরীবল তাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

হিন্দুদের অতি প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন তীর্থক্ষেত্র রূপে পরিচিত অমরনাথ। কাশ্মীরের পূর্ব প্রান্তে এক বিজন প্রদেশে অবস্থিত একটি গুহার মধ্যে অমরনাথ লিঙ্গ বর্তমান। এ'টি মহাদেবের স্বয়ম্ভু লিঙ্গ নামে পরিচিত। প্রতি বৎসর ভাদ্র মাসের রাখী পূর্ণিমার দিন এই তুষার লিঙ্গ দর্শন করা যায়। অনন্তনাগ থেকে অমরনাথের দূরত্ব ২৮ ক্রোশ। অমরনাথ যাবার কালে পথিমধ্যে পঞ্চতরণী নামে পাঁচটি শাখা বিশিষ্ট একটি নির্ঝরিণী অতিক্রম করতে হয়। এ'টি অমরনাথের ১ ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত। মহাদেবের লিঙ্গ যে গুহাটিতে আবির্ভূত হন, তা বেশ বড়। গুহার প্রবেশ দ্বার ৫০ ফিট প্রশস্ত। গুহাভ্যন্তর অতিশয় শীতল। অবিরত ছাদ থেকে এখানে জলবিন্দু পড়ছে। মহাদেবের হিমানী দ্বারা সৃষ্ট লিঙ্গটি স্ফটিকের ন্যায় দৃষ্ট হয়। লিঙ্গটি প্রতি পূর্ণিমায় পূর্ণতা প্রাপ্ত

হয়। পুনরায় প্রতিপদ থেকে তা হ্রাস পেতে থাকে। এই রূপে অমাবস্যার সময় লিঙ্গটি সম্পূর্ণরূপে অন্তর্হিত হয়ে যায়। লিঙ্গ ব্যতীত এখানে প্রস্তর নির্মিত বৃষ এবং অন্যান্য দেবদেবীর ভগ্ন মূর্তিও বর্তমান।

শ্রীনগর থেকে নৌকা যোগে যাত্রা করলে শেষ সেতু পড়ে সাফা কদল। সাফা কদল অতিক্রমের পর বামদিকে দুধগঙ্গা নামক নদীকে প্রবাহিত হতে দেখা যায়।

ক্ষীর ভবানী নামক তীর্থের পথে নদী গর্ভে একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ লক্ষিত হয়ে থাকে, দ্বীপটির উপরিভাগ প্রস্তর নির্মিত। এখানে একটি চেনার বৃক্ষ বর্তমান। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এই চেনার বৃক্ষটি নাকি বর্দ্ধিত হয় না। বৃক্ষতলে একটি শিবলিঙ্গ স্থাপিত আছে। হিন্দুদের কাছে এ'টি প্রয়াগ তীর্থ নামে পরিচিত।

কাশ্মীরস্থিত মানসবল হ্রদটি দৈর্ঘ্যে দেড় ক্রোশ এবং প্রস্থে অর্ধ ক্রোশ। হ্রদতটে মানসবল নামক গ্রাম। এখান থেকে কিছুদূরেই বাদশাহবাগের ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান। দক্ষিণ পাশে অবস্থিত পর্ব্বতশ্রেণী। এ'টির অত্যুচ্চ শৃঙ্গটির নাম আথুং। শৃঙ্গটি ৬২৯০ ফিট উচ্চ। এই পর্বতমালার নিম্নদেশে কুণ্ডবল নামে একটি গ্রাম অবস্থিত।

শ্রীনগরস্থিত মানসবলের জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। শ্রীনগরের অপর কোন স্থান মানসবলের মত স্বাস্থ্যকর নয়।

শ্রীনগরস্থিত হ্রদগুলির মধ্যে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ হ'ল উলার হ্রদ। শ্রীনগর থেকে এর জলপথের দূরত্ব প্রায় ১০ ঘণ্টার পথ। হ্রদটি দৈর্ঘে ৬ক্রোশ এবং প্রস্থে ৫ ক্রোশ। হ্রদটি ১৬ ফিট পর্যন্ত গভীর। হ্রদটির চারপাশে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লী বিদ্যমান। এখানকার অধিবাসীরা হ্রদ থেকে মৎস্য শিকার করে এবং পানিফল, মধু প্রভৃতি সংগ্রহ করে জীবিকা নির্বাহ করে।

শ্রীনগরস্থিত লঙ্কা দ্বীপটি জানালুবউদ্দীন কর্তৃক নির্মিত। দ্বীপটি দৈর্ঘ্যে প্রায় ২০০ হাত এবং প্রস্থ ১৫০ হাতের সমান। দ্বীপটিতে বহু প্রাচীন কীর্তির ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

লঙ্কাদ্বীপের বিপরীত ভাগে শকর উদ্দীন নামক পাহাড় অবস্থিত। পাহাড়টি উচ্চতায় ৭০০ ফিট। শৈল শিখরে শকরউদ্দীন নামক এক ফকিরের একটি মসজিদ বর্তমান। হ্রদের দক্ষিণ পশ্চিম তটে সোপুর নামক জনপদটি

বর্তমান। জনপদটি বিতস্তা নদীর উভয় তীরেই প্রসারিত। বিতস্তা নদীর দক্ষিণ তটে প্রস্তর নির্মিত একটি ক্ষুদ্র দুর্গ। দুর্গের অনতিদূরে 'স্বর্ণচূড়' নামক মসজিদ।

পোড়ানদী যেখানে বিতস্তার সঙ্গে মিলিত হয়েছে, সেই সংযোগ স্থলের দক্ষিণ তটে অবস্থিত দরগাও নামক পল্লীটি। বারমুল্লার নিকটবর্তী স্থানটিতে একটি বৃহদাকৃতির শিবলিঙ্গ বর্তমান। পাণ্ডবদের দ্বারা স্থাপিত বলে বলা হয়ে থাকে। বারমুলাতেই বিতস্তা নদী সর্বাপেক্ষা স্ফীতাকারে প্রবাহিত। নদীর দক্ষিণ তটে একটি অত্যুচ্চ পর্বতের তলদেশে বারমুলা নামক জনপদটি বর্তমান। বারমুলার প্রকৃত নাম বরাহমুলা। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী এখানে নাকি বরাহ অবতারের আবির্ভাব ঘটেছিল। এখানে অবস্থিত একটি পর্বতগাত্রে বরাহের চিহ্ন লক্ষিত হয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে সীতাকুণ্ড, রামকুণ্ড, সূর্য কুণ্ড প্রভৃতি অনেকগুলি কুণ্ড এবং তীর্থ বিদ্যমান।

কাশ্মীরস্থিত পর্ব্বতগুলির অধিকাংশই সুবিস্তৃত। পর্ব্বতের শিখরগুলি সমভূমি। এই সমুদয় অধিত্যকা 'মার্গ' বা ক্ষেত্র নামে পরিচিত। শ্রাবণ ও ভাদ্রমাসে মার্গ গুলি নানাবিধ পুষ্পে ভরে ওঠে। গুলমার্গ এখানকার সর্বশ্রেষ্ঠ 'মার্গ' বলে পরিচিত। গুলমার্গ শ্রীনগরের পশ্চিমদিকে অবস্থিত। এ'টি সমতল ভূমি থেকে ৩০০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। 'গুলমার্গ'[১৩] দৈর্ঘ্যে ৩ মাইল প্রস্থে অবশ্য এর সকল স্থান সমান নয়। এ'টি চতুর্দিকে পর্বতশ্রেণী দ্বারা পরিবেষ্টিত। মার্গের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত, নানাবিধ পুষ্পসম্ভারে পরিপূর্ণ বলে এ'টি গুলমার্গ নামে পরিচিত। এখানে সর্বদাই অতিশয় বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। এখানকার জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। গুলমার্গের সন্নিহিত স্থান সমূহে অনেক গুজ্জর[১৪] এবং পহালের[১৫] বাস।

এখানকার অপর একটি মার্গের নাম কিল্লন। এ'টি গুলমার্গ থেকে ৩ মাইল দূরে অবস্থিত। উচ্চতায় এ'টি সহস্র ফিটের অধিক। গুলমার্গ অপেক্ষা আয়তনে বৃহৎ। এই মার্গটিতে অনেকগুলি উৎস বর্তমান। এর চতুষ্পার্শ্ব তুষারমণ্ডিত পীরপঞ্জাল দ্বারা পরিবেষ্টিত। পর্বতের স্থানে স্থানে গ্লেসিয়ার দৃষ্ট হয়ে থাকে।

এখানকার লোলাব একটি উত্তম পরগণা। এ'টি উত্তর পশ্চিম প্রান্তভাগে স্থিত। এখানে তুঁত, বাদাম, আখরোট, চেনার প্রভৃতি বহুবৃক্ষ বিদ্যমান। এখানকার জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

শ্রীনগরের পূর্ব ভাগে অবস্থিত লার পরগণার উত্তর প্রান্তে সিন্দ্ উপত্যকা অবস্থিত। উপত্যকাটি বেশ দীর্ঘ। এর মধ্যদেশ দিয়ে সিন্দ্ নদী প্রবাহিত বলে এর নামকরণ হয়েছে সিন্দ্ উপত্যকা। সিন্দ্ উপত্যকা শ্রীনগর থেকে ৭ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। উপত্যকাটির উভয় পার্শ্বেই অভ্রভেদী পর্বতশ্রেণী দণ্ডায়মান। এখানকার ভূমি অতিশয় উর্বর। এখানে আঙ্গুর, পিচ, আখরোট, সেউ, নাসপাতি প্রভৃতি বহুল পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানকার জলবায়ু অতি উত্তম। উপত্যকার উত্তর পশ্চিম প্রান্তে একটি উৎস দৃষ্ট হয়ে থাকে। এই উৎসটি 'নাগবল' নামে পরিচিত। 'নাগবলে'র সামনেই 'গঙ্গাজল' নামে একটি পার্বত্য হ্রদ বিরাজমান। এ'টি 'হরমুখ' নামক পর্বতের ১৬,৯০০ ফিট উচ্চতায় অবস্থিত। হ্রদটি দৈর্ঘে দেড় মাইল এবং প্রস্থে ৫০০ হাতের সমান। এ'টি হিন্দুদের একটি প্রসিদ্ধ তীর্থক্ষেত্র। প্রতি ভাদ্রমাসে এখানে বিপুল সমারোহ হয়ে থাকে।

শাল প্রস্তুতকারী তন্তুবায়েরা এখানে 'শালবাফ' নামে পরিচিত এবং তাদের অধীন কর্মচারীরা 'শাকরেত' নামে অভিহিত হয়ে থাকে। শাল, জোড়া, জামেয়ার, গলাবন্ধ, আলোয়ান প্রভৃতি দ্রব্যাদি এখানে 'পশমিনা' নামে পরিচিত। কাশ্মীরী ছাগলের লোম থেকে 'পশমিনা' হয় না, হয় লুই। শাল প্রভৃতি প্রস্তুতের জন্য লাডাক্ তিব্বত প্রভৃতি স্থান থেকে এখানে লোম আনীত হয়।

পশম সাধারণত মেয়েরাই কেটে থাকে, বিশেষতঃ বালিকারাই এই কাজ করে থাকে। কার্তিক মাসে শীতের প্রাক্কালে ছাগল অথবা মেষের লোম কাটা হয়। ক্রেতাদের রুচি অনুযায়ী যারা নিত্য নতুন ডিজাইন আবিষ্কার করে থাকে, তাদের এখানে 'নকাশ' বলে অভিহিত করা হয়। যে তন্তু দ্বারা শাল প্রস্তুত হয়, তাকে বলে 'কানি' বা 'কানিকার'। ছুঁচের কাজ 'আমলি' বা 'আমরিকাল' নামে পরিচিত।

সিন্দ্ উপত্যকার উত্তর পূর্ব প্রান্তে অপর একটি মার্গ অবস্থিত। এ'টি 'সোনামার্গ' নামে পরিচিত।

মেষ এবং ছাগলের স্থূল লোমের দ্বারা 'পট্টু' নামে এক প্রকার বস্ত্র প্রস্তুত হয়। এটি পশমিনা অপেক্ষা নিকৃষ্ট হলেও সুন্দর। অধিকাংশ কাশ্মীরীই এই পট্টু দ্বারা তাদের পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে থাকে। কোন কোন জীবের সলোম চর্ম

দ্বারা এখানে 'পোস্তিন' প্রস্তুত হয়ে থাকে। পোস্তিন নানা প্রকারের হয় ; যেমন নীলজু, সোমুর, কলহুন্, উৎগোগ্র্ প্রভৃতি। নীলজু এক প্রকার পক্ষীর নাম। এ'টি জলচর পক্ষী। কাশ্মীরীরা এদের মাংস ভক্ষণ করে থাকে। এই পক্ষীর মাথা ও গ্রীবার চর্মে যে পোস্তিন প্রস্তুত হয় তা 'নীলজু' নামে খ্যাত।

এক প্রকার সুন্দর লোম বিশিষ্ট প্রাণীর চর্ম থেকে প্রস্তুত হয় সোমুর। এ'টি ইয়র্কন্দ প্রভৃতি স্থান থেকে আনীত হয়। কলহুনের অপর নাম উদ্রু বা উদড়। ইঁদুর জাতীয় প্রাণীর চামড়া থেকে উৎগোগ্র্ প্রস্তুত হয়।

দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন

বাংলা সাহিত্যে ভ্রমণবিষয়ক গ্রন্থাদির মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য সোমড়া নিবাসী দুর্গাচরণ রায় রচিত 'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন'। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, ইন্দ্র প্রমুখ দেবগণের গঙ্গাস্রোত অনুসরণ করে উভয় তীরস্থ স্থান সমূহে উপস্থিত হওয়া এবং প্রসঙ্গক্রমে সেইসকল স্থানের দ্রষ্টব্য বস্তু, উৎপন্ন দ্রব্যাদি প্রভৃতির বর্ণনা প্রদত্ত হয়েছে গ্রন্থটিতে। কাহিনীর উপস্থাপনায়, বর্ণনার চমৎকারীত্বে নানাবিধ জ্ঞাতব্য বিষয়ের অবতারণায় গ্রন্থটি পরম উপাদেয় ভ্রমণ কাহিনীতে পরিণত হয়েছে।

'দেবগণের মর্ত্ত্যে আগমন' প্রথমে দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ সম্পাদিত কল্পদ্রুম পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল ১২৮৭ সাল থেকে।

হরিদ্বারের দু'দিকেই পর্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়ে গঙ্গা তিনটি ধারায় প্রবাহিত। অতঃপর ঐ তিন ধারা এসে মিলেছে কন্খলে। পর্বতগুলিতে অনেকগুলি গুহা দেখা যায়। গুহাগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি আবার মনুষ্যবাসের উপযোগী। সাধু-সন্ন্যাসীরা এই সকল গুহায় বাস করেন। হরিদ্বারে সাধু-সন্ন্যাসীদের অনেকগুলি মঠ বর্তমান।

হরিদ্বার পার্বত্যদেশ বলে শীতকালে এখানে ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। প্রতি দ্বাদশ বৎসর অন্তর হরিদ্বারে 'কুম্ভমেলা' নামে এক প্রসিদ্ধ মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে

থাকে। এই সময়ে বহু ব্যক্তি মহাবিষুব সংক্রান্তির দিন এখানে কুম্ভযোগে স্নান করে থাকে। এই মেলা উপলক্ষে ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে শৈব, শাক্ত, নাগা, সন্ন্যাসী, দণ্ডী, মোহান্ত, পরমহংস, অবধূত, রামায়তগণ প্রভৃতির উপস্থিতি ঘটে। বাস্তবিক মেলার সময়ে হরিদ্বারে সমারোহের আর যেন অন্ত থাকে না।

গঙ্গা যে স্থানে পর্বতে ভেদ করে প্রথমে পতিত হয়েছে তা পরিচিত 'ব্রহ্মকুণ্ড' নামে। যে স্থানে 'ব্রহ্মকুণ্ড' অবস্থিত, তার প্রকৃত নাম মায়াপুরী। মায়াপুরীর পূর্বে অবস্থিত নীল পর্বত, পশ্চিমে বিল্লোকেশ্বর, দক্ষিণে পিছোড়নাথ এবং উত্তরে অবস্থিত ঝোলা। যাত্রীরা হরিদ্বারে উপস্থিত হয়ে ব্রহ্মকুণ্ডে স্নানাদি করে থাকে। ব্রহ্মকুণ্ডের নিকটবর্তী মন্দিরে বিষ্ণু পদচিহ্ন এবং গঙ্গা দেবীর প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই বিষ্ণুপদ চিহ্নে গোদান এবং অন্নদান করলে বিষ্ণুলোক প্রাপ্তি ঘটে।

হরিদ্বারের অর্ধ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত কুশাবর্তের ঘাট। কুশাবর্তের ঘাটে তীর্থযাত্রীরা আপন আপন পিতৃপুরুষগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে থাকে। কুশাবর্তে অসংখ্য মৎস্য বলে কেউ এই সব মৎস্যের প্রতি অত্যাচার করেনা। বরং যাত্রীরা মৎস্যদের চিঁড়া, মুড়ি প্রভৃতি নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য দেয়। কুশাবর্তের পূর্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত দক্ষ প্রজাপতির গৃহ। এখানে 'দক্ষেশ্বর' নামক শিবমূর্তি বর্তমান। দক্ষ প্রজাপতির গৃহের নিকটেই অবস্থিত সীতাকুণ্ড। প্রচলিত সংস্কার এই যে এই কুণ্ডে সাত রবিবার যে স্ত্রীলোক স্নান করে সে সতীর ন্যায় সৌভাগ্যবতী হয়ে শিবলোক প্রাপ্ত হয়।

নারায়ণ শিলা থেকে এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত 'কঙ্খল'। হরিদ্বারের এক ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত 'ভীমগদা'। কথিত আছে, স্বর্গারোহণ কালে ভীম তাঁর গদা এইস্থানে ত্যাগ করে গিয়েছিলেন। এখানে গদার আকৃতিবিশিষ্ট প্রকাণ্ড এক শিলাখণ্ড বর্তমান। একেই ভীমগদা রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

ভীমগদার পূর্ব দক্ষিণ কোণে অবস্থিত সূর্যকুণ্ডের দুই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত সপ্তস্রোত॥ সপ্তধারা॥ আবার সপ্তস্রোতের নয় ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত হৃষীকেশ। এখানে সপ্তর্ষিমণ্ডলের তপস্যার স্থান বিদ্যমান। হৃষীকেশের তিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত লক্ষ্মণ ঝোলা। লক্ষ্মণ ঝোলার নিকটস্থ গঙ্গার উপরিস্থিত সেতু অতিক্রম করে বদরিকাশ্রমে যেতে হয়।

নারায়ণ শিলার দুই ক্রোশ পূর্বে অবস্থিত নীল পর্বত। এখানে নীলধারা নামক নদী প্রবাহিত। নীলধারা নদীর জলের বর্ণ নীল। নীলধারা নদীর ঘাট পরিচিত 'নীলধারার ঘাট' নামে। নীলধারার ঘাটে গৌরীশঙ্কর এবং বিল্লাকেশ্বর নামে দু'টি শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। এখান থেকে এক ক্রোশ পশ্চিমে বিল্লোকেশ্বর নামক অপর একটি মহাদেব মূর্তি দৃষ্ট হয়। এতদ্ব্যতীত নারায়ণ শিলার বারক্রোশ দক্ষিণে পিছোড়নাথ নামে এক শিবলিঙ্গ বর্তমান।

হরিদ্বার থেকে কানপুর পর্যন্ত একটি খাল বর্তমান। এ'টি পরিচিত 'কাটলি-খাঁর খাল' নামে।

দিল্লীতে সকল প্রকার গাড়ীই পরিচিত 'বগী' নামে। এখানে বহু মন্দির মসজিদ এবং গীর্জা বর্তমান। দিল্লীতে টিলপত ও ভাগবত নামে দু' খণ্ড জমি বর্তমান। কথিত আছে যে এই দুই জমি খণ্ড রাজা ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক পঞ্চপাণ্ডবকে প্রদত্ত হয়েছিল। যুধিষ্ঠির যে ঘাটে অশ্বমেধ যজ্ঞের হোম করেছিলেন সেই আগম যোড়ের ঘাটটিও এখানে বর্তমান। দিল্লীতে হুমায়ুনের মসজিদ, শের শাহের রাজবাটী প্রভৃতিও বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত শেরশাহের নামাঙ্কিত সিয়ারগড় বা ইন্দ্রপতও এখানে দৃষ্ট হয়। এই কেল্লার চারদিকে গড়। এ'টি যমুনানদীর সঙ্গে সংলগ্ন। কেল্লাটির চারটি তোরণ বর্তমান।

দিল্লীস্থিত 'লালকোট' দুর্গটি দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল কর্তৃক নির্মিত। লালকোটের পরিধি প্রায় আড়াই মাইল। এর প্রাচীর ৬০ ফিট উচ্চ। এক সময়ে চতুর্দিক গড় দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। কিন্তু বর্তমানে এর তিন দিকের গড় মাত্র অবশিষ্ট। দক্ষিণ দিকের গড়টি বুজে গেছে। লালকোটের অনেকগুলি তোরণ বর্তমান। এর পশ্চিম দিকস্থিত গেটটি, 'রণজিত গেট' নামে পরিচিত। দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পুত্র তৃতীয় অনঙ্গ পালের সময় মহম্মদ ঘোরী দিল্লী অধিকার করেন। আক্রমণ ভয়ে রাজা সপরিবারে লালকোট দুর্গে আশ্রয় নিয়েছিলেন। তাই একে লোকে কেল্লা রায় পৃথুরাজের বলে থাকে। কেল্লার যে গেট দিয়ে মুসলমানগণ প্রবেশ করেছিল তা গিজনিগেট নামে পরিচিত। রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল কৃত 'অনঙ্গ পাল' দীঘিটির দৈর্ঘ্য ১৬৯ ফিট এবং গভীরতায় ১৫২ ফিট।

দিল্লীর 'ভূত খানা' নারায়ণ, ঐরাবতে আসীন দেবরাজ ইন্দ্র, হংস পৃষ্ঠে আসীন ব্রহ্মা এবং বৃষের পৃষ্ঠে আসীন নন্দসহ মহাদেবের মূর্তি বর্তমান। এখানকার কুতুব ইসলামের মসজিদটিও বিশেষ প্রসিদ্ধ। দিল্লীস্থিত কুতুব মিনারটিও উল্লেখযোগ্য। মিনারটি উচ্চতায় ১৫২ হাত এবং এর পরিধি প্রায় ৯৮ হাত। মিনারে আরোহণের সিঁড়ির সংখ্যা ৩৭৬। এর ওপর থেকে যমুনা নদীকে খুব সূক্ষ্ম দেখা যায় এবং মানুষও অত্যন্ত ক্ষুদ্র রূপে প্রতিভাত হয়ে থাকে। কুতুবমিনারের নিকটেই একটি অসমাপ্ত মিনার বিদ্যমান। মিনারের দক্ষিণ পশ্চিমদিকে অবস্থিত একটি কূপ এবং কবর। এছাড়া কিছু ধ্বংসাবশেষ জমিও বিদ্যমান। কূপটি দ্বিতীয় অনঙ্গ পাল কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল। কবরটি আদম খাঁ নামক এক ব্যক্তির। এই স্থানে সম্রাট হুমায়ুনের কবরও বর্তমান।

দিল্লীস্থিত 'জাহান পান্না' বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। এখানে বাহান্নটি গেট এবং সাতটি কেল্লা বর্তমান। এই জন্য এ'টি পরিচিত 'সাত কেল্লা দেওয়ান দরজা' নামে। দিল্লীতে সম্রাট সাজাহানের কন্যা জাহানারার সমাধিও বিদ্যমান।

এখানে একটি বৃহৎ কূপ দৃষ্ট হয়। এ'টি পরিচিত নিজাম উদ্দীনের কূপ নামে। প্রতি বৎসর এখানে একটি মেলা হয়ে থাকে। সেই সময়ে যাত্রীরা এই কূপের জলে স্নান করে থাকে।

ফিরোজ শাহ কৃত ফিরোজাবাদ নামক সহরে কুড়িটি রাজ বাটী, দশটি মনুমেণ্ট, পাঁচটি কবর, এতদ্ব্যতীত কলেজ, হাসপাতাল ইত্যাদি বর্তমান। ফিরোজা বাদে 'ফিরোজ শাহের ছড়ি' নামে পরিচিত একটি অত্যুচ্চ পিলার বিদ্যমান। এ'টি পাঁচ ক্রোশ দূর থেকে দৃষ্ট হয়ে থাকে।

শেরশাহের পুত্র সলিমান কর্তৃক নির্মিত সাতপুলার বাঁধও অন্যতম প্রসিদ্ধ বস্তু। দিল্লীস্থিত হুমায়ুন বাদশাহের 'টুম্ব' একটি আশ্চর্য মসজিদ। এ'টি বৃহদাকৃতির একটি মসজিদ। এখানে হুমায়ুনের বেগম হামিদা ভানু এবং দাদার কবর বর্তমান। এই সকল কবর স্থানের চতুর্দিকে রমণীয় উদ্যান অবস্থিত।

সাজেহানাবাদে বাজার, হাট, বসতি বর্তমান। এর চতুর্দিকে প্রাচীর। এর ভেতরে প্রবেশ করবার জন্য অনেকগুলি গেট আছে। গেটগুলি কাশ্মীর, কাবুল, লাহোর, আজমীর, দিল্লী, রাজঘাট, কলকাতা প্রভৃতি নামে পরিচিত। দিল্লীর জুম্মা মসজিদও খুব বৃহদাকৃতির এবং বেশ প্রসিদ্ধ। মসজিদটি মক্কার

দিকে মুখ করে স্থাপিত। এ'টি দৈর্ঘ্যে ১০০ ফিট এবং প্রস্থে ১২০ ফিট। এর শীর্ষে তিনটি গিলটি করা লাল ও কৃষ্ণবর্ণের প্রস্তর সুসজ্জিত স্তম্ভ বিদ্যমান। জুম্মা মসজিদ শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত।

জুম্মা মসজিদের নিকটেই সম্রাট সাজাহানের রাজবাটী এবং কেল্লা। কেল্লার প্রাচীরটি রক্ত বর্ণের এবং এ'টি বিস্তৃতিতে আড়াই মাইল। কেল্লার অভ্যন্তরে নিয়ে যাবার জন্য সম্রাট যে খাল খনন করে ছিলেন এখনও তা বর্তমান। রাজবাটীর প্রবেশ মুখে নহবৎ খানা এবং কিছু দূরেই দেওয়ানী খানা। দেওয়ানী খানায় সম্রাটের প্রকাশ্য দরবার বসত। এই স্থানেই ছিল ইতিহাস-প্রসিদ্ধ ময়ূর সিংহাসন। সম্রাটের অন্দর মহলে জানালা বিহীন একতলাঘর গুলি ছিল বেগমদের। একটি বাটীতে শ্বেত প্রস্তর নির্মিত সম্রাটের স্নানের ঘর।

দিল্লীর চাঁদনী চকের কাছে আলিমর্দানের খাল অবস্থিত। খালটির উভয়-তীর শ্বেত প্রস্তরে বাঁধান। খালটির ওপর অনেকগুলি সেতু বিদ্যমান। খালের ধারে ধারে ওমরাহদের বহু সংখ্যক উত্তম গৃহাদি বর্তমান।

দেওয়ালীর সময়ে দিল্লীতে সমারোহের প্রাচুর্য লক্ষিত হয়ে থাকে। এই সময়ে প্রতিটি দোকানদার নিজ নিজ দোকানগুলিকে উত্তমরূপে সজ্জিত করে থাকে। প্রতি গৃহে এই সময় নৃত্য, গীতাদি অনুষ্ঠিত হয়। মহাজনেরা এই সময় সম্বৎসরের টাকা আদায় করে থাকে। হিন্দুরা এই সময় লক্ষ্মী পূজা করে থাকে।

আলিগড়ে পূর্বে কোল নামক অসভ্য জাতির বাস ছিল। কথিত আছে, কৃষ্ণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করে জরাসন্ধ এইস্থানে নাকি তাঁর শিবিরস্থাপন করে-ছিলেন। আলিগড়ে বহু উৎকৃষ্ট অট্টালিকা বিদ্যমান। এখানকার মৃত্তিকার দুর্গটি খুব প্রসিদ্ধ। আলিগড় নগরের দুই মাইল দূরে এই দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়ে থাকে।

মথুরায় বহু সংখ্যক মাটির পাহাড় বিদ্যমান। তন্মধ্যে একটির নাম কংসটোলা। কথিত আছে শ্রীকৃষ্ণ এরই ওপর কংসকে বিনাশ করেছিলেন। কংস টিলার অদূরেই অপর একটি মন্দির এবং পুষ্করিণী অবস্থিত।

মন্দিরটি দেবকীর কারাগার বলে পরিচিত। দেবকীর অষ্টম গর্ভের সন্তান নিহত হবার সংবাদ জেনে এইস্থানে কংস নাকি দেবকী এবং বসুদেবের বক্ষে প্রস্তর চাপিয়ে রেখেছিল। কারাগারের স্তূপীকৃত প্রস্তররাজি অদ্যাপি

বিদ্যমান। আর পুষ্করিণীটিতে দেবকী নাকি সূতিকা স্নান করেছিলেন। এখানে একটি ভগ্ন ঘরে দেবকী এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতিমূর্তি বর্তমান।

মথুরায় প্রবাহিত যমুনা নদীর উভয় তীরে বহু উত্তম বাঁধান ঘাট। যমুনা নদীর একটি ঘাট 'বিশ্রামঘাট' নামে পরিচিত। কথিত আছে কৃষ্ণ ও বলরাম কংসকে হত্যা করে এই ঘাটে বিশ্রাম করেছিলেন। সন্ধ্যার সময় ব্রজবাসীরা বিশ্রামঘাটে উপস্থিত হয়ে যমুনাদেবীর উদ্দেশে আরতি করে থাকে। তখন ঘাট অপূর্ব সৌন্দর্য ধারণ করে থাকে। মথুরার শেঠদের ঠাকুর বাড়ীস্থিত স্বর্ণ নির্মিত তালগাছ খুব প্রসিদ্ধ।

বৃন্দাবনের সর্বোচ্চ মন্দির গোবিন্দজীর প্রাচীন মন্দির। মন্দিরটি চূড়াহীন। দিল্লী থেকে মন্দিরটির চূড়া দৃষ্ট হ'ত বলে সম্রাট ঔরঙ্গজেব মন্দিরের চূড়াটি ভাঙ্গিয়ে দিয়েছিলেন। গোবিন্দজীর বিগ্রহ বর্তমানে নূতন মন্দিরে স্থাপিত। গোবিন্দজী রাধা ও ললিতার সঙ্গে বিরাজমান। গোবিন্দজী দিনের এক এক সময়ে এক এক বেশে সজ্জিত হয়ে থাকেন। তবে সকল সময়েই বংশীটি তাঁর হাতেই থাকে।

বৃন্দাবনে জয়পুর, সিন্ধিয়া, হোলকার, বর্ধমান প্রভৃতির মহারাজগণ কর্তৃক নির্মিত বহুসংখ্যক মন্দির বর্তমান। বহু মানুষ বৃন্দাবনে আজীবন প্রসাদ ভক্ষণ করে দিন অতিবাহিত করে থাকে।

গোপীনাথের মন্দিরে, কৃষ্ণ যে বেশে গোষ্ঠে গিয়ে কালিন্দীতীরস্থ বনে বনে রাধিকার হাত ধরে ভ্রমণ করতেন, সেই মূর্তি বিগ্রহ বর্তমান।

বৃন্দাবনের একটি ঘাটের নাম কেশিঘাট। এই ঘাটে কৃষ্ণ কেশি নামক দৈত্যকে সংহার করেছিলেন। আবার এই ঘাটেই কৃষ্ণ খেয়া পার করতেন। অদ্যাপি একখানি নৌকা ঘাটে বাঁধা অবস্থায় দেখা যায়। যে ঘাটে কৃষ্ণ বকাসুরকে বধ করেছিলেন, যে বৃক্ষটিতে কৃষ্ণ গোপীদের বস্ত্র হরণ করে রাখতেন সেই বস্ত্র হরণ বৃক্ষ, যে ঘাটে কালীয় সর্পকে তিনি নষ্ট করেছিলেন সেই কালীদহস্থিত কালীকদম্ব বৃক্ষ প্রভৃতিও বৃন্দাবনে বিদ্যমান। কালীদহের নিকটে মদন মোহনের মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি বর্তমান। এখানে নৌকা ডাঙ্গায় আটকে গেলে মদনমোহনের পূজা মানত করলে তবে তা পুনরায় জলে ভাসে। সওদাগরদের অর্থে মদনমোহনের মন্দির, অতিথিশালা প্রভৃতি প্রস্তুত হয়েছে।

বৃন্দাবনস্থিত গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজের নিকটস্থ তেঁতুল বৃক্ষের নিম্নে চৈতন্য দেবের পদচিহ্ন বর্তমান। বৃন্দাবনস্থিত নিকুঞ্জবনে কৃষ্ণ রাধিকাকে বামে বসিয়ে মনের আনন্দে নাকি গান গাইতেন। নিকুঞ্জবনস্থিত ক্ষুদ্র একটি গৃহে পালঙ্ক রাখা হয়। পরদিন প্রভাতে পালঙ্ক দেখে মনে হয়, যেন কেউ রাত্রে তাতে শয়ন করেছিল। কেন এরূপ হয়, সাহস করে রাত্রিতে কেউ তা দেখতে আসেনা।

বৃন্দাবনে গ্রামবাসীদের উপাস্য দেবতা বঙ্কবিহারী। বৃন্দাবনস্থিত সকল মূর্তি অপেক্ষা বঙ্কবিহারীর মূর্তি বৃহৎ। বঙ্কবিহারীর বামে রাধিকার মূর্তি নেই। বলা হয়ে থাকে যে রজনীতে ইনি প্রকৃত রাধিকার সঙ্গে বিহার করেন বলে কৃত্রিম রাধিকা মূর্তিকে বাম পার্শ্বে গ্রহণ করেন না। প্রাতে ন'টার পূর্বে বঙ্ক বিহারীর নাকি নিদ্রাভঙ্গ হয়না। তাই তৎপূর্বে মন্দিরের দরজাও খোলে না। ব্রজবাসীরা প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় বঙ্কবিহারীকে আরতি করে থাকেন।

গোপাল ভট্ট অর্চিত রাধারমণ আসলে শালগ্রাম শিলা। বর্তমানে প্রতি মূর্তির মধ্যে শালগ্রাম শিলাটি রক্ষিত। বৃন্দাবনে গোবর্দ্ধন পর্বত বিদ্যমান। পর্বতের ওপরে গোবর্ধন দেবের প্রতিমূর্তিও বিদ্যমান। গোবর্ধন দেবের প্রতিমূর্তি কৃষ্ণের বাল্যকালের গোপাল মূর্তি। মূর্তিটি উলঙ্গ অবস্থায় গোপালের নাড়ু ভক্ষণের। বল্লভ আচার্য এই মূর্তি স্থাপন করেছিলেন। কার্তিক মাসে এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বৃকভানু পর্বতে রাধিকার পিতা বৃকভানু নাকি বাস করতেন। পর্বতের ওপরে ও নীচে অনেকগুলি প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। রাজা যুধিষ্ঠির পাশা খেলায় সর্বস্বান্ত হওয়ার পর যেখানে বাস করেছিলেন সেই কাম্যবন, কৃষ্ণ কংসের ভয়ে যেখানে লুকিয়েছিলেন সেই নন্দন বন প্রভৃতিও এখানে বর্তমান। নন্দনবনে নন্দ ও যশোদার প্রতিমূর্তি দৃষ্ট হয়। যে বেসালি থেকে কৃষ্ণ ননী চুরি করে খেতেন সেই বেসালি এবং কৃষ্ণের মস্তকের চূড়া ও পীত ধড়া অদ্যাপি রক্ষিত আছে।

বৃন্দাবনস্থিত দ্বীপাকৃতি স্থানটি গোকুল নামে পরিচিত। এখানে কৃষ্ণ কংস ভয়ে লুকিয়ে ছিলেন। গোকুলস্থিত একটি গৃহে কৃষ্ণের বাল্যকালের ক্রীড়ার সরঞ্জাম এবং অপর এক গৃহে বসুদেব ও দেবকীর প্রতিমূর্তি বিদ্যমান।

বৃন্দাবনে সেবাদাসী সহ অনেক বাবাজীর বাস। বৃন্দাবনে ঘি এবং

ময়দার আমদানী প্রচুর। এখানে ছয় সাত হাজার গৃহ ব্রজবাসী বর্তমান। ব্রজবাসীদের 'দোবে' এবং মথুরাবাসীদের 'চোবে' বলে অভিহিত করা হয়ে থাকে। ব্রজবাসীরা মৃত্তিকা নির্মিত গৃহে বসবাস করে। বৃন্দাবনে বহু বাঙ্গালী, বৈরাগী হয়ে বসবাস করছে। বহু সম্ভ্রান্ত বংশীয় বাঙ্গালী স্ত্রীলোকও বৃন্দাবনে বাস করে থাকেন। বৃন্দাবনে যমুনার ওপর দয়ানন্দ ঠাকুরের বাড়ী। বৃন্দাবনস্থিত কুণ্ডগুলির মধ্যে রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড, ললিতাকুণ্ড প্রভৃতি প্রসিদ্ধ। শ্যামকুণ্ডের সন্নিহিত পাহাড়ের যে গুহায় থেকে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্য চরিতামৃত রচনা করেছিলেন, সেই গুহা আজও বিদ্যমান রয়েছে। এখানে পাঁচটি বৃক্ষ অবস্থিত। লোকে এগুলিকে পঞ্চপাণ্ডব বলে থাকে। বৃন্দাবনে বহু সংখ্যক কুঞ্জ বর্তমান। টাকা জমা দিলে এই কুঞ্জে তীর্থযাত্রীরা যাবজ্জীবন খেতে পায়।

বৃন্দাবনে খেলনার দোকানের সংখ্যা অধিক। প্রতিটি দোকানেই প্রায় রাধাকৃষ্ণের মূর্তি, নামাবলী, তিলকমাটি, মালা ইত্যাদি বিক্রয় হতে দেখা যায়।

আগ্রা স্টেশনের একেবারে সামনেই অবস্থিত আগ্রা ফোর্ট। সম্রাট আকবরের রাজধানী ছিল বলে নগরটির নাম হয়েছে আগ্রা। যমুনানদীর ওপর এক মনোহর সেতু। নদীর পর পারেই সম্রাট আকবর কৃত এমদাদ উদ্যান। এমদাদ উদ্যানে আকবরের একটি উৎকৃষ্ট বৈঠকখানাও বিদ্যমান। এ'টি পরিচিত 'রামবাগ' নামে। আগ্রা ফোর্টে প্রবেশ করবার দরজাটির নাম দর্শন দরজা। এই দর্শন দরজা থেকে সম্রাটের বেগমগণ মল্লযুদ্ধ ইত্যাদি প্রত্যক্ষ করতেন। দুর্গের অভ্যন্তরে প্রবেশের পূর্বেই পড়ে বোখারা গেট। বর্তমানে এ'টি ওমরাও সিংকা ফটক নামে পরিচিত।

যমুনা নদীরদিকে শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত অসংখ্য খিলান বিশিষ্ট স্থানটির নাম দেওয়ানি খাস। সম্রাট সাজাহান এই স্থানেই শেষ বয়সে কারারুদ্ধ ছিলেন। দেওয়ানি খাসে কৃষ্ণ বর্ণের মার্বেল প্রস্তরে নির্মিত একখানি সিংহাসন বিদ্যমান। সিংহাসনটি প্রস্থে বারো ফিট এবং উচ্চতায় দুই ফিট। গ্রীষ্মকালে এই সিংহাসনে উপবেশন করে সম্রাট আকবর বায়ু সেবন করতেন।

বেগমদের স্নানাগারটির নাম সিসমহল। সিসমহলের প্রাচীর কাচ নির্মিত। আগ্রা ফোর্টের মধ্যে একটি সুড়ঙ্গ বর্তমান। অনেকে বলে থাকে যে, এই সুড়ঙ্গের ভিতর দিয়ে আগ্রা থেকে দিল্লী পৌছান যায়।

কেল্লার মধ্যস্থিত 'দেওয়ানখানা'র দালানটি লম্বায় একশত আশি ফিট, প্রস্থে ষাট ফিট। এই দালানস্থিত একখানি সিংহাসনে উপবেশন করে সম্রাট আকবর প্রত্যহ দরবার করতেন। দুর্গের আর একদিকে অবস্থিত মতি মসজিদ। মতির সঙ্গে উত্তম শ্বেত প্রস্তর মিলিয়ে মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। তাই এ'টি মতি মসজিদ নামে খ্যাত। মসজিদটিতে চল্লিশ ফিট পরিধি বিশিষ্ট একখানি মাত্র শ্বেতপ্রস্তরে প্রস্তুত একখানি সিংহাসন ছিল। সম্রাট আকবর প্রত্যহ এই সিংহাসনে বসে স্নান করতেন।

কেল্লার মধ্যে একটি স্থান আছে, যার ওপর থেকে নীচে পর্যন্ত একটি গহ্বর গেছে। গহ্বরটি কোথায় গিয়ে শেষ হয়েছে তা সকলের অজ্ঞাত। হত্যাপরাধীকে এই গহ্বরে নিক্ষেপ করা হ'ত।

আগ্রার তাজমহল বিশ্ববিখ্যাত। তাজমহল অবস্থিত যমুনা নদীর ওপর। এর পাঁচটি মিনার। তাজমহলের দেওয়ালে বৃক্ষলতা, ফল, পুষ্প প্রভৃতি খোদিত। এক সময়ে এই সব বৃক্ষ লতা, ফল, পুষ্প মূল্যবান প্রস্তর দ্বারা ছিল সজ্জিত। তাজমহলের মধ্যে সম্রাট জাহাঙ্গীর, বেগম মমতাজ এবং নূরজাহানের দুহিতা আজবজার কবর বিদ্যমান। তাজমহল সংলগ্ন উদ্যানটি খুব রমণীয়। তাজমহলের পূর্বদিকে অনেকগুলি মসজিদ এবং অপরদিকে অনেক ধ্বংসাবশেষ, অট্টালিকা, প্রাচীর ইত্যাদি দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

যমুনা নদীর উভয়তীরে আগ্রা অবস্থিত। আগ্রার চক খুব প্রসিদ্ধ। গ্রীষ্ম কালে আগ্রা অত্যন্ত উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই সময়ে 'লু' বইতে থাকে।

কানপুরে অসংখ্য উদ্যান এবং বাঙ্গালা বর্তমান। কানপুরে সতী চৌড়ার ঘাটটি খুব প্রসিদ্ধ। পূর্বে এইঘাটে সতী সহমৃতা হতেন। সেইজন্য ঘাটটি 'সতী চৌড়ার ঘাট' নামে পরিচিত। ঘাটে মৎস্যজীবিদের উপাস্য দেবতা মাকাল ঠাকুরের মন্দির অবস্থিত। এখানকার অপর একটি ঘাটের নাম 'বিহারী লালের ঘাট'। এই ঘাটে অনেকগুলি দেব মন্দির বর্তমান। কানপুরে কাটলি খাঁর খাল অবস্থিত। খালটি হরিদ্বার থেকে কানপুর পর্যন্ত এসেছে।

কানপুরের হত্যাগৃহ এবং হত্যাকূপ খুব প্রসিদ্ধ। কানপুরের চর্মনির্মিত দ্রব্যাদিও খুব প্রসিদ্ধ।

লক্ষ্মৌয়ের জয়গঞ্জে বীর বিজয় সিংহ নামক রাজার রাজবাটী বর্তমান। জয়গঞ্জের উভয় পার্শ্বে বহু উত্তম উত্তম অসংখ্য অট্টালিকা দৃষ্টিগোচর হয়ে

থাকে। কেশববাগে নবাব ওয়াজেদ আলি শার বাহান্নটি অন্দর মহল বর্তমান। এই বাহান্নটি অন্দর মহলে বেগমেরা বাস করতেন। কেশববাগের মধ্যস্থলে একটি ক্ষুদ্র বাঁধান পুষ্করিণী বর্তমান। এই পুষ্করিণীর ওপর একটি সেতুও বিদ্যমান। দোলের সময় নবাব এই পুষ্করিণীটি গোলাপ জলে পরিপূর্ণ করে তাতে বহু আবীর ঢেলে বেগমদের সঙ্গে দোল খেলতেন। আর পুষ্করিণীর উপরিস্থিত সেতু থেকে তিনি জলে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। কেশব বাগের মধ্যে জয়পুরের শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত তিনটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গৃহ বর্তমান। মাটির নীচেও অনেকগুলি ঘর দৃষ্ট হয়ে থাকে। নবাব গ্রীষ্মকালে এই ঘরগুলিতে বাস করতেন। কেশব বাগের সংলগ্ন ছত্র মসজিদ। মসজিদের শীর্ষে একটি প্রকাণ্ড ছত্র থাকায় মসজিদটির নাম হয়েছে এইরূপ। মসজিদটি পাঁচতলা বিশিষ্ট, তন্মধ্যে এর একতলা মাটির নীচে। মসজিদের শীর্ষস্থিত ছত্রটি এক সময়ে স্ববর্ণের ছিল। ছত্রের ঝালরগুলি ছিল মূল্যবান মণিমুক্তা খচিত।

ছত্র মসজিদের দক্ষিণ দিকে একতলা বাড়ীটি মতি মহল নামে খ্যাত। নবাব এই গৃহে রূপকথার অনুসরণে অসংখ্য টবে বহু স্বর্ণ রৌপ্য ও মুক্তা খচিত বৃক্ষ রোপণ করেছিলেন।

লক্ষ্ণৌয়ে বেলিগার্ডে সিপাহী বিদ্রোহের সময় সিপাহীদের সঙ্গে ইংরাজদের যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এতদ্ব্যতীত লক্ষ্ণৌ নগরে আলমবাগ এবং সেকেন্দ্রাবাগ নামক অপর দু'টি যুদ্ধ ক্ষেত্রও বর্তমান।

গোমতী নদী তীরে অবস্থিত বাদশাবাগ। বাদশাবাগে এক সময় নবাবের স্নানাগার অবস্থিত ছিল। নদীর তীরস্থিত মসজিদটি নবাব কৃত। এক পাশে রোসেন উদ্দৌলার কুঠীও বর্তমান ছিল। বাদশা বাগস্থিত নবাবের সুবিস্তৃত উদ্যানটি এক সময়ে বহু উৎকৃষ্ট ফল ফুলের বৃক্ষে পরিপূর্ণ ছিল।

গাজিউদ্দীন হাইদারের কবর লক্ষ্ণৌয়ের অন্যতম দ্রষ্টব্য বস্তু। এস্থানে অনেকগুলি নবাব ও বেগমের প্রতিমূর্তি এবং অপরাপর বহুবিধ দ্রষ্টব্য বস্তু বর্তমান। লক্ষ্ণৌস্থিত বারাণসী বাগও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বারাণসী বাগে একটি উৎকৃষ্ট শ্বেতপ্রস্তর নির্মিত রাস্তা বিদ্যমান। বারাণসী বাগস্থিত একটি উৎকৃষ্ট বাটীতে নানাবিধ প্রতিমূর্তি এবং বৃক্ষলতা বিদ্যমান।

লক্ষ্ণৌয়ের পানীফল এবং তরমুজ খুব বিখ্যাত। এখানকার অধিবাসীরা খুব ব্যয় করে থাকে। আগামীরের দেউড়ি খুব প্রসিদ্ধ। লক্ষ্ণৌস্থিত লামার্টিন

কলেজ গৃহটি একসময়ে নবাবের মাদ্রাসা ছিল।

লক্ষ্ণৌয়ের কয়েকটি স্টেশন পরে শাণ্ডিলা নামক স্থান থেকে ১৫ ক্রোশ দূরে অবস্থিত নৈমিষারণ্য। নৈমিষারণ্যে দধীচি মুনির আশ্রম অবস্থিত। এতদ্ব্যতীত এখানে একটি কুণ্ডও বর্তমান। পূর্বে কুণ্ডটি ব্রহ্মকুণ্ড নামে পরিচিত ছিল। বর্তমানে এ'টি পাপ হরণকুণ্ড নামে পরিচিত। নৈমিষারণ্যে ললিতাদেবীর একটি প্রতিমূর্তিও দৃষ্ট হয়ে থাকে। অনেকের মতে এ'টি নাকি বাহান্ন পীঠস্থানের অন্যতম।

অযোধ্যায় দশরথের বাটীতে একটি বেদী বর্তমান। প্রচলিত মত অনুযায়ী এই বেদীর ওপর নাকি রামচন্দ্র জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যাত্রীরা এই বেদী প্রদক্ষিণ করে থাকে। এর কাছেই এক জোড়া জাঁতা ও একটি উনান বিদ্যমান। রামচন্দ্রের বিবাহের বৌভাতের সময় নাকি এই উনুনে রান্না হয়েছিল এবং জাঁতাটিতে ডাল ভাঙ্গা হয়েছিল। অযোধ্যায় রামচন্দ্র অপেক্ষা হনুমানের জনপ্রিয়তা অধিক। একটি উৎকৃষ্ট মন্দিরে হনুমানের প্রতিমূর্তি বর্তমান। মন্দিরের পশ্চাদভাগের একটি গৃহে রাম, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন ও সীতার প্রতিমূর্তি দৃষ্ট হয়ে থাকে। অযোধ্যাস্থিত বশিষ্ঠ আশ্রমে ভগবতীর প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। আশ্রম মধ্যে একটি কূপ লক্ষিত হয়ে থাকে। কথিত আছে রামচন্দ্র বাল্যকালে এই কূপের কাছে ক্রীড়া করতেন এবং কখনও কখনও কূপের জলে লাফিয়ে পড়তেন।

অযোধ্যায় সরযূ নদীতে রামঘাট এবং স্বর্গঘাট নামে দু'টি প্রসিদ্ধ ঘাট বিদ্যমান। প্রাতঃকালে এবং সন্ধ্যাকালে রামায়ত বৈষ্ণবেরা এই দুই ঘাটে জড় হয়ে রামনাম করে থাকে। অযোধ্যা নগরীর অধিবাসীরা প্রত্যহ গৃহে ধূপ-দীপ প্রজ্জ্বলিত করে শঙ্খ ঘণ্টার সঙ্গে রামনাম করে থাকেন। অযোধ্যায় রামায়ত বৈষ্ণবের সংখ্যাই সর্বাপেক্ষা অধিক। এখানে একটি শিব ও কালী মূর্তি বিদ্যমান। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী রাজা দশরথ এই মূর্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

কাশীতে বহু গঙ্গাপুত্র ও যাত্রাওয়ালার বাস। গঙ্গাপুত্র যাত্রীদের গঙ্গা স্নানের সময়ে মন্ত্রপাঠ করিয়ে থাকে। আর যাত্রাওয়ালা যাত্রীদের দেবালয় দর্শন করিয়ে থাকে।

কাশীস্থিত মণি কর্ণিকার ঘাটটি খুব প্রসিদ্ধ। এ'টি চক্রতীর্থ নামেও পরিচিত।

মণিকর্ণিকার ঘাট কাশীর প্রসিদ্ধ ঘাট। কাশীতে সর্বপ্রথম কুমারীভোজ করান বিধেয়। ঢুণ্ঢীরাজ গণেশ কাশীতে খুব প্রসিদ্ধ। কাশীস্থিত বিশ্বেশ্বরের দর্শন করবার পূর্বে ঢুণ্ঢীর পূজা করবার রীতি প্রচলিত। তিলের নাড়ু দিয়ে ঢুণ্ডীরাজ গণেশের পূজা করা হয়।

রাজরাজেশ্বরী ঘাটের পথে পড়ে কাল ভৈরবের মূর্তি এর স্থবর্ণময় মুখ, গুম্ফ দ্বারা শোভিত। একে কাশীর কোতোয়াল নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। যাত্রীরা কাশীতে উপস্থিত হয়ে আগে কাল ভৈরবের পূজা করে থাকে।

কাশীর সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ দ্রষ্টব্যস্থল হ'ল বিশ্বেশ্বরের মন্দির। রাত্রি-চারটা থেকে সমস্ত দিন ও অধিক রাত্রি পর্যন্ত লোকে বিশ্বেশ্বর দর্শন করতে উপস্থিত হয়। বিশ্বেশ্বরের আরতি অত্যন্ত রমণীয়। এই সময়ে ৭।৮ জন ব্রাহ্মণ রুদ্রাক্ষ মালায় শোভিত হয়ে এক একটি পঞ্চ প্রদীপ নিয়ে স্তোত্র পাঠ করতে করতে আরতি করে। আর অপর কতকগুলি লোক এই সময়ে শিঙ্গা ডম্বরুর তালে তালে গালবাদ্য করে নাচতে থাকে।

বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের উপরিভাগ স্থবর্ণাচ্ছাদিত। শিবের কাছারি ঘরে রাশিকৃত শিবলিঙ্গ বর্তমান। অদূরেই বিশ্বেশ্বরের ভগ্নদশা প্রাপ্ত প্রাচীন মন্দির।

কাশীস্থিত জ্ঞান বাপী প্রাচীর বেষ্টিত একটি কূপ। এর তলদেশ গঙ্গার সঙ্গে সংলগ্ন। এইস্থানে নদীর প্রতিমূর্তি বিদ্যমান। সম্মুখে প্রস্তরময় বিশালাকৃতির বৃষ মূর্তি।

অন্নপূর্ণার মন্দির কাশীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থান। মন্দিরের মেঝে শ্বেত ও কৃষ্ণবর্ণ প্রস্তরে নির্মিত। ঘরটি পিতলাচ্ছাদিত। নাটমন্দিরের স্তম্ভগুলি স্থচিত্রিত। গৃহ মধ্যে দ্বিভুজা অন্নপূর্ণা প্রতিষ্ঠিতা। দেবীর সর্বাঙ্গ বস্ত্রাচ্ছাদিত। কেবলমাত্র মুখ মণ্ডল অনাবৃত। মূর্তিটি প্রস্তর নির্মিত। দেবীর এক হস্তে থালা এবং অপর হস্তে হাতা।

ত্রিলোচন মূর্তি একটি তাম্র পত্রাবৃত গহ্বর মধ্যে বিরাজিত। মন্দিরের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ অনেকগুলি শিবমূর্তি বিদ্যমান। অপর প্রসিদ্ধ মূর্তি হ'ল সঙ্কটা দেবী। কাশীবাসীরা কোন সঙ্কটে পড়লে সঙ্কটা দেবীর পূজা মানত করে থাকে। কাশীস্থিত দুর্গাবাড়ী, দণ্ড পাণীশ্বর শিবলিঙ্গ, দুর্গা, গণেশ, পরেশনাথ, আদিকেশব, কেদার নাথের মন্দির, জ্যেষ্ঠেশ্বর শিব, জ্যেষ্ঠা গৌরী, অগস্ত্যেশ্বর প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। কাশীস্থিত পিশাচমোহন তীর্থ ও

খুব প্রসিদ্ধ। এই তীর্থে অগ্রহায়ণ মাসের শুক্লা চতুর্দশীতে স্নান করলে সর্বপাপ থেকে নাকি মুক্তিলাভ ঘটে।

কাশীর চিনি, পেয়ারা ও বেনারসী শাড়ী খুব প্রসিদ্ধ। কাশীর গঙ্গার রাজঘাটের অপর পারে অবস্থিত ব্যাসকাশী। রামনগর ব্যাসকাশীর মধ্যেই অবস্থিত। কাশীর রাজা এই রাম নগরে বাস করে থাকেন। রাম নবমীর সময়ে এখানে খুব সমারোহের সঙ্গে রাম লীলা অনুষ্ঠিত হয়।

কাশীতে ভারতের সকল প্রদেশের মানুষের বাস। এখানে বেদ, বেদান্ত, পুরাণ, দর্শন প্রভৃতির বহু পণ্ডিত বর্তমান। অনেকগুলি অন্নসত্রও এখানে দেখতে পাওয়া যায়। কাশীস্থিত মানস মন্দিরটিও খুব প্রসিদ্ধ।

অন্যান্য স্থান অপেক্ষা এলাহাবাদে বাড়ী ঘরের সংখ্যা অনেক কম বলে এলাহাবাদের অপর নাম ফকিরাবাদ। এলাহাবাদের পল্লীগুলি এত দূরে অবস্থিত যে, এক একটি ভিন্ন ভিন্ন গ্রাম বলে প্রতিভাত হয়।

এলাহাবাদ ষ্টেশন থেকে বেণীতীর আড়াই ক্রোশের পথ। প্রয়াগের নাপিতেরা যাত্রীদের মস্তক মুণ্ডন করে পয়সা রোজগার করে বিশেষতঃ মাঘ মাসে তাদের উপার্জন বেশ ভাল হয়।

বেণীঘাটের সন্নিকটেই এলাহাবাদের প্রসিদ্ধ কেল্লা। কেল্লাটি গঙ্গা এবং যমুনার সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। কেল্লাটি বহুকাল পূর্বে হিন্দু রাজ গণের দ্বারা নির্মিত। এক সময় কেল্লাটি ধ্বংস হয়ে গিয়ে এর প্রাচীরমাত্র অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর সম্রাট আকবর পুনরায় কেল্লাটিকে নূতন করে নির্মাণ করেন। কেল্লার মধ্যে পাতালপুরী। পাতাল পুরীতে এক অক্ষয়বট এবং শিবমূর্তি অবস্থিত। কেল্লাটি এলাহাবাদ নগর থেকে দূরস্থ ময়দানে অবস্থিত। কেল্লার অদূরেই সম্রাট আকবরের রাজপ্রাসাদ। রাজপ্রাসাদ থেকে জলে নামবার সিঁড়ি অদ্যাপি বর্তমান। কেল্লার মধ্যে ভীমের গদাও বর্তমান।

গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর সঙ্গমস্থল ত্রিবেণী তীর্থ নামে পরিচিত। ত্রিবেণীতে অসংখ্য নাপিত, গঙ্গাপুত্র, পুরোহিত, ব্রাহ্মণ এবং ভিক্ষুকের ভীড়। পাণ্ডাগণ প্রত্যেকেই ঘাটের বিভিন্ন স্থান অধিকার করে আছে এবং প্রত্যেকের দখলী কৃত অংশে বিভিন্ন বর্ণের নিশানা উড্ডীয়মান। ত্রিবেণী তীর্থে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতীর জল পৃথক পৃথক বর্ণের। প্রতিটি নদীকেই পৃথকভাবে চেনা যায়। ত্রিবেণী সঙ্গমে পাণ্ডাগণ ক্ষুদ্র নৌকায় নানা রূপ দেবমূর্তি

সাজিয়ে যাত্রীদের নিকটে উপস্থিত হয় এবং ভিক্ষা প্রার্থনা করে থাকে।

ত্রিবেণী তীর থেকে এক মাইল দূরে আলোপীবাগে অবস্থিত আলোপী দেবীর মন্দির। মন্দিরের সামনে বহু সংখ্যক বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ ও শিব মন্দির বর্তমান। আলোপী বাগ বাহান্ন পীঠস্থানের অন্যতম। প্রয়াগে দেবীর দক্ষিণ হাতের আঙ্গুল পড়েছিল। এবং এর থেকেই আ'লোপীদেবী মূর্তির উৎপত্তি। আলোপীদেবী এক বৃহৎ তাম্র নির্মিত সিংহাসনের উপর আসীন। মন্দিরের চতুর্দিকে ব্রাহ্মণগণ উপবিষ্ট হয়ে বেদপাঠ করেন।

ভরদ্বাজ মুনির আশ্রমও এলাহাবাদে অবস্থিত। এলাহাবাদের কেশী ঘাটও খুব প্রসিদ্ধ। ঘাটস্থিত মন্দিরে এক বিষ্ণুমূর্তি। এ'টি বেণীমাধব নামে পরিচিত এবং তদনুযায়ী ঘাটের নাম। বেণীমাধবের ঘাট হয়ে বেণী ঘাটের পরপারে হবুচন্দ্র রাজার বাড়ীঘর। এলাহাবাদ নগরী মধ্যে সম্ভবত প্রধানতম ঘাট হ'ল 'বাসুকীর ঘাট'। বাঁধা ঘাটের উপরিস্থিত মন্দির মধ্যে রাজা বাসুকীর মূর্তি বিরাজিত। বাসুকীর মন্দিরটি বৃহদাকৃতির সর্পদ্বারা পরিবেষ্টিত। রাজা বাসুকীর ঘাট থেকে সকলে শিবকোটী দর্শন করতে যায়। স্থানীয় মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী রামচন্দ্র বনগমনের প্রাক্কালে এই শিবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করে পূজা করেছিলেন। রামচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত এই শিব মূর্তি পূজা করলে কোটি শিবপূজার পুণ্য অর্জন হয়, তাই এর নাম হয়েছে শিবকোটি।

এলাহাবাদের যমুনা নদীর উপর লৌহ নির্মিত সুদীর্ঘ সেতুটি তিন ভাগে বিভক্ত। সেতুর উপর দিয়ে রেল গাড়ী যাতায়াত করে। সেতুর নিম্নভাগ দিয়ে চলাচল করে লোক। আর তারও নীচ দিয়ে জলযানের যাতায়াত।

সম্রাট তনয় খসরু নির্মিত 'খসরুবাগ' এলাহাবাদের অন্যতম দ্রষ্টব্য স্থল। খসরুবাগের ভেতরে দু'টি মসজিদ। মাটির মধ্যে একটি গৃহ বর্তমান। খসরু বাগের উদ্যানটি বহুবৃক্ষ লতায় শোভিত।

ডিউক অব এডিনবরার নামানুসারে নির্মিত এলফ্রেড পার্কটি খসরুবাগ অপেক্ষা বৃহৎ।

এলাহাবাদ অতি প্রাচীন নগর। এখানে সাগঞ্জ, কর্ণেলগঞ্জ, কীটগঞ্জ, মুটগঞ্জ প্রভৃতি নামে অনেকগুলি পল্লী বর্তমান। এখানকার রাস্তাঘাট বেশ প্রশস্ত এবং পরিষ্কার। এলাহাবাদের জলবায়ু বেশ স্বাস্থ্যকর। মাঘ মাসে অনুষ্ঠিত মেলায় এখানে বহু মানুষের সমাগম ঘটে। মিরজাপুরে প্রস্তর নির্মিত

কেল্লার কাছ দিয়ে চকে যাবার পথ। চকে অসংখ্য দোকান বর্তমান। ভাগীরথী তীরে অনেকগুলি প্রস্তর নির্মিত বাঁধাঘাট। জলে অসংখ্য তরী। মিরাজাপুর, কাষ্ঠ বিক্রয়ের একটি উল্লেখযোগ্য স্থান। এখানে সুলভ মূল্যে কাষ্ঠ পাওয়া যায়। মিরাজাপুরে ভোগমায়া নামক দেবীমূর্তি বিদ্যমান। পিতলের স্তম্ভ দ্বারা বেষ্টিত সঙ্কীর্ণ গৃহ মধ্যে ভোগমায়া দেবীর মূর্তি আসীন। মন্দিরের চতুর্দিকে আরো বহু সংখ্যক দেবী মূর্তি বিদ্যমান।

বিন্ধ্যাচল পর্বতের অধিষ্ঠাত্রী বিন্ধ্য বাসিনী বা যোগমায়া বিন্ধ্য পর্বতের উপর অবস্থিত। পর্বতের উপর বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষ শ্রেণী, তন্মধ্যে অবস্থিত শিবমন্দির। মন্দিরের অধ্যক্ষগণের বসবাসের জন্য পর্বত গাত্রে অনেকগুলি গুহা রয়েছে। পর্বতশিখরের কিয়দংশ খনন করে গুহা নির্মাণ করা হয়েছে এবং ঐ গুহায় দেবীমূর্তি বর্তমান। কথিত আছে, কংসের আক্রোশ থেকে রক্ষা করবার জন্য বসুদেব নিজের অষ্টম গর্ভের সন্তানকে যশোদার গৃহে রেখে এসে নিজ গৃহে যশোদার কন্যাকে আনলে তাকেই বসুদেবের অষ্টম গর্ভের সন্তান মনে করে কংস হত্যাভিলাষে প্রস্তরের উপরে সজোরে নিক্ষেপ করলে বালিকা শূন্যে অন্তর্হিতা হয়ে যায়। যাবার সময় কন্যারূপী দেবী মিরজাপুরে বিন্ধ্য বাসিনী মূর্তিতে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন। বিন্ধ্য বাসিনীর দক্ষিণে একটি সুড়ঙ্গ বর্তমান। দেবীনাকি এই সুড়ঙ্গ দিয়েই আত্মপ্রকাশ করেছিলেন। বৎসরের সকল সময়ই দেবীর গাত্র বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকে।

বিন্ধ্য পর্বত থেকে প্রায় আধ ক্রোশ দূরে উচ্চ এক পর্বতে সংহার মায়া নামক ভয়ঙ্করী মহাকালী মূর্তি বর্তমান। প্রায় দেড় শত সিঁড়ি অতিক্রম করে তবে সংহার মায়া নামক মূর্তির নিকটে উপস্থিত হওয়া যায়। পদ্মযোনি মন্দিরের নিকটে নাথজী নামক এক সাধুর সমাধিস্থান অবস্থিত। এখানে কেউ কেউ বরাহ বলি দিয়ে থাকে। সাধু যেখানে বসে তপস্যা করতেন, সেই স্থানটি বিক্রমাদিত্যের বত্রিশ সিংহাসনের ন্যায়। এইখানে বসে অপর কেউ তপস্যা করতে পারে না।

মিরাজাপুরের কয়েকটি ষ্টেশন পরেই চুনার। চুনারের কেল্লা খুব প্রসিদ্ধ। কেল্লাটি পালরাজাদের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। অনেকের বিশ্বাস, কেল্লাটি নাকি মাত্র এক রাত্রিতে ভূত দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। চুনারে বহু প্রাচীন রাজবাটী বিদ্যমান। এখানে ১৫ ফিট পরিধি বিস্তৃত একটি কূপ দৃষ্টিগোচর

হয়ে থাকে। চুনারের প্রস্তর নির্মিত বাটি এবং তামাক খুব প্রসিদ্ধ।

চুনার থেকে যাত্রা করে মোগলসরাই প্রভৃতি অতিক্রম করবার পর যুমানিয়া ষ্টেশন উপস্থিত হয়। এই ষ্টেশন থেকে চোদ্দ মাইল দূরে গাজীপুর নামক একটি স্থান বিদ্যমান। গাজীপুরে বহু গোলাপ ফুলের বাগান অবস্থিত। গাজীপুরের গোলাপজল এবং আতর খুব প্রসিদ্ধ।

যুমানিয়া ষ্টেশন থেকে কয়েকটি ষ্টেশন পরে বকসার। বকসারের কেল্লা খুব প্রসিদ্ধ। এখানে নবাব কাসিম আলি খাঁর বাসস্থানের ধ্বংসাবশেষ আছে। বকসারে বিশ্বামিত্র মুনির তপোবন বিদ্যমান ছিল। রামচন্দ্র হরধনু ভঙ্গ করতে যাবার সময় এই তপোবনে বাস করেছিলেন। ছাপরার সন্নিকটে গৌতম ঋষির তপোবন। রামচন্দ্র এই তপোবনেই অহল্যাকে উদ্ধার করেছিলেন। বকসারের অনতিদূরে ছিল তাড়কা রাক্ষসীর বন। এখনও এখানে তাড়কা নালা বর্তমান। কথিত আছে, রামচন্দ্র তাড়কাকে বধ করে এই তাড়কা নালায় তাড়কার মৃতদেহ নিক্ষেপ করেছিলেন। বকসারে রামেশ্বর শিব বিদ্যমান। রামচন্দ্র তাড়কাবধের পর নাকি এই রামেশ্বর শিবের পূজা করেছিলেন। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই শিবের মস্তকে জল ঢাললে স্ত্রীলোকেরা রামচন্দ্রের ন্যায় পতি লাভ করে থাকে।

প্রতি বৎসর বকসারে দু'টি করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এদের একটি 'ছাতুমেলা' এবং অপরটি 'খিচুড়ি মেলা' নামে পরিচিত। প্রথম মেলাটি অনুষ্ঠিত হয় চৈত্র সংক্রান্তিতে এবং দ্বিতীয়টি অনুষ্ঠিত হয় মাঘী সংক্রান্তি তিথিতে। এই দুই মেলার সময় উপস্থিত যাত্রীরা ছাতু এবং খিচুড়ি খেয়ে থাকে। বকসারের কয়েকটি ষ্টেশন অতিক্রমের পরই শোন নদীর উপরিস্থিত বৃহদাকার সেতুটি দৃষ্টিগোচর হয়।

চৈত্রমাসে মধুগয়া এবং ভাদ্রমাসে সিংহগয়া করবার জন্য গয়ায় বহু যাত্রীর সমাগম ঘটে থাকে। গয়াস্থিত ফল্গুনদী অন্তঃসলিলা রূপে প্রবাহিত। ফল্গুনদীর ঘাটে অসংখ্য নাপিত বসে থাকে। ঝুনো নারকেল, তুলসী, তিল এবং যবের ছাতুর বহু দোকানও এস্থানে দেখা যায়।

ফল্গুনদীর পরপারে অবস্থিত সীতাকুণ্ড। কথিত আছে এই সীতাকুণ্ড থেকে বালি নিয়ে সীতা রাজা দশরথকে পিণ্ডদান করেছিলেন। সীতাকুণ্ডে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার প্রতিমূর্তি বর্তমান। ফল্গুনদীতে স্নান করে সকলে

শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে থাকেন। গদাধরে বাটীতে গদাধরের পদচিহ্ন বর্তমান। এই পদ চিহ্নের উপর পিণ্ডদান করবার রীতি প্রচলিত। গয়াস্থিত বিষ্ণু মন্দিরটি কষ্টি পাথরে নির্মিত। ইন্দোরের মহারাণী এই মন্দিরটি নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। বিষ্ণু মন্দিরের বিপরীত দিকের মন্দিরে ইন্দোরের মহারাণী অহল্যা বাইয়ের মূর্তি বিদ্যমান। বিষ্ণু মন্দিরের অপর এক পার্শ্বে গদাধরের মূর্তি বর্তমান। গয়ায় রাম শিলা, ব্রহ্মযোনী ইত্যাদি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাহাড়েও পিণ্ডদানের রীতি প্রচলিত। প্রেতশিলাতেও সকলে পিণ্ডদান করে থাকে।

গয়ায় অবস্থিত অক্ষয় বটের তলা থেকে পুণ্যার্থীরা স্থফল নেবার আশায় গমন করে থাকে। গয়ালী গুরুরা কেউ শিবিকা মধ্যে, কেউ তাঁবুর মধ্যে, আবার কেউ কেউ বৈঠকখানা গৃহেও অবস্থান করে থাকেন। যাত্রীরা ফুল চন্দন দিয়ে গয়ালীদের পাদপদ্ম পূজা করে থাকে এবং তার পর গয়ালী গরুরা পুষ্প মাল্যের দ্বারা যাত্রীদের হাত বেঁধে দেন। অতঃপর যাত্রীদের নিকট থেকে অর্থের বিনিময়ে এরা স্থফল দান করে থাকেন। এবং তারপর পুষ্পমাল্যের বন্ধন দশা থেকে যাত্রীরা মুক্তিলাভ করে থাকে।

গঙ্গায় প্রায় দুই সহস্র বৎসরের প্রাচীন মন্দির বর্তমান। এখানে সমগ্র ভারতবর্ষের নানা প্রান্ত থেকে আগত যাত্রীরা পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে থাকে। গয়ালীরাই গয়ার সর্বময় কর্তা। গয়ালীরা অত্যন্ত নির্বোধ। গয়ালীরা বেশ অবস্থাপন্ন। গয়ার অপরাপর দেব দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করা হয় না। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী অপরাপর দেব দেবীর মূর্তি নির্মাণ করে পূজা করলে নির্বংশ হ'তে হয়।

গয়া দুই ভাগে বিভক্ত। গয়া এবং সাহেবগঞ্জ। গয়ায় বৌদ্ধদের অনেক কীর্তি বর্তমান। এখানে শাক্য সিংহের একটি প্রতিমূর্তি সহ মন্দিরও বিদ্যমান। গয়ার পাথরবাটি এবং তামাক খুব প্রসিদ্ধ। গয়ার একটি পাহাড়ে একটি গহ্বর পরিলক্ষিত হয়। স্থানীয় জনসাধারণের বিশ্বাস অনুযায়ী ভীমসেন হাঁটু গেড়ে বসে পিণ্ডদান করতে গেলে তাঁর হাঁটু বসে গিয়েছিল তাতেই নাকি ঐ গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। অপর এক স্থানে প্রস্তরের উপরে কতকগুলি গরুর পদচিহ্ন দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে প্রচলিত কিংবদন্তী ব্রহ্মা এক সময়ে গয়ায় উপস্থিত হয়ে গোদান করেছিলেন, চিহ্নগুলি সেই সব গরুর।

পাটনা, বাঁকীপুর এবং দানাপুর সংলগ্ন। বাঁকীপুরের পশ্চিম অংশকে দানাপুর এবং পূর্বাংশকে পাটনা নামে অভিহিত করা হয়।

পাটনা আবার দুই খণ্ডে বিভক্ত নূতন পাটনা এবং পুরাতন পাটনা। পাটনা নগরটি অত্যন্ত প্রশস্ত। এ'টি দৈর্ঘ্যে ষোল মাইল কিন্তু প্রস্থে এক মাইলের অধিক নয়। পাটনার প্রাচীন নাম পাটলিপুত্র। এর অপর নাম আজিমাবাদ।

পাটনার অনতিদূরে হাজিপুর নামে একটি স্থান আছে। হাজিপুরের সন্নিকটস্থ হরিহর ছত্র নামক স্থানে হরিহর দেবের প্রতিমূর্তি বর্তমান। হরিহর ছত্রে প্রতি বছর একটি করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ঐ মেলায় বহু হাতী ঘোড়া প্রভৃতি ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে।

পাটনাস্থিত কঙ্করবাগ নামক উদ্যানে নানাবিধ পশু বিদ্যমান। পাটনায় গাষ্টিন্স ফলি নামে এক সুবৃহৎ গোলাঘর বর্তমান। এ'টি ১০০ ফিট উচ্চ। এর উপরে উঠে নগরের শোভা উপভোগ করা যায়। বিষয় কর্ম উপলক্ষে পাটনায় বহু বাঙ্গালীর বাস।

পাটনায় একাধিক ইমামবাড়ী। ইমাম বাড়ীতে মহরমের সময় খুব ধূম। পাটনাস্থিত গুলজারবাগে পূর্বে শত শত লোক কাঠের বাক্স প্রস্তুত করত। এই সব বাক্স করে চীনদেশে আফিম চালান যেত।

বেতিয়ার মহারাজা নির্মিত মন্দির মধ্যে পাটনদেবীর অবস্থান। পাটন দেবী কালী মূর্তি। এই পাটনদেবীর নাম থেকেই পাটনা নামের উৎপত্তি। পাটনাস্থিত রাম নারায়ণের কেল্লা খুব প্রসিদ্ধ। রাম নারায়ণের কেল্লা থেকে প্রায় অর্ধ ক্রোশ দূরে ইংরাজদের প্রাচীন কবর স্থান।

পাটনার প্রসিদ্ধ বাণিজ্য স্থান মারুগঞ্জ। মারুগঞ্জে নানাস্থান থেকে নানাবিধ শস্য এসে জমা হয়। মারুগঞ্জে ছোলা, মসিনা, জনার প্রভৃতি বহুল পরিমাণে সঞ্চিত থাকতে দেখা যায়।

পাটনায় কাঠ খুব সস্তা। এখানে কাষ্ঠ নির্মিত গৃহাদির সংখ্যা অনেক। অধিকাংশ গৃহ আবার জানলা বিহীন। পাটনায় রণজিৎ সিংহ নির্মিত হর-মন্দিরে গুরুগোবিন্দের পাদুকা এবং গ্রন্থ রক্ষিত আছে। দানাপুরের বারিক খুব প্রসিদ্ধ। এখানে 'দানাপুরের জুতা' নামে বিশেষ এক প্রকার জুতা প্রস্তুত হতে দেখা যায়।

পাটনার কুল এবং দাড়িম খুব বিখ্যাত। পাটনার অনতিদূরে বাড় নামক স্থানটি বিখ্যাত বাণিজ্যের কেন্দ্র। বাড়ে অসংখ্য চামেলি এবং বেল ফুলের উদ্যান আছে। এখানকার ফুলের তেল খুব বিখ্যাত। এইস্থান থেকেই ত্রিহুত রাজ্যের শুরু। ত্রিহুত রাজ্যে প্রতি বৎসর রাম নবমীতে একটি করে মেলা অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিহুত রাজ্যেরই প্রাচীন নাম মিথিলা। বাড়ঘাট স্টেশন থেকে পঞ্চাশ মাইল দূরে মজঃফরপুর এবং এখান থেকে মিথিলা বেশ অনেক সময়ের পথ।

জামালপুরের পর্বতশ্রেণী খুব মনোহর। এখানে ঘোড় দৌড়ের মাঠের নিকটস্থ পাহাড়ের উপর তেঁতুল তলায় পাহাড়ে কালী বিদ্যমান। এই পাহাড়ে কালীই জামালপুরের একমাত্র গ্রামাদেবতা। কালীর নিকটস্থ পর্বতগাত্রে একটি গুহা বর্তমান। লোকে একে 'মুনিকোটর' নামে অভিহিত করে থাকে। অনেকের সংস্কার ঐ কোটরে বসে কোন সময়ে কোন মুনি তপস্যা করতেন।

পূর্বে জামালপুরে ছিল গভীর অরণ্য। অতঃপর রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ একে শিল্প নগরীতে পরিণত করেছেন।

মুঙ্গেরের নাম পূর্বে ছিল মুদ্গালপুর। মুঙ্গের স্টেশনের সন্নিকটে প্রকাণ্ড মুঙ্গের দুর্গ অবস্থিত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী দুর্গটি নাকি ছিল রাজা জরাসন্ধের। দুর্গের মধ্যেই মুঙ্গের জেল, আফিস, আদালত ইত্যাদি অবস্থিত। মুঙ্গের দুর্গের প্রাচীরে অনেকগুলি হিন্দু দেব দেবীর মূর্তি খোদিত। দুর্গটি দৈর্ঘে চার হাজার ফিট, এবং প্রস্থে প্রায় তিন হাজার পাঁচ শত ফিট। দুর্গটির উচ্চতা ১৩।১৪ হাত। দুর্গের তিন দিকে গড় এবং একদিকে ভাগীরথী। বর্তমানে দুর্গের চারদিকের প্রাচীর এবং চারটি গেট মাত্র অবশিষ্ট আছে। গেটগুলি লালদরজা নামে খ্যাত।

মুঙ্গেরে বাড়ী ঘর সুলভ। এখানে 'ঢেবুয়া' প্রচলিত ছিল। 'ঢেবুয়া' হ'ল লৌহ ও তাম্র মিশ্রিত এক প্রকার পয়সা। এগুলি পূর্বে টাকায় ১৮ গণ্ডা ১৯ গণ্ডা করে বিক্রয় হ'ত।

ভাগীরথীর উপরিস্থিত ক্ষুদ্র পুলের নীচে প্রায় শতাধিক সোপান বিশিষ্ট বেগমদের জন্য নির্মিত এক অতি আশ্চর্য 'ধোলী' বা স্নানের ঘাট বর্তমান। যে স্থান থেকে এই সোপান শ্রেণীর শুরু, সেইস্থানে নবাব মীর কাসীমের অন্দর-মহল ছিল অবস্থিত। তাঁর বেগমেরা এই ঘাটে এসে স্নানাদি করতেন এবং

কোনরূপ বিপদের আশঙ্কা ঘটলে গুপ্ত দ্বারে বহির্গত হয়ে যেতেন।

এখানে গঙ্গার একটি ঘাটের নাম কষ্টহারিণী। ভাগীরথী ঘাটের নিকট দিয়ে উত্তরবাহিনী হয়ে প্রবাহিত। ঘাটে কয়েকটি দেবমূর্তি বর্তমান। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী এই ঘাটে যে ব্যক্তি স্নান, দান ইত্যাদি করে সে ব্যক্তি বৈকুণ্ঠ লোকে গমন করে।

মুঙ্গেরে মহাবীর কর্ণের স্মৃতিপূত করণচড়া নামক এক প্রস্তর বেদী বর্তমান। কথিত আছে মহাবীর কর্ণ প্রত্যহ এই কষ্টহারিণী ঘাটে স্নানাদির পর এই প্রস্তর বেদিতে উপবেশন করে শত সহস্র দীন দরিদ্রকে অকাতরে ধন বিতরণ করতেন। তাই এ'টি 'করণ চড়া' নামে পরিচিত। করণ চড়ার ওপরে এক রমণীয় অট্টালিকা বিদ্যমান। স্থানীয় বিশ্বাস অনুযায়ী যেহেতু গৃহটি এক পীঠস্থানের ওপর অবস্থিত সেহেতু এই গৃহে বসবাস কারীর শীঘ্র মৃত্যু অবধারিত। সেইজন্য কেউ এই গৃহে বাস করে না।

মুঙ্গের নগর প্রান্তে এক নির্জন স্থানে ভাগীরথী তীরে বিক্রম চণ্ডীর মন্দির অবস্থিত। মুঙ্গেরের অধিবাসীরা একে বাহান্ন পীঠের অন্যতম বলে থাকে। বিক্রমচণ্ডী সম্বন্ধে স্থানীয় অঞ্চলে এক বিচিত্র কিংবদন্তী প্রচলিত আছে।

দানবীর কর্ণ নাকি প্রতিদিন রাত্রিতে ভাগলপুর থেকে মুঙ্গেরে চণ্ডীকে পূজা করতে আসতেন। ভাগলপুরে ছিল কর্ণপুরী। কর্ণ মুঙ্গেরে উপস্থিত হয়ে অগ্নি প্রজ্বলিত করে তার পর এক কড়া ঘি চাপিয়ে পূজা করতে বসতেন। পূজা সমাপ্ত হলে নিজে পূর্ব্বোক্ত ঘৃতে পড়ে প্রাণত্যাগ করতেন। তারপর তাঁর দেহ ঘৃতে উত্তমরূপে ভাজা হলে চণ্ডীর ডাকিনী যোগিনীরা উপস্থিত হয়ে সেই মাংস নিয়ে আহার করতে বসত। আহার সমাপ্ত হলে একখানি অস্থিতে অমৃত কুণ্ডের জল সিঞ্চন করে তারা কর্ণকে পুনর্জীবিত করে বর প্রদান করত। কর্ণ প্রার্থনা করতেন ঘৃতের কড়ার পরিমাণ স্বর্ণ, রৌপ্য, হীরক ইত্যাদি। পরদিন প্রাতঃকালে কর্ণ ঐ সকল স্বর্ণ, রৌপ্য দরিদ্রদের দান করতেন। কর্ণ প্রত্যহ কিরূপে অত স্বর্ণ-রৌপ্য সংগ্রহ করেন তা জানতে কৌতূহলী হয়ে রাজা বিক্রমাদিত্য কর্ণের নিকট ভৃত্যের ছদ্মবেশে এসে উপস্থিত হলেন। কর্ণ বিক্রমাদিত্যকে ভৃত্যরূপে নিযুক্ত করলেন। অতঃপর বিক্রমাদিত্য কর্ণের পূজা পদ্ধতি, ঘৃতে আত্মাহুতি, পরিশেষে সম্পদ লাভের কৌশল সম্পর্কে অবহিত হলেন। একদিন কর্ণ আসবার পূর্বেই বিক্রমাদিত্য নিজে চণ্ডীর পূজা

সমাপ্ত করে স্বয়ং ঘৃতে আত্মাহুতি দিয়ে ডাকিনী যোগিনীদের আহারোপযোগী হলেন। অতঃপর ডাকিনী যোগিনীরা তাঁর মাংস ভক্ষণ করে পরিশেষে অমৃত কুণ্ডের জলের দ্বারা তাঁর জীবন দান করে বর দিতে চাইলে বিক্রমাদিত্য এইরূপ বর প্রার্থনা করেন যে, সেইদিন থেকে কর্ণ চণ্ডী সমীপে উপস্থিত হওয়ামাত্র যেন তিনি তাঁর প্রার্থিত ধন সম্পদ লাভ করতে সমর্থ হন। আর যেন তাঁকে উত্তপ্ত ঘৃতে প্রাণ দান করতে না হয়। যোগিনীরা বিক্রমাদিত্যের অভিলাষ পূর্ণ করলেন। বিক্রমাদিত্য বর লাভের পর সেই ঘৃতের কড়াখানিকে চণ্ডীর গৃহের ছাদের ওপরে উল্টিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। তদবধি চণ্ডীর গৃহের ছাদ নাকি কড়ার আকার ধারণ করেছে এবং চণ্ডীর নামও হয়েছে বিক্রমচণ্ডী। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী চণ্ডীর গৃহে রাত্রে কেউ একাকী অতিবাহিত করতে পারে না। করলে তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।

বিক্রম চণ্ডী মন্দিরের একদিকে তিন চারটি শিব, অন্নপূর্ণা এবং পার্বতী মূর্তি বিরাজিত। আর প্রবেশ পথে মন্দির মধ্যে অবস্থিত কালভৈরব নামে এক শিবমূর্তি।

নবাবের অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ মাত্র মুঙ্গেরে বর্তমান আছে। মুঙ্গেরে অবস্থিত সীতাকুণ্ড একটি উষ্ণ প্রস্রবণ। এ'টি দৈর্ঘ্যে প্রায় সাড়ে বারো হাত। স্থানটি চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। সীতাকুণ্ডের জল উত্তপ্ত এবং তা থেকে অল্প বাষ্প ও বুদবুদ ওঠে। সীতাকুণ্ডের জল অত্যন্ত স্বচ্ছ।

যাত্রীরা সীতাকুণ্ডের জলে পিণ্ডপ্রদান করে থাকে। সীতাকুণ্ডের অতিরিক্ত জল যা কুণ্ডের মধ্যে সঙ্কুলান হয় না, তা ইষ্টক নির্মিত পয়ঃপ্রণালী দিয়ে বের হয়ে যায়। এখানকার পাণ্ডারা ঐ প্রণালীর এক স্থান ফুটো করে রেখেছে এবং ঐ স্থানকে প্রেতশিলা বলে অভিহিত করে থাকে। এই প্রেত-শিলায় পিণ্ডদান করলে পিতৃ-পুরুষেরা নাকি প্রেতত্ব থেকে মুক্তি লাভ করে থাকেন। সীতাকুণ্ডে প্রবেশের প্রথমেই লক্ষ্মণকুণ্ড এবং রামকুণ্ড বর্তমান। শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরে রাম, লক্ষ্মণ এবং সীতার প্রতিমূর্তি বিদ্যমান।

মুঙ্গেরস্থিত পীর পাহাড় বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। পর্বতের উপর মুসলমান দেবতা পীরের মসজিদ থাকায় পাহাড়টির এতাদৃশ নামকরণ।

মুঙ্গেরে ব্রাহ্মণ এবং রাজপুত ভিন্ন অপর সকল প্রকার জাতির মধ্যেই বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। মুঙ্গেরের মটকী ঘি খুব প্রসিদ্ধ। মুঙ্গেরে এক

সময়ে উৎকৃষ্ট বন্দুক নির্মিত হ'ত। মুঙ্গের স্বাস্থ্যকর স্থান হিসাবে প্রসিদ্ধ। প্রতি বৎসর তাই বহু লোকে মুঙ্গেরে বায়ু পরিবর্তনের জন্য এসে থাকে। মুঙ্গেরের পাথর, পাখা ও ছেলেদের নানাবিধ খেলনাও বিখ্যাত।

সুলতানগঞ্জে গঙ্গার মধ্যস্থলে চরের উপর একটি মন্দিরে গৈরিক নাথ নামে এক শিবমূর্তি বর্তমান। শিবরাত্রির সময় এবং মাঘী পূর্ণিমার সময় বহুযাত্রী গৈরিক নাথের পূজা দিতে আসে। কথিত আছে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বৈদ্য নাথের মস্তকে জল দিতে যাচ্ছিল। জীর্ণ, শীর্ণ ব্রাহ্মণের কষ্ট দেখে বৈদ্যনাথ ব্রাহ্মণ বেশে তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে তৃষ্ণা নিবারণার্থে জল চান। বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণবেশী বৈদ্যনাথকে তৃষ্ণার জল দিলে বৈদ্যনাথ বৃদ্ধকে আপনার প্রকৃত পরিচয় দান করে বলেন যে অতঃপর তিনি সুলতানগঞ্জস্থিত শিবের মধ্যে আসীন থাকবেন। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী গৈরিক নাথশিবের মস্তকে জল প্রদান করলে বৈদ্যনাথের মস্তকে জল দানের ফল হয়ে থাকে। মহর্ষি ভার্গবের আশ্রম থাকায় তাঁর নামানুযায়ী ভাগলপুরের নামকরণ হয়েছে। ভাগলপুরের গঙ্গাতীরে অবস্থিত যোগসর। এখানে বুড়ানাথ নামে এক শিব এবং জয়দুর্গা নামে এক দেবী মূর্তি বিদ্যমান।

ভাগলপুরস্থিত চম্পাই নগর বা চম্পানালা একটি প্রাচীন সহর। পূর্বে ভাগলপুর থেকে এ'টি স্বতন্ত্র ছিল। ক্রমে লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হেতু এ'টি বর্তমানে ভাগলপুরের সঙ্গে সংযুক্ত। চম্পাই নগরে জামুই বা বেহুলানদী নামে এক ক্ষুদ্র নদী বর্তমান। নদীটির প্রকৃত নাম চম্পাবতী। এ'টি গঙ্গার সঙ্গে সংলগ্ন। চম্পাইনগর থেকে কিছুদূরে অবস্থিত কেল্লা। এই স্থানেই নাকি কর্ণের গড় ছিল। তাই চম্পাই নগরেই তাঁর পুরী ছিল বলে বলা হয়। কেল্লার নীচে এক স্থানে দু'টি সুড়ঙ্গ বর্তমান। কথিত আছে, এই সুড়ঙ্গ দিয়ে এসে কর্ণের পরিবার বর্গ নাকি গঙ্গা স্নান করতেন। চম্পাইনগরে নাকি চাঁদ সওদাগর বাস করেছিলেন। প্রতি বৎসর চম্পাইনগরে শ্রাবণ সংক্রান্তি তিথিতে একটি বিখ্যাত মেলা হয়। চম্পাইনগরের কিছুদূরে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তিনটি পাহাড়ের ন্যায় উচ্চ জমি বর্তমান। এ'টিই সাঁতালি পর্বত নামে খ্যাত। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী, চাঁদ সওদাগরের কনিষ্ঠ পুত্র লখীন্দরের এই পর্বত উপরেই সর্পাঘাতে মৃত্যু হয়েছিল।

ভাগলপুরস্থিত সেণ্ট্রাল জেলখানার উত্তরাংশে গঙ্গাতীরে দু'টি অদ্ভুত সুড়ঙ্গ

বর্তমান। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়। একে অনেকে মুনিকোটর বলে।

ভাগলপুর সহরটি অতীব প্রাচীন। নগরটি ভাগীরথী তীরে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ভাগলপুরে হিন্দু ও মুসলমান উভয় জাতির লোকের বাস। তবে এখানে হিন্দুর সংখ্যাই অধিক। ভাগলপুরের অধিবাসীরা অত্যন্ত কুসংস্কারাচ্ছন্ন এবং দুষ্ট প্রকৃতির। চম্পাইনগর ভাগলপুরের পশ্চিমাংশের শেষ সীমা। চম্পাই নগরে চাঁদ সদাগর প্রতিষ্ঠিত বহু প্রাচীন কালের একটি শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। ভাগলপুরে তসর নির্মিত খেস এবং বাপ্তা প্রসিদ্ধ।

কাহাল গাঁয় তিনটি সুন্দর সুন্দর পাহাড় উনানের ঝিকের ন্যায় থাকায় লোকে বলে থাকে এর উপর ভীমের রন্ধনাদি হয়েছিল। কথিত আছে ভীম সেন, ভীম একাদশীর উপবাসের পর এখানে পারণ করেছিলেন।

পীর পৈড়িতে বুদ্ধদেবের মন্দির অবস্থিত। এখানে একজন মুসলমান সাধকের কবরও বর্তমান। মুসলমান সাধকটির নামানুসারেই স্থানটির নাম পীর পৈতি। এখানকার পান খুব প্রসিদ্ধ।

সাহেবগঞ্জের পার্শ্বেই অবস্থিত বিখ্যাত সিক্রিগলি। এখানে একটি কেল্লার ভগ্নাবশেষ বর্তমান। এখানে বহু বাঙ্গালী এবং মারোয়াড়ীর বাস। এখানে মারোয়াড়ীদের উপাস্য দেবতা কৃষ্ণজীর একটি মন্দির বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত হনুমানেরও একাধিক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মন্দির বর্তমান।

বাঙ্গালা দেশে মোঘল রাজত্ব সময়ে রাজমহল ছিল অতিশয় সমৃদ্ধশালী নগরী। মানসিংহ এই নগরীটি নির্মাণ করেছিলেন। সুজা নগরটির সৌন্দর্য অনেকাংশে বৃদ্ধি করেন। এক সময়ে রাজমহল প্রায় দিল্লীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছিল। মুসলমানগণ নগরটিকে 'আকবর নগর' বলে অভিহিত করত। রাজমহলের উত্তর পশ্চিমে যেখানে রাজমহলের পাহাড় গঙ্গার তীরস্থ হয়েছে, সেস্থানে 'তেলিয়াগড়ী' নামক এক প্রসিদ্ধ দুর্গ বর্তমান ছিল। রাজমহল পাহাড়ে 'পাহাড়িয়া' নামক এক আদিম জাতির বাস। রাজমহলে বহু সংখ্যক বাড়ী ও মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রাজমহলের অধিবাসীরা অধিকাংশই মুসলমান, হিন্দুর সংখ্যা এখানে অনেক কম। এখানে জুমা মসজিদ নামে কাল প্রস্তর নির্মিত একটি মসজিদও বর্তমান।

---

১. "ভ্রমণকারি বন্ধুর লিখিত বিষয়" এই উপাধির শ্রেণী মধ্যে যে যে বিষয় প্রকটিত হইয়াছে এতদিন তৎসমুদায় মৎ কর্তৃক রচিত ও প্রেরিত হইয়াছিল। —২৯শে ফাল্গুন ১২৬১ ; সংবাদ প্রভাকর।

২. ৮ই অগ্রহায়ণ, ১২৫৭।

৩. বর্তমান নোয়াখালি।

৪. ২৯শে ফাল্গুন ১২৬১ ; ১২ই মার্চ, ১৮৫৫।

৫. 'আমি যতদূর জানি, দীনবন্ধুর প্রথম রচনা "মানব চরিত্র" নামক একটি কবিতা। ঈশ্বর গুপ্ত কর্তৃক সম্পাদিত "সাধুরঞ্জন" নামক সাপ্তাহিক পত্রে উহা প্রকাশিত হয়।'—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (দীনবন্ধু মিত্রের জীবনী ও কবিত্ব সমালোচনা)।

৬. 'তিনি সেই তরুণ—বয়সে যে কবিত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তাঁহার অসাধারণ 'সুরধনী' কাব্য এবং 'দ্বাদশ কবিতা' সেই পরিচয়ানুরূপ হয় নাই।' —বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপার্ধ্যায় (ঐ)।

৭. এখানে পিরান নামে পরিচিত।

৮. 'ইহা একটি বড় কেদারা, দুই পার্শ্বে দুই দীর্ঘ বরগাতে সংলগ্ন হইয়া ঝুলিতে থাকে এবং তাহা চারিজন লোকেতে বহন করে।'—দেবেন্দ্র নাথের পত্রাবলী ; ৫০।

৯. অথবা পিষ্ঠু, এর অর্থ পিষ্ঠারোহণ।

১০ 'কদল' অর্থে সেতু।

১১. 'লালা' অর্থে গৃহ এবং 'মার, শব্দের অর্থ কন্দর্প।

১২. নিম্নদেশস্থ।

১৩. 'গুল' অর্থে পুষ্প এবং 'মার্গ' অর্থে ক্ষেত্র।

১৪. গো পালক।

১৫. মেষ পালক।

সপ্তম অধ্যায়
বোম্বাই চিত্র

ষোড়শ, সপ্তদশ এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান সমূহ পর্যটন করেছিল সত্য, কিন্তু ধর্মপ্রাণ বাঙ্গালীর এই সকল পর্যটন ছিল একান্ত ভাবেই তীর্থক্ষেত্র সমূহে সীমাবদ্ধ। উনবিংশ শতাব্দীতে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত বাঙ্গালী একদিকে যেরূপ ইতিহাস সচেতন হয়ে ওঠে, অন্য দিকে সেই ইতিহাস সচেতনতার অভিব্যক্তি লক্ষ্য করা গিয়েছিল সমসাময়িক কালে রচিত গ্রন্থাবলীতে। ইতিহাস সচেতন বাঙ্গালী এই সময় ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানের ঐতিহাসিক ঘটনা এবং চরিত্র অবলম্বনে সাহিত্য রচনায় প্রয়াসী হয়েছিল এতদ্ভিন্ন কর্মসূত্রেও শিক্ষিত বাঙ্গলীকে ভারতবর্ষের নানা স্থানেই গমন করতে হয়েছিল। এবং এইরূপে ভারতবর্ষের নানা স্থানেই বাঙ্গালী উপনিবেশ গড়ে উঠেছিল। এই সূত্রেও বাংলা সাহিত্যে এই সকল স্থানের প্রতিফলন ঘটেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্র নাথের মধ্যম পুত্র, প্রথম ভারতীয় আই. সি. এস. সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্মসূত্রে দীর্ঘকাল বোম্বাইতে অতিবাহিত করেছিলেন এবং বোম্বাইয়ের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, এখানকার অধিবাসীদের ভাষা, রীতি নীতি, সংস্কার প্রভৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে পরিচিত হবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'আমি এখানকার একজন প্রাচীন বাসিন্দার মধ্যে গণ্য হইতে পারি। বিশ বৎসর ধরিয়া আমি এ প্রেসিডেন্সিতে কাজ করিতেছি।...আমি ও বোম্বাইকেই নিজের দেশ মনে করি এ দেশ আমার হাড়েমাসে জড়িত,...।' সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর রচিত 'বোম্বাই চিত্র' ॥ ১২৯৫ ॥ নামক বিশাল গ্রন্থে বোম্বাই বাসের অভিজ্ঞতাকে বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করতে হয় যে, সত্যেন্দ্রনাথ তাঁর 'বোম্বাই চিত্র' গ্রন্থটি রচনায় জেমস্ ডগলাস (James Douglas) প্রণীত Bombay and western India ॥১৮৯৩॥ নামক গ্রন্থটির দ্বারাই বিশেষ ভাবে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। জেমস্ ডগলাস তাঁর বোম্বাই এবং পশ্চিম ভারত পর্যটনের অভিজ্ঞতাকেই তাঁর গ্রন্থে প্রকাশ করেছিলেন। তবে ডগলাসের গ্রন্থে বোম্বাইয়ের সামগ্রিক চিত্রটি প্রকাশিত হয় নি। গ্রন্থটি লেখকের কয়েকটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত প্রবন্ধের সঙ্কলন। অপরপক্ষে সত্যেন্দ্র

নাথের গ্রন্থে বোম্বাইয়ের এক সামগ্রিক চিত্র উপস্থাপিত।

ভাষা অনুসারে সত্যেন্দ্রনাথ বোম্বাই প্রেসিডেন্সিকে চারটি ভাগে বিভক্ত করেছেন—গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক ও সিন্ধু দেশ।

সিন্ধুদেশের ভাষা সিন্ধি। সিন্ধি ভাষার লিখন পদ্ধতি উর্দু। সিন্ধু দেশে বর্ষার একান্ত অভাব। নদী, খাল, প্রভৃতির জল দ্বারাই এখানকায় কৃষি কার্য সম্পন্ন হয়। বৃষ্টি হয় না বলে এখানে পাকা গৃহাদি নির্মাণের প্রয়োজন হয় না। খড়, মাটি প্রভৃতির দ্বারাই গৃহাদি নির্মিত হয়ে থাকে। সিন্ধুদেশের উত্তরাংশে শীত এবং গ্রীষ্ম উভয়ের প্রকোপই অধিক। এ অঞ্চলে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রায় অনুপস্থিত বললে অত্যুক্তি হয় না। বাস্তবিক সিন্ধু নদী না থাকলে দেশটি বাসের অযোগ্য হয়ে উঠত। সিন্ধু নদী গঙ্গার ন্যায় বেশ প্রশস্ত। সিন্ধু নদীতে ইলিশ মাছের ন্যায় এক প্রকার মাছ পাওয়া যায়। এর স্থানীয় নাম পল্লা। এখানে পল্লা মাছ খুব জনপ্রিয়। জেলেরা কলসী ভাসিয়ে এই মাছ ধরে থাকে।

নদী ও খালের তটপ্রদেশ ব্যতীত দেশের অন্যত্র গাছপালা প্রায় দৃষ্টিগোচর হয় না বলা চলে। সর্বত্রই বালুকারাজি। এ অঞ্চলে যাতায়াতের ব্যাপারে উটের সহায়তা গ্রহণ অপরিহার্য্য। যাতায়াত ব্যতীত অন্যান্য কার্যেও উটের সহায়তা নেওয়া হয়ে থাকে। যেমন জলের কল, তেলের ঘানি প্রভৃতিও উটের সহায়তায় চালিত হয়।

পশুহরণ সিন্ধিদের প্রায় মজ্জাগত। সুযোগ পেলেই এরা গরু, ঘোড়া, উট, মেষ, মহিষ প্রভৃতি চুরি করে থাকে। এখানে চৌকীদার 'পগী' নামে পরিচিত।

সিন্ধুদেশ শিকারের পক্ষে অত্যন্ত উপযুক্ত। এখানকার বনজঙ্গলে হরিণ বরাহ, নেকড়ে বাঘ প্রভৃতি পাওয়া যায়। সিন্ধিরা সকল শ্রেণীর বাঘকেই 'সিংহ' নামে অভিহিত করে থাকে। সিন্ধিরা অত্যন্ত শিকার প্রিয়।

সিন্ধুবাসী অধিকাংশই মুসলমান। এখানে হিন্দু ধর্মাবলম্বীর সংখ্যা লঘিষ্ঠ। এখানকার হিন্দুগণ আচার-আচরণ প্রভৃতিতে অনেকাংশে মুসলমানেরই অনুরূপ। এরা আমিষ ভক্ষণ এবং সুরাপানেও অভ্যস্ত। 'আমিল' নামে পরিচিত হিন্দুদের প্রধান জাতি কায়স্থ। এদের বেশ ভূষায়ও মুসলমানদের প্রভাব বহুল পরিমাণে লক্ষিত হয়ে থাকে। এরা মুসলমানদের মত শ্মশ্রুজাল মণ্ডিত। এখানকার স্ত্রীলোকেরা অন্তঃপুরে বদ্ধ জীবন যাপন করে থাকে।

সত্যেন্দ্রনাথের সময়েই বোম্বাইয়ে স্ত্রী স্বাধীনতা খুব প্রবল ছিল। একমাত্র মুসলমান আদর্শে প্রভাবিত সমাজেই কুলকামিনীমহলে অবরোধ প্রথা প্রচলিত ছিল। পারসীরা আচার ব্যাপারে ইংরাজের অনুসরণ করলেও বিবাহের ক্ষেত্রে এরা ছিল অত্যন্ত রক্ষণশীল। বোম্বাইয়ে হিন্দু এবং পারসী মহিলাগণ নানাবিধ শাড়ীতে সজ্জিত হয়ে সকল স্থানেই ভ্রমণ করত।

বোম্বাইয়ের হিন্দুদের মধ্যে জাতিভেদ প্রথা কঠিন ভাবে অনুসৃত হলেও চিরবৈধব্য প্রথা এখানকার সকল হিন্দু জাতির মধ্যে প্রচলিত নেই। এমন অনেক হিন্দু জাতি বর্তমান, যাদের সমাজে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ নয়। ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণদের অনুসরণকারীদের মধ্যেই এই প্রথা দৃষ্ট হয়ে থাকে। তবে এখানে বিধবা মাত্রেরই মস্তক মুণ্ডন করবার রীতি বহু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত।

বোম্বাইয়ে অল্প বয়স্ক বালক বালিকার মধ্যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত। গুজরাটে এক জাতীয় কৃষক আছে, এরা কড়ুয়া কুনবী নামে পরিচিত। এদের মধ্যে এক প্রকার বিচিত্র প্রথা প্রচলিত রয়েছে। এদের দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহ কাল উপস্থিত হয়। এবং এই সময় পিতা মাতা তাঁর সন্তান সন্ততির বিবাহের জন্য অতিশয় ব্যগ্র হয়ে ওঠেন। কারণ এই নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হয়ে গেলে পরবর্তী দ্বাদশ বৎসরে আর বিবাহ দেওয়া চলে না। অতএব এই কারণে এই জাতির মধ্যে বাল্য বিবাহ সুপ্রচলিত। অনেক সময় বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হলে দুগ্ধ পোষ্য বালক বালিকারও বিবাহ দেওয়া হয়ে থাকে। অবশ্য মহারাষ্ট্র এবং অন্য কোন কোন দেশে রীতি আছে যে কন্যা বড় না হলে পিতৃগৃহ পরিত্যাগ করে পতিগৃহে গমন করে না।

বোম্বাইয়ে 'নায়িকা' নামে পরিচিত এক শ্রেণীর বারনারী আছে, এরা দেব মন্দিরে নৃত্যাদি করে থাকে। এদের গৃহে সুন্দরী বালিকাকে কখনও কখনও প্রকাশ্য ভাবে এরা নিজেদের ব্যবসায়ে দীক্ষিত করে থাকে। এই প্রকার দীক্ষার বিশেষ বিধান ও অনুষ্ঠান বর্তমান। বিবাহের এক কৃত্রিম অনুষ্ঠানে বরের ঠিকানায় একটি ছুরি কিংবা খঁড়্গাকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়। এই ছুরি বা খড়্গের ওপর পুষ্প মাল্য স্থাপন করে পুরোহিত মন্ত্র পাঠ করে ও মেয়ে এইটিকে পতিত্বে বরণ করে। এখন থেকে কন্যা দেবতার কার্যে ও কুলকর্মে তার জীবন উৎসর্গ করে। এ'টি 'সেজ বিধি' নামে পরিচিত।

গুজরাটে শোক প্রকাশের এক অভিনব রীতি প্রচলিত আছে। মৃত ব্যক্তির জন্য শোক প্রকাশ করবার কালে একদল পেশাদারী স্ত্রীলোক ভাড়া করে আনা হয়। এরা বুক চাপড়িয়ে তীব্র আর্তনাদ করে শোক প্রকাশ করে থাকে। এখানে সর্বত্রই এইরূপ শোক প্রকাশকারী স্ত্রীলোক দৃষ্ট হয়।

গুজরাটে ব্রাহ্মণ এবং উচ্চজাতির মধ্যে মাংস আহার নিষিদ্ধ, তথাপি এখানে মাংসাশী লোকের সংখ্যা নেহাৎ কম নয়। কোঙ্কন ও কানাড়ার সমুদ্র তটবর্তী ধীবর ও অন্যান্য নিম্নজাতির মানুষ মৎস্য ভোজী। এখানকার অধিবাসীরা বাঙ্গালীদের মত মাছ ভাত আহার করে থাকে। মহারাষ্ট্রীয় শূদ্রদের মধ্যেও আমিষ ভক্ষণ নিষিদ্ধ নয়।

এখানে 'সেনবী' নামক এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ দেখতে পাওয়া যায়। এরা নিজেদের 'গৌড় ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দান করে থাকে। এরাও মৎস্যজীবী। অবশ্য অন্যান্য ব্রাহ্মণদের অনুসরণে এদের অনেকেই নিরামিষ আহার করে থাকে। গুজরাটের অধিকাংশ অধিবাসী নিরামিষাশী। কারণ এখানে জৈন ধর্মাবলম্বীদের বাস।

বোম্বাইয়ের অধিবাসীরা প্রধানতঃ রুটি আহার করে থাকে। তবে কোঙ্কন, কানাড়া প্রভৃতি যে সকল স্থানে বর্ষার প্রাচুর্য হেতু প্রচুর ধান উৎপন্ন হয়, সেখানকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য ভাত। এতদ্ব্যতীত, বোম্বাইয়ের এক এক স্থানে বাজরা, জওয়ার, গম প্রভৃতি উৎপন্ন হয়। বলা-বাহুল্য, এই সকল স্থানের অধিবাসীরা এই সকল দ্রব্যই আহার করে থাকে। গুজরাট ও সিন্ধুদেশে বাতরো প্রভূত পরিমাণে হয়ে থাকে। আবার সোলাপুর বীজপুর প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে জওয়ার উৎপন্ন হয়। তাই এইসকল অঞ্চলের শ্রমজীবীদের প্রধান খাদ্য জওয়ার। তবু উল্লেখযোগ্য যে, ধনী এবং উচ্চজাতির লোকেদের ভাত ও বরণ[১] ব্যতীত চলে না। এখানে খাওয়ার সময় নির্দিষ্ট কোন রীতি অনুসৃত হয় না। বাংলাদেশে যেরূপ তিক্ত থেকে আরম্ভ করে মিষ্টান্নে আহারের পরিসমাপ্তি, এখানে কিন্তু রুচি অনুযায়ী যে স্বাদের খাদ্য যে কোন সময়েই গ্রহণ করা চলে। এখানে তরকারী বহুল পরিমাণে আহার করতে দেখা যায়। এখানে তরকারী ঝাল প্রধান। রান্নার মসলার মধ্যে সকল কিছুতেই হিঙের ব্যবহার লক্ষিত হয় এবং মিষ্টান্নে জাফরাণ ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। এ দেশীয় মানুষের আহার্য দ্রব্যের মধ্যে

উল্লেখযোগ্য নানাবিধ চাটনী, নানাবিধ মসলার দ্বারা প্রস্তুত তরকারী, কড়ি,[২] এবং শ্রীখণ্ড[৩]। এতদ্ব্যতীত পরণ, পুরী, সাখরভাত প্রভৃতিও এদেশীয় লোকেদের আহার্যবস্তু সকলের অন্যতম। এ দেশে ছানার মিষ্টান্ন লক্ষিত হয় না। আহারের সময় এদেশে 'সোলা' নামে পরিচিত পট্টবস্ত্র পরিধানের রীতি প্রচলিত।

পারসীরাও মুসলমানদের মত মাংসপ্রিয়। তবে এদের মাংস খুব সাদা-সিধা। হিন্দুদের মধ্যে স্ত্রী ও পুরুষ স্বতন্ত্র আহার করে থাকে। পারসী পরিবারের স্বতন্ত্র আহারের রীতি প্রচলিত।

মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকেরা কোনরূপ শিরোবেষ্টন ব্যবহার করে না। এরা খোলা মাথায় চক্রাকার খোঁপা, তার ওপরে পুষ্প মাল্য এবং স্বর্ণাভরণ ব্যবহার করে থাকে। এরা নাকে নথ পরিধান করে। মহারাষ্ট্রীয় স্ত্রীলোকদের সাড়ী পরবার রীতি কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। এদের অঙ্গাবরণ 'চোলী' নামে পরিচিত। কি মহারাষ্ট্রীয় কি গুজরাটী রমণী সকলেই এই চোলী ধারণ করে থাকে।

এখানে পুরুষেরা মস্তক মুণ্ডন করে থাকে এবং শিখা রাখে। এরা উষ্ণীষ ধারণ করে। এদের পাগড়ীর গঠন ও আকৃতি অনুসারে জাতি ও বর্ণ লক্ষিত হয়। মুসলমানদের জরির বাঁধা মোগলাই পাগড়ী, মহারাষ্ট্রীয়দের শ্বেত কিংবা লোহিত বর্ণের রথচক্র সদৃশ পাগড়ী, গুজরাটীদের রক্ত বর্ণের গজমুণ্ড, পারসীদের ত্রিকোণ বিশিষ্ট লম্বাটুপী, সিন্ধিদের ইংরাজী হ্যাট। এইভাবে এখানে নানাবিধ পাগড়ী লক্ষিত হয়ে থাকে।

পারসীরা এক জাতীয় গুজরাটী বণিকদের অনুসরণে লম্বা পাগড়ী গ্রহণ করেছে। এ'টা কিছু পরিমাণে এদের জাতীয় টুপিরই অনুরূপ। পারসী স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করে থাকে। এদের সংস্কার অনুযায়ী, নগ্ন মস্তকে থাকলে অহরিমান[৪] সহজেই প্রবেশ করে থাকে। পারসী স্ত্রীলোকগণ সাধারণত সুশ্রী এবং গৌর বর্ণের হয়। এরা রঙ্গীন রেশমী শাড়ী পরিধান করে থাকে এবং মাথায় রুমাল বাঁধে।

মহারাষ্ট্রীয়দের মস্তকস্থিত রথচক্রের বিস্তৃতির ওপর এদের মান মর্যাদা নির্ভরশীল। যত সম্মানিত এবং ধনী ব্যক্তি তত বড় পাগড়ী। পারসীদের জাতীয় পোষাক সদরা ও কুস্তি। সদরা এক প্রকার মখমলের জামা। কুস্তি বাহাত্তর

সূত্রের কটিবন্ধ। প্রত্যেক জরতোস্ত বাসীর পক্ষে এ'টি আবশ্যক ভাবে ধারণীয়। কুস্তি তিন বেড়ে কটিদেশ প্রদক্ষিণ করে চার গ্রন্থিতে আবদ্ধ। প্রত্যেক গ্রন্থি বাঁধবার সময় মন্ত্র উচ্চারণ করবার রীতি প্রচলিত। প্রথম মন্ত্র হ'ল ঈশ্বর এক এবং অদ্বিতীয়, দ্বিতীয় মন্ত্র হ'ল জরতোস্ত ধর্মই সত্য। তৃতীয় মন্ত্র হ'ল জরতোস্ত ঈশ্বরের দূত এবং চতুর্থ মন্ত্র হ'ল সদাচরণ করবে ও পাপ পরিহার করে চলবে। এই মন্ত্রসকল উচ্চারণের মধ্য দিয়ে সদর ও কুস্তি পরিধান করে পারসী ব্যক্তি জরতোস্ত ধর্মে দীক্ষিত হয়।

মহারাষ্ট্র অথবা গুজরাট সর্বত্রই পুত্র কন্যার নামকরণ অধিকাংশ ক্ষেত্রে দেবদেবীর নামানুসারে হয়। বৈদিক নাম এখান থেকে প্রায় বিলুপ্ত হয়েছে বলা চলে। মুসলমানদের অনুকরণে কতকগুলি নাম পারস্যভাষায় প্রচলিত হয়েছে।[৫]

গুজরাটে নামকরণ পদ্ধতি 'বাবা' অথবা 'বারগা' নামে খ্যাত।[৬] নামকরণ উপলক্ষে বিশেষ কোন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয় না। স্ত্রীলোকদের দ্বারাই এই নামকরণ কার্য অনুষ্ঠিত হতে দেখা যায়। নবজাতকের নামকরণ করবার দায়িত্ব বিশেষভাবে ফোইয়ের[৭] ওপর সমর্পিত। এই উপলক্ষে তিনি নবজাতকের পিতা অর্থাৎ তাঁর ভ্রাতার নিকট থেকে উপহার প্রত্যাশা করে থাকেন। গুজরাটে নামকরণের প্রথাটি একটু বৈচিত্র্য পূর্ণ।

চারজন বালক যাদের উপনয়ন হয়নি, অথবা পরিবর্তে চারজন স্ত্রীলোক একখণ্ড রেশমের কাপড়ের চারটি কোণ ধরে দাঁড়ায়, পরে নবজাতকের মাতা তাতে নবজাতককে রেখে দেন। বালকেরা অথবা স্ত্রীলোকগণ সেই কাপড়ের ঝোলাটি দোলাতে দোলাতে এই শ্লোক আবৃত্তি করে—

ঝোলী পোলী পীপল পান
ফোইয়ে পাড়্যুঁ॥ অমুক নাম
পিসি রাখে অমুক নাম॥ ।

এর পর মিষ্টান্ন পরিবেশনের মধ্য দিয়ে নামকরণ অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। গুজরাটে ব্রাহ্মণগণ সচরাচর দু'টি নামের অধিকারী হন একটি তাঁদের ডাকনাম এবং অপরটি রাশিনাম। মহারাষ্ট্রীয়দের ক্ষেত্রে দেখা যায় তাদের কতকগুলি নাম কেবলমাত্র তাদের পরিবার এবং আত্মীয় স্বজনদের মধ্যেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এরা বাইরের লোকেদের কাছে এক নামে পরিচিত, অপরপক্ষে

নিজেদের মধ্যে অপর এক নামে অভিহিত হয়ে থাকে। যেমন ঃ

কৃষ্ণ রায়	নানা সাহেব
ভীমরাও	তাত্যা সাহেব
খণ্ডেরাও	ভাউ
গণপতরাও	বালা।

এইরূপে অপপা, আন্না প্রভৃতি আরও কতকগুলি ঘরোয়া নাম আছে। গুজরাটীদের মধ্যে এইরূপে নান্নু, মন্তু, মোটাভাই বলে আরও কতকগুলি নাম প্রচলিত আছে। অনেকসময় পুত্রেরা পিতাকে 'মোটাভাই' বলে অভিহিত করে। এদের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও জ্যেষ্ঠা ভগিনীর জন্য দাদা দিদির অনুরূপ কোন নাম নেই।

গুজরাটে জ্যেষ্ঠা ও মূল এই দুই নক্ষত্র অশুভ বলে পরিচিত। তাই এই দুই নক্ষত্রে পুত্র কিংবা কন্যা জন্মালে সন্তানের জননী নিজের মৃত্যু আশঙ্কা করে থাকেন। এই অমঙ্গল থেকে রক্ষালাভের আশায় সন্তানের নাম জেঠা কিংবা জেঠী, মূলনক্ষত্রে জন্ম হলে মূলজী, শঙ্কর বা মূলী রাখা হয়। অনেকগুলি সন্তানের মৃত্যুর পর দৈবাৎ যদি কোন সন্তান বেঁচে যায়, তবে তার নাম জীবা কিংবা জীবী রাখা হয়। যে গৃহে অনেকগুলি সন্তান, সেক্ষেত্রে ধুনা, কচরা, প্রভৃতি অবজ্ঞা এবং অযত্নসূচক নাম রাখা হয়।

গুজরাটে পুত্রের নামের সঙ্গে পিতার নাম যুক্ত করে দেবার এক রীতি সর্বত্র লক্ষিত হয়ে থাকে।[৮] মহারাষ্ট্রীয়, গুজরাটী, পারসী সকলের মধ্যেই এই রীতি প্রচলিত। অনেকসময় আবার পুত্রের নাম এবং তার পিতার নাম ব্যতীত জাতিসূচক বা মর্যাদাসূচক কোন উপাধি লক্ষিত হয় না। অবশ্য মহারাষ্ট্রীয়দের অনেকেরই কুল পদবী বর্তমান থাকে।[৯] গুজরাটে 'জী' ও 'ভাই' শব্দান্ত নামই অধিক প্রচলিত। কায়স্থ ও বণিকদের মধ্যে দেবতার নামের শেষে দাস শব্দ সংযুক্ত করবার রীতি বর্তমান। এখানে স্ত্রীলোকদের নাম দেবী এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রে নদী থেকে গৃহীত হয়।[১০] এতদ্ব্যতীত পুষ্প কিংবা স্বর্ণ মানিক্যের নামেও কন্যার নামকরণ হয়।[১১]

বিবাহের দিন কন্যা পতিগৃহে উপস্থিত হ'লে গৃহ দেবতার সম্মুখে নবদম্পতী উপবিষ্ট হন। অতঃপর বরের মাতা নববধূর যে নাম রাখা হবে বলে স্থির করেন, তা একটি পাত্রে চাল রেখে তার ওপর অঙ্কিত করেন। পরেনব-

দম্পতীর কানে কানে সেই নাম তিনি বলে দেন। সাধারণতঃ জ্যেষ্ঠা পুত্রবধূর নাম 'লক্ষ্মী' হয়ে থাকে। নামকরণের বিশেষ কোন নিয়ম না থাকলেও সচরাচর স্বামীর নামানুসারেই নব বধূর নামকরণ করা হয়। স্বামীর নাম যদি মহাদেব হয়, তবে স্ত্রীর নাম হয় পার্বতী। আবার স্বামীর নাম যদি শঙ্কর হয়, তা'হলে স্ত্রীর নাম হয় উমা। অনেক সময় গুজরাটে অনূঢ়া কন্যার নামের সঙ্গে 'কুমারী' এবং বিবাহিতা স্ত্রীর নামের সঙ্গে বধূ শব্দ যুক্ত হতে দেখা যায়। এখানে 'বাই' শব্দটি খুব মর্যাদা সূচক বলে বিবেচিত হয়। স্ত্রীলোকদের নামের প্রথমে কিংবা শেষে এই 'বাই' শব্দ যুক্ত থাকে।

পারসীরা সাধারণত পারস্য দেশীয় বীরপুরুষদের নাম গ্রহণ করে থাকে। যেমন দোরাব, সোবাব, জাহাঙ্গীর, জমসেদ ইত্যাদি। এইসকল নামের সঙ্গে গুজরাটী প্রথানুযায়ী 'জী' কিংবা 'ভাই' যোগ করে পারসী নাম সম্পূর্ণ করা হয়। অনেক সময় পারসীরা তাদের পূর্বপুরুষদের অবলম্বিত জীবিকা থেকেও নাম গ্রহণ করে থাকে।[১২]

সত্যেন্দ্রনাথের সময়ে বোম্বাইয়ে সঙ্গীত বিদ্যা অধিকাংশ ক্ষেত্রে পেশাদারী লোকেদের মধ্যেই ছিল সীমাবদ্ধ। এখানে সে সময় সঙ্গীতের আদর্শরূপে গৃহীত হ'ত খেয়াল, ধ্রুপদ প্রভৃতি। মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে সাকী, দিণ্ডি, অভঙ্গ প্রভৃতি কতকগুলি জাতীয়ছন্দের গান শ্রুত হয়। এদেশে ধর্ম প্রচারের উৎকৃষ্ট মাধ্যম হ'ল 'কথা'। একটি ধর্মশিক্ষা নীতি সূত্রকে ব্যাখ্যা করে পরে গান ও উপন্যাসচ্ছলে তার শাখা প্রশাখা বিস্তারের নামই 'কথা'। কথায় যে সকল কবিতা ব্যবহৃত হয়ে থাকে, সাধারণত সেগুলি তুকারাম প্রভৃতি প্রাচীন মহারাষ্ট্রীয় কবিদের রচনা। 'কথা'র বৈশিষ্ট্য হ'ল, 'কথা' প্রসঙ্গে মধ্যে মধ্যে কবিতার সঙ্গে যে গান গীত হয়, সেই গানে উপস্থিত শ্রোতৃবর্গও কথকের সঙ্গে সমস্বরে যোগ দিয়ে থাকে।

গুজরাটে একপ্রকার সঙ্গীত সাধারণের মধ্যে প্রচলিত আছে। এই সঙ্গীতানুষ্ঠানে ভদ্র ঘরের স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই যোগদান করে থাকে। আশ্বিন মাসের নব রাত্রি উৎসবের আরম্ভ থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত এই গরবা গানের ধূম দেখা যায়। সুরাট, বরোদা, আহমদাবাদ প্রভৃতি গুজরাটের প্রধান প্রধান সহরে কুল রমণীরা এই গরবা গানে অংশগ্রহণ করে। সুরাটের নাগর রমণীরা গরবা গানের জন্য খুব প্রসিদ্ধ। গরবা গানের প্রধান

বিষয়বস্তু রাধাকৃষ্ণের প্রেম। কখনও কখনও বিবাহ প্রভৃতির স্থায় গার্হস্থ্য অনুষ্ঠানাদিতেও গরবা গান গীত হতে দেখা যায়। এই গান সচরাচর সমবেতভাবে গীত হয়ে থাকে। অবশ্য একক ভাবে গীত হতেও কোন বাধা নেই। সাধারণত একদল গায়িকা চক্রাকারে ঘুরে ঘুরে করতালি দিয়ে এই গান আরম্ভ করে। প্রথমে প্রধান গায়িকা গান আরম্ভ করে। পরে সকলে মিলে তাতে যোগ দেয়। গরবা গানের প্রতিটি চরণ কিংবা পংক্তি দু'বার করে গীত হয়। অনেক সময় প্রধানা গায়িকা একাকী গান করে থাকে, কেবলমাত্র ধুয়া অংশটি সমবেত ভাবে গীত হয়ে থাকে।

গুজরাটে একপ্রকার নৃত্য প্রচলিত আছে। এ'টি 'কেরল' নামে খ্যাত। এই নৃত্যে নটী পুরুষের বেশে সুতাকাটা, ঘুড়ি ওড়ান, সাপুড়িয়ার ভেঁপু বাজান প্রভৃতি বিষয় নৃত্যের তালে তালে দেখিয়ে থাকে। বলাবাহুল্য 'কেরল' বেশ কৌতূহলজনক উপভোগ্য নৃত্য।

গুজরাটে কৃষিজীবিগণ 'কণবী' নামে পরিচিত। কণবীরা প্রধানত দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। লেওয়া কণবী এবং কড়ুয়া কণবী। লেওয়া কণবী এবং কড়ুয়া কণবী একত্রিত আহার করলেও পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে না। কড়ুয়া কণবীদের দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অন্তর বিবাহের লগ্ন উপস্থিত হয়। এরা অতিশয় উমার ভক্ত। এখানে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী একদিন হর পার্বতী বন মধ্যে বিচরণ করতে করতে একস্থানে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করলেন। মহাদেব উমাকে ঐস্থানে দ্বাদশ বৎসরের জন্য অপেক্ষা করতে বলে নিজে বিরলে তপস্যা করবার উদ্দেশ্যে গমন করলেন। উমা সময় অতিবাহিত করবার উদ্দেশ্যে এই সময়ে মৃত্তিকার পুতুল নির্মাণ করে ক্রীড়া করতেন। অতঃপর দীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর অন্তে মহাদেব পুনরায় এসে উপস্থিত হলে পার্বতীর অনুরোধে মহাদেব পূর্বোক্ত পার্বতী নির্মিত মৃন্ময় পুতুলগুলিতে প্রাণ সঞ্চার করলেন। এই ভাবেই কণবী জাতির নাকি উৎপত্তি। যেস্থানে মহাদেব নিভৃতে দ্বাদশ বৎসর তপস্যা করেছিলেন গাইকবাড় পরগণার অন্তর্গত 'উমা' নামে পরিচিত গ্রামটিকে সেই স্থান বলে নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে। উমা গ্রামটিতে একটি দুর্গা মন্দির বর্তমান। এই দেবীর আদেশেই কড়ুয়া এবং কণবীদের মধ্যে বিবাহ লগ্ন নির্দিষ্ট হয়ে থাকে। প্রতি দশ বৎসর কিংবা

দ্বাদশ বৎসর অন্তর সিংহরাশির সঙ্গে বৃহস্পতির সমাগম ঘটলে তবে বিবাহের সময় উপস্থিত হয়। উমা সম্মতি দান করলে পূজারীরা বিবাহের লগ্ন প্রকাশ করে তা গ্রামে গ্রামে সমস্ত কণবী জাতির মধ্যে দূত দ্বারা প্রচার করে থাকে। এই বিবাহের দিনে কণবী জাতির মধ্যে যত অনূঢ়া কন্যা থাকে, তাদের সকলেরই বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই দিনে এক মাসের সন্তান থেকে আরম্ভ করে বিবাহ যোগ্য সকলেরই বিবাহাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই বিশেষ দিনটি চলে গেলে পুনরায় বিবাহের জন্য দ্বাদশ বৎসর কাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়। সেই জন্য প্রায় কেউই এই সময় অবহেলা না করে বিবাহাদির ব্যবস্থা করে থাকে। যদি কোন কারণে এই সময়ে কন্যার উপযুক্ত বর না পাওয়া যায়, তবে পুষ্পরাশির সঙ্গে তার নাম মাত্র বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হয়। পরেরদিন ঐ পুষ্পরাশি কূপে নিক্ষিপ্ত হয়। এই রূপ ক্রিয়া বরের মৃত্যু বলে পরিগণিত হয়। অতঃপর কন্যার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে কোন রূপ বাধা থাকে না।

গুজরাটে অনুরূপ আর একটি প্রথা প্রচলিত আছে দেখতে পাওয়া যায়। এ'টি 'বাহুবর' বিবাহ নামে পরিচিত। স্বজাতীয় কোন পুরুষ যদি পূর্ব থেকেই এইরূপ অঙ্গীকার করে যে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পেলে তার কন্যার ওপর কোন অধিকার থাকবে না এবং এই বলে যদি সে অর্থ গ্রহণ করে তবে কন্যাদানের অব্যবহিত পরেই সেই বিবাহ বন্ধন থেকে বর ও কন্যা উভয়েই নিষ্কৃতি লাভ করে। যে স্ত্রী এই রূপে অব্যাহতি লাভ করল তার 'নাত্রা' অর্থাৎ পুনর্বিবাহ করবার আর কোন বাধা থাকে না। তবে অনূঢ়া কন্যার 'নাত্রা' হবার বিধি নেই। অতএব বিবাহের পূর্বোক্ত নির্দিষ্ট সময় ভিন্ন তার বিবাহ হতে পারে না। কিন্তু একবার নাম মাত্র বিবাহ হয়ে গেলে পুনর্বিবাহের পক্ষে আর কোন অন্তরায় থাকে না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, নাত্রার কোন নির্দিষ্ট সময় নেই। 'বাহুবর' বিবাহ ক্রিয়া সম্পন্ন হবার পরক্ষণেই বর নিজ আলয়ে গমন করে। অপর পক্ষে কন্যা পিতৃগৃহে এসে হাতের চুড়ি পরিত্যাগ করে স্নান করে, যেন তার স্বামীর মৃত্যু হয়েছে। পরে সুবিধামত পিতা-মাতা কন্যার 'নাত্রা'র ব্যবস্থা করে থাকে।

মুসলমানদের মধ্যে প্রচলিত নিকার সঙ্গে নাত্রা তুলনীয়। তবে নাত্রা নিম্ন বর্ণ হিন্দুদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাত্রায় বিবাহের অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রভৃতির কিছুই প্রয়োজন হয় না। বলাবাহুল্য বিবাহের মত এ'টি ব্যয়বহুলও নয়। বয়স্ক

বিধবা, অল্প বয়সে পতিগৃহে গমন করবার পূর্বে যে সকল হতভাগ্যের বৈধব্যদশা উপস্থিত হয় কিংবা পূর্বোল্লিখিত ভাবে নামমাত্র বিবাহ হবার পর যে স্ত্রীর পুনর্বিবাহ হয়, সেই সব ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত আড়ম্বরের সঙ্গে নাত্রা সম্পন্ন হয়ে থাকে। বরের ধূতির আঁচলের সঙ্গে কন্যার শাড়ীর আঁচলে গ্রন্থি দেওয়া হয়। অতঃপর এই রূপ গ্রন্থি বদ্ধ হয়ে দম্পতী অশ্বারূঢ় হয়ে জনতার মধ্য দিয়ে গীত বাদ্যের সঙ্গে গৃহে প্রবেশ করে থাকে। সেখানে পুরোহিত নব দম্পতীকে গণপতির পূজা করিয়ে বিবাহের কার্য সম্পন্ন করেন। শোনা যায়, কণবী জাতির মধ্যে অজাত সন্তানদেরও কখনও কখনও বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হ'ত।

কণবীদের সকলের কুল সমান নয়। আহমদাবাদের আদিম বাসী কণবীরা কুলশীলে শ্রেষ্ঠরূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। কণবী পিতা মাতা সর্ব্বদা কুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিতে চেষ্টা করে। অকুলীন পাত্রের সঙ্গে কন্যার বিবাহ মহা অপমানের বিষয় রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। কুলীন পাত্র যদি হতশ্রী কিংবা বিগত যৌবন হয়, তথাপি কণবী পিতা মাতা সেই পাত্রকেই নিজ কন্যার জন্য প্রার্থনা করে থাকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে, উচ্চকুলের পাত্রের জন্য কণবী পিতা মাতাকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে হয়। উচ্চকুলের পাত্রের সঙ্গে অনুষ্ঠিত বিবাহও খুব ব্যয় বহুল। এইজন্যই কুলাভিমানী বিত্তহীন কণবী এবং রাজপুতগণের মধ্যে কন্যা হত্যা এক সময় প্রচলিত ছিল। অবশ্য কন্যার প্রতি কণবী এবং রাজপুতগণের বিরাগের অপর এক অদ্ভুত কারণও বর্তমান ছিল। কন্যার বিবাহ হলে, জামাতা কন্যার পিতাকে শ্বশুর, ভ্রাতাকে শালা রূপে সম্বোধন করবে এ'টা ছিল নিতান্ত অপমানের বিষয়। তাই কন্যা ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র তাকে দুগ্ধ পূর্ণ একটি পাত্রে ফেলে দিয়ে পিতা-মাতা কন্যাদায় থেকে মুক্তি লাভ করতেন। এ'টি 'দুধপীতী' প্রথা রূপে পরিচিত ছিল। ইংরাজ রাজত্বে এই প্রথার বিলোপ ঘটে।

কণবী জাতির মধ্যে বর যদি নীচ বংশজ হয়, তবে প্রভূত অর্থের বিনিময়ে তাকে কন্যা ক্রয় করতে হয়। অর্থাভাবে নিজ পরিবারস্থ কোন কন্যার বিনিময়েও অবশ্য পাত্রীলাভ করা যায়। কণবীদের যদি তিন ভ্রাতার তিন ভগিনী থাকে, তবে তারা প্রত্যেকে এক একটি ভগিনীর বিনিময়ে এক একটি পাত্রী লাভ করে থাকে। এই প্রথা 'সট্টা' নামে পরিচিত।

কণবীদের স্ত্রী পুরুষ উভয়েই পরস্পরের সম্মতি ক্রমে বিবাহ বন্ধন থেকে সহজেই মুক্ত হতে পারে। স্বামীর প্রলোভনে প্রলুব্ধ হয়ে অনেক সময় স্ত্রী নিজ অভিলষিত পুরুষের নিকট গমন করে থাকে। বিবাহ সম্বন্ধীয় বিবাদে এরা জাতীয় শাসনকে মান্য করে চলে। জাতির পাঁচজনে মিলে যা সাব্যস্ত করেন, কন্যাপক্ষ এবং বর পক্ষ তাকেই শিরোধার্য করে নেয়। স্ত্রী যদি স্বামীকে পরিত্যাগ করে অপর কারও সঙ্গে বাস করে, তবে স্বামী স্বজাতীয় লোকদের একত্রিত করে নিজের কাহিনী ব্যক্ত করে। অতঃপর জাতির মতানুসারে স্ত্রী কখনও স্বামীর নিকট পুনরায় ফিরে আসে। এই আদেশ লঙ্ঘন করলে অপরাধী পুরুষকে যে ব্যক্তি বিবাহিতা স্ত্রীকে তার স্বামীর অগোচরে নিয়ে যায়, জাতি থেকে তাকে বহিষ্কৃত করা হয়। অনেক সময় অর্থ দণ্ডের বিনিময়েও স্বামীর সম্পত্তি ক্রয়ের আদেশ প্রদত্ত হয়। যে সকল কণবীর মধ্যে স্ত্রীর সংখ্যা কম, সেক্ষেত্রে পুরুষদের বিবাহে মহা গোলযোগ উপস্থিত হতে দেখা যায়। সেক্ষেত্রে কন্যা লাভের জন্য পাত্রকে প্রভূত অর্থ ব্যয় করতে হয় এবং দীর্ঘকাল ধরে বিবাহের জন্য অপেক্ষা করতে হয়।

প্রাচীন কাল থেকেই সিন্ধু দেশ তিনটি ভাগে বিভক্ত—দক্ষিণ সিন্ধু, উত্তর সিন্ধু ও মধ্য সিন্ধু। দক্ষিণ সিন্ধু হায়দ্রাবাদের দক্ষিণে বিস্তৃত। এত-দঞ্চলের প্রধান দুই সহর ছিল করাচী ও ঠাট্টা। পূর্বে করাচী ছিল মক্রগণ প্রদেশের অন্তর্গত, সাগর সান্নিধ্য, উত্তম আবহাওয়া ও বাণিজ্যের জন্য করাচীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। এ অঞ্চল সাধারণত লবণাক্ত এবং মরুভূমি। কেবলমাত্র উত্তর ও দক্ষিণ যেখানে স্বচ্ছ জল সুলভ, সেখানেই কতকগুলি শাক সব্জী ও ফলের বাগান দৃষ্টিগোচর হ'ত। 'মগরপীর' নামক এক উপত্যকা করাচীর তিনক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এই উপত্যকাটি দর্শনীয় স্থানরূপে বিবেচিত হবার যোগ্য। এখানে কুঞ্জবন পরিবেষ্টিত একটি মন্দির এবং মন্দিরের সন্নিকটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ সমন্বিত একটি উষ্ণ জলাশয় বিদ্যমান। 'মগরপীর' এ অঞ্চলের তীর্থক্ষেত্র। মনের বাসনা চরিতার্থ করবার উদ্দেশ্যে মানুষ 'মগরপীরে' গিয়ে ছাগাদি উপহারের মাধ্যমে কুম্ভীর রাজকে পরিতুষ্ট করে থাকে।

এ অঞ্চলের অপর উল্লেখযোগ্য তীর্থস্থান 'হিঙ্গুলাজ'। অবশ্য এ'টি হিন্দুদের প্রসিদ্ধতীর্থ। এ'টি করাচীস্থিত সোনমিয়ানী নামক বন্দরের অনতিদূরেই অবস্থিত। হালা পর্বত শ্রেণীর ধার দিয়ে এই তীর্থে যেতে হয়। পথে অঘোর

নদী অতিক্রম করতে হয়।

এই প্রদেশ বিশেষভাবে রামচন্দ্রের নানাবিধ স্মৃতিবিজড়িত। নদীর ক্রোড়ে কর্দমময় কতকগুলি কুণ্ড বিদ্যমান। এইগুলি 'রামচন্দ্রের কূপ' বলে পরিচিত। এই প্রসঙ্গে এখানে প্রচলিত একটি কিংবদন্তী উল্লেখযোগ্য। রামচন্দ্র সসৈন্যে হিঙ্গুলাজ তীর্থযাত্রায় বের হয়ে পরাস্ত হয়ে ফিরে আসেন। পরে সন্ন্যাসী বেশে 'হিঙ্গুলাজ' তীর্থে প্রবেশাধিকার লাভ করেন। যে স্থান থেকে রামচন্দ্র যাত্রা করেছিলেন, তা পরিচিত 'রামবাগ' নামে। তীর্থ যাত্রীরা 'রামবাগে' সম্মিলিত হয়। এতদ্ব্যতীত যে পথ দিয়ে রামচন্দ্র যাত্রা করেছিলেন, যেখানে বিশ্রাম গ্রহণ করেছিলেন, যে স্থানে তাঁর সৈন্যেরা পরাভূত হয়েছিল সেইসকল স্থান দর্শন করে।

মুসলমান আমলে 'ঠাট্টা' ছিল দক্ষিণ সিন্ধুর প্রধান সহর। এক সময় ছিল যখন সিন্ধুনদী 'ঠাট্টা'র প্রাচীর দিয়ে প্রবাহিত হ'ত। বর্তমানে বাণিজ্যকেন্দ্র হিসাবে করাচীর যে গুরুত্ব পূর্ব্বে 'ঠাট্টা' ছিল সেই গুরুত্বের অধিকারী।

'হায়দ্রাবাদ' মধ্য সিন্ধুর রাজধানী, এ'টি প্রাচীন হিন্দুনগরী 'নীরণ কোটে'র স্থান অধিকার করে বিদ্যমান। 'হায়দ্রাবাদে' সিন্ধু নদীর শাখা নদী 'ফুলেনী' প্রবাহিত। হায়দ্রাবাদ রেশম, জরির কাপড়, সূক্ষ্ম সিনার কাট প্রভৃতির জন্য প্রসিদ্ধ।

দক্ষিণ ভাগের সঙ্গে উত্তর সিন্ধুর উল্লেখযোগ্য পার্থক্য বর্তমান। হায়দ্রাবাদের উত্তরে আর সমুদ্র বায়ু সেবন করা সম্ভবপর হয় না। গ্রীষ্মকালে এই অঞ্চল অতীব উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এখানে দীর্ঘ ৮। ৯ মাস ব্যাপী গ্রীষ্মকাল বিরাজ করে। বর্ষা এখানে হয় না বললেই চলে। শীতকালে আবার এই অঞ্চলে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। মাঝেমাঝে এখানে মস্ত ঝড় উঠে তাণ্ডব নৃত্যের অবতারণা করে। যেখান দিয়ে সিন্ধু নদী প্রবাহিত, তার নিকটস্থ ভূমি ফলবতী। কিন্তু দূরবর্তী স্থানসমূহ কেবলমাত্র সীমাহীন বালুকারাজিতে পরিপূর্ণ। উত্তর সিন্ধুতে কয়েকটি নূতন ও প্রাচীর সহর বর্তমান। নদীর পশ্চিমে অবস্থিত সেওয়ান আরবদের 'সেউইস্তান'। নগরের মধ্যে 'লালসাবাজ' নামক এক মুসলমান পীরের একটি মসজিদ বিদ্যমান। এই 'লাল সাবাজ' সিন্ধুর একজন প্রখ্যাত বীর বলে পরিচিত। তাঁর সমাধি মন্দির মুসলমানদের কাছে পবিত্র তীর্থক্ষেত্র রূপে বিবেচিত হয়ে থাকে। প্রতিবৎসর এক একটি

মুসলমান তরুণী 'লালসা বাজে'র সমাধির সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে থাকে এবং এই উপলক্ষে নাচ গান বাদ্যের সমারোহ হয়ে থাকে। 'লালসাবাজে'র অনুগামী ফকিরদের দীক্ষা বিধি বেশ কৌতূহলজনক। গুরু, শিষ্যের শিরঃ মুণ্ডন ও মুখের শ্মশ্রু প্রভৃতি সমুদায় কেশ মোচনের পর মুখে কাজল আবৃত করে গলদেশে একখণ্ড রজ্জু সংলগ্ন করে সামনে একটি দর্পণ ধরে প্রশ্ন করেন শিষ্য কিরূপ দেখছে। উত্তরে শিষ্য বলে, সুন্দর রূপ দেখছে। অনন্তর শিষ্যের কাঁধে তপ্ত লৌহের দ্বারা দাগ দেওয়া হয়। এবং তারপর তার অঙ্গে ভস্ম লেপন করে দীক্ষা সম্পূর্ণ করা হয়। অতঃপর শিষ্য ভিক্ষার ঝুলি নিয়ে ফকির বেশে বের হয়ে যায়। 'সেওয়ানে' একটি পুরাতন দুর্গের ধ্বংসাবশেষ লক্ষিত হয়ে থাকে। অনেকে এ'টি সেকেন্দর নির্মিত বলে অনুমান করে থাকে।

'সেওয়ান' অতিক্রম করে 'লাড়খানা'। সিন্ধুর পরপারে অবস্থিত 'খয়েরপুর'। খয়েরপুরের উত্তরে সক্কর, বক্কর ও রোঢ়ী, মুসলমান সময়ের তিন বিখ্যাত নগরী। সিন্ধুর ক্রোড়ে অবস্থিত, 'বককর' একটি ক্ষুদ্র দ্বীপ। পূবে 'বককর' দেশের প্রবেশদ্বার রূপে গণ্য হ'ত। সক্করের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত 'শিকারপুর'।

সিন্ধু নদীকে সিন্ধুদেশের প্রাণস্বরূপ বলে অভিহিত করলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয়না। সিন্ধুনদী তিব্বত থেকে নিঃসৃত হয়ে মধ্যে মধ্যে শাখা প্রশাখা বিস্তার করে প্রধান প্রধান নগরীর মধ্য দিয়ে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১৭০০ মাইল প্রবাহিত হয়ে সমুদ্রে গিয়ে পড়েছে।

'সিন্ধুদেশ' মুসলমান অধ্যুষিত। মুসলমানদের মধ্যে কিছু আদিম নিবাসী আসল সিন্ধী। কিছু আফগান বলোচ প্রভৃতি বিদেশী মুসলমান। হায়দ্রাবাদ এবং উত্তর সিন্ধুতেই আফগান অথবা পাঠানগণ দৃষ্ট হয়ে থাকে। এদের অনেকেই পুরুষানুক্রমে সিন্ধুতে এসে বসবাস করছে। এরা বেশ বলিষ্ঠ এবং সুশ্রী। আসল সিন্ধী থেকে এদের সহজেই চেনা যায়।

সিন্ধুতে বলোচদের বসতি পরবর্তীকালের। সিন্ধী অপেক্ষা বলোচেরা বলিষ্ঠ এবং গৌরবর্ণের। এদের শিকার এবং যুদ্ধে প্রবল অনুরাগ লক্ষিত হয়। সিন্ধু দেশে বহু সংখ্যক মুসলমান সুফী পন্থী। সিন্ধুদেশের প্রসিদ্ধ কবি 'সাভেতাই'। সিন্ধুদেশে সুফী সম্প্রদায় আবার দু'টি ভাগে বিভক্ত। এরা

যথাক্রমে 'জলালী' এবং 'জনালী' নামে পরিচিত। 'জলালী'রা অনেকাংশে শাক্তের অনুরূপ। এরা অভক্ষ্য ভক্ষণ, অপেয় পান প্রভৃতি করে থাকে। কিন্তু 'জনালী'রা ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, গুরুভক্তি, উপবাস, ভজন, পূজন, ধ্যান, ধারণা ইত্যাদিতে অনুরাগী। এদের যোগশিক্ষা, 'মুগল'নামে পরিচিত। যোগশিক্ষায় কৃতিত্ব অর্জন করলে তবে সাধক উচ্চতর তপশ্চর্য্যায় নিযুক্ত হয়ে থাকে। এইরূপ সাধন, 'হজুর' নামে পরিচিত। কারণ এতে সর্বদাই হাজির অর্থাৎ নিবিষ্টচিত্তে থাকতে হয়। 'হজুর' ধ্যানের কতকগুলি সোপানমাত্র। গুরুপীর মহাপুরুষদের ধ্যান প্রথম সোপান। এর ওপরের সোপান মহম্মদে মিলন জ্ঞান-ভাব এবং কার্যে তাঁর সঙ্গে সম্পূর্ণরূপে মিলিত হতে হয়। এইরূপ সোপান পরম্পরা থেকে অবশেষে মগ্ন হওয়া জীব ব্রহ্মে লয়ের ভাব পায়।

এখানে হিন্দুরা সাধারণত ব্রাহ্মণ, বণিক ও শূদ্র এই তিন ভাগে বিভক্ত। ব্রাহ্মণগণ আবার 'গোকর্ণ'ও 'সারস্বত' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। গোকর্ণ শ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণেরা মহারাজ ভক্ত বৈষ্ণব পন্থী। এরা ভাটিয়া বণিকদের পুরোহিত।

প্রায় ২০০ বৎসর ধরে 'সারস্বত' পঞ্চগৌড় ব্রাহ্মণেরা সিন্ধুর অধিবাসী। আবার আচরণে এরা বোম্বাইয়ের সেনই ব্রাহ্মণদের অনুরূপ। অবশ্য এরা মাংসও ভক্ষণ করে থাকে।

বণিকদের মধ্যে 'লোহানা' ও 'ভাটিয়া' এই দু'টি শাখাই বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। মূলতানের 'লোহানা' বণিকদের মূল নিবাস। এরা এই স্থান থেকেই জাতীয় নাম গ্রহণ করেছে। এরা বলোচ স্থান, আফগানিস্থান প্রভৃতি নানাদেশে বাণিজ্য সূত্রে ছড়িয়ে পড়েছে।

'লোহানা'গণ ব্যবসা অনুযায়ী আসীল ও বণিক এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। বণিকেরা শ্মশ্রু মুণ্ডন, শিখা রক্ষণ ও পাগড়ী পরিধানে অভ্যস্ত। লোহানাগণের তুলনায় আসীলদের চালচলন কিছুটা ভিন্ন প্রকৃতির।

অপরাপর হিন্দুদের তুলনায় আসীলেরা বেশ হৃষ্ট এবং এরা বেশ সুশ্রী। মুসলমানদের সংস্পর্শে এরাও অনেকাংশে মুসলমান প্রভাবিত। মুসলমানদের ন্যায় এরা বেশভূষা করে, পাগড়ী পরিধান করে এবং শ্মশ্রু ধারণ করে থাকে। তবে এরা কপালে তিলক ধারণ করে থাকে। এরা মদ্য ও মাংস ভক্ষণেও অভ্যস্ত।

উপরোক্ত হিন্দু ভিন্ন হায়দ্রাবাদ, সেওয়ান ও অপরাপর স্থানে অনেক শিখ বসতি লক্ষিত হয়ে থাকে। শিখদের দুই প্রধান শাখা 'খালসা' এবং 'নানক সাহী'। যে কেউ শিখ ধর্মে দীক্ষিত হবার অধিকারী। দীক্ষার সময় শিষ্যকে স্নান করিয়ে শিখ ধর্মশালায় নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে গুরুকে নানাবিধ উপঢৌকন দিয়ে মন্ত্র পাঠ করে তবে শিখ ধর্মে দীক্ষিত হ'তে হয়।

সিন্ধুদেশে হিন্দু ধর্ম তেমন রক্ষণশীল নয়। অনেকে ইচ্ছা পূর্বক মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, আবার মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হবার পরেও অনেকে প্রায়শ্চিত্ত করে পুনরায় হিন্দু ধর্ম গ্রহণ করে থাকে। কখনও হিন্দুকে মুসলমানের আবার মুসলমানকে হিন্দুর শিষ্য হতে দেখা যায়। মুসলমান পীরদের মধ্যে অনেকের হিন্দুনাম। কোন কোন পীরস্থানে লিঙ্গ প্রভৃতি হিন্দুদর দেবচিহ্ন সকল পরিলক্ষিত হয়। সাধারণের মধ্যে পীরপূজা প্রচলিত। এখানে অনেক পীর আছেন যাঁরা হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়েরই পূজনীয়।[১৩] হিন্দুরা 'জেণ্ডাপীর'কে সিন্ধু নদীর অবতার বলে মনে করে থাকে।

সোলাপুরের ৬০ মাইল দক্ষিণে ভীমা ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্তী অধিত্যকায় বিজাপুর অবস্থিত। বিজাপুরের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য প্রায় কিছুই নেই বলা চলে। বিজাপুরস্থিত 'গোল গুম্বজ' সহজেই পথিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে থাকে। এতদ্ব্যতীত এখানে গোর মসজিদ ও অন্যান্য ছোট বড় নানা ইমারতাদি ও ভগ্ন মূর্তি সকল বর্তমান। সহরটি চতুর্দিকে প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। এই প্রাচীরের পরিধি অন্যূন ৩ ক্রোশ ব্যাপী। এই প্রাচীর গভীর প্রশস্ত পরিখায় বেষ্টিত ও বিচিত্রাকারের শতাধিক বুরুজে সুরক্ষিত। এই বুরুজ গুলির প্রত্যেকটি নাকি এক একজন আমীর কর্তৃক নির্মিত। শতাধিক বুরুজের মধ্যে সেরজী, লাণ্ডা কসব, ফিরঙ্গী ও উপরী বুরুজ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সেরজী বুরুজের উপর অতিকায় বিজাপুর তোপ 'মালক ময়দান' অবস্থিত। সহরের উচ্চ ভূমির ওপর স্থাপিত উপরি বুরুজ। উপরি বুরুজের ওপর দু'টি তোপ স্থাপিত। তোপ দু'টি অতিশয় লম্বা। এ'টি 'লম্ব চারী' নামে পরিচিত। উপরি বুরুজের অনতিদূরেই 'মঙ্গল তোরণ' নামক সহরের প্রবেশদ্বার ছিল। ঔরঙ্গজীব 'লম্ব চারী' নামের পরিবর্তে 'ফতে ফটক' নামকরণ করেছিলেন।[১৪]

পাঁচটি তোরণের মধ্য দিয়ে সহরে প্রবেশের পথ। এদের মধ্যে চারটি

অক্ষত। বিজাপুরের কয়েকটি প্রাচীন ইমারত বাদ দিলে এখানে দেখবার মত তেমন কিছুই নেই। প্রাচীন বিজাপুরের সঙ্গে নূতন বিজাপুর সহরের বিস্তর পার্থক্য বর্তমান। আধুনিক বসতি পশ্চিম দ্বারের সন্নিহিত। বিজাপুরস্থিত, আর্ক কেল্লাটি প্রসিদ্ধ। এর আকার গোলাকৃতি এবং এর পরিসীমা প্রায় ১ মাইল হবে। কেল্লার মধ্যে 'সাত মজলী' প্রাসাদ, 'আনন্দ মহল', 'গগন মহল,' মালক জাহান, মসজিদ ও আলি আদিলসার অসম্পূর্ণ সমাধি মন্দির অবস্থিত। সহরের সর্বত্রই প্রাচীন কীর্তি সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে।

বাস্তবিক বিজাপুরের উল্লেখযোগ্য স্থান, 'আর্ক কেল্লা'! দুর্গের অভ্যন্তরে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু মন্দিরের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়ে থাকে। একটি মন্দির অক্ষত রূপে বিরাজমান। এ'টি 'নরসেবার মন্দির' নামে পরিচিত। কথিত আছে, দ্বিতীয় ইব্রাহিম নিজ ধর্ম পরিত্যাগ করে এই মন্দিরে এসে হিন্দুমতে পূজার্চনা করতেন। মন্দিরে মধ্যে মধ্যে মেলা অনুষ্ঠিত হযে থাকে। আর্ক কেল্লার নানাবিধ ইমারতাদি একত্রীভূত। বিশেষত চীন মহলের সৌধমালা উল্লেখযোগ্য। চীন মহলের এক কোণে একটি সরোবর তীরে 'সাত মজলী' বিদ্যমান। 'গগন মহল' ছিল রাজাদের দরবার। এর সম্মুখস্থিত সুবিশাল খিলানটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। উদ্যানসংযুক্ত সুসজ্জিত 'আনন্দ মহল' রাজাদের বিহার ভবন ছিল। 'আনন্দ মহল' প্রকাণ্ড ত্রিতল গৃহ। রাণীদের বায়ু সেবনের জন্য উপরে বেশ প্রশস্ত ছাদ। ছাদের ওপর থেকে অদৃশ্য ভাবে বাইরে দেখা যায়।

বিজাপুরস্থিত প্রাচীন ইমারতাদির ধ্বংসাবশেষগুলির মধ্যে 'বোলগুম্বজ' সর্বোৎকৃষ্ট। 'বোল গুম্বজ' সুলতান মহামুদের সমাধি মন্দির। গুম্বজটি বহির্ভাগ থেকে ১৯৮ ফিট উচ্চ। গুম্বজটি যে চতুষ্কোণ প্রাকারের ওপর স্থাপিত তার প্রত্যেক পার্শ্ব ১৩৫ ফিট দীর্ঘ। ইমারত খানির দৈর্ঘ্য ১৮, ২২৫ ফিট। বাইরের চারটি কোণে চারটি মিনার। গুম্বজের প্রতিধ্বনি গ্যালারি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে এক প্রান্তে কথা বললে তা অন্য সীমান্তে শ্রুত হয়। ধ্বনির এক সঙ্গে বহু প্রতিধ্বনিও শ্রুতিগোচর হয়ে থাকে।

'বোল গুম্বজের' পর বিজাপুরের উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য বস্তু হ'ল ইব্রাহিমের রোজা। এখানে ইব্রাহিম বাদশাহের কবর ও সমাধি বিদ্যমান। বোল গুম্বজ সহরের পূর্ব প্রাচীর ঘেঁসে ভেতরের দিকে, আর ইব্রাহিমের রোজা পশ্চিম

প্রাচীরের কিঞ্চিৎ বহির্ভাগে অবস্থিত। 'বোলগুম্বজ' অলঙ্কার হীন, কিন্তু ইব্রাহিমের রোজা বিপরীত। এ'টি অলঙ্কৃত। জানা যায় এই রোজা নির্মাণে-৬,৫৩৩ জন লোক এবং ৩৬ বৎসর ১১ মাস ১১ দিন সময় লেগে ছিল। সুলতান মাহমুদের পুত্র আলি আদিল সা নিজের জন্য গোল গুম্বুজের অনুরূপ সমাধি মন্দিরের পত্তন করেছিলেন। কিন্তু এ'টি তাঁর দ্বারা সম্পূর্ণ হয় নি। এই অসমাপ্ত সমাধি মন্দিরের এক কোণে একটি চাকচিক্যময় হরিৎ প্রস্তর নির্মিত গোরস্থান পরিলক্ষিত হয়। কারও মতে এ'টি সেকেন্দ্রের গোরস্থান। এর উত্তরে মক্কা ফটক থেকে কেল্লার পথ পর্যন্ত দু'টি গোর মন্দিরে অলঙ্কৃত এই গোরমন্দির পরস্পরের সান্নিধ্য হেতু 'দুই বোন' নামে পরিচিত। এই গোরমন্দির দু'টি যথাক্রমে দ্বিতীয় আলির সচিব প্রধান খাওয়াস খান ও তাঁর গুরু আবদুল খাদিরের।

'দুই বোনে'র অনতিদূরে অবস্থিত প্রাচীর বেষ্টিত একটি উদ্যানের মধ্যে ঔরঙ্গজীবের মহিষীর গোরস্থান। কারও কারও মতে এ'টি সম্রাটের 'মহিষী'র পরিবর্তে তাঁর কন্যার গোরস্থান।

এতদ্ব্যতীত বিজাপুরে 'মোতিগুম্বজ,' 'বারো পায়ার গুম্বজ' প্রভৃতিও অবস্থিত। প্রাসাদগুলির মধ্যে 'আসার মহল' অপেক্ষাকৃত অক্ষয় অবস্থায় বর্তমান। 'আসার মহল' সুলতান মাহমুদ কর্তৃক রচিত। 'আসার মহল' প্রথমে আদালতের উদ্দেশ্যেই নির্মিত হয়েছিল। এ'টি প্রথমে পরিচিত ছিল 'আদালত মহল' বা 'দাদ মহল' নামে। পরে এক নূতন আদালত নির্মিত হলে এর নাম পরিবর্তিত হয় এবং অপর কার্যে নিয়োজিত হয়। 'আসার মহল' চতুষ্কোণ বিশিষ্ট। এর প্রস্থ ১৩৫ ফিট। এর কাষ্ঠ নির্মিত চিত্রিত ছাদটি ৩৫ ফিট উচ্চ এবং চারটি কাষ্ঠ স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। আসার মহলের দ্বিতীয় তলের একটি প্রকোষ্ঠে মহম্মদের শ্মশ্রু স্থাপিত আছে।

কারুকার্যের জন্য বিখ্যাত অপর একটি ইমারত 'মেতের মহল' নামে পরিচিত। কেউ কেউ বলে থাকে 'মেহতর মহলে'র নামকরণ হয়েছে একজন মেথরকে উপলক্ষ করে। এই সম্বন্ধে এখানে একটি কাহিনী প্রচলিত আছে। ইব্রাহিম বাদশাহ কুষ্ঠ রোগে আক্রান্ত হলে একজন গণৎকার তাঁকে পরামর্শ দিয়েছিল শয্যা থেকে গাত্রোত্থান করবার পরই তিনি যার মুখ দর্শন করবেন, তাকে যেন ধনরত্ন দান করেন। এইরূপ পুণ্যকার্য্যের ফলে তিনি

নিশ্চয়ই নিরাময় হয়ে উঠবেন। তদনুযায়ী বাদশাহ প্রত্যূষে গাত্রোত্থান করে একজন মেথরের মুখাবলোকন করেন। অনন্তর গণৎকারের পরামর্শ অনুযায়ী বাদশাহ তাকে যে ধনরত্ন দান করেছিলেন, তাতেই নাকি এই 'মেহতর মহল' নির্মিত হয়েছিল। অপর পক্ষে কারও কারও মতে ফকির দলের মেহতর অর্থাৎ প্রধান কর্তৃক নির্মিত বলে এ'টি 'মেহতা মহল' নামে পরিচিত। এর দোতালার ছাদটি বিশেষ বৈশিষ্ঠ্য পূর্ণ। এ'টি সমতল ও কড়িকাঠের ওপর অবলম্বিত। এর কড়িগুলি প্রস্তর নির্মিত।

বিজাপুরস্থিত মসজিদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষভাবে 'জুম্মা মসজিদ'। বাস্তবিক সমগ্র দাক্ষিণাত্যে অনুরূপ মসজিদ বিরল বলা চলে। প্রধান দ্বার দিয়ে এর চতুষ্কোণ বিশিষ্ট প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলে তিনদিকে মসজিদের গৃহাবলী লক্ষিত হয়। মসজিদের খিলান স্তম্ভময় সুদীর্ঘ, সুন্দর গম্বুজ এবং অপূর্ব ভজনালয় বিশিষ্ট। মসজিদে প্রায় ৪০০০ উপাসক মণ্ডলীর উপবেশনের স্থান আছে।[১৫]

'আটকেল্লা'র মধ্যভাগ 'আনন্দ মহলের' কাছে অবস্থিত। 'মক্কা মসজিদ' মক্কায় অবস্থিত মসজিদের আদর্শে রচিত বলে এ'টি 'মক্কা মসজিদ' নামে খ্যাত। মসজিদ বেশ ক্ষুদ্র অথচ সুন্দর। মসজিদটি উচ্চ প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। অনেকে বলে থাকেন চতুর্দশ শতাব্দীর প্রারম্ভে একজন পীর কর্তৃক মসজিদটি নির্মিত হয়েছিল। এ ছাড়াও বিজাপুরস্থিত 'মালিকা জাহান', 'মালিক সান্দাল', 'আন্দু', 'বোখারা' প্রভৃতি মসজিদ গুলিও উল্লেখযোগ্য। বিজাপুরে বহু সংখ্যক গোরস্থান ও মসজিদ বিদ্যমান।

বিজাপুরস্থিত অপর উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য স্থলগুলি হ'ল বিজাপুরের কূপ, বাপী, তোপ বুরুজ, মসজিদ, গম্বুজ, গোরখ ইমলি, নামক বৃক্ষ প্রভৃতি। সাহাপুর জোরাপুর, ইব্রাহিমপুর, নৌরসপুর, আল্লাপুর, আয়নাপুর প্রভৃতি প্রাচীন বিজাপুরের অন্তর্গত। তবে সকলের মধ্যে সাহাপুরই প্রধান। অধুনাতন পাশ্চাত্য চতুঃপুর—সাহাপুর, জোরাপুর, পীর আমীনের দরগা এবং আফজলপুর সেই প্রাচীন সাহাপুরের ধ্বংসাবশেষ।

সাহাপুরের অন্তর্গত আফজলপুরের নবাব পরিবারের কয়েকটি গোরস্থান মাত্র অবস্থিত।

সাহাপুরের পশ্চিমে 'নৌরসপুর'। স্থানটি বিজাপুর অপেক্ষা রমনীয়। সাহাপুরস্থিত 'সঙ্গীত মহল' প্রাসাদটি বেশ উল্লেখযোগ্য।

বোম্বাই নগরীর মধ্যভাগে অবস্থিত 'জুম্বা দেবী'র মন্দির। কারও কারও মতে এই দেবীর নাম থেকেই বোম্বাই নগরীর নামকরণ হয়েছে। জুম্বা দেবীর মন্দিরটি বেশ প্রাচীন। কথিত আছে ৪০০।৫০০ বৎসর পূর্বে এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।

বোম্বাইয়ের চতুর্দিকে কাপড়ের কল ও অন্যান্য কারখানা সকল বিদ্যমান। বিশালকায় ও সুরম্য সৌধাবলীতে বোম্বাই পরিপূর্ণ। একটি হস্তী দেহের পার্শ্বদেশ মাথা থেকে সামনের পা পর্যন্ত মনে করলে বোম্বাইয়ের আকার সাধারণ ভাবে বলতে গেলে তাই। হাতীটির শুঁড়টি তত নীচে ঝুলে নেই। পা বক্র ভাবে আরও একটু নীচের দিকে গেছে। শুঁড় ও পায়ের মধ্যস্থিত অর্দ্ধচক্র 'Backbay' ওপর দিকের ও মাথার বহির্ভাগে Beach Candy। শুঁড়ের প্রান্ত ভাগে মালাবার কোণ অথবা বিন্দু যেখানে গভর্ণমেণ্ট হাউস সেখানে অবস্থিত। তার ওপরের বালুকেশ্বর রাস্তা ধরে গেলে মালাবার হিল উত্তীর্ণ হওয়া যায়। তার ওপরে 'খম্বালার পাহাড়' বোম্বাইয়ের মধ্যে লোভনীয় জায়গা 'মালাবার হিল'। গজমুণ্ডের ওপর মহালক্ষীর মন্দির অবস্থিত। হাতীর পায়ের অংশটি 'কোলাবা'। কোলাবার উপরিভাগে অবস্থিত ময়দান। এইখানে বণিক, নাবিকদের কার্যালয়। কিঞ্চিৎ ওপরে অবস্থিত দেশ পাড়া, খেতবাড়ী, গিরাগাম, কামতিপুর, প্রভৃতি। এর উত্তরে ভয়কলা, এখানে অবস্থিত—ভিকটোরিয়া উদ্যান ও এলফিনিষ্টন কলেজ। এর নিকট দিয়ে রাস্তাটি পার্কে গেছে।

বোম্বাইয়ে বহু জাতির মানুষের বসতি। কেল্লা থেকে বার হয়ে কালকা দেবীর রাস্তা ধরে পারল পর্যন্ত দুই এক ক্রোশ অগ্রসর হলে বহু জাতির বহু মন্দির দৃষ্ট হয়। হিন্দুর মন্দির থেকে শুরু করে হাবসী—আরব ও মুসলমানদের মসজিদ, পারসীদের অগ্নিগৃহ, ইহুদীদের সিনাগোগ, ইংরাজের গীর্জা প্রভৃতি দৃষ্টিগোচর হয়।

বোম্বাই নগরের অধিবাসীবৃন্দ পাগড়ী পরিধান করে থাকে। এক এক জাতির মানুষের পাগড়ী এক এক রকম। গুজরাটীদের গজমুণ্ড, মহারাষ্ট্রীয়দের রথচক্র, সিন্ধিদের বিপর্যস্ত ইংরাজী হ্যাট, মুসলমানদের জরির মোগলাই পাগড়ী, পারসীদের লম্বা দ্বিকোণ বিশিষ্ট টুপী।

বোম্বাইস্থিত পশ্চিমঘাট শ্রেণীর মধ্যে বহু সুশোভন পাহাড় দৃষ্ট হয়ে থাকে।

এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য 'মহাবলেশ্বর' পর্বত। 'মহাবলেশ্বর' পর্বতের শীর্ষদেশে অবস্থিত 'মহাবলেশ্বর' নামে দেবমন্দির। মহাবলেশ্বরে গ্রীষ্মকালে বহু লোকের সমাগম ঘটে। পাহাড়ের গাত্রে নানাবিধ বাঙ্গালা, উদ্যান প্রভৃতি বিদ্যমান। 'মহাবলেশ্বরে'র পশ্চিমে প্রতাপগড়ের পাহাড় দৃষ্ট হয়ে থাকে।

বোম্বাইয়ে বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী বিচিত্র জাতির বাসের কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। হিন্দুদের মধ্যে গুজরাটী বণিক ও মহারাষ্ট্রীয় বণিক আচার আচরণে বেশ ভিন্ন। মুসলমানদেরও দেশীয় ও পাঠান 'তুরস্ক, আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের মানুষদের বিদেশীয় আখ্যায় ভূষিত করা যায়। এতদভিন্ন এখানে ইহুদী, পোর্ত্তুগীজ, আরমানী, পারসী প্রভৃতি জাতির লোকের বাস।

বোম্বাইয়ে জৈন ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাও বেশ উল্লেখযোগ্য। বিশেষত গুজরাটে এদের সংখ্যাধিক্য। উত্তর গুজরাটে আবুর পাহাড় 'Mount Abu' জৈনতীর্থ হিসাবে বেশ প্রসিদ্ধ।

বোম্বাইস্থিত হিন্দুগণকে প্রধানত শৈব ও বৈষ্ণব এই দুই ভাগে বিভক্ত করা যেতে পারে। কোন হিন্দু শৈব কিংবা বৈষ্ণব তা এদের তিলক দেখে অতি সহজেই নির্ণয় করা যায়। বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী যারা তারা মূল থেকে কেশ পর্যন্ত বিষ্ণুর পদাঙ্কসূচক রেখা ধারণ করে থাকে। অপরপক্ষে শৈবেরা ললাটের বাম পাশ থেকে দক্ষিণ পাশ পর্যন্ত বিভূতি দিয়ে তিনটি তির্যক রেখা অঙ্কিত করে। প্রথমোক্ত তিলককে বলে উর্দ্ধ পুণ্ড্র এবং শেষোক্ত তিলক 'ত্রিপুণ্ড্র' নামে পরিচিত।

বোম্বাই এবং গুজরাটের বৈষ্ণবদের ওপর বল্লভাচার্যের প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষণীয়। বহু স্বর্ণ বণিক এবং ব্যবসায়ী বল্লভাচার্যের অনুগামী। 'বর্তাল' গ্রামে স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ীদের দু'টি মন্দির লক্ষিত হয়ে থাকে। মন্দিরের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের দক্ষিণে রাধিকা ও বাম পার্শ্বে অবস্থিত স্বামী নারায়ণের প্রতিমূর্তি। স্বামী নারায়ণের শিষ্য মণ্ডলী দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত সাধু ও গৃহস্থ। সাধুরা অবিবাহিত এবং গেরুয়া বসনধারী। এরা সন্ন্যাস ধর্মপ্রচার কার্যে নিযুক্ত। স্বামী নারায়ণ সম্প্রদায়ীদের ধর্মগ্রন্থের নাম 'শিক্ষাপত্রী'।

মহারাষ্ট্রে 'বিঠ্ঠল ভক্ত' নামে অপর একটি সম্প্রদায় দেখতে পাওয়া যায়। গুজরাট ও কর্ণাটেও এই সম্প্রদায়ী অনেক লোকের বাস। এদের উপাস্য দেবতার নাম 'বিঠ্ঠল', বা 'বিঠোবা'। এরা 'বিঠ্ঠল' কে বিষ্ণুর অবতার

বলে বিশ্বাস করে। দক্ষিণ পথে ভীমানদীর দক্ষিণ তীরে 'পণ্ডুরপুরে' এই বিঠঠল দেবের এক মন্দির বিদ্যমান। 'পণ্ডুরপুর' মহারাষ্ট্রের এক প্রসিদ্ধ তীর্থ ক্ষেত্র। আষাঢ়ী ও কার্তিকী পূর্ণিমায় বহু সংখ্যক যাত্রীর এখানে সমাবেশ হতে দেখা যায়। মহোৎসবের সময় বিঠঠল ভক্তেরা 'পণ্ডরপুর'স্থিত দেব মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে পরস্পর পরস্পরের অন্নগ্রহণ করে থাকে। এরূপে এই সময় জাতিভেদ প্রথা সাময়িক ভাবে তিরোহিত হয়ে যায়।

বোম্বাইয়ে গুজরাট, মহারাষ্ট্র, কর্ণাট প্রভৃতি নানা প্রদেশ থেকে নানা হিন্দুর সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। অধিকাংশ গুজরাটী ব্যবসা কর্মে লিপ্ত। মধ্য হিন্দুস্থান থেকে বোম্বাইয়ে বহু মারোয়াড়ীর আবির্ভাব ঘটেছে।

মহারাষ্ট্রীয়রা ব্যবসা বাণিজ্যে তেমন দক্ষ নয়। মফঃস্বলে এদের অনেকেই মেষ পালন ও কৃষিকার্য্য করে। শিক্ষিতদের এক উল্লেখযোগ্য অংশ কেরাণী গিরি এবং আইন ব্যবসায়ে নিযুক্ত। এদের ভাষা দক্ষিণে কৃষ্ণা নদী থেকে উত্তরে তাপ্তী পর্যন্ত বিস্তৃত।

বোম্বাইয়ে মহারাষ্ট্রী, গুজরাটী, কণোজ, তেলঙ্গী প্রভৃতি নানা জাতীয় ব্রাহ্মণের বাস। মহারাষ্ট্রী ব্রাহ্মণদের তিন প্রধান শাখা হ'ল দেশস্থ, কোকণস্থ এবং কহ্লাড়। এই তিন শাখার মধ্যেই পান ভোজন সীমাবদ্ধ। গুজরাটী ব্রাহ্মণদের মধ্যে সর্ব প্রধান নাগর ব্রাহ্মণ। এখানে 'সেনই' নামে একজাতীয় ব্রাহ্মণ দেখতে পাওয়া যায়। এরা আমিষ ভক্ষণ করে থাকে। এরা নিজেদের 'গৌড় ব্রাহ্মণ' বলে পরিচয় দেয়। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণেরা এদের ব্রাহ্মণ বলেই গ্রাহ্য করে না।

এইবারে উল্লেখ করা যেতে পারে দাক্ষিণাত্যের 'লিঙ্গায়ৎ' জাতির। এরা শিব উপাসক কিন্তু বৈদিক অনুষ্ঠান বিরহিত স্বতন্ত্র সম্প্রদায়। এদের স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই গলদেশে শিবলিঙ্গ ধারণ করে থাকে। এদের উপাস্য দেবতা শিব এবং শিবের পরিবারস্থ সকলে। শিবের সঙ্গী নন্দীর প্রতিও এরা গভীরভাবে শ্রদ্ধাশীল। এদের আদিগুরু বৃষভ। লিঙ্গায়েতেরা বৃষভকে নন্দীর অবতার বলে বিশ্বাস করে থাকে।

'লিঙ্গায়ৎ' পুরোহিত 'জঙ্গম' নামে পরিচিত। 'জঙ্গমে' রা আবার 'গৃহস্থ' ও 'বিরক্ত' এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। 'গৃহস্থে'রা সংসারী, এরা বিবাহাদি করে। কিন্তু 'বিরক্তে'রা বিবাহ করেনা। 'লিঙ্গায়তে'রা শবদেহ দাহ

করার পরিবর্তে কবর দেয়। এরা মৃত্যু থেকে ভীত নয়। মৃত্যুর জন্য এরা অশৌচ প্রভৃতিও পালন করেনা। এদের মৃত্যু গৃহে নানা অদ্ভুত দৃশ্যাদি লক্ষিত হয়। এদের মৃত্যুর পর মৃতদেহ পুষ্প, চন্দন, বস্ত্র প্রভৃতিতে সজ্জিত করে সমাধি ক্ষেত্রে আনীত হয়। শবদেহের সামনে বাদ্যের আড়ম্বর আর পশ্চাতে শবযাত্রীর অনুগমন লক্ষ্য করা যায়। 'লিঙ্গায়ত' পুরোহিতের প্রভুত্ব খুব। মৃতদেহের ওপর এদের পাদোদক সিঞ্চিত হয় এবং শিবের প্রতি এদের আজ্ঞা পত্র দেহোপরি সংলগ্ন হতে দেখা যায়। এদের বিশ্বাস, পুরোহিতের আজ্ঞাপত্র পাওয়ামাত্র শিব জীবাত্মাকে নিজের কাছে ডেকে নেন। ভারতবর্ষের দক্ষিণ পশ্চিমস্থিত কর্ণাট প্রদেশে এই 'লিঙ্গায়ৎ' সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। পরে এরা ক্রমে ক্রমে মহারাষ্ট্র, গুজরাট ও অন্যান্য স্থানে ছড়িয়ে পড়েছে। বোম্বাইয়ে বেশ কিছু সংখ্যক 'সিয়া' সম্প্রদায় ভুক্ত মুসলমানদের দেশী এবং বিদেশী এই দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে। যারা হিন্দুকুলে জন্মগ্রহণ করে পরবর্তী কালে মুসলমান ধর্মে দীক্ষিত হয়েছে, এদের দেশীনামে অভিহিত করা যেতে পারে। অপরপক্ষে অবশিষ্ট সকলে বিদেশী মুসলমান। অবশ্য এই দুই শ্রেণীর মুসলমানই পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে, তবে কয়েকটি সম্প্রদায় আছে যারা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে থাকে। যেমন কোঙ্কণী মুসলমান, কচ্ছী ইত্যাদি।

বোম্বাইয়ে 'বোহরা' নামে পরিচিত এক জাতীয় মুসলমান দেখতে পাওয়া যায়। এরা মূলত গুজরাটী হিন্দু। পরে একাদশ শতাব্দীতেই এরা মুসলমান ধর্মে ধর্মান্তরিত হয়। এদের পেশা লোকের বাড়ী বাড়ী জিনিস ফেরি করে বেড়ান। এদের প্রধান আবাসস্থল সুরাট। সুরাটস্থিত 'মুল্লা সাহেব' এদের ধর্মযাজক। বোহারাদের ভাষা গুজরাটী।

'খোজা' নামে পরিচিত অপর একটি সম্প্রদায়ের লোক দেখতে পাওয়া যায়, এরা নিজেদের মুসলমান বলে পরিচয় দিয়ে থাকে। কিন্তু এদের আচার ব্যবহার ও ধর্মানুষ্ঠান প্রভৃতি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম মিশ্রিত। এদের উদ্বাহক্রিয়া কাজীদের পরামর্শে সম্পন্ন হয়। আবার সন্তান ভূমিষ্ঠ হলে হিন্দু মতানুযায়ী জাত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান পালিত হয়ে থাকে। মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট কোরাণ এবং দশাবতারের উপাখ্যান উভয়ই পঠিত হয়। মৃত ব্যক্তির সৎকারের ক্ষেত্রেও হিন্দু ও মুসলমান উভয় শাস্ত্রের নিয়মই অনুসৃত হতে দেখা

যায়। 'খোজা' রা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের তীর্থ ই পর্যটন করে থাকে।

বোম্বাইয়ে পারসী জাতির সবিশেষ প্রাধান্য লক্ষিত হয়ে থাকে। পারসী ভিন্ন, ইহুদী, পোর্ত্তুগীজ এবং অপরাপর আরও কতকগুলি জাতি বোম্বাইয়ে বসতি স্থাপন করেছে। গোয়া থেকে অনেক গোয়ানীসও বোম্বাইয়ে এসে বসতি স্থাপন করেছে।

বোম্বাই বঙ্গোপসাগরের প্রকোপ থেকে মুক্ত। গ্রীষ্মকালে বোম্বাই অপেক্ষাকৃত শীতল বলে অনুভূত হয়। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসেও সমুদ্রের বায়ুর জন্য এখানকার উত্তাপ অনেক কম থাকে। বোম্বাইয়ে শীতের প্রকোপ দেখা যায় নবেম্বর থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত। শীতকালে বোম্বাইয়ে উত্তর পূর্ব থেকে শীতল বায়ু প্রবাহিত হতে থাকে। এই সময় বোম্বাই বাস অতীব সুখকর। এই সময় রাত্রি শীতল হলেও দিবসকাল অনতি উষ্ণ থাকে। জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত বোম্বাইয়ে বর্ষাকাল চলতে থাকে। এখানে সারা বৎসরে গড়ে ৮০ ইঞ্চি পরিমিত বৃষ্টিপাত হয়। প্রচুর বর্ষণ এবং সাগর সান্নিধ্য বশত বোম্বাই কখনও উষ্ণাতিশয্যে দগ্ধ হয় না। সেপ্টেম্বরের শেষে ঝড়বৃষ্টির পরিমাণ পুনরায় হ্রাস পায়। অকটোবরে বর্ষার সম্পূর্ণরূপে অবসান ঘটে। এরপর ক্রমে শীতের আগমন ঘটতে থাকে। শীতকালে অন্যান্য স্থান থেকে অনেকে বোম্বাইয়ে এসে উপস্থিত হয়। বোম্বাইয়ের নিকটেই উত্তম স্বাস্থ্যকর স্থানগুলি অবস্থিত।

বোম্বাইয়ের প্রাকৃতিক শোভা সত্যই প্রশংসনীয়। এখানে পাহাড় এবং সমুদ্র দু'টি বর্তমান। বোম্বাইয়ের একদিকে অবস্থিত মালাবার হিল, অপর পার্শ্বে অবস্থিত সমুদ্রতীরস্থিত বন্দর। মালাবার হিলের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ থেকে সাগরদ্বীপ, গিরি এবং বোম্বাই নগরের দৃশ্য অতীব রমণীয়। বোম্বাইয়ের অধিকাংশ মানুষই ব্যবসার দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। বোম্বাই তুলার বাজার হিসাবে খুব প্রসিদ্ধ। এখানে বহু তুলা ও কাপড়ের কল বর্তমান।

উত্তর গুজরাটে লাল রঙ সকলের খুব প্রিয়। দক্ষিণ গুজরাট এবং মহারাষ্ট্রে লাল ও হলুদ বর্ণের সঙ্গে নীল এবং সবুজ রঙেরই বিশেষ প্রাদুর্ভাব। মহারাষ্ট্রীয়রা ছাপওয়ালা সূতার বস্ত্র প্রায় ব্যবহার করেনা বললেই চলে। কিন্তু গুজরাট ও কাটোওয়াড়াবাসীদের ছাপওয়ালা বস্ত্রই অধিক প্রিয়।

বোম্বাইয়ে মিলের বস্ত্রই অধিক প্রস্তুত হয়। এখানে কিঙখাব ও জরির

রেশমী কাপড় অল্পই প্রস্তুত হয়। আহমদাবাদ এবং সুরাট কিংখাবের জন্য প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত পুনা, নাসিক প্রভৃতি স্থানেও উত্তম জরির কেনারি বিশিষ্ট শাড়ী প্রস্তুত হয়। বোম্বাইয়ে পারসী মহিলারাই অধিক পরিমাণে চিনাই রেশমের শাড়ী ব্যবহার করে থাকে।

এখানে উৎকৃষ্ট মৃন্ময় দ্রব্যাদি প্রস্তুত হয় না। শিশম কাঠের ওপর নকসা কাটা গৃহ দ্রব্য নির্মাণের জন্য বোম্বাই বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এতদ্ব্যতীত এখানে প্রস্তুত কাষ্ঠ নির্মিত টিপয়, ডেকস প্রভৃতিও বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। আহমদাবাদ কিংবা সুরাটে বোম্বাইয়ের মত উৎকৃষ্ট কাষ্ঠ নির্মিত দ্রব্যাদি দেখা যায় না। চন্দন এবং শিশম কাঠ, হাতির দাঁতের প্রস্তুত দ্রব্যাদি প্রভৃতি বোম্বাই ও সুরাটেই অধিক প্রচলিত। কর্ণাটকে উৎকৃষ্ট চন্দন কাঠের দ্রব্যাদি প্রস্তুত হতে দেখা যায়।

বোম্বাইয়ে কাপড়ের কলের তুলনায় অপরাপর কলের সংখ্যা নিতান্ত সীমিত।

বোম্বাইয়ে হাইকোর্ট, ইউনিভার্সিটি, স্যার জামসেদজি শিল্প বিদ্যালয়, এলফিনিষ্টন হাইস্কুল, সেনট জেভিয়ার্স কলেজ, পারসী দাতব্য বিদ্যালয়, গোকুলচাঁদ হাসপাতাল, ইউরোপীয় হাসপাতাল, নাবিকাশ্রম, নানাবিধ হোটেল পান্থশালা, আদালত প্রভৃতিও বিদ্যমান। বোম্বাইয়ে কেল্লা ও ময়দানের প্রবেশপথে অবস্থিত ক্রাফোর্ডমার্কেট। আমের জন্যও বোম্বাইয়ের বিশেষ খ্যাতি। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই বোম্বাইয়ে আমের আমদানী লক্ষ্য করা যায়। সমুদ্রতীরস্থিত রত্নাগিরি এবং গোয়া উৎকৃষ্ট আমের জন্য বিখ্যাত। বোম্বাইস্থিত কেল্লা থেকে আধ মাইল দূরে কোলাবা প্রান্তে অবস্থিত বাজারটি দেড় মাইল ব্যাপী বিস্তৃত। দেওয়ালীর পর থেকেই এই বাজারে তুলার আমদানী শুরু হয় এবং মার্চ এপ্রিল মে পর্যন্ত তুলার ব্যবসা পুরাদমে চলতে থাকে।

মুম্বাতলাওয়ের সম্মুখস্থ কাংস্য বাজার থেকে গিরগাম পর্যন্ত হিন্দু ও জৈন মন্দিরে সমাকীর্ণ। বোম্বাইস্থিত হিন্দু মন্দিরগুলির মধ্যে প্রাচীন বালুকেশ্বর, মহালক্ষ্মী, মুম্বা দেবী ও শ্রীব্যঙ্কটেশের মন্দির। এগুলি প্রায় দুশত বৎসরের প্রাচীন। এতদ্ব্যতীত জীবন লালের বল্লভাচার্য মন্দির, মারোয়াড়ীদের বালাজী এবং জগন্নাথের মন্দির, স্বামীনারায়ণ সম্প্রদায়ের মন্দির, নানকপন্থী, কবীরপন্থী,

রাধাবল্লভী, রামানুজ প্রভৃতি প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই নিজস্ব ভজনালয় বর্তমান।

বালুকেশ্বর মন্দিরটি প্রাচীন মন্দিরগুলির মধ্যে অন্তম। এ'টি মালাবার হিলের পশ্চিমে অবস্থিত।

কোলাবা থেকে মাহিম পর্যন্ত মুসলমানদের বহুসংখ্যক মসজিদ লক্ষিত হয়ে থাকে। বোম্বাইয়ের প্রধান মসজিদ হল জুম্মা মসজিদ।

বোম্বাইয়ের বিভিন্ন স্থানে পারসীদের অগ্নিমন্দিরগুলি অবস্থিত। পারসী মন্দিরগুলিকে আতস বেহরাম, আতস আদারণ অথবা আম্বিয়ারি এবং আতস দাদগা এই তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যেতে পারে।

মালাবার হিলের ওপর পারসীদের পঞ্চ শবস্তম্ভ বর্তমান। মৃতের জন্য প্রয়োজনীয় শবস্তম্ভগুলি প্রস্তর নির্মিত প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। প্রাচীরের মধ্যে এক একটি অগ্নি মন্দির অবস্থিত। পারসী শবদেহ সাদা বস্ত্রে আচ্ছাদিত করে পাহাড়ের ওপর স্থাপন করা হয়। আত্মীয় স্বজন প্রভৃতিরা শুভ্রবেশ ধারণ করে শবের অনুগমন করে থাকে। পথিমধ্যে এক বিশ্রাম গৃহে শবদেহ স্থাপিত হয়। এখানে উপাসনাদি হবার পর শবদেহ আনীত হয়। স্তম্ভ প্রস্তর নির্মিত এবং ১৬।১৮ হাত উঁচু। প্রাচীরের একটি দ্বার দিয়ে বাহকেরা প্রবেশ করে দেহটিকে যথাস্থানে এনে রক্ষা করে। স্তম্ভের ওপরে কোন ছাদ নেই। অন্তর্ভাগে প্রস্তর নির্মিত গোলাকার শ্মশান ভূমি। সেই গোল চক্রের তিনটি স্তর ক্রমশঃ নেমে গেছে। মধ্যে এক গভীর গর্ত। পুরুষের দেহ উপরি স্তরে, নারীর দেহ মধ্য ভাগে এবং শিশুদের দেহ একেবারে নিম্ন স্তরে স্থাপিত হয়। যথাস্থানে শব প্রতিষ্ঠার পর বাহকেরা চলে যায়। বহু সংখ্যক শকুনি এই শবদেহ ভক্ষণ করে। কিছুদিন পরে বাহকেরা ফিরে এসে মৃত দেহের অস্থি খণ্ড সংগ্রহ করে মধ্যবর্তী কুয়ায় নিক্ষেপ করে।

বোম্বাইয়ের সকল জাতির মানুষের নানাবিধ উৎসব লেগেই থাকে। মুসলমানদের প্রধান উৎসব মহরম। দশদিন ধরে এই উৎসব চলে। দশম দিনে হুসেনের সমাধি মন্দির 'তাবুৎ' সমুদ্রে বিসর্জন দেওয়া হয়। বোম্বাইয়ে সিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমানের সংখ্যা অধিক। তাই মহরমের সময় এখানে যেমন আড়ম্বর লক্ষিত হয় অন্যত্র তেমন দেখা যায় না। মহরমের শেষ দিনে 'হুসেন বধ' নাটক অভিনীত হয়ে থাকে।

নবরাত্রি উপলক্ষে কোন কোন হিন্দু গৃহে দুর্গাপূজা এবং গুজরাটী রমণীদের

মধ্যে 'গরবা' গানের ধূম লেগে যায়। দশমীর দিন মুম্বাদেবী এবং ভুলেশ্বর মন্দিরে দেবী দর্শনের জন্য ভীড় লেগে যায়। কথিত আছে পঞ্চ পাণ্ডবেরা বিরাট রাজ্যে প্রবেশের প্রাক্কালে শমী বৃক্ষতলে অস্ত্র রেখে শমী পূজা সম্পন্ন করেছিলেন। এই দৃষ্টান্তের অনুসরণে বোম্বাইয়ে বিজয়াদশমীতে শমী পূজা হ'তে দেখা যায়। সিন্ধু দেশেও শমী পূজা হতে দেখা যায়। গ্রামের বাইরে লোকেরা শমী বৃক্ষতলে মিলিত হয় এবং পরস্পরের মধ্যে শমী পত্র আদান প্রদান করে। মহারাষ্ট্রে দশহরায় বিশেষ ধূম লেগে যায়। এই সময়ে অশ্ব সকল বিচিত্র ফুলহারে সজ্জিত হয় এবং নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মেষ-মহিষ প্রভৃতি বলি দেয়।

বোম্বাইয়ে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে দেওয়ালী উৎসব পালিত হতে দেখা যায়। এই সময় ইহুদী ও খ্রীস্টানগণ ব্যতীত অপর সকল সম্প্রদায় ভুক্ত লোকই উৎসবে মেতে ওঠে। সকলেই এই সময় নিজ নিজ গৃহাদি আলোকিত করে। দেওয়ালী আরম্ভ হয় ধনত্রয়োদশী তিথিতে এবং শেষ হয় অমাবস্যায়। এখানে দেওয়ালী উৎসবের অধিষ্ঠাত্রী দেবীর কালীর পরিবর্তে লক্ষ্মী। অমাবস্যার দিনই দেওয়ালী উৎসবের প্রধান দিন। এইদিন বণিকেরা বই পূজায় মত্ত হয়। এই দিন বণিকেরা পুরাতন হিসাব পত্র শেষ করে নববর্ষের হিসাব শুরু করে।

শ্রাবণী পূর্ণিমায় বোম্বাইয়ে অপর এক উৎসব লক্ষিত হয়। এই সময়ে হিন্দুরা ছোট বড় নির্বিশেষে উপযুক্ত সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নারকেল এবং পুষ্প হাতে সমুদ্রতীরাভিমুখে গমন করে। এই দিন থেকে নাবিকেরা সমুদ্র যাত্রায় বার হয়। শুভ যাত্রার কামনায় এইদিন ফল মূল দ্বারা সমুদ্রের আরাধনা করা হয়ে থাকে। ব্যাকবের তীরে বহু সংখ্যক লোককে এই সময় সাগর অর্চনা করতে দেখা যায়। চাল, দুধ, নারকেল প্রভৃতি মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক সমুদ্রে নিক্ষিপ্ত হয়।

বোম্বাইয়ের অপরাপর উৎসবগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য দোলযাত্রা, গণেশ চতুর্থী, নাগপঞ্চমী, গোকুলাষ্টমী, রাম নবমী প্রভৃতি। বোম্বাইয়ে হনুমান সাধারণের উপাস্য দেবতা। এতদভিন্ন এখানে গণেশের বিশেষ সম্মান।

গণেশ চতুর্থী তিথিতে বোম্বাইয়ে বিশেষ আড়ম্বর লক্ষিত হয়ে থাকে। বোম্বাইযে 'ভ্রাতৃদ্বিতীয়া' 'যমদ্বিতীয়া' নামে পরিচিত। এদেশে সরস্বতীরবাহন

ময়ূর। এখানকার দেবমূর্তিগুলি প্রায়শই কদাকার। নাট্যাভিনয়ের সময় প্রথমেই ময়ূরাসন বীণাপাণি নৃত্যের অবস্থায় রঙ্গভূমিতে অবতীর্ণ হয়ে থাকে।

বোম্বাইয়ের নিকটেই অবস্থিত 'গজদ্বীপ'। এলিফাণ্টার বা গজদ্বীপের অপর নাম 'ঘারপুরী'। এই দ্বীপে অবস্থিত গুহা মন্দির সকল পাহাড় খুদে নির্মিত। 'আপলো' বন্দর থেকে ষ্টীমারে করে 'এলিফাণ্টা' দ্বীপে যাওয়া যায়। পূর্বে দ্বীপের অবতরণ স্থলে প্রস্তর নির্মিত একটি বিশালকায় হস্তী মূর্তি ছিল। এই মূর্তি থেকেই দ্বীপের নামকরণ হয়েছে, 'এলিফাণ্টা' বা 'গজদ্বীপ'। এই মূর্তি আর নেই। গুহার প্রবেশের দ্বারটি বেশ বড়। সারি সারি চার থাক স্তম্ভের মধ্য দিয়ে প্রধান মন্দিরে প্রবেশ করা যায়। এই সব স্তম্ভ বিরাটকায় প্রস্তরময় ছাদের ভারবহন করছে। স্তম্ভের সংখ্যা সর্বমোট. দ্বাচত্বারিংশৎ। মন্দিরের প্রবেশ দ্বার থেকে শেষ পর্যন্ত প্রায় ১৩০ ফিট দীর্ঘ এবং পূর্বদ্বার থেকে পশ্চিম দ্বার পর্যন্ত অনুরূপ প্রস্থ সম্বলিত। কোন কোন শৈব উৎসবে এই 'গজদ্বীপে' কিছু কিছু যাত্রীর সমাগম লক্ষ্য করা যায়। শিবরাত্রির সময় এখানে এক মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মন্দিরের অভ্যন্তর ভাগে খোদিত প্রায় সকল মূর্তিই শৈব। চতুর্দ্বার বিশিষ্ট একটি প্রকোষ্ঠে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। এই প্রকোষ্ঠের বাইরের চতুর্দিকে দ্বার পালগণ পিশাচের ওপর ভর দিয়ে দণ্ডায়মান। উত্তরদিক থেকে প্রবেশ করলে সম্মুখে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বরের মূর্তি দৃষ্ট হয়ে থাকে।

এই ত্রিমূর্তির দক্ষিণে অবস্থিত অর্ধনারীশ্বর এক মূর্তি। এর বামার্ধ গৌরী এবং দক্ষিণার্ধ মহাদেব। এই অর্ধনারীশ্বর মূর্তির দক্ষিণে হংসবাহন চতুর্মুখ ব্রহ্মা এবং ব্রহ্মার বামপাশে গরুড় বাহন বিষ্ণুমূর্তি বিদ্যমান। এতদ্ব্যতীত অপরাপর অনেক দেব মূর্তিও বিরাজমান।

ত্রিমূর্তির বাম পাশে অবস্থিত হরপার্বতীর বিশালকায় মূর্তি। হরশির থেকে গঙ্গা যমুনা এবং সরস্বতীর অভ্যুদয়। মহাদেবের মূর্তিটি দণ্ডায়মান অবস্থায় অধিষ্ঠিত। শিবের দক্ষিণে তাঁর অপরাপর অনুচরগণের মূর্তি বর্তমান। পার্বতী শিবের দিকে কিঞ্চিৎ ঝুঁকে এক পিশাচীর ওপর তাঁর বামহাত ভর দিয়ে বর্তমান। তদুপরি গরুড়াসীন বিষ্ণুমূর্তি। সর্বোপরি ছ'টি মূর্তি বিদ্যমান। এদের দু'টি নারী মূর্তি অবশিষ্টগুলি নরমূর্তি।

ত্রিমূর্তির কিঞ্চিৎ বামস্থিত পশ্চিম প্রকোষ্ঠে হরপার্বতীর বিবাহ সভার

মূর্তি খোদিত। অপর একটি প্রকোষ্ঠে গণেশের জন্ম লাভের বৃত্তান্ত খোদিত।

এতদ্ভিন্ন দক্ষযজ্ঞের বৃত্তান্ত, মহাদেবের অষ্টভুজ ভৈরব মূর্তি, যোগাসনস্থিত মহাযোগীমূর্তিদ্বয় প্রভৃতিও লক্ষ্য করা যায়। তবে সব মূর্তিই ভগ্নদশা প্রাপ্ত।

---

১. ডাল।

২. এক প্রকার মসলা যুক্ত দইয়ের ঝোল।

৩. জাফরান ও মিষ্টি দই দিয়ে প্রস্তুত এক প্রকার খাদ্য। মহারাষ্ট্রীয়দের কাছে পরম উপাধেয় বলে বিবেচিত হয়।

৪. শয়তান।

৫. যেমন দৌলত রায়, হুকুমত রায়, খুসাল রায়, মহতাব রায় ইত্যাদি।

৬. 'বার' বাসর বলেও অভিহিত হয়।

৭. পিসিমা।

৮. যেমন পিতার নাম সারাভাই, পুত্রের নাম ভোলানাথ সারাভাই, আবার পৌত্রের নাম ভীমরাও ভোলানাথ।

৯. যথা গোড় বোলে, কড়কড়ে, জোসী-মুন্সী ইত্যাদি।

১০. যেমন সীতা, জানকী, পার্বতী, লক্ষ্মী, উমা, দুর্গা, রেবা, যমুনা ইত্যাদি।

১১. যেমন সোনু বাই, আনা বাই, দুর্গা বাই, বাই রতন ইত্যাদি।

১২. যথা বোতল ওয়ালা, বাসওয়ালা, দারুখানা ওয়ালা।

১৩. যেমন সেওয়ানের পীর লাল সাবাজ।

১৪. ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে।

১৫. এই ভজনালয়টি সুলতান মাহমুদের আদেশে তাঁর ভৃত্য মালিক য়াকুব কর্তৃক ১৬৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নির্মিত।

১৬. এই সম্প্রদায়ের স্বষ্টিকর্তা সহজানন্দ স্বামী।

অষ্টম অধ্যায়
আর্য্যাবর্ত, ধোলপুর ও তীর্থমুকুর

উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় মহিলাদের রচিত ভ্রমণ বিষয়ক রচনা তেমন লক্ষিত হয় না। এর কারণ, অন্তঃপুরবাসী রমণীদের দেশ ভ্রমণের সুযোগ ছিল নিতান্তই সীমিত। একমাত্র তীর্থ দর্শন উপলক্ষে কখনও কখনও অন্তঃপুর রুদ্ধা বঙ্গনারী ভ্রমণের সুযোগ লাভ করতেন। তবে সেই ভ্রমণের লিপিবদ্ধ বিবরণ দেখা যায় না। উনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মহিলাদের ভ্রমণ বিষয়ক রচনাবলীর মধ্যে রাজকুমারীদেবীর ইংলণ্ডে বঙ্গ বধূ, প্রসন্নময়ী দেবী রচিত 'আর্য্যাবর্ত' এবং গিরিন্দ্র নন্দিনী দেবীর 'ধোলপুর' উল্লেখযোগ্য।

প্রসন্নময়ী দেবী রচিত 'আর্য্যাবর্তে' (১২৯৫) ভারতবর্ষের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থান সমূহের বিবরণ প্রদত্ত হয়েছে। লেখিকা গ্রন্থের 'অবতরণিকায় তাঁর ভ্রমণের কারণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেছেন, 'মাতৃভূমির ঘটনাপূর্ণ প্রধান প্রধান স্থানগুলি দেখিবার প্রবল ইচ্ছা হৃদয়ে যত্নের সহিত আশৈশব পোষণ করিয়া আসিতেছিলাম ; কখন যে সে অভিলাষ পূর্ণ হইবে আমার, কিন্তু এমন বিশ্বাস ছিল না। অবরোধবাসিনী হিন্দুমহিলাদিগের পক্ষে দেশ ভ্রমণ কত যে অসম্ভব তাহা সহজেই অনুমেয়। হিন্দু ধর্মে অচল বিশ্বাসে পূর্বেও শত শত মহিলা তীর্থ দর্শনে যাইতেন এবং এখনও গিয়া থাকেন, তথাপি ইহা হিন্দু রমণীর পক্ষে যে তত সহজ সাধ্য নহে, ইহা কে না স্বীকার করিবে ? দেশ ভ্রমণের কল্পনা অথবা স্বপ্ন আমার কখনই সফল হইত কিনা, তাহা আমি জানি না ; কিন্তু সঙ্কটাপন্ন শারীরিক অসুস্থতা ও আত্মীয় স্বজনের উদ্বিগ্ন স্নেহে আমার এই অভিলাষ পরিপূর্ণ হইয়াছে।

......অসুস্থতাই আমার ভ্রমণের মুখ্য কারণ।[১]

লেখিকা সর্ব প্রথম এটোয়ায় গিয়ে উপস্থিত হন। এখানকার জলবায়ু তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে অনুকূল হওয়ায় এখানেই তিনি দীর্ঘ দিন অতিবাহিত করেন।

এটোয়া একটি ক্ষুদ্র নগর। পার্বত্যময় স্থান না হলেও এটি বেশ উচ্চ স্থানে অবস্থিত। পুরাতন সহরের নিম্ন ভাগ দিয়ে যমুনা প্রবাহিত। যমুনার

ঘাটগুলি বাঁধান এবং ঘাটের ওপরে শিবমন্দির বিদ্যমান। যমুনা তীরে বহুসংখ্যক ময়ুর দেখতে পাওয়া যায়। যমুনা তীরের অনতিদূরেই একটি ভগ্ন দুর্গ ও একটি ক্ষুদ্র গৃহ দৃষ্ট হয়ে থাকে। শেষোক্তিটি 'বারদ্বারী' নামে পরিচিত।

পশ্চিমাঞ্চলে ইদারা থেকে সকলে পানীয় জল সংগ্রহ করে থাকে। এখানকার ইদারাগুলি যেমন গভীর, জলও তেমনি স্বাস্থ্যকর।

এটোয়ার রাজপথগুলি বেশ পরিষ্কার তবে জনতাহীন। স্থানীয় অধিবাসীদের আবাসস্থলগুলি খুবই ক্ষুদ্র এবং রৌদ্র বাতাস বর্জিত। এখানে শীত ও গ্রীষ্ম উভয়ের প্রকোপ খুব। প্রবল শৈত্যের আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য তাই এখানকার গৃহগুলি বিশেষভাবে নির্মিত। এ অঞ্চলে শীতকালে সকলে গৃহ মধ্যে এবং গ্রীষ্মকালে ছাদে বা প্রাঙ্গণে শয়ন করে থাকে। এই জন্য গৃহ মধ্যে বায়ু প্রবেশের সম্যক ব্যবস্থা থাকে না।

এদেশের আচার-আচরণ ও ব্যবহৃত পরিচ্ছদ বিশেষ বৈচিত্র্যপূর্ণ। হিন্দুস্থানী পুরুষেরা ধুতি, পায়জামা, চাপকান ও টুপী পরিধান করে থাকে। স্ত্রীলোকেরা ল্যাংঘা,[২] আঙ্গরাখা ও চাদর ব্যবহার করে। মুসলমান ও ক্ষত্রিয় রমণীরা জুতা এবং খড়ম পরিধান করে থাকে। এদেশের লোকেরা বেশ স্বাস্থ্যবান এবং এদের রঙ ফরসা। পশ্চিমাঞ্চলে খাদ্য সামগ্রী বেশ সুলভ। এ অঞ্চলের দুধ ও নবনী অত্যন্ত উপাদেয়। অন্যান্য দ্রব্যাদিও পাওয়া যায়। হিন্দুস্থানীরা সারাদিনে মাত্র একবার অন্নাহার করে থাকে। এদের প্রধান খাদ্য ভাত নয়, রুটি। এখানকার ভিক্ষুকদের ময়দা অথবা রুটি ভিক্ষা দেওয়ার রীতি প্রচলিত।

এখানকার মানুষ আরামপ্রিয় নয়। এরা বাহিক আড়ম্বরের প্রতি আসক্ত। স্ত্রীলোকদের বেশভূষার প্রতি বিলক্ষণ দৃষ্টি থাকলেও তা মোটেই সুমার্জিত নয়। এদের সর্বাঙ্গ উলকি দ্বারা চিহ্নিত।

এটোয়ার অবরোধ প্রণালী অত্যন্ত কঠিন। বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক উৎসবে ভদ্র রমণীরা মঝোলীতে[৩] আরোহণ করে আবরণের মধ্য থেকে উচ্চৈস্বরে গান গাইতে গাইতে যায়। অবশ্য সাধারণ স্ত্রীলোকেরা প্রকাশ্য ভাবে ঘোড়ায় আরোহণ করে কুটুম্ব বাড়ী যাতায়াত করে থাকে।

হিন্দুস্থানীরা অধিকাংশই পৌত্তলিক। তবে প্রতিমা পূজার প্রচলন

এখানে তেমন নেই। মহাদেব প্রভৃতি যে সকল বিগ্রহ এখানে আছে, তাদেরই পূজা মধ্যে মধ্যে হতে দেখা যায়। যারা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী তারা মূর্তিবিহীন মন্দিরে অনুরূপ উপাসনা করে। এরা অহিংসা ধর্মে এতদূর বিশ্বাসী যে, কীট পতঙ্গাদির মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে বলে রাত্রিকালে প্রদীপ পর্যন্ত প্রজ্বলিত করে না। এদের দ্বার থেকে দীন দরিদ্রেরা কখনও শূন্য হস্তে প্রত্যাবর্তন করে না। এরা অত্যন্ত অতিথি বৎসল। এমন কি নিজেরা উপবাসী থেকেও অতিথিদের আপ্যায়িত করে থাকে।

এখানে বাল্য বিবাহ প্রথা বিদ্যমান। অনেক সময় মাতৃগর্ভ থেকেই সন্তানাদি পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়ে থাকে। এরা বাঙালী ব্রাহ্মণদের জাতিচ্যুত বলে মনে করে। এদের ধারণা, বাঙ্গালী মাত্রেই খ্রীষ্টান। তাই এরা বাঙ্গালী-দের কোন দ্রব্য ভক্ষণ করে না। লালা[৪] ব্যতীত কোন ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় প্রদেশে মদ্যপান করে না। সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয় সমাজ থেকে পরিত্যক্ত হয়ে থাকে। তবে নিম্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্যে 'মোয়া' এবং 'তাড়ি' পানের রীতি প্রচলিত।

এদেশে জমির অধিকারীমাত্রই জমিদার নামে পরিচিত। এক বিঘা কি ততোধিক জমির মালিককেও 'জমিদার' নামে অভিহিত করতে দেখা যায়। ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়েরা এখানে নিজেরাই কৃষিকার্য সম্পন্ন করে থাকে। যমুনার তীরে অবস্থিত আগ্রা। আগ্রার প্রস্তর নির্মিত রাজপথগুলি সর্বদাই জনস্রোতে পরিপূর্ণ লক্ষিত হয়। এখানকার বিপনীগুলি বেশ পরিপাটি রূপে সজ্জিত।

আগ্রাস্থিত তাজমহল দেখতে প্রতিদিন বিপুল জনসমাগম ঘটে। তাজমহলের সম্মুখেই রমণীয় পুষ্পোদ্যান। এই পুষ্পোদ্যানে অনেকগুলি কৃত্রিম উৎস বিদ্যমান। আগ্রার অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হ'ল 'ইসলামদৌলা'[৫]। এর প্রস্তর-ময় ভিত্তি যমুনা বক্ষে প্রোথিত। বাদশাহগণ এখান থেকে যমুনার জলক্রীড়া উপভোগ করতেন।

আগ্রাস্থিত দুর্গটিকে একটি সুন্দরীনগরী রূপে অভিহিত করলে সম্ভবত অত্যুক্তি হয় না। এই দুর্গের মধ্যেই 'মতি মসজিদ' ও অন্যান্য বিখ্যাত প্রাসাদগুলি বর্তমান। 'মতি মসজিদ' মোঘল বাদশাহগণের পারিবারিক ভজনালয় ছিল। মসজিদটি প্রস্তর নির্মিত। পূর্বে এ'টি মূল্যবান প্রস্তরে ভূষিত ছিল।

দুর্গমধ্যে বাদশাহদের সায়াহ্ন সমীরণ সেবন স্থানও বিদ্যমান। সম্রাট আকবর নাকি এই প্রাসাদের ওপর থেকে অস্তগামী সূর্যের আলোকে মথুরার দেব মন্দিরের শীর্ষদেশ দর্শন করতেন।

এখানে দু'খানি 'তক্ত' প্রস্তরাসন বর্তমান। কৃষ্ণ বর্ণের শিলাসনে স্বয়ং বাদশাহ এবং শ্বেতাসনে বীরবল উপবেশন করে কখনও কখনও নিশীথকালে গুপ্ত দরবার করতেন।

'শীশমহল' বেগমদের চারু নিকেতন ছিল। এর ভেতরের সমুদায় প্রাচীর আয়না দ্বারা সজ্জিত। বেগমগণের প্রাসাদের নিম্নতলে তাঁদের বাঁদীরা অবস্থান করত। এই স্থান অতিশয় শোচনীয়।

বেগমদের স্নানাগারটিও অতীব রমণীয়। স্নানাগারের প্রাচীরও দর্পণে শোভিত। স্নানের নিমিত্ত এর অভ্যন্তরে একটি বৃহৎ কৃত্রিম সরিৎ স্থাপিত আছে।

দুর্গস্থিত 'দেওয়ানী আমে' সম্রাট সাধারণ মানুষদের সঙ্গে দরবারে মিলিত হতেন। অপর পক্ষে 'দেওয়ানী খাসে' কেবলমাত্র আত্মীয় বর্গের সঙ্গে বসত দরবার।

আগ্রা নগরীর বাইরে সেকেন্দ্রা নামক সমাধি ক্ষেত্র বিদ্যমান। এখানে সম্রাট আকবর এবং তাঁর অন্যান্য পরিজন বর্গের সমাধি স্থল বর্তমান। বাদশাহদের সমাধির অনতিদূরেই অপর একটি সমাধি সৌধ দৃষ্ট হয়ে থাকে। এ'টি 'শীশমহল' নামে পরিচিত। কথিত হয়ে থাকে যে, এটি মহারাজ মানসিংহের ভগ্নীর স্মৃতির উদ্দেশে সংস্থাপিত।

মথুরার পাণ্ডাগণের আত্মপরিচয় বেশ রহস্যময়। তারা সাড়ে চার ভাই, 'আড়াই ভাই' 'দেড় ভাই' প্রভৃতি নামে পরিচয় প্রদান করে থাকে। এদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তারা পূর্ণাঙ্গ হতে পারে না। অবিবাহিত ব্যক্তি মাত্রই এদের কাছে অর্ধেক। কেবলমাত্র যে সকল ভ্রাতারা বিবাহিত তারাই পূর্ণ বলে পরিচিত।

মথুরা দেখতে খুব রমণীয়। এখানকার পথ ঘাট বেশ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন্ন। মথুরাবাসী প্রায় সকলেই গৌরাঙ্গ এবং সুস্থ সবল।

মথুরায় 'কংসখেড়া' এবং 'রণভূম' বিদ্যমান। প্রচলিত কিংবদন্তী, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবন থেকে মথুরায় আসলে তাঁকে হত্যা করবার জন্য নানাবিধ ষড়যন্ত্র করা

হয়েছিল। কিন্তু কৃষ্ণ সেই সকল ষড়যন্ত্র অতিক্রম করে সম্মুখ যুদ্ধে কংস রাজকে বিনাশ করে স্বয়ং মথুরার রাজপদে অভিষিক্ত হয়েছিলেন। কৃষ্ণের সঙ্গে কংসের যেখানে সংগ্রাম হয়েছিল তাই 'রণভূম' নামে পরিচিত। 'রণভূম' ক্ষুদ্র একটি জমি, এর চারদিকে গাছ। যুদ্ধক্ষেত্রস্থ এক ভগ্ন মন্দিরে এক মহাদেব মূর্তি বিদ্যমান। অত্যাচারী কংসের নিধন হলে রণক্ষেত্রের মধ্য থেকে নাকি সহসা শিব নৃত্য করতে করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন এবং এইজন্য এই শিবের নাম 'রঙ্গেশ্বর মহাদেব'।

কংসরাজের রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ ও গড়খাই অদ্যাপি বর্তমান। এই ভগ্নস্তূপের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান। প্রবাদ, এই 'সতী মঠে' নাকি কংসের মহিষী বাস করতেন। স্বামীর মৃত্যু সংবাদ শুনে এখানেই তিনি প্রাণ ত্যাগ করেছিলেন সেইজন্য তাঁর সতীত্বের স্মৃতিস্বরূপ এই মন্দির 'সতী মঠ' নামে পরিচিত।

প্রভাতকালে এবং সায়াহ্নকালে মথুরাবাসী স্ত্রীলোকেরা নানা বর্ণের বিচিত্র বসনরাজি পরিধান করে পুষ্পমালা হাতে দেব দর্শনে গমন করে থাকে। মথুরার স্ত্রীলোকেরা গৃহকর্ম সম্পন্ন করে না। এরা আমোদ প্রমোদে জীবন অতিবাহিত করে। তবে দুই বেলা এরা 'মথুরানাথ' দর্শন না করে জলগ্রহণ করে না।

সন্ধ্যায় আরতির সময়ে মথুরানাথের মন্দির দীপালোকে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। এই সময় গায়কগণ হরি সংকীর্তন করতে থাকে।

'বিশ্রামঘাটে'ও প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে আরতি হয়ে থাকে। এই বিশ্রামঘাটে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করে তাঁর 'বংশী' ও মোহন চূড়া নাকি রেখে গিয়েছিলেন, তাই এ'টি 'বিশ্রামঘাট' নামে পরিচিত। সন্ধ্যাকালে এখানে বহু সংখ্যক ব্যক্তি যুক্ত করে নিমীলিত নয়নে 'জয় জয়' ধ্বনিতে মুখরিত করে তোলে। শঙ্খ ঘণ্টা কাঁসর প্রভৃতি বাজতে থাকে এবং রাশি রাশি পুষ্প মাল্য জলে নিক্ষিপ্ত হতে থাকে। বিশ্রাম ঘাটের আরতি কিছুটা বৈচিত্র্যপূর্ণ। একজন বলবান ব্রাহ্মণ প্রজ্বলিত দীপাধার নিয়ে প্রথমে হাত দিয়ে তারপর বক্ষ এবং পরিশেষে মস্তকে স্থাপন করে আরতি করতে থাকে। বিশ্রাম ঘাটের আরতির সময়ে পুষ্প বিক্রেতা রমণীরা ফুল মালা ও দীপ বিক্রয় করে। ফুলমালা স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই ক্রয় করে, কিন্তু প্রদীপ ক্রয় করে কেবলমাত্র স্ত্রীলোকেরা। প্রদীপ প্রজ্বলিত করে প্রিয়জনের মঙ্গল কামনায় যমুনার জলে ভাসিয়ে

দেওয়া হয়। যার মঙ্গল কামনায় এ'টি ভাসান হয়, দীপ নির্বাপিত হয়ে গেলে তার অমঙ্গল আশঙ্কা করা হয়। আর বিপরীতক্রমে এ'টি প্রজ্বলিত অবস্থায় যদি ভেসে যায় তাহলে উদ্দিষ্ট ব্যক্তির মঙ্গল হয়।

বৃন্দাবনের বাড়ী মাত্রই 'কুঞ্জ' নামে পরিচিত। যাত্রী দেখলে এখানকার বৈষ্ণবেরা নিজ নিজ কুঞ্জে স্বতঃস্ফূর্তভাবে আহ্বান জানায়। মথুরা থেকে বৃন্দাবনের দূরত্ব কয়েকক্রোশ। বৃন্দাবনের চতুর্দিকে যমুনা নদী। যমুনার ঘাটগুলির প্রত্যেকটি পৃথক পৃথক নামে পরিচিত। এইসকল ঘাটে শ্রীকৃষ্ণ ভিন্ন ভিন্ন সময়ে বিহার করতেন।

বৃন্দাবনে গাড়ী প্রভৃতি পাওয়া যায় না। পদব্রজেই বৃন্দাবন ভ্রমণ করা রীতি। মন্দিরে জুতা, ছাতা এবং ছড়ি নিয়ে প্রবেশ নিষেধ।

বৃন্দাবনের প্রধান বিগ্রহ গোবিন্দজী ও রাধারাণী। গৃহত্যাগী ভিক্ষুক, বৈষ্ণব এবং গোস্বামীতে বৃন্দাবন পরিপূর্ণ। এখানকার অধিকাংশ পুরুষই কৌপীন ও নামাবলীধারী এবং স্ত্রীলোকেরাও এখানে স্বল্প পরিমিত বস্ত্র পরিধান করে থাকে। এখানকার বাজারে মাছ মাংস পাওয়া যায় না। তবে দুধ ও ঘৃতের প্রাচুর্য খুব। এখানকার দোকানে কেবলমাত্র তুলসীর মালা, তিলক এবং রজ৺ ও নামাবলী বিক্রয় হতে দেখা যায়।

বৃন্দাবনে লালাবাবুর অক্ষয় কীর্তি বিদ্যমান। তাঁর 'সদাব্রতে' প্রত্যহ অসংখ্য দীন দরিদ্র অন্ন দ্বারা প্রতিপালিত হয়ে থাকে। বৃন্দাবনের অধিকাংশ দেব মন্দিরই অতীব রমণীয়, তবে শেঠের মন্দিরটিকেই সর্বশ্রেষ্ঠরূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। শেঠের দেবালয় প্রাঙ্গণে বহু শ্রুত 'সোনার তালগাছ' বিদ্যমান। এখানকার সাহাজীর চিত্রময় মন্দিরটি বিশেষভাবে প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরের ভেতর এবং বার খোদিত ও চিত্রিত মূর্তিতে অলঙ্কৃত।

আগ্রা থেকে শুরু করে দিল্লী পর্যন্ত ভয়ানক বানরের উৎপাত লক্ষিত হয়ে থাকে। বৃন্দাবনও এর ব্যতিক্রম নয়।

বৃন্দাবনে 'বংশীবট' নামে একটি জীর্ণ ও প্রাচীন বটবৃক্ষ দৃষ্ট হয়ে থাকে। গোপীনাথ এই বটবৃক্ষে নাকি বংশী রাখতেন বলে বিশ্বাস। এর পরই গোপেশ্বর শিব। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী মাধব একদা গোপিনী সহ যখন নৃত্য গীতে রত, সেই সময় মহাদেব নৃত্যগীতে আকৃষ্ট হয়ে স্বর্গ থেকে নারীরূপে মর্ত্যে আবির্ভূত হন এবং গোপিনীদের সঙ্গে নৃত্যগীতে যোগদান করেন। শিরে

নৃত্য ও গীত নৈপুণ্যে যখন গোপিনীরা চমৎকৃত হয়ে পরস্পরের প্রতি দেখছিলেন, সেই সময় শিব নিজ মূর্তি ধারণ করে নিজের দুর্বলতার জন্য লজ্জানুভব করেন। অতঃপর কৃষ্ণ শিবের প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাঁকে গোপেশ্বর নাম দিয়ে বৃন্দাবনে বাস করবার অনুমতি প্রদান করেন। বৃন্দাবনের সর্বত্রই রাধাকৃষ্ণ মূর্তি, একমাত্র ব্যতিক্রম এই 'গোপেশ্বর মহাদেও' মূর্তিটি।

বৃন্দাবনে ব্রহ্মকুণ্ড, কালীয়দহ, নিধুবন, নিকুঞ্জবন প্রভৃতিও বিদ্যমান। নিধুবন এবং নিকুঞ্জবনের মধ্যে কুণ্ড বর্তমান। একদা রাধিকা বনবিহারে ক্লান্ত হয়ে কৃষ্ণের নিকট শীতল জল প্রার্থনা করলে কৃষ্ণ ললিতা ও বিশাখার হস্তস্থিত বংশীদ্বারা দু'টি কুণ্ড খনন করে রাধিকার পিপাসা দূর করেছিলেন। এই কুণ্ডদ্বয় ললিতা ও বিশাখার নামে নামাঙ্কিত।

বৃন্দাবন থেকে দিল্লী যাবার পথে পড়ে আলিগড়। আলিগড় একটি প্রাচীন ঐতিহাসিক ও আধুনিক সমৃদ্ধশালী স্থান। এখানকার মৃত্তিকা দুর্গ খুব প্রসিদ্ধ ছিল। আলিগড়ে বহু সংখ্যক মুসলমানের বাসস্থান। এখানকার মৃন্ময় পাত্রাদি অতীব সুন্দর।

ইন্দ্রপ্রস্থ এবং দিল্লী দু'টি পৃথক নগরী। অবশ্য দুইয়ের মধ্যেকার ব্যবধান অতি সামান্য। দিল্লীর কেল্লা খুব প্রসিদ্ধ। এখানে 'দেওয়ান আম', 'দেওয়ান খাস', 'রঙ্গমহল', 'মতি মসজিদ' প্রভৃতি বিদ্যমান। দিল্লীস্থিত জুম্মা মসজিদও খুব প্রসিদ্ধ। এ'টি শ্বেত প্রস্তরে নির্মিত এবং তাজমহলের পরেই অবস্থিত। দিল্লীনগরীর সকলস্থান থেকেই জুম্মা মসজিদ দৃষ্ট হয়ে থাকে।

দিল্লীতে হুমায়ুনের বিখ্যাত সমাধি মন্দির 'হুমায়ুমাকবারা' অবস্থিত। এস্থানে হুমায়ুন এবং বেগম ললাম হামিদার সমাধি বিদ্যমান। হুমায়ুমাকবারা'র অনতিদূরেই অসংখ্য বেগম, সাজাদা,[৭] সাজাদি[৮] ও অন্যান্য রাজপরিবারভুক্ত ব্যক্তি বর্গের সমাধি বিদ্যমান।

এখানে অবস্থিত রাজা দ্বিতীয় অনঙ্গপাল কর্তৃক নির্মিত 'বাউলি'টি, দৈর্ঘ্যে ১৬৯ ফিট এবং গভীরতায় ১৫২ ফিট। এ'টি দেখতে প্রকাণ্ড। এর চতুর্দিকে ভগ্নদশা প্রাপ্ত অট্টালিকা ও পরিত্যক্ত ভূমি বর্তমান। মধ্যস্থলে একটি সুবৃহৎ জলাশয় দেখা যায়।

মহম্মদ ঘোরী দ্বিতীয় অনঙ্গপালের পুত্র তৃতীয় অনঙ্গপালের রাজত্বকালে দিল্লী অধিকার করলে রাজপরিবারভুক্ত সকলে 'লালকোট' দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ

করেছিল। সেইজন্য এ'টি কেল্লারায় পৃথ্বরাজ নামে পরিচিত।

দিল্লীস্থিত 'আজবঘরে'[৯] বাদশাহদের ব্যবহৃত শিরস্ত্রাণ, জরির বিনামা, মণিময় বলয় ইত্যাদি এবং বেগমদের নথ 'হয়কল বাজুবন্দ, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি রক্ষিত আছে।

দিল্লীর অন্যতম দর্শনীয় বস্তু হ'ল কুতুবমিনার। এ'টি বর্তমানে ২৩৮ ফিট উচ্চ। কথিত হয়ে থাকে, এককালে এর উচ্চতা নাকি ৩০০ ফিট ছিল। মিনারের তলদেশ একটি বিশাল বহুভুজ; এতে সর্বমোট ২৪টি ভুজ। সেগুলি সমেত এ'টি ১৪৭ ফিট বিস্তৃত। কুতুবমিনার পাঁচটি তলে বিভক্ত। এর একটি তলা প্রস্তর নির্মিত বারান্দা দ্বারা বেষ্টিত। কুতুবের তৃতীয় তল পর্যন্ত রক্তিমবর্ণের প্রস্তরে নির্মিত। মিনারের চতুর্দিকে অসংখ্য অট্টালিকার ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান।

ধোলপুর

গিরিন্দ্র নন্দিনী দেবী রচিত' ধোলপুর' গ্রন্থটি [১২৯৫] বাংলা ভ্রমণ সাহিত্যের ইতিহাসে তেমন পরিচিত না হলেও গ্রন্থটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। আগ্রা এবং গোয়ালিয়রের মধ্যবর্তী 'ধোলপুর' নামক রাজ্যে লেখিকা দীর্ঘকাল বসবাস করে সেখানকার লৌকিক রীতি নীতি, সংস্কার, প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বৈশিষ্ট্য প্রভৃতি প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ লাভ করেছিলেন। 'ধোলপুর' গ্রন্থটি সেই অভিজ্ঞতারই ফলশ্রুতি।

ধোলপুর রাজ্যটি ছোট। এ'টি আগ্রা এবং গোয়ালিয়রের মধ্যবর্তী। চম্বল নদী এর দক্ষিণ সীমা এবং বাণগঙ্গা এর উত্তর সীমা। রাজ্যটি পূর্ব ও পশ্চিমে প্রায় ৫০ ক্রোশ দীর্ঘ। প্রস্থেও প্রায় ১৬ ক্রোশ। জনশ্রুতি তোঁর বংশীয় ক্ষত্রিয় রাজা ধোলার নামানুসারে প্রদেশটির নাম হয়েছে ধোলপুর।

এখানকার প্রচলিত রীতি অত্যন্ত বৈচিত্র্যপূর্ন। এখানে নিমন্ত্রণ করতে আসে নাপিতানী। নিমন্ত্রণ করতে এসে যদি সে বলে 'চুলানুতো হঁয়' অর্থাৎ 'উনানকে নিমন্ত্রণ করেছে', তবে বুঝতে হবে যে সপরিবারের নিমন্ত্রণ। যদি সপরিবারে নিমন্ত্রণ করা না হয়, তবে সেক্ষেত্রে যাকে যাকে নিমন্ত্রণ করা হয়

তাদের নাম করে নিমন্ত্রণ করা হয়। আবার খাওয়াবার পরিবর্তে যদি কেবল দেখার নিমন্ত্রণ করা হয়, তবে বলা হয় 'বোলাউয়া হঁয়'।

এখানে পালকীকে বলে পীনস। পালকী কেবলমাত্র ধনী এবং মহারাণী-দের ব্যবহারের জন্য। এখানে ভাড়া পালকী মেলে না। অবশ্য ডোলা সর্বদাই চলে। এর কপাট নেই, বসবার স্থান একপ্রকার ফিতের বুনানি, একে বলে নেওয়ার।

নিমন্ত্রণ বাড়ীতে পৌছবার পর প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা 'মিলাপ' করে। মিলাপ বিজয়াদশমীর আলিঙ্গনের অনুরূপ। গৃহিণীরা দু'বার করে নিমন্ত্রিতদের মস্তকে হাত স্পর্শ করেন এবং মুখে 'রাম রাম' বলে অভ্যর্থনা করে থাকেন। বধূরা নিজেদের দুই হাতের আঙ্গুল নিমন্ত্রিতদের দুই পায়ের আঙ্গুলে স্পর্শ করে নিজেদের মস্তকে দুবার করে লাগায়। এখান-কার বধূরা সকলকেই প্রণাম করে থাকে। এমনকি চুড়ি পরবার পর মুসলমান চুড়িওয়ালীকেও এরা প্রণাম করে থাকে। তাই বলে অবিবাহিত কন্যারা [ঝিউড়ীরা] কাউকে প্রণাম করে না বরং পিতা, মাতা, মাতামহী প্রভৃতির ন্যায় গুরুজন স্থানীয়েরাই এদের প্রণাম করে থাকে।

গ্রামের স্ত্রীলোকেরা অন্যবিধ উপায়ে প্রণাম করে থাকে। এক প্রকার রীতি অনুযায়ী এরা পা ধরে কিছুক্ষণ বসে থাকে তার পর পা ছেড়ে দেয়। অপর একপ্রকার রীতি অনুযায়ী হাঁটু থেকে পা টিপতে আরম্ভ করে গোড়ালিতে এসে ছেড়ে দেয়। যাইহোক প্রাথমিক অভ্যর্থনার পর বাড়ীর দরজা থেকে বসবার স্থান পর্যন্ত একখানি চুনারি করা কাপড় পেতে দেওয়া হয়। এই প্রথার নাম 'পাঁওড়া'। এর ওপর দিয়ে হেঁটে নিমন্ত্রিতেরা চলে যায়। এরপর একজন গৃহিণী নিমন্ত্রিতদের কপালে চন্দনের তিলক কেটে তার ওপরে চারটি চাল টিপে দিয়ে হাতে দু'টি টাকা দেয়। এই টাকাটির নাম 'নৌছাত্তর'। প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী 'নৌছাত্তর' করলে শরীরের যত রোগ, ক্লেশ দূরীভূত হয়ে যায়। 'পাঁওড়া' ও 'নৌছাত্তর' নাপিতানীদের প্রাপ্য। যার টীকা পাট্টা করা হয় তাদের টাকাও নাপিতানী পেয়ে থাকে। টীকা পাট্টা করা না হলেও নিমন্ত্রিত-দের অবশ্যই নৌছাত্তর করা হয়ে থাকে। রোগ থেকে নিরাময় লাভ করলেও নৌছাত্তর করবার রীতি প্রচলিত।

এর পর দু'টি মেয়ে এসে উপস্থিত হয়। এদের একজনের হাতে সরবৎ অপর

জনের মাথায় থাকে একটি কলসী (জলের ঘটি)। এই সরবৎ ও জলে নিমন্ত্রিতদের একটি করে টাকা দিতে হয়। এর নাম 'কলসা পাঁওড়া'। অতঃপর নিমন্ত্রিতদের নিয়ে গিয়ে বসান হয়। এমন সময়ে একজন নাপিতানী একথালা জল নিয়ে উপস্থিত হয় নিমন্ত্রিতদের পা ধোয়াবার জন্য। একটি টাকা তারও প্রাপ্য। 'কলসা পাঁওড়া' করলেই নিমন্ত্রিতদের পা ধোয়াতে হয়।

এখানকার লোকেরা নাপিতানীকে চাকরাণী রূপে নিযুক্ত করে। এইসব নাপিতানীরা ঠিকে কাজ করে। এরা স্ত্রীলোকদের স্নান করায়, তামাক সেজে দেয়, বাতাস করে, লোকের বাড়ী নিমন্ত্রণ করতে যায়, লোকের বাড়ী দ্রব্যাদি নিয়ে যায় এবং গৃহিণীদের ডোলার সঙ্গে গমন করে। এখানে কেনা দাসী রাখবার রীতিও প্রচলিত। এইসকল দাসী, গৃহের লোকের ন্যায় রাত্রি দিন থাকে এবং সকল প্রকার সাংসারিক কাজকর্ম করে। বিনিময়ে এরা খেতে ও পরতে পায়। সাধারণত এরা বেতন পায় না। গহনা পায়। তবে এই গহনার ওপর এদের কোন দাবী থাকে না। গহনা থাকে বাড়ীর গৃহিণীর কাছে। গৃহিণী নিজের ইচ্ছানুযায়ী পরতে দেয় মাত্র। কেনা দাসীরা ধোলপুরে 'লড়কিনী' নামে পরিচিত। যে যত ধনী, তার লড়কিনীর সংখ্যাও তত অধিক। লড়কিনীরা বাড়ীর বাইরে যায় না। এরা অবিবাহিত থাকে। কিন্তু সন্তানাদি হলে সেইসব সন্তান বাড়ীর দাসীপুত্র নামে অভিহিত হয়ে থাকে। বাড়ীর গৃহিণীরা সাধারণত কোনরূপ কাজ করে না। কেবলমাত্র দিনের বেলায় এরা চরকা কাটে ও সেই চরকা কাটা স্থতা দিয়ে ঘাগরা বুনিয়ে পরে।

এখানে দালানকে বলে 'তেবারে'। বড় ঘরকে বলা হয় 'মঢ়া' এবং ছোট ঘরকে বলে 'কুঠরিয়া'। উঠানকে বলে 'আঙ্গণ'। সদর দরজা থেকে ভেতরে আসবার ঘরটিকে বলা হয় 'পোর তেবারেতে'। এখানে মাটির বড় বড় সিন্দুকের ন্যায় ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এগুলিকে বলা হয় 'কুঠিলা'। কুঠিলায় থাকে গম, ছোলা ইত্যাদি দ্রব্য। গম গুঁড়ো করবার জাঁতা এখানে 'চকীয়া' নামে পরিচিত। মঢ়াতে বাঁটলো করা গহনা ও ডালা, কুলা, লবণ, তেল, ঘি ইত্যাদি রাখা হয়। বাঁশের ঢাকা দেওয়া কৌটায় এরা কাপড় রাখে। এর নাম 'টেপারী'। ছোট টেপারীতে আরসী, চিরুণী, টিকুলী, কাজল, আতর ইত্যাদি রাখা হয়।

ধোলপুরের লোকেরা প্রচুর পরিমাণে আচার ভক্ষণ করে থাকে। সমগ্র বর্ষাকাল ধরে এরা আচার দিয়ে রুটি খায়। বর্ষাকালে মাছির আধিক্যের জন্য এরা তরকারী করে না। কাঁচা আম থেকে এরা সম্বৎসরের উপযোগী প্রচুর পরিমাণে আচার করে রাখে।

এখানকার পোষাক দেখে সধবা অথবা বিধবা চেনবার উপায় নেই। কারণ এখানকার স্ত্রীলোকেরা সিঁথিতে সিন্দুর ব্যবহার করে না। আর সকলেরই পরনে রঙ্গীন পোষাক এবং গায়ে ও হাতে গহনা। তবে ধনী স্ত্রীলোকদের অলঙ্কার দেখে বোঝা যায় কে সধবা অথবা বিধবা। এরা রৌপ্য নির্মিত কর্ণফুল, ঝুমকা, নাকে মুক্তার নাকছাবি, কপালে টিকুলী ও আড় প্রভৃতি ব্যবহার করে। এখানে লম্বা টিকুলী আড় নামে পরিচিত। বিধবা মহিলারাও টিকুলী ব্যবহার করে না। সধবা মহিলারা সোনা দিয়ে গাঁথা পুঁথির মালা ব্যবহার করে থাকে। কিন্তু বিধবারা তাও পরে না। সোনা দিয়ে গাঁথা পুঁথির মালা এখানে 'টীক' নামে পরিচিত। সধবারা কাঁচের চুড়ি ব্যবহার করে থাকে। যে সকল বিধবা তীর্থ পর্যটন করেনি, তারাও কাঁচের চুড়ি পরে থাকে।

ধোলপুরে ব্যবহৃত অলঙ্কারাদির মধ্যে আছে রূপার বালা, রতনচুর, মাথার জন্য রূপার সিঁথি, পিঠের জন্য ঝাঁপা, আঙ্গুলের জন্য আরসী বসান আংটি, পায়ের জন্য মল। এ'টি পায়ের গোছাতেই লেগে থাকে, নড়ে না। তার নীচে খুব মোটা রূপার শিকল, এর স্থানীয় নাম তোড়া। তারও নিম্নে আর এক প্রকার মল-এর একদিক খুব সরু এবং অপর দিক মোটা। পায়ের আঙ্গুলে ব্যবহৃত হয় চুটকী। এ'টি 'বিছিয়া' নামে পরিচিত। 'বিছিয়া' কেবলমাত্র সধবারাই পরিধান করে থাকে। এখানে ঘাগরাকে বলা হয় 'লহঙ্গা'। সলুকাকে বলা হয় 'আঙ্গিয়া'। উড়নীকে বলে 'লুগড়া'। সাধারণ লোকেরা রূপার পরিবর্তে কাঁসার গহনা ব্যবহার করে থাকে। আর বিশেষ ধনী ব্যক্তি হলে রূপার পরিবর্তে ব্যবহার করে স্বর্ণালঙ্কার। কিন্তু কেউ পায়ে স্বর্ণালঙ্কার পরিধান করে না। এখানে নিম্ন শ্রেণীদের মধ্যে কেউ বিধবা হলে সে তার স্বামীর ভ্রাতা থাকলে তাকেই পুনরায় বিবাহ করে।

ধোলপুরে পুরুষদের পোষাক হল ইজের পায় আঁটা এবং জামা। কিন্তু জামার হাতা এত লম্বা যে, আধহাত পরিমিত উল্টিয়ে রাখতে হয়। মাথায়

এরা ২০।২৫ হাত লম্বা কাপড়ের পাগড়ী ব্যবহার করে। বগলে এদের একখানি উড়ুনী ও হাতে তলোয়ার। পায়ে এদের চটী জুতা, কানে সোনার মাকড়ী, গলায় সোনার পদক কিংবা গোঁফহার, হাতে এদের বালা ও আংটি এবং এক পায়ে রূপার তোড়া।

এখানে সকল শ্রেণীর স্ত্রীলোকেই তামাক সেবন করে। সকলেরই নিজস্ব এক একটি করে গড়গড়া থাকে। নিমন্ত্রণ বাড়ীতে আহারের পূর্বে নাপিতানী প্রত্যেকের হাত ধুইয়ে দেয় এবং আহারান্তে নিমন্ত্রিতরা গেলাসের উচ্ছিষ্ট জলেই মুখ হাত ধুয়ে থাকে। নিমন্ত্রিতদের দুখানি করে চৌকি প্রদান করা হয়। একটি চৌকি বসবার জন্য এবং অপরটি থালা রাখবার জন্য। থালা রাখবার চৌকিটির ওপর একখানি সাদা চাদর পাতা থাকে। পরিবেশন ঘোষণা হলে কেউ খেতে বসে না। এখানকার সকল তরকারীতেই প্রচুর পরিমাণে হিং ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

আহার এখানে দুই প্রকার—এক প্রকার 'পক্কী' এবং অপরটি পরিচিত 'কচ্চী' নামে। 'পক্ক' আহারে লুচি, কচুরী, পাঁপড়, মিষ্টান্ন ইত্যাদি দেওয়ার রীতি। কেবলমাত্র ডাল দেওয়া হয় না, তেল ও হলুদ বিহীন তরকারী ও দই বড়া দেওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রকারের আহারে ভাত, রুটি ইত্যাদি এবং হলুদ ও তেলযুক্ত তরকারী দেওয়া হয়। এখানে সকল প্রকার কাজেই গান গাওয়ার রীতি। এমন কি নিমন্ত্রিত ব্যক্তি বর্গের খাওয়া আরম্ভ হবার সঙ্গে সঙ্গেই গান হ'তে থাকে। আহারান্তে নিমন্ত্রিতদের থালায় একটি টাকা দিতে হয়। তবে বারংবার খাওয়ালে টাকা দিতে হয় না। 'কলসা পাঁওড়া' হলেই থালায় টাকা দেওয়ার রীতি।

এস্থানে স্ত্রীলোকদের প্রায়শই কোনরূপ নাম থাকে না। স্বামীর নামে নাম মিলিয়ে বধূদের ডাকা হয়। যে দেশের মেয়ে, সেই গ্রামের নাম মিলিয়েও অনেক সময় বধূদের ডাকা হয়। আবার বাপের বাড়ীর গোত্র ধরেও অনেক সময় ডাকা হয়। অবশ্য স্ত্রীলোকদের যে প্রকৃতপক্ষে কোন নাম থাকে না তা নয়। আসলে অধিকাংশের নিকটেই সেই নামটি অপরিচিত থাকে। এখানে ধনী লোকের ছোট ছেলে হলে তাকে 'লল্লু' এবং গরীবের ছেলে হলে তাকে 'মোড়া' বলে অভিহিত করা হয়।

ধোলপুরে অক্ষয় তৃতীয়াকে বলে 'এক্ তীজ'। এখানে সেদিন পর্বের

দিন। অক্ষয় তৃতীয়ার দিন এখানে ছোট ছোট মেয়েরা পুতুলের বিবাহ দিয়ে থাকে। এই দিন এখানে নাচগান, কৃষ্ণযাত্রা, বাই নাচ ইত্যাদি অনুষ্ঠিত হয়। এখানে বৎসরে দুবার মাত্র পুতুলের বিবাহ হয়। একবার বৈশাখ মাসে অক্ষয় তৃতীয়াতে আর একবার আশ্বিন মাসে শরৎ পূর্ণিমার পরের প্রতিপদের দিন। সম্বৎসরের মধ্যে আর পুতুল ছুঁতে নেই।

জ্যৈষ্ঠ মাসে এখানে অগ্নির প্রকোপ অত্যন্ত অধিক। এই সময়ে এখানে প্রায়ই নানা স্থানে আগুন লেগে থাকে। অনেক সময়ে সন্তানহীনা স্ত্রীলোকেরা সন্তান লাভের আশায় আগুন লাগিয়ে থাকে। জ্যৈষ্ঠমাসে প্রচণ্ড ঝড় আসে। এখানে ঝড়, 'আঁধি' নামে পরিচিত। এই সময়ে 'লু' নামে পরিচিত গরম বাতাস প্রায় সমস্ত দিন ধরে বইতে থাকে। কখনও কখনও রাত্রিতেও 'লু' চলে।

ধোলপুরে ইঁট প্রভৃতি পাওয়া যায় না। তাই ধনী লোকেদের গৃহগুলি প্রস্তর নির্মিত। এখানে পাথরের অনেকগুলি খনি আছে। সেখানে প্রচুর লাল পাথর পাওয়া যায় এবং কিয়ৎ দূরেই উত্তম শ্বেত প্রস্তরও পাওয়া যায়। 'লু' চল্লে প্রস্তর নির্মিত গৃহগুলি খুব উষ্ণ হয়ে ওঠে।

আষাঢ় মাসে এখানে বৃষ্টি শুরু হয়। গ্রামের কৃষকেরা প্রথম যখন লাঙ্গল নিয়ে চাষ করতে যায়, তখন তার নাম 'হরায়তা'। কৃষিকার্যে যাবার পূর্বে মেয়েরা ঘুঁটের স্তূপ পূজা করে। একে বলে 'বিটোরা পূজা।'

প্রতি বৎসর ধোলপুরের স্ত্রীলোকেরা 'ইরাপীরা' নামক দেবতার পূজা করে থাকে। এ'টি এক প্রকার রোগ নিরাময়ের পূজা। পূজার রীতি কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য পূর্ণ। বাড়ীর যত পুরুষ মানুষ থাকে, তাদের প্রত্যেকের নামে এক এক বেলন আটা ওজন করে নেওয়া হয়। স্ত্রীলোক এবং ঘোড়া গরুর নামে নেওয়া হয় এক এক মুঠো পরিমাণ। অতঃপর এই আটায় প্রস্তুত করা হয় লুচি ও মোহনভোগ। তারপর ৭/৮ জন স্ত্রীলোক একত্রিত হয়ে একটি মাঠে গিয়ে সেই খাদ্য দ্রব্যের কতকাংশ দিয়ে পূজা করে। এই পূজা মেথরের প্রাপ্য। কারণ পূজা করে মেথরে। অবশিষ্ট খাদ্য দ্রব্যগুলি সেই মাঠে সকলে আহার করে। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় সকলে হাত পা ধুয়ে সঙ্গে যে সব বাসন নিয়ে যায় সেগুলি মেজে ঘসে নিয়ে আসে। আহারের পরেও যদি দ্রব্য বাঁচে, তবে তা মাঠেই ফেলে দিয়ে আসে। কোন দ্রব্য ফিরিয়ে আনতে নেই। প্রচলিত

সংস্কার অনুযায়ী এই আটাতে নাকি সকলের রোগ আসে। এই সকল দ্রব্য প্রস্তুত করবার সময় ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের খেতে অথবা ছুঁতে দেওয়া হয় না।

এখানে প্রায় সকল জাতির লোকেরাই শুকনো বালি দিয়ে বাসনপত্র মাজে। যদি জলের দ্বারা বাসন মাজা হয়, তাহলে তা উচ্ছিষ্ট বলে ধরা হয় এবং এইরূপ উচ্ছিষ্ট বাসনে সকলে খেতে অস্বীকার করে।

শ্রাবণ মাসে ধোলপুরের সকলে আনন্দে মাতোয়ারা হয়ে ওঠে। কেউ বৃহৎ বৃক্ষে, কেহ আবার বাঁশ পুঁতে দড়ি টাঙ্গিয়ে এই সময়ে ঝুলতে থাকে। বালিকা, যুবতী, বৃদ্ধা সকলেই এই সময়ে ঝুলতে থাকে। রৌদ্র মানে না, বৃষ্টি মানে না কেবল দোলে আর বর্ষার গান গায়।

বাংলাদেশের দুর্গাপূজার ন্যায় এদেশে রাখী পূর্ণিমার দিন খুব ধূম। দীন-দুঃখী-ধনী সকলেই এই সময়ে নতুন বস্ত্র পরিধান করে চুড়ি পরে মেদীপাতা দিয়ে হাত পা চিত্র বিচিত্র করে।

এখানে জলকষ্ট ভীষণ। তাই স্ত্রীলোকেরা সপ্তাহে মাত্র একবার স্নান করে। শুভ কর্ম বা পর্বদিন উপলক্ষেও স্নান করবার রীতি প্রচলিত। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্নান করান হয় সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়ে যাবার পর।

এখানকার একটি প্রসিদ্ধ তীর্থ হল মছকুণ্ড। মছকুণ্ড পুষ্করিণীটি চতুর্দিকে পাহাড় বেষ্টিত। স্থানটি অত্যন্ত রমণীয়। রাখী পূর্ণিমার ৮ দিন পূর্বে এখানকার অধিবাসীরা গামলাতে মাটি দিয়ে গম পোঁতে। রাখী পূর্ণিমার দিন গমগুলি থেকে বড় বড় গাছ বের হয়। রাখী পূর্ণিমার দিন সকলে গম গাছ সহ গামলা-গুলি মাথায় করে নিয়ে গিয়ে মছকুণ্ডের জলে ভাসিয়ে দেয়। আর গাছগুলি জলে ধুয়ে ফেরৎ আনে। এই রূপ গাছের নাম 'ভূজরীয়া'। এর পরের দিন ব্রাহ্মণ ও ভিক্ষুকেরা রাখী ও ভূঁজরীয়ার বিনিময়ে ভদ্রলোকদের বাড়ী থেকে কিছু অর্থ উপার্জন করে থাকে। এই সময়ে সকলে নিজ নিজ আত্মীয় স্বজনের বাড়ী যায়। সকলে আমোদে প্রমোদে দিন অতিবাহিত করে। যাদের বধূর দ্বিরাগমন হয়নি, তারা বধূর জন্য 'সুহাগী' নামক তত্ত্ব প্রেরণ করে থাকে।

ভাদ্র মাসের ব্রত পক্ষের ষষ্ঠীকে এখানে বলা হয় 'মোরছট'। 'মোর' মানে টোপর। এই দিনেই এখানে বিবাহের টোপর ভাসাবার রীতি। মছকুণ্ডের ধারে এই দিন একটি বৃহৎ মেলা বসে। যাদের বিবাহের টোপর অথবা অন্ন

প্রাশনের পাতা ভাসাবার থাকে, তারা প্রাতঃকালে সকলের বাটী গিয়ে নিমন্ত্রণ করে আসে 'মোর সিরাইবে কো বুলউত্তা হোয়' অর্থাৎ টোপর ভাসাবার নিমন্ত্রণ। নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোকগণ সকলে সমবেত হলে সকলকে রথে করে মছকুণ্ডে নিয়ে যাওয়া হয়। সঙ্গে যায় বাদ্য ভাণ্ড ও আহারের সামগ্রী সকল। নির্দিষ্ট স্থানে পৌছিয়ে প্রথমে হয় আহারাদি। তার পরে হয় গান বাজনা। সকলের শেষে বরের মাতা আঁচলে করে টোপর ভাসিয়ে থাকে।

ধোলপুরে পুত্রের অন্নপ্রাশন হয় পাতায়। সেই উচ্ছিষ্ট পাতাটি তুলে রেখে দেওয়া হয়। এই পাতাও 'মোরছটে'র ন্যায় ধূমধাম করে ভাসান হয়।

শয়ন একাদশীর দিন 'মছকুণ্ড' নামক পূর্বোক্ত পুষ্করিণীতে ঠাকুরের 'জল-বিহার' অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে রাজবাটীর নরসিংহ ঠাকুর ও অন্যান্য মন্দিরের সকল ঠাকুর ফৌজ, তোপ, ঘোড়সওয়ার প্রভৃতি সমভিব্যাহারে মছকুণ্ডে গমন করেন এবং স্নানাদির পর নিশ্চিন্ত হয়ে এসে শয়ন করেন।

পিতৃপক্ষের ১৫ দিন ধরে অনূঢ়া কন্যারা 'চন্দা-তারাইয়া' নামক পূজা করে। এরা এই সময়ে দেওয়ালের গায়ে গোবরের চন্দ্র ও তারা অঙ্কিত করে এবং প্রত্যহ রাত্রে গান গায়।

ধোলপুরে পিতৃপক্ষকে বলে 'কনাগত'। 'কনাগতে' এখানে খুব আড়ম্বর লক্ষিত হয়। প্রত্যহ সকালে এই সময় সকল জাতির মানুষই তর্পণ করে থাকে। এখানে তর্পণের সময় পূর্ব পুরুষদের নামোল্লেখের প্রথা প্রচলিত নেই। এই ক'দিন এরা ধোপার বাড়ী কাপড় কাচতে দেয় না, এমন কি স্নানাদিও করে না। পালঙ্কেও শোয় না। এই ১৫দিন এরা অশৌচের মত পালন করে থাকে। যে যে তিথিতে আপনার লোকেদের মৃত্যু হয়েছে সেই সেই তিথিতে ব্রাহ্মণ, জ্ঞাতি প্রভৃতিদের ভোজন করান হয়। খাঁটি দুধে শুষ্ক চাল দিয়ে শূদ্র যদি পায়স প্রস্তুত করে দেয়, তবে ব্রাহ্মণে তা ভক্ষণ করে। পিতৃ পক্ষের ১৫ দিন ধরে সকল জাতির লোকেই উপবীত ধারণ করে থাকে, নতুবা তর্পণ সিদ্ধ হয় না। অথচ উল্লেখযোগ্য, ব্রাহ্মণেরা সারা বৎসর উপবীত ধারণ করে না, বিবাহের দিন ব্রাহ্মণদের উপবীত ধারণ করান হয়। এখানকার ব্রাহ্মণেরা মাছ মাংস প্রভৃতি আহার করে না।

আশ্বিন মাসে নবরাত্রের নয় দিন মেয়েরা 'নওা' নামক এক প্রকার পূজা করে থাকে। এই সময়ে এরা দেওয়ালে মাটির দানব অঙ্কিত করে। তার

দুই হাঁটুতে গৌরী ও দুই পায়ে কুকুর লিখে দেয় এবং এই সময় এরা প্রত্যহ রাত্রে গান করে।

নবরাত্রের প্রতিপদ থেকে নবমী পর্যন্ত রাজবাটীতে ঘট স্থাপন করে সহস্র চণ্ডী পাঠ হয়ে থাকে। বাসন্তী পূজার সময়ও অনুরূপ চণ্ডীপাঠ হয়ে থাকে। সন্ধি পূজা, ভদ্রকালী পূজা প্রভৃতি সমাপনান্তে নবমীর দিন প্রদান করা হয় পূর্ণাহুতি। এই সময় নারকেল বলিদান দেওয়া হয়। অষ্টমীর দিন হয় অস্ত্র পূজা। পুরুষানুক্রমে এই দিন একটি তরবারি পূজিত হয়ে আসছে। নবমীর দিন হয় হাতী ও ঘোড়ার পূজা। রঙ্ দিয়ে হাতির মুখ ও শুঁড় চিত্রিত করে রাজবাটীর সম্মুখস্থ মাঠে উপস্থিত করা হয় এবং রাজপুরোহিত, আচার্য ইত্যাদিরা সকলেই উপস্থিত হয়। মহারাণা নিজ হাতে পূজা করেন এবং হাতী ও ঘোড়ার মাথায় চাল ও হলুদ দিয়ে টীকা করেন। সকলের শেষে একটি ভেড়া বলি দেওয়া হয়।

বিজয়া দশমীর দিন অনুষ্ঠিত হয় 'ছেকুর পূজা'। মহারাণা রণসজ্জা করে একটি মাঠে গিয়ে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি একটি শমী বৃক্ষ পূজা করেন। পূজার পর সম্বৎসরের শুভাশুভ জানবার অভিপ্রায়ে একটি নীলকণ্ঠ পাখী ছেড়ে দেওয়া হয়। যেদিকে শুভ, পাখীটি সেই অভিমুখে উড়ে যায়। অতঃপর উপস্থিত সকলে শমী বৃক্ষের পাতা আশীর্বাদী রূপে গৃহে নিয়ে আসে। পরদিবস থেকে পূর্ণিমা পর্যন্ত সকলে পরিচিত ব্যক্তির গৃহে যাতায়াত এবং পান আদান প্রদান করে থাকে।

এখানে আশ্বিন মাসে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এই মেলাকে এখানে 'শরৎমেলা' রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। মেলা দুর্গাপূজার পঞ্চমীর তিথিতে আরম্ভ হয়ে কালীপূজার দ্বিতীয়ার দিন সমাপ্ত হয়।

প্রতিপদের দিন এখানে হয় ঝেঁঝির বিবাহ। একপ্রকার মাটির হাঁড়ির নাম ঝেঁঝি। এর ভেতরে একটি প্রদীপ প্রজ্বলিত করে সাত দিন পূর্ব থেকেই ছোট ছোট মেয়েরা তা মাথায় করে সন্ধ্যার সময় গান গাইতে গাইতে বাড়ী বাড়ী ভিক্ষা করে বেড়ায়। বিবাহের দিন একটি তিন পায়ের মাটির পুতুল তৈরী করা হয়, তার নাম 'টেঁশু'। এর পেটের ওপরে একটি প্রদীপ জ্বালান হয়। এইটি হয় বর। বিবাহ হয়ে গেলে এই বরের পা ধরে টানতে টানতে রাস্তায় নিয়ে গিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। পরে কন্যাকে মাথায় করে দু'টি মেয়ে

হাত ধরাধরি করে নাচতে থাকে। এইরূপ নাচের উদ্দেশ্য হাঁড়িটি যাতে মাথা থেকে পড়ে ভেঙ্গে যায়। কিন্তু হাঁড়িটির ভেতরের প্রদীপটি যদি ভেঙ্গে যায়, তবে যার মাথায় ঝেঁঝি ছিলেন, প্রচলিত সংস্কার অনুযায়ী সে বিধবা হয়।

কালীপূজাকে এখানে বলে দেওয়ালী। এ'টি এখানকার অন্যতম প্রসিদ্ধ পর্ব। কালীপূজার দিন রাত্রে লক্ষ্মীপূজা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। ব্যবসায়ীরা এইদিন নূতন খাতা মহরৎ করে থাকে। এই উৎসব উপলক্ষে গৃহের উঠান সাদা ও লাল মাটি দ্বারা চিত্র বিচিত্র করা করা হয়। এই ৩।৪ দিন এখানে খুব জুয়া খেলা হয়। দেওয়ালীর পরদিন অনুষ্ঠিত হয় গোবর্ধন পূজা। গোবরের মানুষ গড়ে মাটিতে শুইয়ে তার মুখে ভাত ও রুটি দেওয়া হয়। এবং তার বুকের ওপরে ছোট ছোট মাটির ভাঁড়ে করে খই ও রেউড়ি রেখে দেওয়া হয়। পূজা হবার পর উনান শুকিয়ে নিয়ে তাতে আগুন জ্বালান হয়। দ্বিতীয়ার দিন দোয়াত ও কলম পূজা করা হয়। সেইদিন যারা কায়স্থ তারা চিত্রগুপ্তের পূজা করে।

অগ্রহায়ণ মাসের উত্থান একাদশীকে এখানে 'দেউঠান' নামে অভিহিত করা হয়। সন্ধ্যার পরে দেবতার সিংহাসনের চারদিকে আখ, বেগুন, পানিফল, ছোলার শাক, মূলা প্রভৃতি সাজিয়ে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মন্ত্র পাঠ করা হয় এবং এক একবার সিংহাসন স্পর্শ করে উচ্চৈস্বরে বলা হতে থাকে 'উঠোদেব, বৈঠো দেব কুমারীকো বিয়াহ করো বিয়াহ বারেনকো গোনা করো।' শয়ন একাদশী থেকে এইদিন পর্যন্ত ধোলপুরে কোনরূপ সাংসারিক কাজকর্ম হয় না।

শয়ন একাদশী থেকে এখানকার লোকেরা আর আখ বেগুন খায়না। এটা ছাড়া উত্থান একাদশীর পূর্বে যে সকল নূতন দ্রব্য ওঠে, তাও দেবতাকে উৎসর্গ না করে কেউ খায় না।

পৌষ মাসে ধোলপুরে প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। এই সময় স্ত্রীলোকেরা সকলে জুতা অথবা মোজা পরিধান করে। তবে কেউ জুতা এবং মোজা দুই পরিধান করে না। যে কোন একটিমাত্র পরিধান করে। এখানে পৌষপার্বণও অনুষ্ঠিত হয়। পৌষমাসের ৮ দিন পূর্ব থেকেই কলাইয়ের ডাল বেটে 'চাঁদিরা' নামক দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়। মুগের ডালের বড়ার নাম এখানে 'মগোঁরা' এবং তিলের নাড়ুকে বলা হয় 'তেলোয়া'। কুটুম্ব ও আত্মীয়বর্গের মধ্যে পৌষ পার্বণ উপলক্ষে এইসকল দ্রব্যাদির আদান প্রদান হয়ে থাকে।

মাঘমাসে এখানে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর পাখী দৃষ্ট হয়। এইদিন থেকে এখানে স্ত্রীপুরুষ নির্বিশেষে বাসন্তী রঙের বস্ত্র ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। ফাল্গুন মাসে দোল পূর্ণিমার দিন অনুষ্ঠিত হয় চাঁচর। এখানে এ'টি 'হোলী মিলকো' নামে খ্যাত। প্রতিপদের দিন এখানে ছেলেদের অন্নপ্রাশন এবং দ্বিতীয়ার দিন ভ্রাতৃদ্বিতীয়া অনুষ্ঠিত হয়। এই ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিনও আবার সরস্বতীপূজার অনুরূপ দোয়াত ও কলমের পূজা হয়ে থাকে। দোল উপলক্ষে এখানে খুব ধুম পরিলক্ষিত হয়। বৈশাখ মাস পর্যন্ত এখানকার গ্রামগুলি উৎসব-মুখরিত থাকে।

এখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী পর্ব দিনে কারও বাটীতে মৃত্যু হ'লে আর কখনও সেই বাটীতে সেই পর্ব পালিত হয় না। দোলের পর তৃতীয়ার দিন এখানে একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এর নাম কংসবধের মেলা। মহারাজ এইদিন বিজয়া দশমীর ন্যায় শমীপূজা করে থাকেন। সহরের বাইরে একটি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। তা 'কংস টিলিয়া' নামে পরিচিত। সেইখানে কাগজ নির্মিত বৃহদাকৃতির একটি কংস মূর্তি স্থাপন করা হয়। তারপর একটি হাতীর ওপরে দু'টি ব্রাহ্মণ সন্তানকে কৃষ্ণ বলরাম বেশে সজ্জিত করে স্থানটিতে নিয়ে যাওয়া হয়। হাতী গিয়ে মূর্তিটিকে ফেলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে তোপ বন্দুক ব্যবহৃত হতে থাকে।

চৈত্রমাসে বাসন্তী ব্যতীত অপর কোন পর্ব নেই। এইসময়ে কারও বসন্ত হলে প্রথমে রোগীর গৃহে গঙ্গাজল দেওয়া হয়। পরে দুয়ারে জলভরা মাটির ঘট, নিমের ডাল ও আগুন রাখা হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত স্ত্রীলোকেরাও সেবার কার্যে নিযুক্ত হয়। সেবাকারী ব্যক্তি ব্যতীত অপর কেউ রোগীর গৃহে প্রবেশ করতে পারে না। এই সময়ে বাড়ীর কেউ স্নান পর্যন্ত করতে পারে না। এমন কি ধোপার বাড়ী কাপড় পর্যন্ত দিতে পারে না। এইসময়ে কেউ লবণ, লঙ্কা, হলুদ প্রভৃতি খায় না। শিল পর্যন্ত ব্যবহৃত হয় না, কোন দ্রব্য ভাজা কিংবা সাঁতলানো পর্যন্ত হয় না। এই সময়ে জুতা পরা, খাটে শয়ন করা, মাছ মাংস ভক্ষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধ। বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা একসঙ্গে সমবেত হয়ে প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় শীতলার গান গেয়ে থাকে। তিন অবস্থায় তিন প্রকার গান গীত হয়। সর্বপ্রথম রোগের লক্ষণ দেখলে বলা হয়, মাতা এলেন, বসন্তে গা ভরে গেলে বলা হয়, মাতা সিংহাসন পর অয়েঁ হঁয়, এবং কমবার সময়

বলা হয়, 'বাগলে গাঁহ'। রোগীকে 'মাতা মইয়া' বলে ডাকা হয়। বসন্ত রোগী যা খেতে চায় তাকে তাই খেতে দেওয়া হয়।

শীতলার যে ক'দিন পূজা না হয়, সেই ক'দিনই এরূপ নিয়মে চলে। যেদিন পূজা না হয় তার পূর্ব দিন রাত্রে ভাত রান্না করা হয়। অর্ধেক রাত্রে শীতলার মন্দিরে গিয়ে ঐ ভাত দিয়ে পূজা দেওয়া হয়। একে বলে 'চোরমাতা পূজা'। এরপর প্রাতঃকালে সকলে পূর্বের ন্যায় প্রাত্যহিক কর্মাদি করতে শুরু করে। দুইদিন পরে বাসী ভাত দিয়ে কোন ব্রাহ্মণের অবিবাহিত পুত্র কন্যাকে সকালে ভোজন করান হয়। সেইদিন রাত্রিতে হয় শীতলার আরতি। শীতলার ভজনও গাওয়ান হয়। অনন্তর গান বাজনা সহ সকলে শীতলার মন্দিরে গমন করে এবং লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি দিয়ে শীতলার পূজা দেওয়া হয়। এই পূজা মালীর প্রাপ্য।

এখানকার প্রচলিত রীতি অনুযায়ী ১০ মাস পর্যন্ত গর্ভবতী রমণীকে প্রত্যহ সকালে নিজ হাতে কুকুর, বিড়াল ও পক্ষীদের খাওয়াতে হয়। এই সময়ে প্রত্যহ ৫টি করে গান গীত হয়।

সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্র সদ্যোজাত সন্তানের কানের কাছে থালা বাজান হয়ে থাকে। ৫টি পূর্ণ কলসী উপুড় করে দেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়। তারপর কুমোরনী একটি মাটির ঘড়া মাথায় করে গাইতে গাইতে আসে। পরে নাপিতানী সকলের বাটীতে গিয়ে 'চরুয়া'র নিমন্ত্রণ করে আসে। অতঃপর শাশুড়ী সম্পর্কিত কেউ চরুয়া উনুনে বসিয়ে দেয়। চরুয়াতে পয়সা ও পাঁচন ফেলে দেওয়া হয়। চাকরাণী মাটির ঘড়াতে জল ঢেলে দেয়। এই ঘড়াটির নামই 'চরুয়া'। চরুয়ার জল সারাক্ষণ সিদ্ধ করা হয়। প্রসূতি এই জলই পান করে। শুঁট, পিপুল, হলুদ প্রভৃতি মসলা দ্বারা সিদ্ধ করে তবে এই জল প্রসূতিকে খেতে দেওয়া হয়। বাটীর স্থানে স্থানে আগুন রেখে দেওয়া হয় এবং তাতে সরষে ও গন্ধক দেওয়া হয়। প্রসবের দিন থেকে ১০দিন পর্যন্ত প্রসূতিকে এখানে 'পচ্চা' নামে অভিহিত করা হয়। সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার পর নাপিত চাল ও তিল নিয়ে প্রসূতির পিতৃগৃহে সংবাদ দিতে যায়। একে বলে 'তিল চাঁত্তরী'। নাপিত ব্যতীত অপর কেউ এটা নিয়ে যেতে পারে না। এখানে শুভকর্ম হলেই 'বাধাই' প্রেরণ করতে হয়। 'বাধাই' হ'ল এক মন দেড় মন পরিমিত চাল, ৪/৫ সের পরিমিত বাতাসা, এক পোয়া পরিমিত তিল,

একখানি চুমুরী করা কাপড় এবং বাদ্য। ৭/৮ জন স্ত্রীলোক এইগুলি গান গাইতে গাইতে নিয়ে যায়। বাটীর গিন্নীও দোলায় চড়ে গমন করে। বাধাইদের বিনিময়ে সেই ডালিতে দিতে হয় একসের পরিমিত চাল। এদের মধ্যে নাপিতানীর প্রাপ্য গম, অবশিষ্ট সবই গিন্নী পেয়ে থাকে।

'বাধাই' এসে পৌছালে ৫/৭ টি গান গাওয়া হয়। তার পরে যারা 'বাধাই' বহন করে থাকে এবং নিজেদের গৃহের চাকরাণীদের মধ্যে 'বাধাইয়ে'র সামগ্রী বণ্টন করে দেওয়া হয়। বাড়ীতে থাকে কেবলমাত্র তিল ও চুমুরী করা কাপড়খানি মাত্র।

'ধোলপুরে' কোন শুভকর্ম উপলক্ষে যখন 'বুলউতা' দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়, তখন তার পূর্বদিন রাত্রে ছোলা ভিজিয়ে দেওয়ার রীতি। শুভকর্মের দিন গান হয়ে গেলে ভিজে ছোলা প্রত্যেককে এক এক বাটি করে দেওয়া হয়। একেবলে 'বেলহা'। ধনী ব্যক্তি হলে, কিংবা বিশেষ কোন উৎসব উপলক্ষে ছোলার পরিবর্তে চাল দেওয়া হয়। এ'টি 'খোঁইচা' নামে পরিচিত।

দশম দিবসে হয় ষষ্ঠী পূজা। সেইদিন প্রস্থতির পিতৃগৃহ থেকে 'পছ' নামক তত্ত্ব প্রেরিত হয়। এই তত্ত্বে থাকে নবজাতকের গহনা, পোষাক, দরিয়া প্রভৃতি। এখানে স্থতিকা গৃহ থেকে বের হয়ে প্রস্থতিকে ৩ মাস পর্যন্ত 'দরিয়া' ভক্ষণ করতে হয়। সুজি অপেক্ষা বড় বড় করে পেষা গমকে বলে 'দরিয়া'। এখানকার প্রথানুযায়ী, শুভকর্ম উপলক্ষ্যে দুধ ও নারকেল দিতে হয়। বাটীর সকল স্ত্রীলোক একত্রিত হয়ে তবে চুড়ী পরিধান করে এবং সকলের চুড়ীপরা হয়ে গেলে তবে প্রস্থতি চুড়ী পরতে পায়। প্রস্থতি সন্ধ্যাকালে নবজাতককে নিয়ে স্থতিকাগৃহের বাইরে আসে। তখন জাতকের পিতার ভ্রাতৃ সদৃশ একটি ছোট ছেলে একটি তীর ধরে, প্রস্থতিও সেই তীর ধরে এবং দুই তিন পা অগ্রসর হয়। এরপর সকলে প্রস্থতিকে 'টীকা পট্টা' করতে থাকে। জাতকের পিতার ভগিনী সম্পর্কীয়া স্ত্রীলোকেরা একটি গোবরের পুতুল স্থতিকা গৃহের দেওয়ালে লাগায় এবং ভ্রাতা ভগিনীরা বিদায় স্বরূপ কিছু পেয়ে থাকে। এইরূপ পুতুল খেলার নাম 'সাঁতিয়া ধরা'।

পুত্র সন্তান হলেই সকলে 'হুভো দষ্টোন' নামক সমারোহের আয়োজন করে থাকে। ষষ্ঠীপূজার এক সপ্তাহ পরে হয় 'ইঁদেরা পূজা'। যতদিন পর্যন্ত না এই পূজা অনুষ্ঠিত হয়, ততদিন প্রস্থতি বাটীর বাইরে যেতে পারে না। ইঁদেরা

পূজার দিন সকল বৌ, ঝি গান গাইতে গাইতে ইঁদেরার নিকট গমন করে এবং লুচি, মোহনভোগ প্রভৃতি দিয়ে পূজা করে। এখানে ফুল চন্দন দিয়ে পূজার্চনা প্রায় লক্ষিত হয় না। নবজাতকের পিসি সম্পর্কীয়া সকলে কাজল প্রস্তুত করে। এদের সকলেই এক একখানি করে থালা পায়। পুত্রের কাকা সম্পর্কীয়েরা পুত্রের জন্ম পায় বালা। দোলনায় নবজাতককে তার পিসি শুইয়ে দেয়। বিদায় স্বরূপ পিসি পায় গহনা, দোলনার বিছানা ও কিছু পরিমাণ চাল। তারপর হলুদ ও গুড় দিয়ে ঢোলক পূজা করা হয়। সন্তান জন্মের পরই বাটীতে বাইনাচ শুরু হয় এবং এ'টি ১১ দিন ধরে চলে। ইঁদেরা পূজার পর এই নাচগান বন্ধ হয়। ছেলের অসুখে সকলেই 'নগরা' নামক দেবতার পূজা করে থাকে। 'নগরা' পূজার উপকরণ হল ডিম, মদ এবং ছাগল। এই পূজার পুরোহিত ধোপা। পূজা শেষে ধোপা পায় পূজার নৈবেদ্য। বালকের অসুখ হলে বলা হয়, 'নগরাণে খোর কর দই' অর্থাৎ নগরা পূজার লোভে অসুখ করিয়েছেন। সঙ্গে সঙ্গে নগরার নামে পূজা মানত করা হয় এবং অসুখ সারলে ভাল করে নগরার পূজা দেওয়া হয়।

প্রথমা পক্ষের স্ত্রীর মৃত্যু হলে দ্বিতীয়বার বিবাহের সময় যখন 'চড়াওয়া যায়, তখন তার সঙ্গে রৌপ্য নির্মিত একটি সপত্নীর মূর্তি প্রেরণ করা হয়। এইরীতি এখানকার সকল জাতির মধ্যেই প্রচলিত। যদি ভুলবশতঃ এ'টি প্রেরণ করা না হয় তাহলে মৃতা স্ত্রী নাকি ভাবী সপত্নীর অসুখ বাধিয়ে দেয় বলে বিশ্বাস। এইরূপক্ষেত্রে বিবাহ দশ পনের দিন স্থগিত রাখা হয় এবং অনতি-বিলম্বে সপত্নীর মূর্তি নির্মাণ করিয়ে ভাবী পত্নীর গলায় পরিয়ে দিতে হয়। তবেই সে আরোগ্য লাভ করে। এরপর বিবাহ কার্য সুসম্পন্ন হয়।

বিবাহের পর নব পরিণীতা স্ত্রী প্রত্যহ মুখ ধোবার ও আহার করবার সময় মৃতা সপত্নীর মূর্তিটির মুখ নিজ মনে ধ্যান করে ও তাকে মনে মনে আহার করিয়ে তবে নিজে আহার্য্য দ্রব্য গ্রহণ করে। সংসারে কোন শুভকার্য অনুষ্ঠিত হলে, মৃতা পত্নীর স্মরণে সধবা রমণীকে নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাতে হয়। এরূপ না করলে সপত্নী নাকি স্বপ্নে দেখা দেয়।

এখানকার স্ত্রীলোকেরা 'দশারাণী' নামে এক ব্রতপালন করে থাকে। এই ব্রত পালনের উদ্দেশ্য অসময় দূরীকরণ। এই ব্রতোপলক্ষে প্রতিবেশীদের মধ্যে যার বাটীতে প্রথম পুত্র সন্তান হয়েছে সেই বাটীতে ছয় খি সূতা স্পর্শ

করিয়ে আনা হয়। তাতে ব্রতানুষ্ঠানকারিণী নিজ অঞ্চলের এক খি সূতা মিশিয়ে দেয়। অতঃপর এই সাত খি সূতায় প্রত্যহ একটি করে গেরো দিতে হয়, আর প্রত্যহ ব্রত কথা শুনতে হয়। দশ দিনের দিন দশ মুটো আটা নিযে ভেজে আহার করতে হয়। এই দিন অন্য কিছু আর খেতে নেই।

অন্নপ্রাশনের দিনই সর্বপ্রথম পুত্র অথবা কন্যাকে অন্নভক্ষণ করান এখানকার রীতি। আম্রপাতায় খাদ্য সাজিয়ে, টাকার ওপর পরমান্ন রেখে তা থেকে খাওয়ান হয়। এই উপলক্ষে গান বাজনা, ছেলের টীকা পট্টা প্রভৃতিও হয়ে থাকে।

এরপর ছেলেকে 'রক্ষেশ' দেওয়া হয়। যতদিন পর্যন্ত না 'রক্ষেশ' প্রদান করা হয়, ততদিন ছেলেকে গৃহের নূতন বস্ত্র অথবা অলঙ্কার পরাতে নেই। জ্ঞাতি কুটুম্ব যা দেয়, তাই পরাতে হয়। আড়াই বৎসর বয়স হলে তবে 'রক্ষেশ' প্রদান করা হযে থাকে। সেইদিন সকল বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ করা হয়ে থাকে। কুটুম্ব জ্ঞাতি সকলে একত্রিত হয়ে খাদ্য সামগ্রী সঙ্গে নিয়ে গীতবাদ্য সহ কোন একটি উদ্যানে গমন করা হয়। সেখানে এক গোয়ালা কুল গাছের নীচে বসে ছেলেটির কোমরে সূতা পরিয়ে দেয়। এই সূতার নামই হ'ল 'রক্ষেশ'।

এখানে মস্তক মুণ্ডনকে বলে 'মূড়না'। পঞ্চম কিংবা সপ্তম বর্ষে ছেলের 'মূড়না' হয়। মস্তক মুণ্ডনের দিন খুব উৎসবের দিন। এই দিন নৃত্য গীত হয়, জ্ঞাতি কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করা হয়। ছেলের এই দিন 'টীকা পট্টা' হয় এবং সেই চুল তুলে রাখা হয়। ভাদ্রমাসের মোরছটের দিন টোপর ভাসাবার ন্যায় মছকুণ্ডে এই চুল ভাসিয়ে দেওয়া হয়।

যে তিথিতে সন্তান ভূমিষ্ঠ হয়, সেই তিথিতে পর বৎসর থেকেই জন্মতিথি পূজা অনুষ্ঠিত হতে থাকে। এবং একটি দীর্ঘ সূতায় প্রতি বৎসর একটি করে গিঁট দেওয়া হয়। জন্মতিথি পূজাকে এখানে 'বরষ পাঠ' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে। এই দিন নৃত্য, গীত, নৌছাত্তর প্রভৃতি সকল প্রকার উৎসবই অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

ধোলপুরে প্রায় সকল জাতির লোকেরই অল্প বয়সে বিবাহ হয়ে থাকে। অবশ্য যারা ক্ষত্রিয়, তারা ১৭/১৮ বৎসরের পূর্বে কন্যারত্নে বিবাহ দেয় না। বেণেদের মধ্যে অত্যন্ত অল্প বয়সে বিবাহ দেবার রীতি প্রচলিত। এদের বিবাহ

সাতটি অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশটি পরিচিত 'সগাই' নামে। তিন অথবা চার বৎসরের কন্যা হলেই বিবাহের পাকা কথা চলতে থাকে। প্রথমে চলে কথাবার্তা পরে দেখা হয় গোত্র। এখানে চারটি গোত্র কেবল মাত্র বিবেচনা করা হয়ে থাকে। এই গুলি হ'ল পিতা, মাতামহ, মেসোমশাই এবং পিসে-মশায়ের গোত্র। কন্যা অপেক্ষা বর মাথায় অথবা বয়সে ছোট হলেও কিছু যায় আসে না। এমন কি পাত্র শিক্ষিত কিংবা অশিক্ষিত কিনা, তাও দেখা হয় না। পাত্রের পিতা মাতা ধনী হলেই হ'ল।

'সগাই' স্থির হয়ে গেলে কন্যাপক্ষীয়েরা ১০।১২ জন মোহর নিয়ে বরের বাটীতে এসে উপস্থিত হয় এবং বরের কপালে টীকা দেয়। একে বলে টীকা চড়ানো। এই উপলক্ষে আত্মীয় কুটুম্বেরা সমবেত হয়ে দু'চার দিন আনন্দে অতিবাহিত করে। যাদের মোহর দেবার ক্ষমতা নেই তারা বরকে একটি পান খাওয়ায়।

এর কিছুদিন পরে বরপক্ষীয়ের ১০।১২ জন কন্যার জন্য ঘাগরা, ফরীয়া, নারকেল, বাতাসা, খেলনা প্রভৃতি নিয়ে কন্যার বাটীতে এসে উপস্থিত হয়। ক্ষমতাবান লোক হলে গহনাও প্রেরিত হয়। তখন আবার কন্যার গৃহে গীত বাদ্য প্রভৃতি অনুষ্ঠিত হয়। কন্যাকে ভাবী শ্বশুরালয়ের বস্ত্র পরিধান করান হয় এবং কন্যার কোঁচড়ে নারকেল ও বাতাসা প্রদান করা হয়। এর নাম 'গোজভরা'।

যারা তত্ত্বাহক, তাদের 'কচ্চী' ও 'পক্কী' ভোজে আপ্যায়িত করা হয়। তার পরে যদি কন্যার খুড়া, জ্যাঠা, মামা প্রভৃতি থাকে, তা হলে তারাও আপন আপন গৃহে বরপক্ষীয়দের আহ্বান করে নিজ নিজ অবস্থানুসারে আপ্যায়িত করে থাকে। যাবার সময় বরপক্ষীয়দের টাকা ও চাদর প্রদান করা হয়।

বিবাহের তৃতীয় অংশ 'সীধে ছোঁওয়া'। এই তিন বৎসর 'ঘঘরীয়া ফরীয়া' প্রেরণ করবার পরে যখন বিবাহ দেবার সুবিধা হয়, তখন বর ও কন্যাপক্ষ মাস ও দিন স্থির করে। দুই মাস পূর্ব থেকেই একটি উত্তম দিন দেখে বর ও কন্যার গৃহে 'সীধে' স্পর্শ করান হয়। কন্যাকে পিঁড়ার ওপর বসিয়ে হাতে চাল, গম প্রভৃতি স্পর্শ করিয়ে গান বাজনা হয়। সেই দিন থেকে বিবাহ শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রত্যহ সন্ধ্যায় গান হবার রীতি। এইদিন থেকেই আরম্ভ হয়

'বাধাই'। 'বাধাই' প্রথমে আসে গুরু ও পুরোহিতের, পরে আসে কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবদের। শনি মঙ্গল ব্যতীত অপর সকল দিনেই বাধাই আসে। ধোলপুরে কোন শুভকর্ম উপলক্ষে 'বুলউত্তা' দিয়ে নিমন্ত্রণ করা হয়। গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় প্রত্যেককে এক এক বাটি ভিজে ছোলা দিয়ে 'বেলহার' পালিত হয়ে থাকে। ধনীলোক হলে ছোলার পরিবর্তে চাল দেয়। একে বলে 'খোইচা'। এইদিন সকল কুটুম্ব একত্রিত হয়ে কিছু পরিমাণ চাল ইত্যাদি ঝেড়ে থাকে। এইদিন থেকেই প্রকৃত পক্ষে বিবাহের কার্য শুরু হয়ে যায়। বিবাহে যত আটা, ময়দা, বেসন প্রভৃতি খরচ হয়, প্রায় সকল লোকই পূর্ব হতেই তা প্রস্তুত করিয়ে নেয়। এই নিয়মকে এখানে বলে 'সীধা ছোঁজ।' এরপর ময়দার পাঁপর তেলে ভাজা হয় এর নাম পপরীয়া এবং মঙ্গোরা। এই পপরীয়া ও মঙ্গোরা লোকের বাড়ী বিতরণ করা হয়।

এর পর লগুন। সোনা ও রূপায় বাঁধান নারকেল, সুপারি, রেশমের থান এবং নগদ টাকা যে যার সামর্থ অনুযায়ী দিয়ে থাকে। এই সময়ে যত টাকা প্রদান করা হয়, সেই পরিমাণ টাকা বিবাহের প্রতিটি কার্যেই দিতে হয়। কুটুম্ব সকল একত্রিত হয়ে গান বাজনা করে এবং কন্যার হাতে ঐ সকল দ্রব্যাদি স্পর্শ করিয়ে গুরু, পুরোহিত ও নাপিত দ্বারা বরের বাটীতে প্রেরণ করা হয়। প্রেরণ করবার সময় যে সকল কুটুম্ব এসে উপস্থিত হয়, তারাও 'লগুন' দেখে কয়েকটি করে টাকা প্রদান করে। সেই টাকাও সঙ্গে দেওয়া হয়। বরের হাতে এই সকল সমর্পণ করা হয়।

লগুনের দিন রাত্রিতে কন্যার বাটীতে হয়, 'মাটিয়ানা'। অর্থাৎ কন্যার পিসেমশাই মাটি খুঁড়ে দেয় এবং বাটীর অন্যান্যেরা গান বাজনা করতে থাকে। সেই মাটি দিয়ে উনান নির্মিত হয়। এই একটি উনানেই বিবাহের যাবতীয় জিনিষ পাক করা হয়।

বিবাহের এক সপ্তাহ পূর্বে বৃহদাকৃতির লুচি ও গুড় নিয়ে কন্যার মাতা নিজের ভ্রাতা ও মাতুলের বাটী নিমন্ত্রণ করতে যায়। একে বলে 'ভাত চাওয়া।' সেখানে ২।১ দিবস অতিবাহিত করে মাতা পুনরায় নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে। তারপর দিন সকালে একটি ঘটির গলায় গহনা পরিয়ে কলুর বাড়ী থেকে গীত বাদ্য যোগে তেল আনীত হয়। এই তেলে হয় গায়ে হলুদ। পরদিন শুষ্ক হলুদ মাখিয়ে গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। পর পর

৩।৪ দিন ধরে এইরূপ করা হয়। কন্যা অথবা বর কাউকে জল কিংবা তেল স্পর্শ করান হয় না। বিবাহের দিন কন্যাকে স্নান করান হয় এবং কেবলমাত্র এই দিন তাকে জল ও তেল স্পর্শ করান হয়। এর পর পোঁতা হয় 'মাড়জ'। যদি কন্যার বিবাহ হয়, তাহলে ২১টি কাঁঠের খুঁটি পুঁতে আটচালা বাঁধা হয়। সেই আটচালার ভেতরে মাটির ঘট, গণেশ ও প্রদীপ স্থাপন করা হয়। একেই বলে 'মাড়জ' অর্থাৎ মণ্ডপ। এই মাড়জেই বিবাহের সমস্ত কার্য অনুষ্ঠিত হয়। কন্যার পিসেমশাই প্রথমে একটি খুঁটি পুঁতে দেয়। এর জন্য তার যা প্রাপ্য হয়, তা 'নেগ' নামে পরিচিত। এর পর ছুতার বাকি খুঁটিগুলি পোতে। আম ও গমের শিষ দিয়ে আটচালা বাঁধা হয়। খুঁটিতে লাল শালুর ওপর জরি মোড়া হয়। ছেলের বিবাহের 'মাড়জ' হলে একটি খুঁটি পোঁতা হয় এবং খুঁটির গায়ে বাঁশের ও আমের ডাল বেঁধে দেওয়া হয়। তার ওপর মুসলমান ফকিরের রূপার পাঞ্জা স্থাপন করা হয়। অবশিষ্ট কন্যার মাড়জেরই অনুরূপ।

বিবাহের দিন রাত্রে কন্যার মাতুল ও ভ্রাতা ডালাতে করে 'ভাত' ও নগদ কিছু টাকা নিয়ে আসে। সঙ্গে থাকে গীত বাদ্য। এদিকে কন্যার মাতা কুটুম্বদের স্ত্রীলোকদের সঙ্গে নিয়ে সদর দরজাতে গিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। সেই-খানেই আলপনা দিয়ে পিঁড়ি পেতে তার ওপরে দাঁড় করিয়ে 'ভাতাইয়া' দেয়। অর্থাৎ যারা 'ভাত' আনে, তাদের কপালে টীকা দেওয়া হয়। কাপড়ের ডালা, 'ভাতাইয়ারা' নিজ নিজ মস্তকে করে এনে কন্যার মাতার মস্তকে দেয়। এই প্রথা যে কেবলমাত্র নিজের মাতুল এবং ভ্রাতা হলেই হয়ে থাকে তা নয়, ঘনিষ্ঠতা থাকলে মুসলমান পর্যন্ত এই 'ভাত' দিতে পারে। এরপর কন্যার মাতা ভাতাইয়াদের ধরে বাড়ীর ভেতরে নিয়ে আসে এবং পা ধুইয়ে সরবৎ খেতে দেয়। শাশুড়ী, ননদ ইত্যাদিরা ভাতাইয়াদের প্রদত্ত 'ভাত' অর্থাৎ এই সকল 'জোড়া' পরিধান করে। তারপর কন্যার সিঁথে ময়ূর বেঁধে নতুন কাপড় পরিধান করিয়ে 'ঘুরো' পূজা করতে নিয়ে যাওয়া হয়। পূজা করে প্রত্যাবর্তনের সময় কন্যা চক্ষু বন্ধ করে দুই হাতে সেখানকার দুই মুষ্টি ধূলি আনে এবং বিবাহের যেখানে ভাঁড়ার হয়, সেই ঘরে ফেলে দেয়। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী এতে নাকি ভাণ্ডার পরিপূর্ণ থাকে।

বিবাহের প্রথম দিন বরের বাড়ী থেকে প্রথমে 'বরোণা' আসে। একটি ঘটিতে পাঁচ সিকা পয়সা সহ ধান প্রেরিত হয়। কন্যাপক্ষীয়েরা প্রথমে ধানগুলি

বের করে নিয়ে তাতে আরও কিছু টাকা দিয়ে ঘটিটি প্রত্যর্পণ করে। কন্যার শ্বশুর বাড়ী থেকে কোন দ্রব্য আসলে এখানে তা গ্রহণ করবার রীতি নেই। বরং ক্ষমতানুসারে তাতে আরও কিছু দিয়ে ফেরত দেওয়া হয়।

বরযাত্রীদের এখানে বলে 'বরাত'। যেখানে তাদের থাকবার বাসা দেওয়া হয় তাকে বলে 'জনযাত্রা'। বর বাড়ীতে এসে পৌঁছলে দ্বারদেশে গিয়ে দাঁড়ায় এবং কন্যাপক্ষীয় কোন স্ত্রীলোকে কন্যাকে কোলে করে সেখানে নিয়ে আসে। এর পর কন্যা বরের গায়ে চাল নিক্ষেপ করে এবং বর তৎক্ষণাৎ বসে পড়ে। তার পর একটি ঘটি সুদ্ধ ঘড়া, ঘটির গলায় থাকে রূপার হাঁসুলী এবং 'লগুনে' যত টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই পরিমিত টাকা, ১১ খানি বাসন, ঢাল, তরোয়াল, ছোরা, গোঁফহার, বালা, মাকড়ী প্রভৃতি বরকে প্রদান করা হয়। 'লগুন'কে বলা হয় 'প্রথম ঠিক' এবং শেষোক্ত দেওয়াকে বলা হয় 'দ্বিতীয় ঠিক'।

এই সকল অনুষ্ঠানের পর বর জন মাসায় ফিরে যায়। তারপর বিবাহ সম্বন্ধে বরকে যতবার প্রয়োজন হয়, ততবারই বাজনা নিয়ে জনমাসা থেকে তাকে নিয়ে আসা হয় এবং কার্য শেষ হয়ে গেলে পুনরায় তাকে জনমাসায় পৌছে দেওয়া হয়। জনমাসা থেকে বর কর্তারা কন্যার জন্য 'চড়াওয়া' অর্থাৎ গহনা ও বস্ত্র প্রেরণ করে। একখানি সাদা থান ধুতি এবং দোহরা কাপড়ের জামা, তার ভেতরে বাতাসা, টাকা ও মেওয়া থাকে। সেই জামাটি ও সাদা থান ও ধুতি খানি পরিধান করে কুশণ্ডিকা করতে হয়। সেইসঙ্গে রেশমের একটি জোড়াও বরেরা পাঠিয়ে দেয়। কন্যা তা পরিধান করে। কন্যা দানের পর বাটীর ভেতরে প্রবেশ করে। অপর একটি যে শালুর জোড়া আসে, তা পরিধান করে 'ফেরপাটা' হয়। কন্যাকে কাপড় পরিধান করাবার পর বর আসে। তখন বর যাত্রীরা আহার করতে বসে। খাওয়া শেষ হলে কন্যাদানের জন্য বরকে বাড়ীর ভেতরে আনয়ন করা হয়। গাঁটছড়া বেঁধে মাতা ও পিতা কন্যাদান করতে বসে। গাঁটছড়া না বেঁধে বসলে কন্যাদান সিদ্ধ হয় না। এই সময়েই কুশণ্ডিকা অনুষ্ঠানটিও হয়ে যায়।

এই সময়ের দানকে বলা হয় 'তৃতীয় ঠিক'। তৃতীয় ঠিকে দান করা হয় গরু এবং সাধ্যানুযায়ী ময়দার গোলার ভেতরে রক্ষিত মোহর, অঙ্গুরীয় প্রভৃতি গুপ্তধন। পরে একখানি কড়া দেওয়া হয়, তাতে বর ও কন্যা পা দিয়ে

বসে। এই সময়ে যেসকল কুটুম্ব ও ভাতাইয়ারা উপস্থিত থাকে, সকলে সস্ত্রীক গাঁটছড়া বেঁধে বর ও কন্যার পা ধুইয়ে পূজা করে ও যথাসাধ্য কিছু কিছু দান করে। এরপর বর ও কন্যা ভেভরে যায়, শাশুড়ী বরের মাথা থেকে টোপর নামিয়ে নেয় অতঃপর জামাই তার প্রাপ্যের কথা বলে। উত্তরে শাশুড়ী বরকে কিছু অর্থ প্রদান করে। এরপর বর ও কন্যা একসঙ্গে উপবেশন করে দুধভাত আহার করে। তারপর বর জনমাসে প্রত্যাবর্তন করে। ইতিমধ্যে কন্যার পিতামাতা আহার সেরে নেয়। সাধারণ ক্ষেত্রে প্রায় ২০০।২৫০ জন বরযাত্রী এসে থাকে। বরযাত্রীদের মোট ৩ দিন রাখা হয়। কিন্তু তাদের সমগ্র দিনের মধ্যে কেবলমাত্র সন্ধ্যার সময় আহার্য দেওয়া হয়। বিবাহের দ্বিতীয় দিন সকালে বরকে আনা হয় এবং ফেরপাটা নামক অনুষ্ঠান পালিত হয়। অর্থাৎ বর ও কন্যা পরস্পরের পিঁড়ি বদল করে উপবেশন করে।

সন্ধ্যার সময় বর ও বরের পিতা বরযাত্রীদের সঙ্গে 'মাড়োয়ার' নীচে ভোজনে বসে। এইসময়ে প্রথমেই প্রাপ্য চাওয়া হয়, তখন কন্যার পিতাকে কিছু দিতে হয়। এরপর আবার বরের পিতার জন্য খাবার আসে এবং সেই আহার্যের থালাতে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করা হয়। বরের পিতা এই থালা থেকে সামান্য কিছু আহার্য দ্রব্য তুলে নিয়ে অধিকাংশই প্রসাদস্বরূপ কন্যার মাতাকে প্রত্যর্পণ করে। পুনর্বার ভিতর থেকে পৃথক থালায় আহার্য সামগ্রী আসে, তখন বৈবাহিক যথার্থ আহারে বসে। আহার শেষে তাকে একটি টাকা ও পাঁচটি পয়সা উচ্ছিষ্ট থালাটির ওপর রাখতে হয়। তারপর থালাটি ভেতরে প্রেরিত হয়। এইসময় নাপিতানীকে ৫টি পয়সা দেওয়া হয়। অনন্তর বৈবাহিকের পূর্বে প্রেরিত একটি টাকাকে দ্বিগুণ করে বৈবাহিককে প্রত্যর্পণ করা হয়। যখন বরযাত্রীরা আহার করতে থাকে, বাটীর মেয়েরা সেইসময় গীত শুরু করে। কিন্তু এই গানগুলি অতীব অশ্লীল। বরযাত্রীরা আহারান্তে আস্ত পান ও মসলা ভেতরে প্রেরণ করে। এই পানের নাম 'গারীঝুঠনকে পান' অর্থাৎ এতক্ষণ যারা গান গাইছিল তাদের জন্য উচ্ছিষ্ট পান।

বিবাহের তৃতীয় দিবসে সকালে, অঙ্ক মালার জন্য বরকে আনয়ন করা হয়। মাড়োয়ার নীচে বরকন্যাকে পালঙ্কের ওপরে বসিয়ে খাট বিছানা, ২১টি বাসন, লগুনে যত টাকা দেওয়া হয়েছিল সেই পরিমিত টাকা প্রভৃতি প্রদান করা হয়। এর পর কুটুম্ব ও ভাতাইয়ারা 'অঙ্কমালা' করে। কন্যাপক্ষী-

য়দের টাকা প্রদান করে এবং টাকার পরিবর্তে নারকেল পায়। এইরূপ আদান প্রদান কিন্তু সমান সম্পর্কীয়দের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। অক্ষমালার পর দুই বৈবাহিক নিজ নিজ পোষাক খুলে তা পরস্পরের নাপিতকে অর্পণ করে। কন্যার পিতা বেয়াইকে একখানি গাত্র বস্ত্র প্রদান করে। তখন দুই বৈবাহিক পরস্পরের বক্ষে ভিজা পান লাগায়। কন্যার পিতা বরকর্তার পানের ভেতরে মোহর রেখে দেয়। তারপর দুই বেয়াই পরস্পরের মুখে ফাগ মাখাতে থাকে। এরপর বরকে দিয়ে মাড়োয়ার আটচালার গেরো উন্মুক্ত করান হয়। বর প্রথমে তার প্রাপ্য চায়, শ্বশুর তার সাধ্যমত বরকে দেয়। এর পরে গেরো খোলা হয়। সন্ধ্যার সময় হয় আহারাদি। বিবাহের চতুর্থ দিন সকালে শাশুড়ী বরকে ভিতরে ডেকে নিয়ে গিয়ে গোপনে কিছু পরিমাণ অর্থ প্রদান করে। অতঃপর বর ও কন্যা বিদায় নেয়।

ধোলপুরে ছেলে ও মেয়ের বিবাহের রীতিনীতি প্রায় একই। কেবলমাত্র ছেলের বিবাহের দু'টি অনুষ্ঠান অধিক, একটি 'বিন্নায়গী' এবং অপরটি 'খোঁইয়া'। ছেলের গায়ে হলুদ অনুষ্ঠান শেষে ছেলেকে গান বাজনা করতে করতে কুটুম্বদের দ্বারে দ্বারে নিয়ে যাওয়া হয়। এরই নাম 'বিন্নায়গী'। বিন্নায়গী হয় কেবল-মাত্র একদিন। ছেলে বিবাহ করতে গিয়ে যতদিন না ফিরে আসে, সেই ক'দিন বাটীতে হয় 'খোঁইয়া'। কুটুম্বদের বৌ ঝি সকলে সঙ সাজে সেজে নাচ গানে প্রবৃত্ত হয়। অতঃপর রাত্রিবেলায় রাস্তাদিয়ে হেঁটে আত্মীয়স্বজনদের বাড়ীতে গিয়ে পুরুষদের ধরে প্রহার করবার চেষ্টা করে। সেইজন্য পুরুষেরাও 'খেঁাইয়া' আসছে শুনলে আত্মগোপন করে। 'খোঁইয়া' এবং 'বিন্নায়গী' কারও বাটীতে আসলে এক একটি টাকা দেওয়ার রীতি প্রচলিত।

ছেলের বিবাহে অপর একটি রীতি অনুসৃত হয়ে থাকে, তা হল বরের মাতা যখন পুত্র এবং পুত্রবধূকে গাঁটছড়া বেঁধে বরণ করে নেয়, তখন বাড়ীর যত কুটুম্ব ও জ্ঞাতির পরিবার, সকলে নতুন বধূকে কোলে করে বরের সম্মুখে নৃত্য করতে থাকে এবং বাড়ীর গৃহিণী তাদের গম, ছোলা, টাকা, বস্ত্র প্রভৃতির দ্বারা 'নোছোয়ার' করে। এরপর শাশুড়ী দুধ দিয়ে বধূর পা ধুইয়ে দেয় এবং সেই দুধ নিজে পান করে।

ধোলপুরে প্রচলিত রীতি অনুযায়ী বধূ কিংবা কন্যাকে আনতে যাবার সময় 'মথনা' নিয়ে যেতে হয়। গৃহের লোকেরা এক একটি লম্বা পেরাকী,

এক সের ওজন বিশিষ্ট এক একটি লাড্ডু ও থালার ন্যায় বৃহদাকৃতির লুচি মাটির ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জালাতে রেখে দিয়ে মুখবন্ধ করে নানাবিধ রংএ জালা চিত্র বিচিত্র করে প্রেরণ করে। এই 'মথনা' প্রেরণের সময় বেয়ানকে ঠকাবার জন্য এক একটি পেরাকীতে চাল, গম, কিংবা টাকা রেখে দেওয়া হয়। আবার বিপরীতক্রমে বধূ কিংবা কন্যা যখন আসে, তখন তারাও ঐরূপ করে আনে, কেউ পাঁচটি কেউবা সাতটি পর্যন্ত এইরূপ জালা দেয়।

এখানে কন্যার বিদায়ের সময় এবং কন্যা শ্বশুরালয় থেকে পিত্রালয়ে আসলে চিৎকার করে সকলে ক্রন্দন করতে থাকে। বিবাহের পর কন্যাকে আর একদিনের জন্যও শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করা হয়না। তিন কিম্বা পাঁচ অথবা সাত বৎসর পরে কন্যার দ্বিরাগমন অনুষ্ঠিত হয়। তখন কন্যাকে ৮। ১০ দিনের জন্য শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করা হয়। তারপর কন্যাকে পুনরায় ছয়মাস অথবা এক বৎসরের জন্য শ্বশুরালয়ে প্রেরণ করা হয়না। দ্বিতীয়বার দ্বিরাগমন হলে তবেই প্রেরণ করা হয়। অতঃপর বধূ শ্বশুরালযেই থাকে। এখানে দ্বিরাগমনকে বলে 'গৌনা'। গৌনার জন্য প্রথমে দিনস্থির করতে হয়। তারপর দিনস্থির হয় গৃহ প্রবেশের। অতঃপর 'গীত কড়না' বাঁধাই প্রভৃতি সকলই বিবাহের ন্যায় অনুষ্ঠানাদি শুরু হয়। তৎপরে ৪০।৫০ জন লোক বধূকে আনতে যায়।

কন্যার বাড়ীতে বরকে দুই, তিন দিন মাত্র রাখা হয়। বিদায়ের সময় ২০। ২৫টি জোড়া, গা সাজানো গহনা, ডোলা কিংবা পালকী, খাট, বিছানা, বাসন ২। ৩ জন লড়কিনী প্রভৃতি দেওয়া হয়। যারা বধূকে আনতে যায়, তাদের সকলকে 'অঙ্কমালা'র টাকা প্রদান করা হয়। ৫।৭ টি 'মথনা'ও দেওয়া হয়। বধূর পালকী তুললে কন্যার শ্বশুর পালকীর ওপরে টাকা—পয়সা ছড়িয়ে দেয় এবং দাসদাসীদের বকশিস প্রদান করে। শ্বশুর বাড়ী পৌছালে বর কন্যাকে গাঁটছড়া বেঁধে নিয়ে যাওয়া হয় এবং 'টীকাপট্টা' 'কলস পাঁউড়া' প্রভৃতি করা হয়। তার পরের দিন রাত্রে অনুষ্ঠিত হয় ফুলশয্যা। সেইসময়ে বর বধূকে ১০। ১২টি থলি দেওয়া হয়। তাদের কোনটিতে থাকে মেওয়া, কোনটিতে এলাচ, কোনটি আবার রেজকী ভরা। তৃতীয় দিনে হয় বৌভাত। বিবাহের সময় ফুলশয্যা কিংবা বৌভাত হয় না। এখানে দ্বিতীয়বারের দ্বিরাগমনকে বলে 'বোণো।' বিবাহে যা যৌতুক দেওয়া হয়, তার অর্ধেক

দেওয়া হয়। গৌনার এক তৃতীয়াংশ দেওয়া হয় 'বোণো' তে।

যতদিন পর্যন্ত না কন্থার 'সমধারো' হয়, ততদিন কন্যার মাতৃ সম্পর্কীয়া কেউই তাকে দেখতে তার শ্বশুরালয়ে যেতে পারে না। গরীব হলে অবশ্য প্রায় ক্ষেত্রেই 'সমধারো' করা হয় না। সেক্ষেত্রে কন্যার মাতার আর কন্যার শ্বশুরবাড়ী যাওয়া হয়ে ওঠেনা। 'সমধারো' হয় এইরূপ কন্যার পিত্রালয়ে গান বাজনার আয়োজন করা হয়, জ্ঞাতি কুটুম্বদের নিমন্ত্রণ করা হয় ও সেই সঙ্গে কন্যার শ্বশুর বাড়ীর স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলকেও নিমন্ত্রণ করা হয়। নিমন্ত্রিতরা সকলে সদর দরজাতে এসে পৌছালে সেই থানেই বেয়ানকে পিঁড়া পেতে টাকা, নৌছাওড়, কলসা পাউড়া প্রভৃতি করা হয়। তারপর পা ধুইয়ে দেওয়া হয় এবং আঁচলে জোড়ো, টাকা নারকেল প্রভৃতি দিয়ে বাড়ীর মহলের দিকে ডাকা হয়। সেই সময় বেয়ান নিজের দিকে টানতে থাকে। যে টেনে আনতে পারে তারই এক্ষেত্রে জিৎ হয়। পরে আহারাদি হয় এবং সেই থেকে যাওয়া আসাও শুরু হয়।

ধোলপুরে হিন্দুদের শবদাহ করা হয়। যারা সরদার, তারা নিজ নিজ বাগানে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন করায় এবং সেইস্থানে একটি শিব স্থাপন করায়। একে বলে 'ছতুরী'। সৎকারের কিছুক্ষণ পরে সকলে স্নান করে ফিরে আসে। তৃতীয় দিবসে শবদাহের ছাই ও দুগ্ধ অস্থি গঙ্গায় নিক্ষেপের উদ্দেশ্যে প্রেরিত হয়। এর নাম 'ফুল ভেজনা'। এখানে তিন দিনেই সকলে শুদ্ধ হয়ে যায়। শুদ্ধ হওয়াকে বলা হয় 'উজরো'। দাহকর্তা হবিষ্যান্নের পরিবর্তে ডাল---রুটি আহার করে। তবে সেই রুটি চাটুতে প্রস্তুত হয় না। তের দিনের দিন অনুষ্ঠিত হয় শ্রাদ্ধ, ব্রাহ্মণ থেকে সকলজাতির মানুষই শ্রাদ্ধোপলক্ষে মালপুয়া করে ভোজন করায়।

এখানে শ্রাদ্ধকে বলা হয় 'তেরহী'। যাদের অশৌচ হয়, তারা এই ১৩ দিন বাড়ী থেকে বের হয় না। সকল আত্মীয় স্বজন, বন্ধু কুটুম্ব বাড়ীতে এসে দুঃখ প্রকাশ করে যায়। এখানে অগ্রদনী ব্রাহ্মণকে বলা হয় 'মহাব্রাহ্মণ' বা 'কটীয়া'। এদের বসতি গ্রামের বাইরে। বেলা নয় ঘটিকা পর্যন্ত এদের সদর দরজা খোলা নিষেধ। যাতে সকালেই কেউ এদের মুখ দর্শন করে না ফেলে, তার জন্যই এইরূপ ব্যবস্থা। 'তেরহী'র দিন ব্যতীত অন্য কোন দিন কোন লোকের বাড়ীতেই এরা প্রবেশ করতে পারে না।

বসন্ত রোগে কারো মৃত্যু হলে এখানে তাকে দাহ না করে মৃত দেহ স্রোতের জলে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। এবং কুশপুত্তলিকা করে তাই দাহ করা হয়, এর নাম 'নারায়ণ বলি'।

ধোলপুরে সকলেই তলোয়ারকে পোশাকের অঙ্গ হিসাবে দেখে থাকে। প্রত্যেকেই তাই সঙ্গে করে তলোয়ার নিয়ে বেড়ায়। এই রাজ্যে নানা প্রকার হরিণ, নীলগাই প্রভৃতি দেখতে পাওয়া যায়।

তীর্থমুকুর

লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বাগচী তীর্থযাত্রীদের হিতার্থে স্বয়ং হিন্দুদের প্রধান প্রধান তীর্থ-স্থানগুলি ভ্রমণ করে এবং জয়নারায়ণ ঘোষাল কৃত 'কাশীখণ্ড' অবলম্বন করে 'তীর্থমুকুর' নামক গ্রন্থটি প্রণয়ন করেছিলেন ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে॥ ১২৯৯॥ গ্রন্থটি এই শ্রেণীর অপরাপর গ্রন্থগুলির তুলনায় নিতান্তই ক্ষুদ্র। সপ্তম অনুচ্ছেদে সমাপ্ত গ্রন্থটিতে লেখক কাশী, গয়া, বৈদ্যনাথ, প্রয়াগ, নৈমিষারণ্য, মথুরা, বৃন্দাবন পুষ্করতীর্থ, হরিদ্বার, কনখল, চণ্ডীর পাহাড়, বদরিকাশ্রম, পুরী, চন্দ্রনাথ এবং কামাখ্যার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা প্রদান করেছেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কাশী। এর উত্তরে বরণানদী, দক্ষিণে অসী নদী, পূর্বে জাহ্নবী এবং পশ্চিমে দেহলী গণেশের মন্দির। কাশী ক্ষেত্রের পরিমাণ ৫ ক্রোশ। কাল ভৈরব, দণ্ডপাণি এবং ঢুণ্ঢিরাজ গণেশকে কাশীর শাসনকর্তা রূপে অভিহিত করা হয়ে থাকে। কাশীর সর্বত্রই অসংখ্য শিবলিঙ্গ বিদ্যমান। এদের মধ্যে ১৪টি শিবলিঙ্গ সর্ব প্রধান।

কাশীর পাণ্ডাগণ দু'টি বিভাগে বিভক্ত। এদের এক শ্রেণী যাত্রাওয়ালা এবং অপর শ্রেণী গঙ্গাপুত্র বা ঘাটিয়াল নামে পরিচিত। যাত্রাওয়ালাদের কার্য হ'ল যাত্রীদের কাশীস্থিত সমুদায় শিবলিঙ্গের দর্শন এবং পূজা করান। গঙ্গাপুত্রগণ কাশীর বিভিন্ন ঘাটে উপস্থিত থেকে তীর্থস্নানের সঙ্কল্প করিয়ে থাকে। এতদ্ব্যতীত যাত্রীদের পরিধেয় বস্ত্র ও অন্যান্য দ্রব্যাদি এদের হেফাজতে থাকে।

কাশীস্থিত মণিকর্ণিকা, পঞ্চগঙ্গা, দশাশ্বমেধ প্রভৃতি ঘাটগুলি প্রসিদ্ধ।

কাশীতে যে শিব লিঙ্গগুলি সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ, সেগুলি হ'ল প্রণবেশ্বর, ত্রিলোচন মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চন্দ্রেশ্বর, কেদারেশ্বর, ধর্মেশ্বর, বীরেশ্বর, কামেশ্বর, বিশ্বকর্মেশ্বর মণিকর্ণিকেশ্বর, অবিমুক্তেশ্বর, মহালিঙ্গ বিশ্বেশ্বর।

কাশীতে নানাবিধ ফল, শাক, তরকারী, মিষ্টান্ন এবং অন্যান্য খাদ্যসামগ্রী সুলভ।

ফল্গু নদীর পশ্চিম তটে ক্ষুদ্র পর্বতের ওপরে গয়া স্থাপিত। এখানকার সুবর্ণ কলস ও চক্র ভূষিত বিষ্ণুপদ তীর্থোপরি অত্যুচ্চ প্রস্তরময় মন্দিরটি রাণী অহল্যাবাই কর্তৃক নির্মিত। মন্দিরের মধ্যভাগে প্রস্তরোপরি বিষ্ণুপদচিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। যাত্রীরা এখানে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ড প্রদান করে থাকে।

পূর্ব পশ্চিমে প্রায় তিন ক্রোশ এবং উত্তর দক্ষিণে আনুমানিক দুই ক্রোশ পরিমিত স্থান নিয়ে গয়াক্ষেত্র। গয়ার পাণ্ডাগণ গয়ালী নামে পরিচিত। গয়ালীরা বেশ ধনশালী। গয়ালীদের কার্য হ'ল এখানে উপস্থিত যাত্রীদের পিণ্ডদান করান। এরা খাবরা, দর্শনী এবং একোদ্দিষ্ট এই তিন প্রকারে পিণ্ড দেওয়ায়। রাম শিলা, প্রেতশিলা প্রভৃতি পর্বতে, ফল্গু নদীতে, বিষ্ণু পদে প্রভৃতি ক্ষেত্রে পিণ্ডদান করাকে বলে খাবরা, রামশিলা, প্রেতশিলা ব্যতীত অন্যান্য স্থানে পিণ্ডদান করার অধিকারের নাম দর্শনী। আর কেবলমাত্র বিষ্ণুপদ, ফলগু নদী এবং অক্ষয় বটে পিণ্ডদানের নাম একোদ্দিষ্ট। রাত্রিকালে পুষ্প, মালা, তুলসী প্রভৃতির দ্বারা বিষ্ণুপদের শিঙ্গার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

গয়ার জলবায়ু অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর। গয়ার উত্তরভাগ সাহেবগঞ্জ নামে পরিচিত। গয়া অপেক্ষা সাহেবগঞ্জের জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

বৈদ্যনাথের চতুর্দিকে ক্ষুদ্র এবং বৃহৎ পর্বতমালার সারি। এখানে বৈদ্যনাথের প্রস্তরময় সুউচ্চ মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরটির চূড়া স্বর্ণময় এবং পতাকা শোভিত। বৈদ্যনাথের মন্দিরের চতুষ্পার্শ্বে অন্যান্য নানাবিধ দেব দেবীর মন্দির বিদ্যমান। মন্দিরের মধ্যস্থল অন্ধকারাচ্ছন্ন। এইজন্য সর্বদাই একটি বৃহদাকৃতির ঘৃতের প্রদীপ প্রজ্বলিত থাকে। মন্দিরের মধ্যস্থলে প্রস্তরময় বৈদ্যনাথ নামে শিবলিঙ্গ বিরাজমান। বৈদ্যনাথে 'শিবগঙ্গা' নামে একটি বৃহদাকৃতির দীঘি বিদ্যমান। প্রচলিত প্রবাদ অনুযায়ী রাবণের মুষ্টির আঘাতে পাতাল থেকে ভোগবতী গঙ্গার নাকি উৎপত্তি হয়েছিল, পরবর্তীকালে এই স্থানেই যে বৃহৎ দীঘি খনন করা হয়, তাই পরিচিত 'শিবগঙ্গা' নামে।

প্রত্যহ. সূর্যোদয়ের পূর্ব থেকেই বৈদ্যনাথের পূজা শুরু হয়ে যায়। ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসী প্রভৃতিরা প্রত্যূষ কালেই চন্দ্রকূপের জলদিয়ে বৈদ্যনাথের পূজা করে থাকেন। অতঃপর প্রধান পাণ্ডা পূজা সম্পন্ন করেন। এর পরে যাত্রীরা বৈদ্যনাথের পূজা করবার সুযোগ পায়। পশ্চিমদেশীয় বহুলোক প্রয়াগ, হরিদ্বার প্রভৃতি থেকে গঙ্গাজল এনে বৈদ্যনাথের পূজা স্নান করে থাকে। প্রত্যূষ থেকে বেলা তিনপ্রহর পর্যন্ত বৈদ্যনাথের পূজা হয়। সন্ধ্যাকালে হয় আরতি, তারপর একপ্রহর রাত্রি পর্যন্ত বৈদ্যনাথের শিঙ্গার অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। এই সময়ে বৈদ্যনাথকে পুষ্প মাল্য, চন্দন, বিল্বপত্র প্রভৃতি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। শিঙ্গারের পর বৈদ্যনাথকে একপ্রকার লাড্ডু ভোগ দেওয়া হয়। এ'টি প্রধান পাণ্ডা কর্তৃক প্রদত্ত হয়। বৈদ্যনাথকে কোন প্রকার অন্নভোগ প্রদান করা হয় না।

বৈদ্যনাথের মন্দিরের বাইরে পশ্চিম দক্ষিণ দিকে বিখ্যাত বৈজুর মন্দির বিদ্যমান।

এখানকার জলবায়ু খুব স্বাস্থ্য কর। যমুনা ঝোর নামে একটি ক্ষুদ্র নদী দৃষ্ট হয়। এখানে আম, কাঁঠাল, আতা, পিয়ারা প্রভৃতি নানাবিধ ফল প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উৎকৃষ্ট দধি, দুগ্ধ, ঘৃত, নানাবিধ ডাল, চাউল এবং মিষ্টান্ন সুলভ। তবে এখানকার জলে তরকারী সহজে সিদ্ধ হতে চায় না। গ্রীষ্মকালেও এখানে তেমন গরম বোধ হয় না। শিবরাত্রি উপলক্ষে এখানে বহু জনসমাগম ঘটে থাকে।

এলাহাবাদের দুর্গ সুপ্রসিদ্ধ। দুর্গের পূর্বদিকে অবস্থিত প্রয়াগ ঘাট। প্রয়াগে নানাবর্ণের বহুসংখ্যক পতাকা উড্ডীন দেখতে পাওয়া যায়। এইসকল পতাকায় হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি নানাবিধ পশু এবং পক্ষীর মূর্তি শোভিত দেখা যায়। এখানকার পাণ্ডারা পরিচিত প্রয়াগী নামে। পাণ্ডারা নিজ নিজ যাত্রীদের চেনাবার জন্য পূর্বোক্ত পতাকা উড্ডীন করে থাকে। এখানকার প্রচলিত রীতি অনুসারে সধবা স্ত্রীলোকদের কেশের অগ্রভাগ ছেদন করতে হয়। বিধবাদের মস্তক মুণ্ডন প্রচলিত। এখানে উপস্থিত কেশ ব্যবসায়ীরা তীর্থ জলে পতিত কেশগুলি সংগ্রহ করে নিয়ে যায়। এই প্রয়াগে গঙ্গা, যমুনা এবং সরস্বতী এসে মিলিত হয়েছে ত্রিবেণী। এই ঘাটের অনতিদূরে বেণীমাধব বিদ্যমান। এলাহাবাদস্থিত দুর্গ মধ্যে অক্ষয়

বট এবং ভীমের গদা বিদ্যমান। ভীমের গদাটি প্রস্তরময়। এ'টি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৩ ফিট এবং এর মধ্যভাগের পরিধি গদা নামেই পরিচিত।

দুর্গটি আকবরের সময়ে নির্মিত। এ'টি দশকোণ বিশিষ্ট এবং সুদৃঢ়। প্রয়াগের উত্তর পশ্চিমে ভরদ্বাজ মুনির আশ্রম বিদ্যমান।

সরযূ নদীর দক্ষিণ তীরে অযোধ্যা অবস্থিত। এ'টি রামগয়াতীর্থ নামেও পরিচিত। যে স্থানে রামচন্দ্র দেহত্যাগ করেছিলেন, তা মহাতীর্থে পরিণত হয়েছে ঐ স্থানে 'রামগয়া' ও স্বর্গদ্বার উল্লেখ করে পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করবার রীতি প্রচলিত। অযোধ্যায় বশিষ্ঠ মুনির আশ্রম বর্তমান।

আশ্রমের সন্নিকটে বশিষ্ঠকুণ্ড বিদ্যমান। এর অনতিদূরেই রামচন্দ্রের জন্মস্থান, রাজা দশরথের রাজভবন, হনুমানগড় প্রভৃতি বহুবিধ দ্রষ্টব্যস্থল বিদ্যমান। সর্বত্রই রামচন্দ্র, সীতা, লক্ষ্মণ, ভরত শত্রুঘ্ন, দশরথ প্রমুখাদির প্রতিমূর্তি দৃষ্ট হয়ে থাকে। এখানে বানরের দৌরাত্ম্য খুব।

নৈমিষারণ্য অপর একটি তীর্থস্থান। পুরাকালে এখানে নাকি দধীচি মুনির আশ্রম ছিল। এখানে খাদ্য দ্রব্যাদি খুব সুলভ।

মথুরা নগরীর দৃশ্যাদি অতীব মনোরম। কাশীর ন্যায় এখানে বহু দ্বিতল ত্রিতল অট্টালিকা দৃষ্ট হয়ে থাকে। রাজা জয়সিংহ নির্মিত অত্যুচ্চ মানস-মন্দিরটি অদ্যাপি বিদ্যমান। মথুরা যমুনার দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। যমুনার ঘাটসকল প্রস্তর দ্বারা নির্মিত। ঘাটগুলি নানাবিধ রমণীয় শিল্প কার্যে সুশোভিত। এখানকার ধ্রুবঘাট এবং বিশ্রামঘাটে পিতৃপুরুদের পিণ্ডদান করা হয়ে থাকে। এখানকার ঘাটে বৃহদাকৃতির কচ্ছপ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। এখানেও বানরের খুব উৎপাত। রাজা জয়সিংহের দুর্গের ভগ্নাবশেষ মাত্র বিদ্যমান। এখানেও নানাবিধ খাদ্য সুলভে পাওয়া যায়।

হিন্দুদের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র হ'ল বৃন্দাবন। এর উত্তর, পূর্ব ও পশ্চিমে যমুনা নদী বেষ্টন করে রয়েছে। এখানকার পাণ্ডারা ব্রজবাসী নামে পরিচিত। এখানকার প্রতিটি গৃহ 'কুঞ্জ' নামে পরিচিত। গৃহাধিপতি সাধারণ ভাবে 'কুঞ্জবাসী' নামে পরিচিত। এখানে অসংখ্য রাধাকৃষ্ণের মূর্তি বিদ্যমান। তবে সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হলেন গোবিন্দ, গোপীনাথ এবং মদনমোহন। এখানে রাধাকৃষ্ণের প্রণামী বাবদ যে অর্থ প্রদান করা হয় তা 'ভেট' নামে পরিচিত।

যারা দু'টাকা ভেট প্রদান করে তাদের বলা হয় লাল যাত্রী। লালযাত্রীরা দু'টাকা ভেটের বিনিময়ে দু'হাত পরিমিত রক্তবর্ণের বস্ত্র ও পাঁচটি নাড়ু পায়। যারা দু'টাকার কম ভেট দেয়, তাদের বলা হয় কাঙ্গাল যাত্রী। এরা কেবল মাত্র নাড়ু পায়, কিন্তু রক্তবর্ণের বস্ত্র পায় না। বৃন্দাবন থেকে ৬। ৭ ক্রোশের ব্যবধানে অবস্থিত রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ড ও গিরি গোবর্দ্ধন। গোবর্দ্ধন গিরির উচ্চতা ৭। ৮ হাতের অধিক হবে না। ব্রজবাসীদের বিশ্বাস এ'টি ক্রমেই ভূগর্ভে বসে যাচ্ছে।

এখানকার নিকুঞ্জবনে একটি ক্ষুদ্র অট্টালিকা বিদ্যমান। এর মধ্যে রাধা ও কৃষ্ণের প্রতিমূর্তি রয়েছে। এখানে প্রতিদিন সন্ধ্যার সময় ব্রজবাসী স্ত্রীলোক-গণ ভজন গেয়ে থাকে। যাত্রীরা ইচ্ছা করলে এখানে ফুল শয্যা দিতে পারে। ফুল শয্যায় নানাবিধ সুগন্ধি ফুল, ফুলের মালা, ফুলের বিছানা এবং ফুলের মশারি ও কয়েক প্রকার মিষ্টান্ন সাজিয়ে দেওয়া হয়। গৃহ বন্ধ করে গৃহের চাবি যাত্রীর নিকট প্রদান করা হয়। অতি প্রত্যূষে ব্রজবাসী সহ ঐ যাত্রী গৃহে উপস্থিত হয়ে চাবি খুলে দেখতে পায় কেউ যেন ফুল শয্যা ব্যবহার করেছিল। প্রদত্ত খাদ্য দ্রব্যাদিও কেউ যেন ভক্ষণ করেছে বলে প্রতীতি জন্মে। প্রচলিত বিশ্বাস অনুযায়ী কৃষ্ণই ফুল শয্যা ব্যবহার করে থাকেন এবং প্রদত্ত খাদ্য সামগ্রী ভক্ষণ করেন।

বৃন্দাবনে বহু দরিদ্র মানুষের বাস। প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী এখানে উপস্থিত যাত্রীদের একদিন ব্রজবাসীদের নিকট ভিক্ষা করতে হয়। এর নাম মাধুকরী। বৃন্দাবনের সর্বত্র বহু বানর এবং ময়ূর পরিলক্ষিত হয়। ব্রজের ধূলা সকলে পবিত্র জ্ঞানে মাথায় দেয়। বৃন্দাবনস্থিত লক্ষ্মীচাঁদ শেঠের দেবালয় বিশেষ ভাবে প্রসিদ্ধ। দোলযাত্রা উপলক্ষে বৃন্দাবনে শেঠের একটি মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এবং তা প্রায় ২০দিন পর্যন্ত চলতে থাকে। বৃন্দাবনে মাছ ব্যতীত সর্ব প্রকার খাদ্য সুলভ।

আজমীর থেকে দুই ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত পুষ্কর হ্রদ। এ'টিই পুষ্কর তীর্থ নামে খ্যাত। এখানে লোকে স্নান এবং পিতৃপুরুষের উদ্দেশে পিণ্ডদান করে।

গোমুখ নামক পর্বত থেকে গঙ্গা অবতরণ করে প্রবল বেগে হরিদ্বার হয়ে ক্রমশঃ দক্ষিণাভিমুখে প্রবাহিত হয়েছে। হরিদ্বারে গঙ্গার জল নির্মল এবং

শুভ্র বর্ণ বিশিষ্ট। এখানে একটি গঙ্গার ঘাট 'ব্রহ্ম কুণ্ড' নামে পরিচিত। যাত্রীরা এই ব্রহ্ম কুণ্ডে স্নান করে কুণ্ডের দক্ষিণে অপর একটি ঘাটে পিণ্ডদান করে থাকে। হরিদ্বার সমতল ক্ষেত্রের উপর অবস্থিত হলেও এর উভয় পার্শেই পর্বতেই সারি। এখানকার জলবায়ু অতীব স্বাস্থ্যকর। হরিদ্বারে মাছ ছাড়া অপরাপর সর্ববিধ খাদ্যদ্রব্যই পাওয়া যায়। গঙ্গার জলে কোন খাদ্য দ্রব্য অথবা পিণ্ড নিক্ষেপ করলে বহু সংখ্যক মাছ নির্ভয়ে তা খেতে থাকে। এখানে 'সর্ব্বনাথ' নামে পরিচিত একটি শিবলিঙ্গ বিদ্যমান।

হরিদ্বার থেকে এক ক্রোশ ব্যবধানে কনখল তীর্থ বিদ্যমান। কনখল নাকি পুরাকালে দক্ষ রাজার রাজধানী ছিল। এখানে দক্ষ রাজার যজ্ঞস্থানেও দক্ষেশ্বর নামক শিবলিঙ্গ বর্তমান।

হরিদ্বারের পূর্বদিকে প্রায় এক ক্রোশ ব্যবধানে একটি পর্বত অবস্থিত। এ'টি চণ্ডীর পাহাড় নামে খ্যাত। এই পর্বতের শিখরদেশে চণ্ডীদেবীরমূর্তি সহ একটি মন্দির বিদ্যমান। চণ্ডীর পাহাড়ে যেতে হলে গঙ্গার একটি নীল বর্ণের শাখা দৃষ্ট হয়ে থাকে। এ'টি 'নীলধারা' নামে পরিচিত। হরিদ্বার থেকে বদরিকাশ্রমে যেতে হয়। বদরিকাশ্রমে চতুর্ভুজ বিষ্ণুমূর্তি বিদ্যমান। বৈশাখ থেকে আশ্বিন মাস পর্যন্ত এখানে যাত্রীদের সমাবেশ ঘটে। কার্তিকমাস থেকে চৈত্রমাস পর্যন্ত এখানে দুঃসহ শীত। এই সময়ে এখানে প্রবল তুষারপাত হয়। কেউ এই সময়ে এখানে যায় না। প্রচলিত কিংবদন্তী অনুযায়ী, আশ্বিন মাসের শেষভাগে মন্দিরের দ্বার সহসা বন্ধ হয়ে যায় এবং ছয়মাস কাল পর্যন্ত তা বন্ধ থাকে। এই সময়ে দেবর্ষি নারদ নাকি বিষ্ণুর পূজার্চনা করে থাকেন।

উড়িষ্যা দেশের অন্তর্গত পুরী জেলাতে সমুদ্রতীরে জগন্নাথদেবের মন্দির অবস্থিত। জগন্নাথ, বলরাম এবং সুভদ্রার কাষ্ঠ নির্মিত মূর্তি এখানে বিরাজ মান। রথযাত্রা উপলক্ষে এইদিন বিগ্রহকে রথে আরোহণ করান হয়। রথ-যাত্রার সময়ে এখানে বিপুল জনসমাগম ঘটে। এখানে অন্নাদি ভোগ দেওয়ার নাম 'আটিকা করা'। এই ভোগ সকলেই গ্রহণ করতে পারে। এই ভোগ গ্রহণের ব্যাপারে তথাকথিত সংস্কার মানা চলে না।

আসামের প্রধান জেলা গৌহাটি থেকে দু'ক্রোশ ব্যবধানে নীল পর্বতের উপরিভাগে এক প্রস্তরময় মন্দিরে কামাখ্যা দেবীর মূর্তি বিদ্যমান। এখানে

যোনি পীঠ দর্শন, স্পর্শন ও পূজাই প্রচলিত রীতি। যোনি পীঠটি একটি গহ্বরের অনুরূপ। গহ্বরটি সর্বদাই পর্বতের প্রস্রবণে পরিপূর্ণ থাকে। এই যোনি পীঠ সর্বদাই স্বর্ণময় একটি আচ্ছাদনে আবৃত থাকে। যোনি পীঠের নিকটেই চতুর্ভুজা সিংহবাহিনী জগদ্ধাত্রীর প্রস্তর নির্মিত মূর্তি বিদ্যমান। নিকটস্থ একটি জলাশয়ে পিতৃলোকের উদ্দেশে পিণ্ডদান করা হয়। এই স্থানের নিকটবর্তী অপর একটি পর্বত শিখরে মহাদেব এবং পার্বতীর মন্দির বিদ্যমান। এই মহাদেব এখানে উমানন্দ নামে পরিচিত। প্রচলিত বিশ্বাস, অম্বুবাচীর সময় পূর্বোক্ত যোনিপীঠ থেকে রক্তস্রাব হয়। কথিত আছে যাত্রীদের কেউ জারজ থাকলে সে উমানন্দের দর্শন লাভ করতে পারে না।

---

১. অবতরণিকা : পৃষ্ঠা ২—৩।
২. ঘাঘরা।
৩. একপ্রকার গরুর গাড়ী।
৪. কায়স্থ।
৫. ইতমদ্দোলা।
৬. বৃন্দাবনের ধূলা।
৭. রাজকুমার।
৮. রাজকুমারী।
৯. মিউজিয়াম।

নবম অধ্যায়

মণিপুর প্রহেলিকা, পালামৌ, আত্মজীবনী ও বিদ্রোহে বাঙ্গালী

সুদীর্ঘ প্রায় দ্বাদশ বৎসর মণিপুরে অবস্থান করে মণিপুরের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য, অধিবাসীদের প্রাত্যহিক জীবন যাত্রা, আচার—আচরণ, ধর্ম অত্যন্ত নিকট থেকে প্রত্যক্ষ করবার সুযোগ ঘটেছিল জানকীনাথ বসাকের। এবং সেই অভিজ্ঞতাকেই লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক তাঁর 'মণিপুর প্রহেলিকা' ॥ ১৮৯২ ॥ নামক গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থে। অবশ্য গ্রন্থের উল্লেখযোগ্য অংশ, রাজবংশাবলী, মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের রাজত্ব, মহারাজ সুরচন্দ্র সিংহের অভিযোগে গভর্ণমেণ্টের বিচার, ভ্রাতৃবিরোধ, বিপ্লব ও হত্যাকাণ্ড, 'গভর্ণমেণ্টের মণিপুর আক্রমণ, বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে মণিপুরের সম্বন্ধ ও সন্ধি ইত্যাদি বিষয় সমূহের বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ। তথাপি স্বল্প পরিসর ক্ষেত্রে লেখক মণিপুরের যে এক বাস্তব ও প্রামাণিক চিত্র উপস্থাপিত করেছেন তার জন্য তিনি নিঃসন্দেহে প্রশংসার যোগ্য।

মণিপুরের আদিম অধিবাসীরা গন্ধর্ব জাতি বলে পরিচিত। এদের মধ্যে বিলাসপ্রিয়তা, পুষ্প, মাল্য, সঙ্গীত প্রভৃতির প্রতি তীব্র আসক্তি, স্ত্রী স্বাধীনতা বিদ্যমান। এরা নিজেদের মিত্রবাক্ বা মৈতায় এবং বিদেশীদের 'মেরবাক্' বা মখাং বলে থাকে।

মণিপুরী ভাষায় অশ্বকে বলা হয় 'সাগোল'। যেখানে বভ্রুবাহন যজ্ঞের ধৃতাশ্ব বন্ধন করে রেখেছিলেন, তা 'সাগোল পণ' নামে পরিচিত। মণিপুরীরা নিজেদের আদিমপুরুষকে 'পাখাংবা' বলে অভিহিত করে থাকে। পাখাংবার কনিষ্ঠ সহোদর 'সনামাহি' নামে পরিচিত। এরা দু'জনেই দেবতার অংশ বিবেচনায় মণিপুরে পূজিত হয়ে থাকেন। মণিপুরীরা বিশ্বাস করে থাকে যে, পাখংবা নাগমূর্তি ও অমর অদ্যাপি মণি উদ্ধত সুড়ঙ্গ গর্ভে বিরাজমান।

এখানে রাজ্যাভিষেকের সময়ে রাজবংশধরেরা মস্তকে শ্বেত, কৃষ্ণনীল ও রক্তিমবর্ণের পালক, কেয়ূর, বলয় ও কৌপীন পরিধান করে সর্পের মূর্তিখচিত অঙ্গত্রাণ ও উষ্ণীষ ইত্যাদিতে ভূষিত হয়ে পূর্ব পুরুষের 'সিংহাসনে' কিয়ৎ-ক্ষণের জন্য উপবেশন করেন। এই সিংহাসনে উপবেশন না করলে রাজা বলে

গণ্য হতে পারেন না। চারটি ক্ষুদ্র সিংহ মূর্তির মস্তকে বৃহৎ কাষ্ঠ ফলকাবদ্ধ আসন 'সিংহাসন' নামে পরিচিত। জনশ্রুতি এই যে, এই সিংহাসনে আরোহণ করলেই সমগ্র শরীর ক্রমশঃ অবশ হয়ে যেতে থাকে। সেইজন্য যিনি এই সিংহাসনে যতক্ষণ স্থির থাকতে পারেন, তাঁর রাজত্বকালের স্থায়ীত্ব তদনুযায়ী স্থির হয়ে থাকে।

বর্তমানে মণিপুরে লিখন পঠনে বর্ণমালা প্রবর্তিত হলেও পূর্বে মণিপুরে অন্যবিধ বর্ণমালার প্রচলন ছিল। এই বর্ণমালার উচ্চারণের সঙ্গে বঙ্গীয় বর্ণমালার উচ্চারণের ঘনিষ্ঠ সাদৃশ্য থাকলেও আকৃতিতে তা ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। বর্তমানে এই আদিম বর্ণমালা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

নাগা পর্বত বাসীদের অনুরূপ মণিপুর রাজ্যের অন্তর্গত পর্বতশিখরেও বহু সংখ্যক নাগার বাস। মণিপুরীদের চক্ষু ক্ষুদ্র, এদের নাক খর্ব, ওষ্ঠ স্থূল, বর্ণ পাণ্ডুর এবং এরা শ্মশ্রু গুম্ফ বিহীন। অধিকাংশ মণিপুরীই বেশ সবল, তবে নাতিখর্বাকৃতি বিশিষ্ট।

মণিপুর অতি ক্ষুদ্র প্রদেশ। এর আয়তন ৭০০ বর্গমাইল। এর পূর্বসীমা ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে কাছাড়, উত্তরে নাগাহিল এবং দক্ষিণে লুসাই পর্বত-শ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এ'টি ২৬১৯ ফিট উচ্চে অবস্থিত। মণিপুরে অসংখ্য অনুচ্চ উপত্যকা ও অধিত্যকা বিদ্যমান। মণিপুরের পূর্বে এবং পশ্চিমে দুই বৃহৎ পর্বতশ্রেণী। উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তেও দু'টি অনুচ্চ পর্বত অবস্থিত।

মণিপুর নগরটিকে একটি বৃহৎ গ্রাম বললেও চলে। এর উত্তর ও দক্ষিণের দৈর্ঘ প্রায় ৫ মাইল এবং পূর্ব পশ্চিমের মধ্যেকার ব্যবধান প্রায় ৩ মাইল। সাধারণত পশ্চিম থেকে প্রবল বায়ু প্রবাহিত হয় বলে মণিপুরীদের বাসগৃহ পূর্ব পশ্চিমে দীর্ঘ ও পূর্বদ্বারী। এখানকার গৃহগুলির পূর্বভাগে বারান্দা ও প্রবেশের জন্য একটিমাত্র দ্বার লক্ষিত হয়। গৃহের দ্বিতীয় দ্বার অথবা বাতায়ন থাকেনা বললেই চলে। প্রত্যেক গৃহের সামনেই একটি করে অঙ্গন দৃষ্ট হয়। এই অঙ্গনের মধ্যস্থলে দেখা যায় বৃন্দাদেবী[১] অপর প্রান্তে পুষ্পবৃক্ষ বিদ্যমান। এখানকার গৃহ ও অঙ্গনগুলি খুব পরিষ্কার।

মহারাজ গম্ভীর সিংহের সময় পর্যন্ত রংথাবাল নামক স্থানে এখানকার রাজবাটী অবস্থিত ছিল। অতঃপর মহারাজ চন্দ্রকীর্তি সিংহ প্রায় সাড়ে তিন মাইল উত্তরে আদি পুরুষ 'পাখাংবা'র আদিম নিবাসের নিকটে নূতন রাজপু-

রীকে স্থানান্তরিত করেছিলেন।

নগরের পূর্বে অবস্থিত পর্বতের ওপরে 'হুং মাইজিং' নামক মহাদেবের মন্দির। 'লংথাবালে'র পশ্চিম দক্ষিণ কোণে কামাখ্যা দেবীর মন্দির। প্রতি বৎসর দুর্গাপূজার সময় মহাষ্টমী তিথিতে রাজা প্রজা সকলেই কামাখ্যামূর্তি দর্শন করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্যায় কুমারী কন্যারা দলে দলে কামাখ্যা দর্শন ও পূজার্চনা করে থাকে।

নগরের মধ্য দিয়ে দু'টি নদী উত্তর থেকে দক্ষিণ দিকে প্রবাহিত। এর প্রায় বিংশতি মাইল ব্যবধানে এক রমণীয় হ্রদ বিদ্যমান। হ্রদটি যেমন গভীর তেমনই বিস্তৃত। এ'টি চতুর্দিক পর্বতশ্রেণী দ্বারা বেষ্টিত। হ্রদটি প্রায় ৩০ মাইল বিস্তৃত। হ্রদের মধ্যে ক্ষুদ্রাকৃতির কতকগুলি পর্বত বিদ্যমান। স্থানে স্থানে শৈল শিখর থেকে স্রোতস্বিনী সকল নিম্নে পতিত হওয়ায় জলপ্রপাতের সৃষ্টি হয়েছে। নগরীর পূর্ব ও পশ্চিমে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীর কোন কোনটি ৫০০০ ফিট পর্যন্ত উচ্চ।

মণিপুরে মোট চারটি ঋতু অনুভূত হয়ে থাকে। এগুলি বর্ষা, শরৎ, শীত এবং বসন্ত। এখানে গ্রীষ্মের প্রকোপ নেই বললেই চলে। জ্যৈষ্ঠমাসের শেষার্ধেই এখানে বর্ষার প্রাদুর্ভাব লক্ষিত হয়। ভাদ্রমাস পর্যন্ত বর্ষা থাকে। অগ্রহায়ণ মাসের প্রথমেই প্রচণ্ড শীত অনুভূত হয়। ফাল্গুন মাসের শেষার্ধ থেকে জ্যৈষ্ঠের প্রথমার্ধ পর্যন্ত বসন্তকাল। এখানে কোকিল দেখতে পাওয়া যায় না। তবে 'বৌ কথা কও' পাখী এখানে প্রচুর সংখ্যায় দৃষ্ট হয়ে থাকে।

মণিপুরীরা স্বীয় রাজধানীকে 'ইম্‌ফাল' নামে অভিহিত করে থাকে। রাজধানী 'ইমফাল্' থেকে কাছাড়ের দূরত্ব ১৩২ মাইল, কোহিমার দূরত্ব ১০৫ মাইল এবং তামুর দূরত্ব প্রায় ৭০ মাইল। কাছাড়, কোহিমা এবং তামু থেকে মণিপুরে প্রবেশের তিনটি পথ আছে। এতদ্ব্যতীত পার্বত্য পথেও মণিপুরে প্রবেশ করা যায়।

মণিপুরে দারুচিনি, পনস, আম্র, লিচু, কুচিলা প্রভৃতি প্রচুর বৃক্ষ বিদ্যমান। এখানে একপ্রকার তৃণ দেখতে পাওয়া যায়, এ'টি কাশ জাতীয় অথচ গন্ধযুক্ত। শীতকালে এর মূল থেকে তামাকের মসলা প্রস্তুত করা যেতে পারে।

মণিপুরীদের প্রধান উপজীবিকা ধান্য উৎপাদন। এখানে প্রচুর পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন হয়। ভূমি অত্যন্ত উর্বর। এখানে ধান্য উৎপন্ন বেশ সহজ।

রোপণ এবং নিড়াইয়ের প্রয়োজন হয়না বললেই চলে। কৃষকেরা প্রথমে সামান্য ভূমি কর্ষণ করে নেয়। অতঃপর ভূমি কর্দমময় করে নিয়ে আর্দ্র ও অঙ্কুরিত ধান্য বীজ বপন করে দেয়। এরপর তারা চতুর্দিকে বেড়া দিয়ে দেয়।

এ অঞ্চলে তেল তেমন ব্যবহৃত হয় না বললেই চলে। ঘৃত প্রভৃতি পদার্থের ব্যবহারও খুব কম। এখানে কাঠের প্রাচুর্য্য হেতু সকলেই গৃহে বহুল পরিমাণে কাঠ ব্যবহার করে থাকে। মণিপুরীদের প্রধান সেব্য তাম্রকূট। এখানকার কি বালক, কি বৃদ্ধ, কি যুবতী সকলেরই নিজস্ব একটি করে হুঁকা থাকে এবং প্রত্যেকেই তামাক সেবন করে থাকে। তাই প্রতি গৃহেই তামাকের চাষ দেখা যায়। অবশ্য মণিপুরে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর তামাক উৎপন্ন হয়না। অতি ক্ষুদ্র পত্র বিশিষ্ট তামাকই এখানে প্রভূত পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। এখানে মটর, মুগ, কলাই, ইক্ষু আলু, বেগুন হলুদ, লঙ্কা, চীনাবাদাম, কচু, কুমড়া, বাতাকু, শাক সব্জী প্রভৃতি প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়ে থাকে। তবে এখানে গম, চণক, তিসি, অড়হর, মুসুর প্রভৃতির তেমন উৎপাদন হয়না। ফলের মধ্যে এখানে সুলভ আম, আনারস, কাঁঠাল, গোলাপজাম, কুল, জলপাই, কামরাঙ্গা, লেবু, তেঁতুল, নারঙ্গ, কলা প্রভৃতি। মণিপুরে প্রচুর পরিমাণে ইক্ষু জন্মে থাকে। ইক্ষু থেকে এখানে গুড় প্রস্তুত করা হয়। এদেশে গুড়কেই চিনি বলে অভিহিত করা হয়। মণিপুরীরা যদিও তেমন চা ব্যবহারে অভ্যস্ত নয়, তথাপি এখানে বহুল পরিমাণে বন্য চা বৃক্ষের উদ্যান দৃষ্ট হয়। এখানকার লোক রেশমপ্রিয়, অথচ এরা রেশমের চাষ বিষয়ে অজ্ঞ। এখানে গজদন্ত, মোম, রবার প্রভৃতিও প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

মণিপুরের পূর্বদিকে অনেকগুলি লবণাক্ত জলকূপ বর্তমান। এইসকল কূপের জল জ্বাল দিয়ে এখানে একপ্রকার লবণ প্রস্তুত হয় এবং মণিপুরীরা সেই লবণ আহার করে থাকে। ঔষধ রূপেও এই লবণ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এখানে প্রচুর পরিমাণে চূণা পাথর, পাথরিয়া কয়লা, লৌহ প্রভৃতি পাওয়া যায়। গন্ধকের খণিও মণিপুরে বিদ্যমান।

এখানকার অরণ্যে মেথন,[২] মহিষ, হরিণ, হাতী, ভালুক ও প্রচুর সংখ্যক ব্যাঘ্র দেখতে পাওয়া যায়। এখানে এক বিশেষ কৌশলে হাতী ধরা হয়। এই কৌশল 'খেদা' বা 'ফান্দাই' প্রথা নামে পরিচিত। মাটির মধ্যে বৃহৎ গর্ত করে সেই গর্ত তৃণ পত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করে রাখা হয়। অতঃপর চলবার

সময়ে হাতীর দলের দুই একটি অকস্মাৎ এই গর্তে পড়ে যায় আর উঠতে পারে না।

মণিপুরবাসীদের নিকট ঘোড়া অত্যন্ত প্রিয়। এখানকার সকলেই অশ্বারোহণে খুব পটু। অশ্বের রক্ষণাবেক্ষণেও এরা অতিশয় যত্নবান। মণিপুরের ঘোড়া আকারে খুব বড় তবে খুব উঁচু নয়। এখানকার ঘোড়াগুলি খুল বেগশীল এবং সুন্দর অবয়ব বিশিষ্ট। এখানে গরুর প্রাচুর্যও লক্ষিত হয়। তবে মণিপুরীরা ঘোড়ার ন্যায় গরুর প্রতি যত্নবান নয়। এখানকার গরুগুলি মাঠের ঘাস এবং জল ব্যতীত অন্য কোন খাদ্য পায় না। অনেকের আবার তাও জোটে না। গরুগুলির আবাসস্থলও অত্যন্ত অপরিষ্কার থাকে। অনেক সময় প্রচণ্ড শীতে বহু গরুকে উন্মুক্ত স্থানে রাত্রি অতিবাহিত করতে দেখা যায়।

মণিপুরের অধিবাসীরা যদিও আমিষভোজী নয় তথাপি অত্যন্ত মৎস্য প্রিয়। এরা তাজা, পচা, দগ্ধ, শুষ্ক সকল প্রকার মাছই প্রচুর পরিমাণে ভোজন করে থাকে। এখানে মাগুর জাতীয় মৎস্যই অধিক। রুই, চিতল জাতীয় মৎস্য এখানে তেমন দেখতে পাওয়া যায় না। তবে চিংড়ি, পুঁটি, পাবদা জাতীয় ক্ষুদ্রাকৃতির মৎস্যও প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হয়। মণিপুরে শুষ্ক মাছের ব্যবহার খুব। এখানে ব্যাঙের ছাতা[৩] ভক্ষিত হতে দেখা যায়।

এখানে পুরুষেরা বস্ত্রবয়ন বিষয়ে অনভিজ্ঞ। এখানকার স্ত্রীলোকদের প্রধান কার্যই হ'ল বস্ত্রবয়ন। নানাবিধ বস্ত্র ব্যতীত কাঁসার ঘটি, বাটী প্রভৃতি নানাবিধ তৈজস পত্রাদি, হস্তীদন্ত নির্মিত চিরুণী, খেলনা প্রভৃতিও এখানে প্রস্তুত হ'তে দেখা যায়। এখানকার সম্পন্ন ঘরের মহিলারা মখমলের ওপর জরির কারুকার্য বিশিষ্ট একপ্রকার পাদুকা ব্যবহার করে থাকেন। এই জুতার তলায় পুরু কাপড় সেলাই করে নেওয়া হয় ও চামড়া ব্যবহৃত হয় না। মণিপুরীরা এক বিচিত্র ধরনের ঘোড়ার জিন ব্যবহার করে। জিনের দুই পাশে দু'টি বৃহদাকৃতির চামড়া আবদ্ধ রাখা হয়। এর ফলে কাদা, ধূলা প্রভৃতি গায়ে লাগতে পারে না, তদুপরি দৌড়াবার সময়ে এই দুখানি চামড়া পাখার ন্যায় দেখাতে থাকে। দৌড়াবার কালে বিচিত্র একপ্রকার শব্দও হতে থাকে।

মণিপুরে একপ্রকার ক্ষুদ্রাকৃতির নৌকা প্রস্তুত হয়ে থাকে। এগুলি এখানকার ক্ষুদ্র পার্বত্য নদীতে চলবার উপযোগী করে প্রস্তুত হয়। কেবলমাত্র বেতের সাহায্যে এই সকল নৌকা চালিত হয়। মণিপুরীরা পাল তুলে নৌকা

চালাতে জানে না।

এখানে বিচিত্র উপায়ে ভার বাহিত হতে দেখা যায়। একটি বক্রাগ্র বাঁশের ওপর কয়েকটি বংশখণ্ড আড়াআড়ি ভাবে বেঁধে তার ওপরে ৪/৫ মন পর্যন্ত ভার স্থাপন করা হয়। অতঃপর তা দু'টি গরুকে দিয়ে টানান হয়। এতে চাকার প্রয়োজন হয় না।

মণিপুরে নানা শ্রেণীর মানুষের বাস। ক্ষত্রিয় মৈতাই মণিপুরী, থোংহাই, তাংখুল, কোয়রেং, কামহাউ ও স্থতি ইত্যাদি নানা জাতির মানুষ এখানে বাস করে থাকে। যে সব মণিপুরী হিন্দু, তারা বাঙ্গালীদের ন্যায় ধুতি, কামিজ, হিন্দুস্থানীদের ন্যায় উষ্ণীষ প্রভৃতি ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা ৫ হাত দীর্ঘ এবং ২॥০ হাত প্রস্থ বিশিষ্ট 'ফণিক' নামক একপ্রকার স্থূল বস্ত্র বক্ষ পর্যন্ত এঁটে পরিধান করে। এরা অতিসূক্ষ্ম ওড়নাও ব্যবহার করে থাকে। মণিপুরী মহিলারা ঘোমটা দেয় না। এখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলকার কেশই বেশ বিন্যস্ত দেখা যায়। এদের কানে স্বর্ণ মুদ্রা, কপালে রসকলি, কবরীতে পুষ্প, দাঁতে মিশি এবং গলায় তুলসীর মালা দেখতে পাওয়া যায়। পুরুষেরাই কেবলমাত্র গায়ে রাধাকৃষ্ণের নামাঙ্কিত ছাপ ব্যবহার করে। স্ত্রীলোকেরা কিন্তু এই ছাপ ব্যবহার করে না।

হিন্দু মণিপুরীদের অধিকাংশই বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী। এদের প্রত্যেকের নিকটেই একটি করে নামাবলী এবং একটি করে 'কুড়াজালী' দেখতে পাওয়া যায়। 'কুড়াজালী'র মধ্যে এরা এদের জপের মালা, গোপীচন্দন, ছাপা ইত্যাদি রাখে। স্ত্রীলোকের ন্যায় এখানকার অনেক পুরুষকেও সুদীর্ঘ কেশ রাখতে দেখা যায়।

মণিপুরী স্ত্রীলোকেরা রৌপ্যাভরণ ব্যবহার করতে ঘৃণাবোধ করে। অবস্থাপন্ন স্ত্রীলোকেরা স্বর্ণহার, কেয়ূর প্রভৃতি ব্যবহার করে থাকেন। পূর্বে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী রাজপরিবারভুক্ত স্ত্রীলোকগণ ব্যতীত অপর কোন স্ত্রীলোক প্রকাশ্যভাবে স্বর্ণাভরণ ব্যবহার করতে পারত না। এখানকার স্ত্রীলোকেরা পুষ্প, গন্ধ, দ্রব্য, মাল্য প্রভৃতির প্রতি বিশেষ অনুরাগী। ত্রিসন্ধ্যা এদের নিত্যকর্ম। প্রতিবার মলত্যাগের পর এখানকার সকলেই গা ধুয়ে ফেলে। সকল স্ত্রীলোকই প্রায় হাটে বাজারে গমনাগমন করে। মণিপুরী ভাষায় হাটকে বলা হয় 'কাইথেল'।

মণিপুরে স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই নৃত্য গীতে পারদর্শী। এখানকার পুরুষেরা গৃহ নির্মাণ, নৌকা নির্মাণ, হাল চালনা প্রভৃতি কর্মই করে থাকে। এতদ্ব্যতীত সকল প্রকার কার্যই স্ত্রীলোকে সম্পাদন করে থাকে। স্ত্রীলোকে ধান্যরোপণ ও ছেদন প্রভৃতিও করে থাকে। এ ছাড়া মাছ ধরা, গৃহস্থালীর কার্য, পণ্য দ্রব্যাদির ক্রয় বিক্রয়ও মহিলারাই সম্পন্ন করে থাকে। এখানকার পুরুষেরা ক্রয় করে, কিন্তু বিক্রয় করতে লজ্জা পায়। বাস্তবিক মণিপুরের পুরুষেরা অত্যন্ত অলস প্রকৃতির।

এখানে পুরুষের তুলনায় স্ত্রীলোকের সংখ্যা অধিক। এইজন্য পুরুষেরা একাধিক দার পরিগ্রহ করে থাকে। স্ত্রীলোকরাই এখানে স্বামীদের প্রতিপালন করে থাকে। স্বামীরা স্ত্রীদের প্রতিপালন করে না।

মণিপুরী স্ত্রীলোকদের পোশাক পরিচ্ছদ দেখে তারা সধবা কি বিধবা বোধগম্য হয় না। এখানকার বিবাহপ্রথা নাম মাত্র বললে অত্যুক্তি হয় না। এখানে স্বামী এবং স্ত্রী ইচ্ছামত পরস্পরকে ত্যাগ করতে পারে।

মণিপুরে ক্ষৌর প্রথা অনুপস্থিত। ক্ষুদ্রাকৃতির সন্না প্রভৃতি দিয়ে এরা নিজ নিজ শ্মশ্রু-গুম্ফ উৎপাটিত করে থাকে। মস্তক পর্যন্ত এরা মুণ্ডন করে ফেলে।

এখানে অষ্টম বর্ষীয়া পর্যন্ত অনূঢ়া কন্যাকে বলা হয় 'চাওবী'। 'চাওবী'দের মস্তক প্রায় সম্পূর্ণরূপেই মুণ্ডিত থাকে। কেবলমাত্র পিছনের দিকে এক গুচ্ছ চুল আজন্মকাল রক্ষিত থাকে। নবম থেকে কিশোরীদের বলে 'লাইসাবী'। লাইসাবীদের মস্তকে অবশ্য কেশ অক্ষুণ্ণ থাকে। তবে এদেরও কপালের সম্মুখের কেশরাজি মণ্ডলাকারে কর্তিত হয়ে থাকে। লাইসাবীরা কবরী বন্ধন করতে পারে না। বরের অভাবে অনেক লাইসাবী অধিক বয়স পর্যন্ত অনূঢ়া থাকে। বিবাহিত হয়ে গেলে আর 'লাইসাবী'দের সম্মুখস্থ চুল কাটতে হয় না।

মণিপুরের নাগা ও কুকীরা অত্যন্ত আদিম অবস্থায় রয়ে গেছে। এদের পুরুষেরা কেবলমাত্র কৌপীন পরিধান করে আর স্ত্রীলোকেরা বক্ষ পর্যন্ত বস্ত্র জড়িয়ে রাখে। 'তাংখুল' নামে এক শ্রেণীর নাগারা প্রায় উলঙ্গ অবস্থাতেই থাকে। এদের পুরুষেরা জননেন্দ্রিয়ের অগ্রভাগে হস্তী দন্ত নির্মিত এক প্রকার অঙ্গুরীয় লাগিয়ে রাখে। অপর পক্ষে স্ত্রীলোকেরা সামান্য কৌপীনের অনুরূপ স্বল্প বস্ত্র খণ্ড নিজেদের কটিদেশে রজ্জু দ্বারা বেঁধে রাখে। এরা বক্ষোদেশে

কোনরূপ আবরণ ব্যবহার করে না। মণিপুরের ক্ষত্রিয় নাগা, কুকী সকলেই কর্ণাভরণ ব্যবহার করে থাকে। আবার নাগা এবং কুকী যারা, তারা সছিদ্র একটি বংশখণ্ড কিংবা একটি রৌপ্য খণ্ড কর্ণে প্রবেশ করিয়ে রাখে। এরা সকল প্রাণীর মাংসই ভক্ষণ করে। এমন কি মৃত জন্তুর মাংসও এরা ভক্ষণ করে থাকে। এরা সকলেই মদ্যপায়ী। এরা পর্বতশিখরে বসতি স্থাপন করে। সমভূমিতে বসতি স্থাপন এরা পছন্দ করে না। এরা ইংরাজদের অনুকরণে বংশখণ্ড নির্মিত পাইপে তামাক পাতা দিয়ে ধূমপান করে।

মণিপুরীদের সাধারণত রোগ হয় না। তবে রোগ হলেও এরা ঔষধ ব্যবহার পছন্দ করে না। এখানে ওঝাদের অভাব অনেকখানি। এদেশে ওঝাদের 'মাইবা' নামে অভিহিত করা হয়ে থাকে।

মণিপুরীরা অত্যন্ত শঠ ও প্রবঞ্চক প্রকৃতির। এরা কথায় কথায় মণিপুরের মহারাজার গৃহদেবতা গোবিন্দজীর নামে শপথ করে থাকে। এখানে জুয়াখেলা ব্যভিচারের প্রচলন সমধিক।

এখানকার বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বীরাও মৎস্য ভোজী। মণিপুরী বৈষ্ণবেরা মাথায় শিখা রাখে। এরা কণ্ঠে হরিনামের মালা, যজ্ঞোপবীত, কপালে তিলক, গাত্রের সর্বাঙ্গে রাধাকৃষ্ণের ছাপ ও নামাবলী ব্যবহার করে থাকে। এদের সর্বাপেক্ষা বড় উৎসব 'রাসলীলা'। রাসলীলার সময়ে কৃষ্ণবর্ণের এক তরুণকে কৃষ্ণ এবং এক সুন্দরী কিশোরীকে রাধিকা ও অন্যান্য কিশোরীদের গোপিনী সাজিয়ে নৃত্য গীত অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

মণিপুরীরা নিজেদের আদি পুরুষ পাখাংবা এবং তার অনুজ সনামাহিকে দেবতার অংশ বিবেচনায় পূজার্চনা করে থাকে। মণিপুরে সনামাহির মন্দিরও বিদ্যমান। মন্দিরের নিকটস্থ পল্লী 'সনামাহিলিকাই' নামে পরিচিত।

পালামৌ

ঊনবিংশ শতাব্দীর অন্যতম উল্লেখযোগ্য ভ্রমণকাহিনী মূলক রচনা বঙ্কিম-অগ্রজ সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় রচিত 'পালামৌ'। সঞ্জীবচন্দ্র বাংলায়

আট নয় খানি গ্রন্থ রচনা করলেও প্রকৃতপক্ষে তাঁর সাহিত্য কীর্তি একমাত্র 'পালামৌ' কে কেন্দ্র করেই সুপ্রতিষ্ঠিত। 'পালামৌ' গ্রন্থটি আকারে ক্ষুদ্র হলেও রমণীয় ভ্রমণ বৃত্তান্ত রূপে স্বীকৃত। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে সঞ্জীবচন্দ্রই সর্ব প্রথম ভ্রমণকে সাহিত্যে পরিণত করেন। 'পালামৌ' নিছক নীরস তথ্যের ভাণ্ডার মাত্র নয়। গ্রন্থটি ১২৮৭-৮৯ সালের 'বঙ্গদর্শনে' ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। সঞ্জীবচন্দ্রের মৃত্যুর পরে ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে এই রচনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়।

পাহাড় বন আর জঙ্গল এই নিয়েই পালামৌ। পালামৌ পরগণায় পাহাড়ের সীমা-সংখ্যা নেই। কোন কোন পাহাড়ে বিশেষ অংশে মৃত্তিকা নেই। সুতরাং এগুলির অভ্যন্তরস্থ সকল স্তরই দৃষ্ট হয়। এক স্তরে নুড়ি, এক স্তরে কাল পাথর এমনই বিভিন্ন স্তরে বিভিন্ন পদার্থ। আবার এমন পাহাড়ও আছে যার সমস্তটাই একটি মাত্র শিলা। তাতে কণামাত্র মৃত্তিকা নেই। পালামৌর দু' পাশেই পর্বতশ্রেণী। এখানে কেবল শালবন। অন্যান্য বন্য বৃক্ষাদি কিছু থাকলেও তাল-হিন্তাল একেবারেই নেই। এখানকার শাল বৃক্ষ গুলির বৈশিষ্ট্য হ'ল যে এগুলি তেমন দীর্ঘ নয়। তথাপি এখানকার জঙ্গল অতিশয় দুর্গম এবং ভয়ঙ্কর। কোথাও যেন বনের ছেদ নেই।

কোন কোন স্থানে অর্ধশুষ্ক তৃণাবৃত প্রান্তর দৃষ্ট হয়। সেখানে স্থানে স্থানে মহুয়া গাছ ভিন্ন গুল্ম কি লতা কোন কিছুই জন্মায় না। প্রান্তরে কোল বালকেরা মেষ চরায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, এতদঞ্চলে মহিষ ব্যতীত গরু দৃষ্ট হয় না। প্রান্তরের পরই মাঝে মাঝে ক্ষুদ্র গ্রাম পরিলক্ষিত হয়। গ্রামের পর্ণকুটীরে বাস করে কৃষ্ণ বর্ণ বন্য কোল জাতি।

পালামৌ অঞ্চলে প্রধানত কোলদের বসতি। এরা দেখতে খর্বাকার ও কৃষ্ণ বর্ণ। স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেরই গায়ের রঙ ঘোর কৃষ্ণ বর্ণ। কোল রমণীরা কটিদেশে একখানি করে ক্ষুদ্র কাপড় জড়িয়ে থাকে। সকলেরই বক্ষো-দেশ আবরণ শূন্য। এদের নিরাবৃত বক্ষে পুঁতির সাত নরী শোভিত দেখা যায় যাতে আবার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আরসী লাগান। এরা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বনফুল কর্ণাভরণ রূপে ব্যবহার করে। মস্তকেও এরা বড় বড় বনফুল লাগায়। জানু স্পর্শ করে উপবেশন করা কোল জাতির স্ত্রী লোকদের রীতি। পালামৌ বনাঞ্চলের যত্র তত্র মদের ভাঁটি। এখানকার স্ত্রী-পুরুষ সকলেই পানাসক্ত। পালামৌ অঞ্চলে

যুবতীর সংখ্যাই অধিক। এখানকার অধিক বয়স্কা রমণী ও যুবতীর ন্যায় প্রতিভাত হয়ে থাকে। সহজে এরা লোলচর্মা হয় না। কোল রমণীরা অতিশয় পরিশ্রমী। এরা কৃষিকার্য সকলই নিষ্পন্ন করে থাকে। কিন্তু পুরুষগণ অলস প্রকৃতির। এদের কার্য সন্তান রক্ষা করা এবং কথনও কথনও চাটাই বোনা। কোল রমণীরা অতিশয় বলিষ্ঠ এবং আশ্চর্য কান্তি বিশিষ্টা। অপর পক্ষে পুরুষ দের জীবনী শক্তি হীন বলে মনে হয়। রমণীরা সদা হাস্যময় এবং নৃত্য প্রিয়ও বটে।

পালামৌ পরগণার স্থানে স্থানে কোল ভিন্ন অপর একটি জাতি বাস করে- অসুর জাতি। এরা পর্বতের নিভৃতস্থানে বাসকরে বলে সহজে এদের সাক্ষাৎলাভ ঘটে না। এরা কোল অথবা অন্য কোন বন্যজাতির সঙ্গে একত্রে বাস করে না। এরা অন্য জাতির মানুষ দেখলে পলায়ন করে। সংখ্যায় এরা অতিশয় অল্প।

পালামৌ অঞ্চলে জলাশয়ের একান্ত অভাব। শীতকালে এখানকার নদী শুষ্ক প্রায় হয়ে যায়। সেই সময়ে গ্রাম্য লোকেরা কূয়ার আকারে স্থানে স্থানে ক্ষুদ্রাকৃতির খাদ খনন করে। এই সকল খাদ দুই হাতের অধিক গভীর হয় না। সকল খাদে জল এসে জমে। এই খাদগুলি 'দাড়ি' নামে পরিচিত।

কোলজাতি বড়ই নৃত্যগীত প্রিয়। সন্ধ্যার পর প্রায়শই তারা নৃত্যগীত উৎসবে মত্ত হয়। গ্রামস্থ যুবকগণ 'খোপা' বেঁধে তাতে দুই তিনখানি কাঠের 'চিরুনী' সাজিয়ে গ্রামের প্রান্তস্থিত এক বট বৃক্ষতলে এসে সমবেত হয়। তাদের কারও হাতে মাদল, কারও হাতে লাঠি। রিক্ত হাতে এরা কেউই আসেনা। বৃদ্ধেরা বৃক্ষমূলে উচ্চ মৃন্ময় মঞ্চের ওপর উপবেশন করে। তার পর দলে দলে কোল যুবতীরা এসে হাত ধরাধরি করে অর্ধ চন্দ্রাকৃতি আকারে দাঁড়ায়। অবশ্য ইতিপূর্বেই তারা উপস্থিত যুবাবৃন্দের সঙ্গে হাস্য উপহাস সেরে নেয়। অতঃপর বৃদ্ধেরা ইঙ্গিত করামাত্র যুবাদল মাদল বাজাতে শুরু করে। আর সঙ্গে সঙ্গে রমণীদের নৃত্য শুরু হয়ে যায়। এদের নৃত্য কিছু পরিমাণে বৈচিত্র্যময়। কারণ, এরা মাদলের তালে তালে পা ফেলে অথচ কেউ চলে না, দোলেনা কিংবা টলেনা। যার যেথানে স্থান, সেই স্থানে দাঁড়িয়েই তালে তালে পা ফেলে। এইরূপ নৃত্য শুরু হবার পর একজন বৃদ্ধ মঞ্চ থেকে একটি গীতের 'মহড়া' আরম্ভ করে। আর সঙ্গে সঙ্গে যুবারা সেই গীত উচ্চৈস্বরে গেয়ে ওঠে, যুবতীরাও সঙ্গে সঙ্গে তীব্র তানে 'ধুয়া' ধরে।

কোলজাতির মধ্যে অনেক শাখা বিদ্যমান। তন্মধ্যে প্রধান হ'ল উরাঙ, মুণ্ডা, খেরওয়ার এবং দোষাদ। কোলেরা যদিও সকলেই বিবাহ করে তথাপি তাদের সকল জাতির মধ্যে বিবাহ একরূপে অনুষ্ঠিত হয় না। উরাং জাতিদের বিবাহ প্রথা অতি প্রাচীন। এতে প্রত্যেক গ্রামের প্রান্তে একখানি করে বড় ঘর থাকে। সন্ধ্যাবসানে গ্রামস্থ সকল কুমারীই এই ঘরে এসে রাত্রিযাপন করে। কুমারীরা শয়ন করবার পর গ্রামস্থ অবিবাহিত যুবকেরা এসে সেই ঘরের কাছে রসিকতা শুরু করে। কেউ গীত গায়, কেউ বা নৃত্য করে। বিবাহ করতে উৎসুক মেয়েরা যুবকদের নাচ দেখে, গান শোনে। কখনও কখনও যুবকদের সঙ্গে হাস্য পরিহাসে যোগ দেয়। এইরূপে কোন যুবকের সঙ্গে যদি কোন যুবতীর ভাব জন্মায়, তাহলে সঙ্গী সঙ্গিনীদের দ্বারা ক্রমে গ্রামে রাষ্ট্র হয়ে পড়ে। কন্যাপক্ষের আত্মীয়স্বজন তখন বড় বড় বাঁশ কাটে, তীরধনুক সংগ্রহ করে এবং অস্ত্রাদিতে শান দেয়। পাত্রপক্ষও কৃত্রিম সাবধানতা অবলম্বন করে। কিন্তু উভয় পক্ষেই গোপনে বিবাহের প্রস্তুতি চলতে থাকে। শেষে একদিন অপরাহ্নে কুমারী বেশ বিন্যাস করে পুষ্পাভরণে সজ্জিত হয়ে একাকী গাগরী নিয়ে জল আনতে যায়। বনের ধার দিয়ে যায় আর চকিত দৃষ্টিতে দুই পাশে তাকাতে থাকে। সহসা বনের মধ্য থেকে তার মনোনীত যুবা বের হয়ে এসে কুমারীকে বুকে ধরে ছুটতে আরম্ভ করে। কুমারীও কৃত্রিম প্রতিবাদ করতে থাকে। সে হাত পা ছোঁড়ে, চীৎকার করে। অতঃপর কুমারীর আত্মীয় স্বজনেরাও তীরধনুক নিয়ে বাঁধা দেয়। এইরূপে কিছুক্ষণ কৃত্রিম যুদ্ধের পর উভয় পক্ষে আপোষ হয়ে যায় এবং উভয়পক্ষ তৎক্ষণাৎ একত্র আহার করতে বসে। এইরূপ কন্যাহরণের মাধ্যমে বিবাহ কার্য সম্পাদিত হয়। বিবাহের অপর কোন আচার বা মন্ত্র তন্ত্র নেই।

কোলদের বিবাহেই সর্বাপেক্ষা অধিক উৎসবাদি অনুষ্ঠিত হয়। এই উপলক্ষে এরা টাকা কর্জ করে থাকে। দু-চারটি গ্রাম অন্তর একজন করে হিন্দুস্থানী মহাজন বাস করে। এরাই টাকা ঋণ দেয়। ঋণ গ্রহণের বিনিময়ে কোন কোন কোল মহাজনকে 'সামকনামা' লিখে দেয়। অর্থাৎ জন্মের মত সে মহাজনের নিকট বিক্রীত হ'ল। আপনার সংসারের সঙ্গে আর তার কোন সম্বন্ধ থাকে না।

পালামৌর প্রধান আওলাত মোয়া গাছ। এ অঞ্চলে উৎকৃষ্ট খাদ্য

রূপে ব্যবহৃত হয়। বর্ষার সময়ে কোলরা মৌয়ার ফুল ভক্ষণ করেই অতিবাহিত করে। পয়সার বিনিময়ে এই ফুলেও তাদের মজুরী শোধ হয়। মৌয়া ফুল থেকে মদ্য প্রস্তুত হয় এবং সেই মদ্যই পালামৌ অঞ্চলে ব্যবহৃত হয়।

আত্মজীবনী

রবীন্দ্রনাথের পিতৃদেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত 'আত্মজীবনী' ॥ ১৮৯৪ ॥ বাংলা জীবনী সাহিত্যের ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য সংযোজন। অতুল ঐশ্বর্য এবং ভোগ সুখের মধ্যে থেকেও কিরূপে তিনি ঈশ্বর সাধনায় আত্মনিয়োগ করে পরম সার্থকতার অনুভূতি লাভ করেছিলেন, তা তাঁর 'আত্মজীবনী' পাঠ করলে জানতে পারা যায়।

নির্জন প্রকৃতির সান্নিধ্য লাভের উদ্দেশ্যে এবং দেশ ভ্রমণের জন্য দেবেন্দ্রনাথ হিমালয়ের সন্নিহিত অঞ্চলগুলি সহ ভারতবর্ষের নানাস্থান সমূহ পরিভ্রমণ করেছিলেন। এইসকল স্থানসমূহের বিবরণ এবং জ্ঞাতব্য নানাবিধ তথ্য ও প্রসঙ্গ তাঁর আত্মজীবনী এবং পত্রাবলীতে স্থান পেয়েছে। পরিবেশিত এই সকল তথ্য একদিকে যেমন দেবেন্দ্রনাথের বাস্তববোধ এবং সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিচয় বহন করে, অপরপক্ষে সেইসঙ্গে 'ভারতবর্ষের' বিভিন্ন স্থান সমূহের বর্ণনায় গ্রন্থের গুরুত্বও বৃদ্ধি পেয়েছে।

বেদপাঠ শ্রবণের উদ্দেশ্যে দেবেন্দ্রনাথ ১৮৪৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের শেষে কাশীযাত্রা করেন। কাশীতে অবস্থানকালে কাশীর রাজার আহ্বানে কাশীর পরপারে রামনগরস্থ রাজবাটীতে দেবেন্দ্রনাথ গিয়েছিলেন। রামনবমীর দিন রামনগরে রামলীলা অনুষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের যাত্রার মত রামচন্দ্রের জীবন নিয়ে অনুষ্ঠিত অভিনয় এখানে 'রামলীলা' নামে পরিচিত। রাম নবমীতে বিরাট মেলাও অনুষ্ঠিত হয়। মেলার একস্থানে ফুলের দ্বারা সজ্জিত করে একটি সিংহাসন স্থাপন করা হয়। তার উপরে থাকে চন্দ্রাতপ। এই কৃত্রিম সিংহাসনে একটি বালককে ধনুর্বাণসহ রামচন্দ্র সাজিয়ে উপবেশন করান হয়।

লোকে রামরূপী এই বালককেই ভক্তিভরে প্রণাম নিবেদন করে অদূরে প্রস্তত যূদ্ধক্ষেত্রে নানাবিধ মুখোস পরিধান করে অনেকে কৃত্রিম যুদ্ধের অভিনয় করে থাকে।

কাশীতে চন্দ্রগ্রহণের সময় বিশাল জনসমাবেশ ঘটে থাকে। এই সময়ে দেশের নানা প্রান্ত থেকে আগত মানুষের ভীড় দেখা যায়।[৪]

কাশী থেকে দেবেন্দ্রনাথ নৌকা যোগে বিন্ধ্যাচল হয়ে মির্জাপুর পর্যন্ত গমন করেছিলেন। বিন্ধ্যাচলস্থিত ক্ষুদ্র পর্বত দেখে তিনি খুব আনন্দ লাভ করেন। বিন্ধ্যাচলে তিনি যোগমায়া এবং ভোগমায়া দর্শন করেছিলেন।

১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে দেবেন্দ্রনাথ আসাম অঞ্চল পরিভ্রমণের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। ঢাকা, মেঘনা প্রভৃতি অতিক্রম করে অবশেষে ব্রহ্মপুত্র দিয়ে গৌহাটী গিয়ে উপস্থিত হয়। এখানে তিনি কামাখ্যার মন্দির দর্শন করতে কামাখ্যা পর্বতের পাদদেশে গিয়ে উপস্থিত হলেন। পর্বতের পথ প্রস্তর নির্মিত। পথের দুই পাশেই গভীর জঙ্গল। পর্বতের ওপর বিস্তীর্ণ সমভূমি অবস্থিত। কামাখ্যার মন্দিরটি আসলে একটি পর্বত গহ্বর। এখানে কোন প্রকার মূর্তি নেই, কেবল যোনিমুদ্রা বর্তমান। এই যোনিমুদ্রা দর্শন করে দেবেন্দ্রনাথ ফিরে আসলেন।

১৮৫১ সালের মার্চ মাসে দেবেন্দ্রনাথ কটক গমন করেন। চৈত্র মাসে কটক অত্যন্ত উষ্ণ হয়। কটক থেকে দেবেন্দ্রনাথ পাণ্ডুয়ায় গিয়ে কিছুদিন অবস্থান করলেন। অতঃপর পাণ্ডুয়া থেকে তিনি পুরী অভিমুখে রওনা হলেন। পুরীর অনতিদূরে অবস্থিত একটি পুষ্করিণী। 'চন্দন যাত্রার পুষ্করিণী' নামে এ'টি পরিচিত। এই পুষ্করিণীতে স্নান করে দেবেন্দ্রনাথ জগন্নাথ দেবের মন্দির অভিমুখে রওনা হলেন। জগন্নাথের সামনে বৃহৎ একটি তাম্রকুণ্ড পূর্ণ জল, তাতে জগন্নাথের প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত। এই প্রতিবিম্বকে দাঁতন করে পুনরায় তাম্রকুণ্ডে জল ঢেলে তাতেই জগন্নাথের দন্তধাবন এবং স্নানাদি অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। স্নানাদির পর পাণ্ডারা জগন্নাথকে নূতন বস্ত্রাদি এবং আভরণ পরিধান করিয়ে থাকে।

জগন্নাথের মন্দির থেকে দেবেন্দ্রনাথ বিমলাদেবীর মন্দিরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। প্রথমে তিনি গিয়ে পৌছালেন মুঙ্গেরে। এখান থেকে তিনি সীতাকুণ্ড দেখতে গেলেন। সীতাকুণ্ডের জল খুব উষ্ণ এবং স্পর্শ করা

দুঃসাধ্য। অতঃপর ফতুয়ার বিস্তীর্ণ গঙ্গার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে পাটনা অতিক্রম করে গিয়ে পৌছালেন কাশীতে। কাশী থেকে দেবেন্দ্রনাথ গিয়ে উপস্থিত হলেন এলাহাবাদে। এলাহাবাদে গঙ্গার চড়ায় বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিশান উড়তে দেখলেন। এ'টিই প্রয়াগ তীর্থ নামে প্রসিদ্ধ। প্রয়াগস্থিত বেণীঘাটে লোকে মস্তক মুণ্ডন করে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে থাকে। এলাহাবাদ থেকে যাত্রা করে তিনি গিয়ে পৌছালেন আগ্রায়। আগ্রায় পৃথিবী বিখ্যাত তাজমহল দেখলেন। অতঃপর এখান থেকে রওনা হলেন দিল্লী অভিমুখে। মথুরা এবং বৃন্দাবন হয়ে দেবেন্দ্রনাথ অবশেষে দিল্লীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। দিল্লী অতি প্রাচীন নগরী। নগরীটি চতুর্দিকে প্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত।[৫]

দেবেন্দ্রনাথ দিল্লী থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত প্রসিদ্ধ কুতুবমিনার দেখতে গেলেন। মিনারটি প্রায় ১৬১ হাত উঁচু। অতঃপর দিল্লী থেকে যাত্রা করে আরও পশ্চিমে আম্বালায় গিয়ে তিনি উপস্থিত হলেন। আম্বালা থেকে দেবেন্দ্রনাথ লাহোরে গিয়ে পৌছালেন, আবার লাহোর থেকে গেলেন অমৃতসরে।

অমৃতসরের স্বর্ণমন্দির বিখ্যাত। একটি বৃহৎ সরোবরে এ'টি অবস্থিত। অমৃতসর থেকে ৬৭ মাইল দূরবর্তী ইরাবতী নদীর কূলে অবস্থিত মাধবপুর নামক গ্রাম থেকে ইরাবতীর জল এসে সরোবরকে পূর্ণ রাখে। শিখগুরু রামদাস এই সরোবরটি খনন করিয়েছিলেন। তাঁরই প্রদত্ত নামানুসারে সরোবরটির নাম হয়েছে 'অমৃতসর'। পূর্বে এর নাম ছিল 'চক্'। সরোবরের মধ্যে এক শ্বেত প্রস্তরের মন্দির। একটি সেতু দিয়ে এই মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। মন্দিরের সম্মুখে একটি বিচিত্র বর্ণ রেশমের বস্ত্রে আবৃত দীর্ঘ স্তূপাকৃতি গ্রন্থ সকল বর্তমান। গায়কেরা কেউ গ্রন্থের গান গেয়ে থাকেন, কেউ আবার গ্রন্থগুলিকে চামরের দ্বারা ব্যজন করেন। পাঞ্জাবী স্ত্রী পুরুষ নির্বিশেষে এই মন্দির প্রদক্ষিণ করে কড়ি ও ফুল দিয়ে প্রণাম করেন। স্বর্ণমন্দিরে সকলের অবাধ প্রবেশাধিকার। সন্ধ্যার সময়ে পঞ্চপ্রদীপ দ্বারা গ্রন্থগুলিকে আরতি করা হয়। আরতি শেষে সকলকে কড়া ভোগ ॥ মোহন ভোগ ॥ দেওয়া হয়। দিবারাত্র মন্দিরে উপাসনা চলে। কেবলমাত্র রাত্রির শেষ প্রহরে উপাসনা বন্ধ থাকে। এই সময়ে মন্দির পরিষ্কার করা হয়। স্বর্ণমন্দিরে কোন প্রতিমা নেই। তবে গুরুদ্বারের সীমানার মধ্যেই এক প্রান্তে একটি শিবমন্দির স্থাপিত। দোলের

সময় মন্দিরে সাড়ম্বরে উৎসব অনুষ্ঠিত হয়।

গ্রীষ্মকালে অমৃতসরে খুব গরম। এই সময়ে এখানকার অধিবাসীরা তয়খানায় বাস করে। তয়খানা হ'ল ভূগর্ভস্থ কক্ষ। গ্রীষ্মকালে এই সব কক্ষ খুব শীতল থাকে। অমৃতসর থেকে দেবেন্দ্রনাথ সিমলা অভিমুখে যাত্রা করলেন। ক্রমে পঞ্জোরি অতিক্রম করে তিনি কালকা নামক উপত্যকায় গিয়ে উপস্থিত হলেন। কালকায় তিনি পর্বত দেখতে পেলেন।

দেবেন্দ্রনাথ ঝাঁপান নিয়ে ঘুরে ঘুরে পর্বতে উঠতে আরম্ভ করলেন। ঝাঁপান একটি বড় কেদারা। দুই পাশে দুই দীর্ঘ বরগাতে সংলগ্ন হয়ে ঝুলতে থাকে এবং চারজন লোকে এটিকে বহন করে থাকে।[৬] কখনও খাদ, কখনও উচ্চতর পর্বতের পাদদেশে প্রবাহিত ক্ষুদ্র নদী অতিক্রম করে ক্রমে এসে পৌঁছালেন হরিপুর নামক স্থানে। হরিপুর থেকে যাত্রা করে এসে পৌঁছালেন সিমলায় বাজারে। সেই সময়ে সিমলায় বর্ষাকাল। ক্রমাগতই সূর্য বাষ্পাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রায়ই বৃষ্টি হয়ে থাকে। এখানে মেঘের সঞ্চার হলেই শীতের প্রকোপ বৃদ্ধি পায়। শীতের জন্য এখানে বারো মাসই উষ্ণ বস্ত্র ব্যবহার করতে হয়।[৭]

সিমলা পরিত্যাগ করে দেবেন্দ্রনাথ গিয়ে উপস্থিত হলেন ডগশাহীতে। এখানে কয়েকদিন অতিবাহিত করে পুনরায় তিনি সিমলায় প্রত্যাবর্তন করলেন। পুনরায় দেবেন্দ্রনাথ এখান থেকে যাত্রা করলেন। তিনি চললেন আরও উত্তরাভিমুখে। এখানকার লোকেদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রার বৈচিত্র্য দেবেন্দ্রনাথ লক্ষ্য করলেন। এ অঞ্চলের লোকেদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা অতীব কষ্টকর। বরফের সময়ে এদের একহাঁটু বরফ ভেঙে চলতে হয়। ক্ষেতের সময়ে শূকর এবং ভালুক এসে ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে। তাই রাত্রিতে মাচার ওপরে থেকে তাদের ক্ষেতের ফসল রক্ষা করতে হয়। এই অঞ্চলে স্ত্রীলোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম।

তাই সকল ভাই মিলে একজনকেই বিবাহ করে থাকে এবং স্ত্রীর সন্তানেরা সকল ভাইকেই পিতা বলে সম্বোধন করে। সিমলা থেকে ২০ ক্রোশ পথ পর্যটন করে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ এসে পৌঁছালেন নারকাণ্ডা নামক পর্বতশিখরে। নারকাণ্ডা অতি উচ্চ শিখর। এখান থেকে ১২ ক্রোশ ভ্রমণ করে এসে উপস্থিত হলেন সুঙত্রী নামক পর্বত চূড়াতে। পথে হরিৎ বর্ণ ঘন পল্লবাবৃত বৃহৎ বৃক্ষসকল

তিনি দেখতে পেলেন। এইসকল বৃক্ষে একটি ফল অথবা ফুল দেখলেন না। কেবলমাত্র কেলু নামক সুউচ্চ বৃক্ষে হরিৎবর্ণ একপ্রকার কদাকার ফল প্রত্যক্ষ করলেন। এইফল কোন পক্ষী পর্যন্ত আহার করে না। তবে সর্বত্রই নানা বর্ণের বিবিধ বন্য পুষ্পরাজি দেখতে পেলেন। স্থানে স্থানে শ্বেতবর্ণের গোলাপ দেখলেন। এই গোলাপগুলি চারটি পত্রের একটি স্তবকমাত্র। একই আকৃতির রক্তবর্ণের গোলাপও দেবেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন। মধ্যে মধ্যে ষ্ট্রাবেরি ফলও তিনি দেখলেন।[৮]

সুঙত্রী শিখর থেকে পরস্পর অভিমুখী দুই পর্বতশ্রেণী দেবেন্দ্রনাথ দেখতে পেলেন। এই শ্রেণীদ্বয়ের মধ্যে পর্বতে নিবিড় বন, এবং ভাল্লুক প্রভৃতি হিংস্র জন্তুর এখানে বাস। কোন পর্বতের আপাদমস্তক গোধূমক্ষেত্র। অতঃপর দেবেন্দ্র নাথের অবতরণ শুরু হ'ল। পর্বতে কেবলমাত্র কেলুবৃক্ষের বন। কেলুগাছ দেবদারু গাছের ন্যায় ঋজু এবং দীর্ঘ। এদের শাখা সকল অগ্রভাগ পর্যন্ত বেষ্টন করে রয়েছে। এদের পাতা ঝাউগাছের পাতার অনুরূপ অথচ সূচীপ্রমাণ দীর্ঘমাত্র। কেলুগাছগুলির শাখা শীতকালে তুষারাচ্ছন্ন হয়ে যায়, অথচ এদের পাতা তুষারপাতে জীর্ণ হওয়ার পরিবর্তে অধিকতর সতেজ হয়ে ওঠে। দেবেন্দ্রনাথ ক্রমে বোয়ালি নামক পর্বতে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

এটি সুংত্রী শিখরের অনেক নীচে অবস্থিত। এই পর্বতের নীচ দিয়ে নদী এবং নিকটস্থ অন্যান্য পর্বততল দিয়ে শতদ্রু নদী তীরস্থিত রামপুর নামক নগরটি খুব প্রসিদ্ধ। রামপুরে এখানকার পর্বত সমূহের অধিকারী রাজার রাজধানী। শতদ্রু নদী রামপুর থেকে ভজ্জীর রাণার রাজধানী মোহিনী হয়ে তার নীচে বিলাসপুরে গিয়ে পর্বত ত্যাগ করে পাঞ্জাবে গিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। বোয়ালি থেকে অবতরণ করে দেবেন্দ্রনাথ নগরী নদীতীরে গিয়ে পৌছালেন। নগরী নদী খুব খরস্রোতা। এর উভয়তীরেই প্রাচীরের ন্যায় দুই বৃহৎ পর্বত দণ্ডায়মান। নদীর পর পারস্থিত উপত্যকা ভূমি অতীব রম্য এবং জনবিরল। এখান থেকে যাত্রা করে ক্রমে দেবেন্দ্রনাথ 'দারুণঘাট' নামক এক উচ্চ পর্বত শিখরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এর ঠিক সম্মুখেই অপর এক উচ্চ পর্বত বিদ্যমান। পর্বতশৃঙ্গটি তুষারাবৃত। চৈত্রমাস শেষ হতে না হতেই সাধারণত সিমলা পর্বত তুষারমুক্ত হয়ে ওঠে। কিন্তু আষাঢ় মাসের প্রথমেই দেবেন্দ্রনাথ, দারুণঘাটে উপস্থিত হয়ে তুষারপাত প্রত্যক্ষ করলেন।

দারুণঘাট থেকে অবতরণ করে দেবেন্দ্রনাথ গিয়ে পৌছালেন সিরাহন নামক পর্বতে। এখানে রামপুরের রাণীর গ্রীষ্মনিবাস। অবশেষে এখান থেকে তিনি পুনরায় সিমলায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

সিমলায় বৃক্ষলতা সকল শুষ্ক হয়ে যায়। তবে চৈত্রমাসের শেষে চতুর্দিক ফুলে ফুলে ভরে ওঠে।

ভজ্জীর রাণার আমন্ত্রণে দেবেন্দ্রনাথ শতদ্রু নদী তীরে রাণার রাজধানী মোহিনীনগরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এখানে শতদ্রু খুব প্রশস্ত। নদীর জল সমুদ্রের জলের মত নীল, উজ্জ্বল এবং পরিষ্কার। জলমধ্যে বৃহদাকৃতির প্রস্তর নিমগ্ন থাকায় নদীতে কাষ্ঠ নির্মিত নৌকা চলাচল করতে পারে না। একমাত্র মশক চলতে পারে। দেবেন্দ্রনাথ চর্মনির্মিত মশকে চড়ে নদীর অপর প্রান্তে গিয়ে পৌছালেন। অপর পারের নদীর জল মুঙ্গেরের সীতাকুণ্ডের জলের ন্যায় উষ্ণ। অনেক পীড়িত ব্যক্তি এখানে স্নান করে থাকে। এখানে স্নান করলে নাকি বহু রোগের উপশম ঘটে থাকে।

এখানে পর্বতবাসী ভূম্যধিকারীদের মধ্যে প্রধান রাজা, পরে রাণা, তারপর ঠাকুর এবং সকলের শেষে জমিদার। রাজা ও রাণাদের বিবাহ সময়ে সখীদেরও কন্যার সঙ্গে সম্প্রদান করা হয়। রাণীর গর্ভের পুত্র রাজা বা রাণা হয়। আর সখীর গর্ভের পুত্র রাজপরিবারে থেকে যাবজ্জীবন অন্নলাভ করে। সখীর গর্ভজাত কন্যা রাজকন্যার সখীরূপে পরিচিত হয়। এবং রাজকন্যার স্বামীর হাতে এরা নিজেদের জীবন ও যৌবন সমর্পণ করে। রাজা ও রাণার রাণীর সংখ্যা অধিক। স্বাভাবিক কারণেই তাই সখীদের সংখ্যাও অধিক। একজন রাজা বা রাণার মৃত্যু হলেই বন্দীর ন্যায় কারাগারে বন্ধ থেকে এরা যাবজ্জীবন কষ্টভোগ করে।

সিমলা থেকে দেবেন্দ্রনাথ পুনরায় আপন গৃহাভিমুখে যাত্রা করলেন। কালকা থেকে পঞ্জোর এবং পঞ্জোর থেকে আম্বালা এবং এখান থেকে কানপুর ও এলাহাবাদ হয়ে কলকাতাভিমুখে রওনা হলেন।

গ্রীষ্মকালে কানপুর ও এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থান বড় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। পশ্চিমাঞ্চলের দেশ সকল বর্ষাকাল গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর।[৯]

বিদ্রোহে বাঙ্গালী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে সকল বাঙ্গালীকে কর্মসূত্রে বাংলার বাইরে অতিবাহিত করতে হয়েছিল তাঁদের মধ্যে অন্যতম দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়। দুর্গাদাসের কর্মক্ষেত্রই কেবলমাত্র বাইরে ছিল না, তাঁদের জন্মক্ষেত্রও ছিল বাংলার বাইরে। দুর্গাদাসের পৈতৃক নিবাস ছিল হুগলী জেলার অন্তর্গত তড়া আঁটপুর নামক গ্রামে। তাঁর পিতা শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়কেও কার্যোপলক্ষে পশ্চিমে গমন করতে হয়েছিল। শিব চন্দ্র৬ সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহী রেজিমেণ্টে কার্য করতেন। বলাবাহুল্য রেজিমেণ্ট কখনও একস্থানে স্থায়ীরূপে থাকে না। সুতরাং রেজিমেণ্টের সঙ্গে শিবচন্দ্রকেও নানা স্থানে গমন করতে হ'ত। ৮৩৫ সালের কার্তিক মাসে শিবচন্দ্রের রেজিমেণ্ট কুরুক্ষেত্র থেকে তিন ক্রোশ দূরবর্তী কর্ণাল নামক স্থানে যখন ছাউনি করেছিল সেই সময়ে দুর্গাদাসের জন্ম হয়। বাল্যকালাবধি দুর্গাদাস তাঁর পিতার সঙ্গে দেশ-দেশান্তর ভ্রমণের সুযোগ লাভ করেছিলেন। তাঁর ভাষায়, 'বাল্যকালাবধি পিতার সঙ্গে নানা দেশ দেশান্তরে গিয়াছি। অনেক দেশ অনেক নগর ইহার মধ্যে দেখিয়াছি।'

কর্ণাল থেকে নিমাচ, নিমাচ থেকে সাকার-বাকার, সাকার-বাকার থেকে দুর্গাদাস কাশীতে আসেন। কাশীতে কিছুকাল অতিবাহিত করে তিনি এখান থেকে বাংলায় ॥ শান্তিপুরে॥ আসেন। কিন্তু বাংলাদেশেও তাঁর অধিককাল অতিবাহিত করা সম্ভব হল না। পুনরায় তিনি কাশীতে প্রত্যাবর্তন করলেন। বেনারসস্থিত কলেজে দুর্গাদাস অধ্যয়ন করতে থাকেন। অতঃপর ১৮৮৪ সালে পিতা শিবচন্দ্র দমোতে বদলি হয়ে গেলে দুর্গাদাসকেও বেনারস থেকে দমোতে যেতে হয়। এখানে দুই বৎসরকাল অবস্থান করে পুনরায় তিনি কাশীতে আসেন। ১৮৫১ সালে শিবচন্দ্র পরলোকে গমন করলে পঞ্চদশ বর্ষীয় দুর্গাদাসের ওপর সংসারের সকল দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। এই সময়ে বেনারস থেকে সাত ক্রোশ দূরবর্তী সুলতান পুর নামক স্থানে ৮ম সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহী সৈন্য ছাউনি করেছিল। এখানকার এডজুটেণ্ট অফিসে একটি চাকুরী খালি ছিল। দুর্গাদাস এই চাকুরীতে নিযুক্ত হন ১৮৫১ সালের অকটোবর মাসের শেষে। অতঃপর পিতার ন্যায় তাঁকেও রেজিমেণ্টের সঙ্গে স্থান থেকে স্থানান্তরে

ঘুরে বেড়াতে হয়। কর্মবহুল জীবনে বহুবিধ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে অবশেষে ১৯১৪ সালে॥ ১৩২১ সালের ১২ই শ্রাবণ॥ যুক্ত প্রদেশের অন্তর্গত এটোয়ায় দুর্গাদাস পরলোক গমন করেন।

দুর্গাদাসের কর্মবহুল জীবনের কাহিনী 'আমার জীবন চরিত' নামে তৎকালীন 'জন্মভূমি' নামক মাসিক পত্রিকায় ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হয় ১৮৯১ সাল থেকে ১৯২৩ সাল পর্যন্ত॥ ১২৯৮ সালের আষাঢ় থেকে ১৩৩০ সালের বৈশাখ পর্যন্ত॥ অতঃপর এ'টি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয় ১৯২৪ খ্রীষ্টাব্দে॥ ১৩৩১॥ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হবার সময় এ'টির নামকরণ হয় "বিদ্রোহে বাঙ্গালী"।

দুর্গাদাস বাংলার বাইরে দীর্ঘকাল কর্মসূত্রে অতিবাহিত করলেও তাঁর জীবনীতে বঙ্গেতর ভারতের উল্লেখযোগ্য বিবরণ প্রদত্ত হয় নি। কারণ দেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতা বর্ণনা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁর কর্মবহুল জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাকেই তিনি প্রকাশ করে গেছেন। বিশেষত তৎকালীন সিপাহী বিদ্রোহের পূর্ণাঙ্গ বিবরণই তাঁর আত্মজীবনীর উল্লেখযোগ্য অংশ অধিকার করে আছে। অবশ্য প্রসঙ্গত বহির্বঙ্গের কিছু কিছু বিবরণও ইতস্তত বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রদত্ত হয়েছে লক্ষ্য করা যায়।

১৮৫১ সালের ৮ই নভেম্বর সুলতানপুর থেকে ৮ম সংখ্যক ইরেগুলার অশ্বারোহী বাহিনীর হান্সিতে যাবার নির্দেশ আসে। দুর্গাদাসও হান্সি অভিমুখে চললেন।

পাঞ্জাবে অবস্থিত হিসার জেলার অন্তর্ভুক্ত হান্সির দূরত্ব কলকাতা থেকে ১৮০১ মাইল। এ'টি ১৮০২ খ্রীষ্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক অধিকৃত হয়েছিল। হান্সি বেশ ক্ষুদ্র সহর। দুর্গাদাস যখন তাঁর রেজিমেণ্টের সঙ্গে এখানে উপস্থিত হন তখন এখানকার অধিবাসীর সংখ্যা ছিল ১২।১০ হাজারের মত। নগরটি চারদিকে উচ্চ প্রাচীর দ্বারা বেষ্টিত। নগরের উত্তরদিকে একটি প্রাচীন এবং ভগ্ন কেল্লা বিদ্যমান। এখানকার পথ সমূহ বেশ প্রশস্ত। হান্সির জলবায়ুও বেশ স্বাস্থ্যকর। তিন চার মাস হান্সিতে অবস্থান করবার পর দুর্গাদাস তাঁর মাতাকেও হান্সিতে নিয়ে আসেন।

অতঃপর ১৮৫৩ সালের শেষে গভর্ণমেণ্ট থেকে দুর্গাদাসের রেজিমেণ্টের ব্রহ্মদেশে যাবার নির্দেশ আসে। তদনুযায়ী ১৮৫৪ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে তাঁদের রেজিমেণ্ট ব্রহ্মের পথে কলকাতা অভিমুখে যাত্রা করে। আবার

১৮৫৬ সালে রেজিমেণ্ট ব্রহ্মদেশ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সুলতানপুরে গিয়ে উপস্থিত হয়। সুলতানপুরে তিন চার মাস অতিবাহিত হবার পর রেজিমেণ্ট উপনীত হয় বেরিলিতে। বেরিলিতে প্রায় তিন বৎসরের জন্য রেজিমেণ্টকে ছাউনি করতে হয়।

বেরিলি উত্তর-পশ্চিমের অন্তর্গত, রোহিল খণ্ডের রাজধানী। বেরিলি এলাহাবাদ থেকে ৩১১ মাইল দূরবর্তী। দিল্লী থেকে বেরিলির দূরত্ব ১৫২ মাইল। কলকাতা থেকে এ'র দূরত্ব ৭৮৮ মাইল। ১৮৫৬ সালের শেষভাগে দুর্গাদাসের রেজিমেণ্ট বেরিলিতে পৌছায়।

বেরিলি সহরটি প্রাচীন। এখানে অনেক যুদ্ধ বিগ্রহ ঘটেছে। তবে বেরিলি সহরটি গড়বন্দী নয়, এমনকি এ'টি প্রাচীর দ্বারাও বেষ্টিত নয়। সুদৃঢ়, সুবৃহৎ কেল্লাও সে সময়ে বেরিলিতে ছিল না। এই সময়ে বেরিলিতে মাত্র ১২। ১৪ জন বাঙালী ছিলেন। এদের কেউ বা কাজ করতেন কমিশনার অফিসে কেউ ছিলেন পোস্টমাস্টার, কেউ বা ছিলেন ব্রিগেডিয়ার অফিসের বড়বাবু। কেউ আবার কাজ করতেন কালেকটারীতে। বেরিলির জলবায়ু খুব স্বাস্থ্যকর। এখানকার জিনিসপত্র সে সময় ছিল বেশ সস্তা। পিলিভিটের নিকট নিউরিয়া নামক স্থানের চাল ছিল খুব প্রসিদ্ধ। বেরিলিস্থিত হিন্দুস্থানীরা মাছ মাংস খেত না। কিন্তু বেরিলির মুসলমানগণ ছিল মাছ মাংসের ভক্ত। এখানকার হিন্দুস্থানীরা তরকারী বড় খেত না। তাদের প্রধান খাদ্য ছিল ডাল এবং রুটি। বেরিলিতে রুই, কাতলা, পুঁটি প্রভৃতি নানাবিধ মাছ পাওয়া যেত। এখানে পটল অত্যন্ত কম জন্মে। বেরিলিতে কাঁঠাল, কলা এবং নারকেল পাওয়া যায় না। কিন্তু এখানে আম হয় প্রচুর। বেরিলি সহরে, সহরের প্রান্তভাগে, পল্লী গ্রামে, মাঠে, ঘাটে সর্বত্রই আমগাছ। পঞ্চাশ বিঘা একশত বিঘা ব্যাপী এক একটি আমের বাগান। এখানে আষাঢ় ও শ্রাবণ এই দুই মাসই আমের সময়। এই সময় সাধারণ লোকে আম খেয়েই জীবন ধারণ করে। তবে বেরিলিতে এক বৎসর অন্তর আম জন্মায়। অর্থাৎ এক বৎসর আমের ফলন হলে পরের বৎসর আর তেমন ফলন হয় না।

বেরিলি অঞ্চলে পরমাসুন্দরী নৃত্য পটিয়সী রমণী দেখা যেত। এরা পুরাণের অপ্সরা বংশীয় বলে খ্যাত ছিল। নৈনিতাল এবং কুমায়ুনের পার্বত্য প্রদেশে এদের বসতি ছিল। সেখানে এদের সম্প্রদায় পরিচিত ছিল

'রামজানি' নামে। এরা হিন্দুধর্মকেই মান্য করত। এরা ছিল হর পার্বতীর সেবিকা। সুন্দরীদের আচার, অনুষ্ঠান, নিষ্ঠা সমস্তই ছিল হিন্দুর অনুরূপ। এরা মুসলমানদের সঙ্গে একাসনে বসে পান, তামাক পর্যন্ত খেত না। এমনকি মুসলমান স্পৃষ্ট হলে এরা স্নান করত। প্রভাতে উঠে এরা শিব বা দুর্গা পূজায় দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করত। এরা কতকাংশে ছিল গৃহস্থ এবং কতকাংশে ছিল বারবিলাসিনীর অনুরূপ। মা, বাবা, ভাই, এরা গৃহস্থ জীবন যাপন করত, থাকত অন্দর মহলে ; অপরপক্ষে কন্যা নর্তকীর ব্যবসা করে অর্থোপার্জন করত। এরা অবস্থান করত বৈঠকখানায়। এই 'রামজানি' জাতির রহস্য এরা কন্যা হলেই সাধারণত নর্তকী হ'ত, আর পুত্র হলে যথাসময়ে সেই পুত্র বিবাহ করে গৃহস্থ হ'ত।

বেরিলিকে বামে রেখে আরও উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হলে পড়ে কাশীপুর। বেরিলিতে টাট্টুওয়ালার প্রচলন ছিল। ছোট ছোট দেশী ঘোড়ার ওপর ঘি, আটা, ডাল প্রভৃতি দ্রব্য বোঝাই করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে গিয়ে এরা বেচা-কেনা করত। এইরূপে তারা গ্রামের জিনিস সহরে আনত এবং সহরের জিনিস নিয়ে যেত গ্রামে।

দুর্গাদাস বেরিলি থেকে যাত্রা করে রামপুর হয়ে পৌছালেন সাফাখানায়। সাফাখানার অর্থ 'ঔষধালয়'। এই স্থান থেকেই নিবিড় অরণ্য আরম্ভ হয়েছে। অরণ্যবাসীরা এই সাফাখানায় আসত চিকিৎসার জন্য। সেই নিবিড় জঙ্গলের মধ্যে দূরে দূরে ছিল গ্রীষ্মের অবস্থান। লোকসংখ্যা ছিল খুবই কম। সাফা-নার নিকট ছিল দু'খানি মাত্র চালাঘর। এখানে বাঘ, হাতী প্রভৃতি ছিল। সাফাখানা থেকে কয়েক মাইল অগ্রসর হলে ক্রমশঃ মেঘবন পর্বত সমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। অতঃপর পড়ে কালাডুঙ্গি ; কালাডুঙ্গি থেকে নৈনিতাল।

বেরিলি থেকে নৈনিতাল যাবার পথ দু'টি। একটি পথ বামে এবং অপরটি দক্ষিণে। বাম দিকের পথ দিয়ে গমন করলে রামপুর রাজ্য হয়ে সাফাখানা অতিক্রম করে কালাডুঙ্গি পৌছানো যায়। কালাডুঙ্গি অবস্থিত নৈনিতাল পর্বতের মূলদেশে। কালাডুঙ্গি হয়ে তবে নৈনিতাল পর্বতে উঠতে হয়। বেরিলি থেকে দক্ষিণের রাস্তা ধরে নৈনিতালে যেতে হলে বহেড়ি, চারপুরা, হলদোয়ানী প্রভৃতি গ্রাম নগর অতিক্রম করে যেতে হ'ত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় এই হলদোয়ানীতেই নবাব খাঁ বাহাদুর খাঁর প্রধান সেনানিবাস স্থাপিত হয়ে

ছিল। তাই দুর্গাদাস বামদিক দিয়ে কালাডুঙ্গি হয়ে নৈনিতালে যাবার পরিকল্পনা করলেন। কালাডুঙ্গিতে সে সময় ছিল কেবলমাত্র জঙ্গল। এখান থেকে দু'টি পথ দিয়ে নৈনিতাল পর্বতীয় পথে উপস্থিত হওয়া যেত। এদের একটি পথ সোজা এবং অপরটি বাঁকা। বাঁকা পথ দিয়ে যাওয়া ছিল সহজ এবং সে রাস্তাটিও ছিল ভাল। পাহাড়ের নীচে দিয়ে একটি ক্ষীণ খরস্রোতা নদী প্রবাহিত। দ্বিতীয় পথটি কিন্তু এক মাইলের অধিক ঘুরে গেছে। এই পথটি ইংরাজ কর্তৃক নির্মিত হয়েছিল সৈন্যদের গমনাগমনের জন্য। এই পথ দিয়ে গেলে পদব্রজে নদী অতিক্রম করতে হত না। নদীর উপর নির্মিত সেতুর ওপর দিয়ে পার হওয়া যেত। কালাডুঙ্গি থেকে হলদোয়ানি যাবার পথে পাহাড়ের নিম্নপ্রদেশে স্থানে স্থানে ছিল কলাবাগান।

হলদোয়ানি পার্বত্যময় জঙ্গলপূর্ণ দেশ। এ'টি নৈনিতাল পাহাড়ের নিম্নতলে অবস্থিত। এখানে তখন লোকেদের বসবাস ছিল না। বাজার ছিল একটিমাত্র। পার্শ্ববর্তী গ্রামের অধিবাসীরা নির্দিষ্ট দিয়ে এখানে উপস্থিত হয়ে তাদের বেচা কেনা সারত। হলদোয়ানি থেকে বহেড়ি দিয়ে বেরিলি যাবার রাস্তা ছিল কাঁচা। এই পথ দিয়ে সর্বদা লোকজন যাতায়াত করত না। পথটির দুই পাশে ছিল নিবিড় অরণ্য।

বেরিলি থেকে রামপুর হয়ে দুর্গাদাস কাশীপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন। কাশীপুর থেকে নৈনিতালে যাবার এক সহজ গুপ্ত অরণ্যপথ ছিল। চিলকিয়ার পথ ধরে দুর্গাদাস এবং তাঁর সঙ্গের লোকজন নৈনিতাল অভিমুখে চলতে লাগলেন। চার পাঁচ মাইল পথ অপেক্ষাকৃত পরিষ্কার। কিন্তু তার পরই নিরবিচ্ছিন্ন জঙ্গলের শুরু।

কালাডুঙ্গি গ্রাম নয়। এখানে কারও বসবাস ছিলনা, দোকান ছিল না, বাজার ছিল না, এমন কি খাদ্যদ্রব্যও কিছুই পাওয়া যেত না। ছিল কেবল একটি প্রশস্ত বাঁধা রাস্তা। এই পথ দিয়ে নৈনিতালে যেতে হ'ত এবং নৈনিতাল থেকে মোরাদাবাদ, বেরিলি অঞ্চলে আসা চলত। এছাড়া একটি অগভীর পার্বত্য নদী এখানে প্রবাহিত ছিল।

হলদোয়ানি গ্রাম নয়, এ'টি মণ্ডী বা বাজার নামে তখন খ্যাত ছিল। প্রায় পঁচিশ বিঘা চৌকোণা জমি, এই জমির চারদিকেই এক সারি করে ঘর, ঘরগুলি ছিল পরস্পরের সংলগ্ন। জমির মধ্যস্থলটা ছিল ফাঁকা। অর্থাৎ সেই

জমি গৃহ রূপ প্রাচীর দ্বারা চারদিকে ছিল বেষ্টিত। এই গৃহগুলি ছিল দোকান ঘর। বহু সংখ্যক দোকানদার বিদ্রোহের পূর্বে এখানে বেচাকেনা করত। সপ্তাহে একদিন বসত হাট। সেই চতুষ্কোণ বিশিষ্ট জমিটির মধ্য স্থলের উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে এই হাট বসত। বহুদূর থেকে লোকজন এই হাটে উপস্থিত হ'ত। নানা রূপ সামগ্রীর আমদানি হ'ত। এই প্রদেশে তখন এইরূপ কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল যে, হলদোয়ানির হাটে যা পাওয়া যাবেনা তা অন্য কোথায়ও মিলবে না।

হলদোয়ানি থেকে বহেড়ির দূরত্ব ষোল মাইল।

---

১. তুলসী মাছ

২. বণ্য মোষ এবং গরুর সংযোগে উৎপন্ন

৩. গুগ্‌নি ব্যাঙের ছাতা।

৪. পত্র সংখ্যা ৬৭।

৫. পত্র সংখ্যা ৫০।

৭. ঐ ৫০।

৮. ঐ ৫০।

৯. ঐ ৬৬।

গ্রন্থপঞ্জী

১। চৈতন্য চরিতামৃত — কৃষ্ণদাস কবিরাজ।

২। চৈতন্য ভাগবত — বৃন্দাবন দাস।

৩। চৈতন্য মঙ্গল — জয়ানন্দ।

৪। চৈতন্য মঙ্গল — লোচন দাস।

৫। গৌরাঙ্গ বিজয় — চূড়ামণি দাস।

৬। প্রেমবিলাস — নিত্যানন্দ দাস।

৭। ভক্তি রত্নাকর — নরহরি চক্রবর্ত্তী।

৮। শ্রীশ্রী ভক্তমাল — নাভাজী বিরচিত ও কৃষ্ণদাস অনূদিত, বসুমতী সংস্করণ, ৫ম।

৯। পদকল্পতরু ॥ ১ম-৪র্থ খণ্ড ॥ সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত।

১০। করুণানিধান বিলাস — জয়নারায়ণ ঘোষাল।

১১। কাশীখণ্ড — জয়নারায়ণ ঘোষাল।

১২। তীর্থ ভ্রমণ — যদুনাথ সর্বাধিকারী।

১৩। তীর্থমঙ্গল — বিজয়রাম সেন।

১৪। তীর্থমুকুর — ঈশ্বরচন্দ্র বাগচী।

১৫। বোম্বাই চিত্র — সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৬। আত্মজীবনী — মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

১৭। ধোলপুর — গিরিন্দ্রনন্দিনী দেবী।

১৮। পালামৌ — সঞ্জীবচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১৯। আর্য্যাবর্ত — প্রসন্নময়ী দেবী।

২০। কাশ্মীর কুসুম — রাজেন্দ্রমোহন বসু।

২১। মণিপুর প্রহেলিকা — জানকীনাথ বসাক।

২২। অন্নদামঙ্গল — ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর।

২৩। দেবগণের মর্ত্যে আগমন — দুর্গা চরণ রায়।

২৪। দেবেন্দ্রনাথের পত্রাবলী — প্রিয়নাথ শাস্ত্রী সম্পাদিত।

২৫। গোবিন্দদাসের করচা

২৬। বিদ্রোহে বাঙ্গালী — দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়

২৭। সংবাদ প্রভাকর — ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সম্পাদিত
২৮। চৈতন্যদেবের দক্ষিণ ভ্রমণ ॥ ১ম ও ২য় খণ্ড ॥ চারুচন্দ্র শ্রীমানী।
২৯। শ্রীচৈতন্যদেবের উৎকল ভ্রমণ — সারদাচরণ মিত্র।
৩০। গৌড়ীয় বৈষ্ণব শ্রীপাট বিবরণী — হরিদাস দাস।
৩১। গোবিন্দ লীলামৃত — কৃষ্ণদাস কবিরাজ, অনুঃযদুনন্দন দাস।
৩২। শ্রীশ্রীচৈতন্য চরিত্র চিন্তামণি — নরহরি চক্রবর্ত্তী।
৩৩। বিদগ্ধ মাধব — রূপ গোস্বামী ॥ অনুঃ যদুনন্দন দাস ॥
৩৪। ললিত মাধব — রূপ গোস্বামী। অনুঃস্বরূপ চরণ গোস্বামী।
৩৫। গোপাল চম্পু — শ্রী জীব গোস্বামী।
৩৬। মহাপ্রভু শ্রী গৌরাঙ্গ — ডঃ রাধাগোবিন্দ নাথ।
৩৭। চৈতন্য চরিতের উপাদান — ডঃ বিমানবিহারী মজুমদার।
৩৮। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস — ডঃ সুকুমার সেন।
৩৯। ভক্ত সিন্ধু — লচমন দাস।
৪০। হরিবংশ
৪১। গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য — মৃণালকান্তি ঘোষ।
৪২। ভ্রমণকারী বন্ধুর পত্র — মোহনলাল মিত্র সম্পাদিত।
৪৩। শ্রী বৈষ্ণব চরিত অভিধান — অমূল্যধন রায়।
৪৪। বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী — জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাস।
৪৫। 'ব্রজ পরিক্রমা' — নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত।
৪৬। সুরধুনী — দীনবন্ধু মিত্র।
৪৭। Mathura: a District Memoir — Growse.
৪৮। Holy cities of India — Kanwar Lal.
৪৯। Imperial Gazetter of India — Vol XVIII.
৫০। Catalogue of the Archaeological Museum at Mathura — J PH. Vogel, Ph. D.
৫১। History of Ancient Bengal — Dr. R. C. Majumdar.

*

প্রাক্ চৈতন্যযুগে বঙ্গদেশের সঙ্গে বহির্বঙ্গের রাজনৈতিক পরিচয় স্থাপিত হলেও বাংলা সাহিত্যে তার কোন ছাপ পড়েনি। শ্রীচৈতন্যদেবের ভারতবর্ষ পর্যটনকে কেন্দ্র করেই সত্যকারের বঙ্গদেশের সঙ্গে বৃহত্তর ভারতবর্ষের এক আত্মিক যোগ স্থাপিত হয় আর তার প্রতিফলন ঘটে চৈতন্য-জীবনী কাব্য গুলিতে। পরবর্তীকালে বহু বাঙ্গালী নানা সূত্রে ভারতবর্ষের বিস্তীর্ণ অঞ্চল যেমন পর্যটন করেছেন, সেইসব অভিজ্ঞতা নিয়ে রচিত হয়েছে বহু উল্লেখযোগ্য গ্রন্থাদি। 'বাংলা সাহিত্যে বঙ্গেতর ভারত' গ্রন্থটিতে সেই সব বিচিত্র অভিজ্ঞতারই পরিচয় পাওয়া যাবে। ইদানীং যখন জাতীয় সংহতির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে, সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই ধরণের গ্রন্থের যে এক বিশেষ মূল্য আছে তা বলা বাহুল্য মাত্র। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই ধরণের অভিনব গবেষণা ইতঃপূর্বে আর হয় নি।